বাংলা গল্পের উত্তরাধিকার

আহমাদ মোস্তফা কামাল

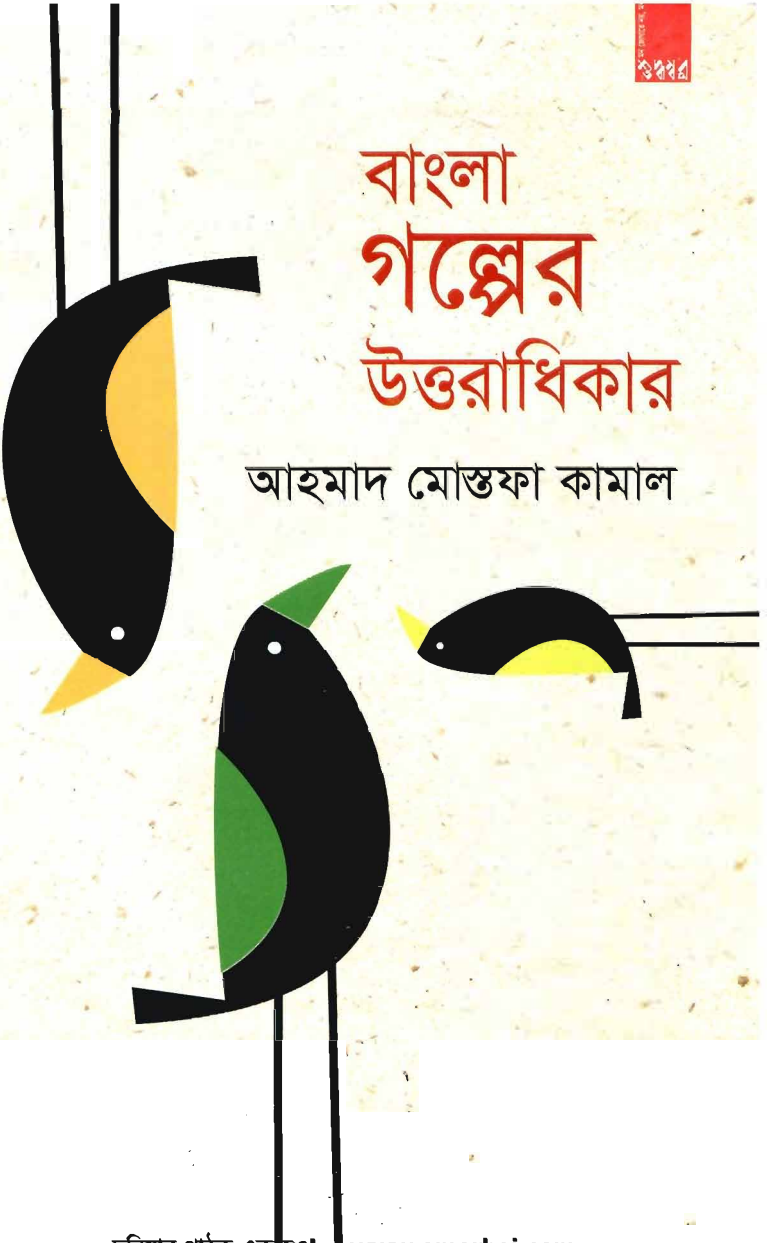

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমাদ মোস্তফা কামালের জন্ম ১৪ ডিসেম্বর ১৯৬৯-এ। পড়াশোনা ঃ পাটগ্রাম সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, মানিকগঞ্জ থেকে এসএসসি; নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বিএসসি ও এমএসসি, এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিল ও পিএইচডি। ছাত্রজীবনে প্রতিটি স্তরে রেখেছেন দুর্দান্ত মেধার স্বাক্ষর, কিন্তু যাবতীয় বৈষয়িক সাফল্যের সম্ভাবনাকে নাকচ করে শুধুমাত্র লেখালেখিকেই জীবনের সকল স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছেন। পেশাগত জীবনের শুরু থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। বর্তমানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ-এ কর্মরত।

লেখালেখির শুরু '৯০ দশকের গোড়া থেকেই।

পুরস্কার :
প্রথম আলো বর্ষসেরা বই ১৪১৩
এইচএসবিসি-কালি ও কলম পুরস্কার ২০০৯
জেমকন সাহিত্য পুরস্কার ২০১৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা গল্পের উত্তরাধিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা গল্পের উত্তরাধিকার

আহমাদ মোস্তফা কামাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন জোগাতে নয়, মন জাগাতে
শুদ্ধস্বর ২০১৪

বাংলা গল্পের উত্তরাধিকার। আহমাদ মোস্তফা কামাল

© লেখক

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

প্রকাশক
আহমেদুর রশীদ চৌধুরী
শুদ্ধস্বর, বি-৬, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড, কাঁটাবন, ঢাকা
৯৬৬৬২৪৭, ০১৭১৬৫২৫৯৩৯
shuddhashar@gmail.com
www.shuddhashar.com

প্রচ্ছদ : তৌহিন হাসান

মূল্য ৫৪০ .০০ টাকা

ISBN : 978-984-90999-9-4

Bangla golper uttoradhikar by Ahmad Mostfa Kamal

Publisher
Ahmedur Rashid Chowdhury
Shuddhashar, B-6, Concord Emporium Shoping Complex
253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road, Kataban, Dhaka

First published in February, 2014

Price $ 540 $ 9 £ 7

এই বইয়ের আংশিক বা পূর্ণ অংশ লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ড অথবা অন্য কোনো তথ্যসংরক্ষণ পদ্ধতিতে যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অনুলিপি করা যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার শিক্ষক

অধ্যাপক মিয়া মুহাম্মদ আবদুল হামিদ শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কলেজে পড়ার সময় এই মহান শিক্ষকের কাছেই আমি শিখেছিলাম
কীভাবে সাহিত্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা গল্পের উত্তরাধিকার ১৩
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : একজন পিতৃপুরুষের গড়ে ওঠা ৯৬
আবু রুশদ: অগ্রজের পথ চলা ১১২
আবু ইসহাক গল্প : ডুবুরীর কৌতুকপূর্ণ চোখ ১২৫
সৈয়দ শামসুল হক : জীবনের চেনা-অচেনা কোণে বহুবর্ণিল আলো ১৩৪
হাসান আজিজুল হক : গল্পে বাঙালির ইতিহাস নির্মাণ ১৪৭
রাহাত খান : 'খুব বেশি আশা করতে নেই' ১৬৭
মাহমুদুল হক : আশ্চর্য অবলোকন ১৭৮
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : নির্দয় সময়ে বেঁচে থাকার দায় ১৯৫
আবদুল মান্নান সৈয়দ : অন্তর্লোকে সাফল্যবিহার ২১৯
হুমায়ূন আহমেদ : গল্পের জাদুকর ২৩৪
ইমদাদুল হক মিলন : গাহে অচিন পাখি ২৪৩
মঈনুল আহসান সাবের : নগর জীবনের ধ্রুপদী রূপকার ২৫৮
শহীদুল জহির : রহস্যের সন্ধানে ২৭৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকার পরিবর্তে দু-একটি কথা

দীর্ঘ সময় ধরে আলস্য ও উদাসীনতার অবহেলা সয়ে অবশেষে সংকলিত হওয়ার সুযোগ পেলো এই গ্রন্থের লেখাগুলো। না, লেখার আলস্য নয়, পাণ্ডুলিপি তৈরির আলস্য ও উদ্যমহীনতা। আমি লিখতে যতটা ভালোবাসি, পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে ততটাই কষ্ট লাগে। এমনিতেই গদ্য লেখার কাজটি আক্ষরিক অর্থেই কামলা খাটার মতো হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কাজ; দিন-রাতের হিসাব থাকে না, একটানা কেবল লিখে যেতে হয়। তাতে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন সবই এলোমেলো হয়ে যায়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি তৈরি করার কাজটি লেখার চেয়ে হাজারগুণ কঠিন। বিশেষ করে প্রবন্ধগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। নিজের লেখা পড়ার মতো বিরক্তিকর কাজ আর কী হতে পারে? যা একবার বলে ফেলেছি, সেগুলো আবার ফিরে দেখার কোনো মানে হয়? শুধু তো পড়া নয়, পড়তে পড়তে এডিট করা, তথ্যসূত্র মিলিয়ে দেখার জন্য হাজারটা বই সামনে নিয়ে বসে থাকা, বারবার প্রুফ দেখা— যেন ভয়াবহ এক শাস্তি হয়েছে আমার! যেন লেখকের জীবন নয়, পেয়েছি এক আসামীর জীবন— এরকম মনে হতে থাকে। ফলে লেখাগুলো পরম ঔদাসীন্যে পড়ে থাকে বছরের পর বছর। এবার মনে হলো— বয়স তো কম হলো না, এসব লেখার একটা বিহিত-ব্যবস্থা করা দরকার। ভাবছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমার আলস্য আর উদ্যমহীনতায় সেটি আর কাজে রূপান্তরিত হচ্ছিল না। আমাকে এই বিপুল দুর্যোগ থেকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন আমারই এক প্রিয় বন্ধু। অগ্রন্থিত লেখাগুলো নিয়ে বসলেন তিনি, কোন লেখাগুলোকে গ্রন্থিত করা যায় তার তালিকা করলেন আমার সঙ্গে আলোচনা করে, অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি পরিকল্পনা বলতে যা বোঝায় আর কি! অনেক লেখা হারিয়ে ফেলেছি শুনে মৃদু বকলেনও। একসময় আমার কম্পিউটার ছিল না, কাগজে-কলমে লিখতাম, সেসব লেখার কোনো সফট কপিও নেই, তিনি সেসবের অনেকগুলোই নিজে কম্পোজ করে দিলেন। পাণ্ডুলিপি তৈরি হওয়ার পর আবার আগাগোড়া পড়লেন, মূল্যবান মতামত জানালেন, একবার প্রুফ দেখার কাজটিও করে দিলেন। বলতে গেলে তারই অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনায় তৈরি হলো এই পাণ্ডুলিপিটি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তিনি, আড়ালে-নির্জনে থাকতে পছন্দ করেন, এমনকি এই ভূমিকায় তার নামটি লেখার অনুমতিও দিলেন না! কিন্তু আমার কাছে তার পঠন-পাঠন আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতামতের গুরুত্ব যে কতখানি সেটি বোধ হয় কোনোদিন বুঝতেই পারেননি তিনি। বুঝলে নাম উল্লেখের ব্যাপারে এমন অনড় হয়ে থাকতেন না। যাহোক, আমি নিজে তো বটেই, এই গ্রন্থের লেখাগুলোও তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে রইলো তাদেরকে উদাসীনতার কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য।

এই প্রবন্ধগুলো ১৯৯২ – ২০০৮ সময়কালে লেখা। ১৯৯২ সালে, আমি তখন এক অতি-তরুণ লেখক, অগ্রজ গল্পকার হুমায়ূন মালিকের উৎসাহে ও অনুরোধে তাঁর সম্পাদিত সাহিত্য সাময়িকীর জন্য একটা প্রবন্ধ মুক্ত গদ্য লিখে দিই। সেই প্রবন্ধটিও এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এরপর গল্প-উপন্যাস লেখার পাশাপাশি আমি প্রায় বিশ বছর ধরে একটানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ মুক্তগদ্য লিখেছি। প্রায় শ'খানেক প্রবন্ধের মধ্যে শিল্প-সমাজ-সংস্কৃতি-দর্শন বিষয়ক বারোটি লেখা নিয়ে এর আগে দুটো গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলো আর গ্রন্থভূক্ত করা হয়ে ওঠেনি।

প্রায় দুই যুগ ধরে আমি বিরামহীনভাবে লিখে চলেছি। ব্যক্তিগত জীবনে কত কত দুর্যোগ এসেছে, মৃত্যুর কালো ছায়া বারবার এসে পড়েছে আমার আপনজনদের ওপর, পারিবারিক বিপর্যয় বলতে যা বোঝায় তা ছিল নিত্যসঙ্গী, এই মৃত্যুগুলোর কারণেই। সময়ের অভাবেও ভুগেছি খুব। লেখক-জীবন বলতে এদেশে কিছু নেই, লেখালেখিকে কোনো 'কাজ' হিসেবে গণ্যই করা হয় না এখানে, লেখালেখি করে জীবিকা নির্বাহও সম্ভব হয় না। চাকরি তো করতেই হয়, তার সঙ্গে আছে পারিবারিক-সামাজিক জীবন। আমার জীবনে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা, গবেষণা ও কাজকর্ম, যেহেতু শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে নিয়েছি আমি। সব কাজ সেরে লেখালেখির সময় বলতে ওই মধ্যরাত। বছরের পর বছর ধরে প্রায় সারারাত জেগে লিখেছি, শরীর ভেঙে পড়েছে, মন অবসাদে ভরে উঠেছে, তবু লেখা থামাইনি কখনো। বরং লেখালেখির ভেতরে ডুবে থেকে সয়ে যেতে চেয়েছি আমার সকল অসহনীয় বেদনার ভার। যেহেতু নিয়মিত লিখেছি এবং সেসবের প্রায় অধিকাংশই পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তাই ওই লেখাগুলোর ভার আমাকে বহন করে যেতে হচ্ছে বহু বছর ধরে। বই হলো এমন একটি বিষয় যা লেখককে একটা ধাপ এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। পুরনো লেখাগুলো গ্রন্থিত হলে নতুন ধাঁচের লেখা শুরু করতে, নতুন লেখা নিয়ে ভাবতে সুবিধা হয় যে-কোনো লেখকের। এই গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আমার অন্য প্রবন্ধগুলোও গ্রন্থিত হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হলো।

এই গ্রন্থভুক্ত প্রতিটি লেখার শেষে রচনাকাল ও প্রথম প্রকাশের তারিখ দেয়া হয়েছে। বানান সমন্বয় এবং দু-এক জায়গায় বাক্য ঠিকঠাক করা ছাড়া মূল বক্তব্যগুলো একই আছে, কোনোরকম পরিবর্তন করিনি। ১৯৯২ সালের লেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ২০০৮ সালের লেখা একইরকম হওয়ার কোনো কারণ নেই, তবু পরিবর্তন না করার কারণটি হলো— এই লেখাগুলোর মাধ্যমে একজন প্রবন্ধ-লেখকের গড়ে ওঠার ধারাবাহিক চিহ্ন ধরা রইলো। রচনাকাল ও প্রথম প্রকাশের তারিখ দেয়ার আরেকটি বিশেষ কারণ আছে। এই লেখাগুলো প্রকাশের সময়ই নানা আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেয় এবং পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। প্রচুর পরিমাণ প্রতিক্রিয়া পেয়েছি এগুলোর জন্য। কিন্তু গ্রন্থভুক্ত না হওয়ার কারণে আমাকে এই লেখাগুলো নিয়ে নানারকম ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। তার একটি— বিনা অনুমতিতে বিভিন্ন কাগজে এগুলোর পুনর্মুদ্রণ, দ্বিতীয়টি— বিনা অনুমতিতে এবং কোনো রকম সূত্র উল্লেখ ছাড়াই আমার লেখা থেকে অবিকল কপি করে নিজের লেখা হিসেবে চালিয়েছেন কেউ কেউ। উদাহরণ দিচ্ছি। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের গল্প : নব্বইয়ের দশক' (প্রকাশকাল : জুন ২০১১) সংকলনটির ভূমিকার একটি বড়ো অংশ আমার 'বাংলা গল্পের উত্তরাধিকার' প্রবন্ধ থেকে হুবহু কপি করা হয়েছে, অথচ কোনো উদ্ধৃতচিহ্ন ব্যবহার বা তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি, সংকলনটির সম্পাদক পাপড়ি রহমান আমার সমকালীন লেখক হওয়া সত্ত্বেও, মৌখিকভাবেও বিষয়টি আমাকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। সংকলনটি হাতে পেয়ে আমি স্রেফ হতভম্ব হয়ে গিয়েছি। ভূমিকার শেষের দিকে যদিও তিনি দয়া করে জানিয়েছেন— 'বিশেষ করে সময়ের লেখক আহমাদ মোস্তফা কামালের *বাংলা গল্পের উত্তরাধিকার* নামক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটির উল্লেখ না করলেই নয়।' — কিন্তু এই বাক্য থেকে কোনোভাবেই বোঝার উপায় নেই যে, তিনি কেবল 'সহায়তা' নেননি, অবিকল নকল করেছেন! এমনকি এ-ও বোঝা সম্ভব নয় যে, ভূমিকার কোন অংশগুলো আমার লেখা থেকে নিয়েছেন তিনি। এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে। ইমাদুল হক মিলনকে নিয়ে আমার লেখাটি থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা হুবহু কপি করেছেন শহিদুল ইসলাম মিন্টু তার 'অন্তরঙ্গ ইমদাদুল হক মিলন' বইটিতে, কোনো তথ্যসূত্র ছাড়াই। এই কথাগুলো বাধ্য হয়েই বলতে হলো। কৌতূহলী পাঠকরা মিলিয়ে দেখতে পারেন। আমি শুধু আমার পাঠকদের এই বলে নিশ্চিত করতে চাই যে, এ প্রবন্ধগুলোর প্রতিটি শব্দই আমার নিজের লেখা, চৌর্যবৃত্তির স্বভাব আমার নেই। উদ্ধৃতি যেগুলো দেয়া হয়েছে, সেগুলোর প্রত্যেকটির তথ্যসূত্রও দিয়েছি।

এই গ্রন্থের নাম-প্রবন্ধ 'বাংলা গল্পের উত্তরাধিকার' ছাড়াও বাংলাদেশের গল্প নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছি আমি। যেমন, 'বাংলাদেশের ছোটগল্প উত্তরাধিকারের পরিপ্রেক্ষিত', 'ষাট দশক আমাদের পথিকৃৎ গল্পকারদের সামান্য মূল্যায়ন', 'তরুণদের গল্প', 'আশির দশকের গল্প', 'আমাদের গল্প : ৫০ বছর', 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের গল্প' প্রভৃতি। যেহেতু 'বাংলা গল্পের উত্তরাধিকার'-এ বাংলাদেশের গল্পচর্চার মোটামুটি সবগুলো দিক স্পর্শ করার চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছি, তাই অন্যগুলো আর গ্রন্থভুক্ত করা হলো না। হয়তো ভবিষ্যতেও ওগুলো অগ্রন্থিতই রয়ে যাবে। নাম-প্রবন্ধ ছাড়াও আরও বারোটি প্রবন্ধ রয়েছে এই গ্রন্থে। ১৯৪০ দশক থেকে শুরু করে ১৯৮০ দশক পর্যন্ত যে-সব লেখক নিরন্তর গল্পচর্চা করেছেন, তাঁদের কয়েকজনকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার চেষ্টা করেছি এসব প্রবন্ধে। তবে, যেহেতু নাম প্রবন্ধেও তাঁদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, তাই একই রকম বা কাছাকাছি ধরনের কিছু আলোচনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা গেল না। আশা করি পাঠকরা বিষয়টিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। গ্রন্থিত লেখাগুলো ছাড়াও আরো অনেক গল্পকার সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে লিখেছি। সবগুলো খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে এবং গ্রন্থের কলেবর আশঙ্কাজনকভাবে বাড়তে থাকায় সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হলো না।

নানা বিপর্যয়ের ভেতরে থেকে লেখালেখি চালিয়ে যাওয়ার দুরুহ কাজটি করতে গিয়ে পরিবার-পরিজন এবং বন্ধুদের বিপুল সহযোগিতা পেয়েছি সবসময়। লেখাগুলো পত্রিকায় প্রকাশের ব্যাপারে সম্পাদকদের আগ্রহ ও আন্তরিকতাও ছিল আমার জন্য খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ব্যাপার। এই সুযোগে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবশেষে, শুদ্ধস্বর-এর প্রকাশক বন্ধু আহমেদুল রশীদ চৌধুরীকে ধন্যবাদ আর্থিক ঝুঁকির চিন্তা মাথায় নিয়েও এই গ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য।

আহমাদ মোস্তফা কামাল
ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা গল্পের উত্তরাধিকার

প্রাককথন

রাজনৈতিক কারণে একটি দেশ ভাগ হয়ে গেলে আসলে কী ভাগ হয়? শুধু ভূমি? শুধু সীমানা? নাকি ভাষা-সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্রকলা-চলচ্চিত্র-নাটক প্রভৃতি সাংস্কৃতিক উপকরণগুলোও? যদি ভাগ না হয় তাহলে কি এই দুটো নতুন দেশে সংস্কৃতির এই উপকরণগুলো একই ভাবে একই ধারায় বিকশিত হয়? আর যদি ভাগ হয়ে যায়, তাহলে দেশের কোন অংশটি অবিভক্ত দেশটির শিল্প-সাহিত্যের মূলধারার ধারাবাহিকতা বহন করে? যে-কোনো একটি, নাকি দুটোই? এইসব প্রশ্ন এখন আমাদের সামনেও অনিবার্যভাবে চলে আসছে। কারণ আমরা, বাংলা নামক দেশটির অধিবাসীরাও, এই রাজনৈতিক বিভাজনের শিকার হয়েছি। ভারতবর্ষ কখনোই এক জাতির দেশ ছিল না। তবু গত শতকের মাঝামাঝিতে ব্রিটিশরাজের কূটচালে এবং ব্রিটিশদের এদেশীয় অনুগত রাজনীতিকদের সহযোগিতায় ভারতবর্ষের ভাগ হয়ে যাওয়াকে আমরা 'দেশভাগ' হিসেবেই বর্ণনা করে থাকি। যদিও এটি কোন দেশ, কার দেশ, কেনই-বা ভারত-ভাগকে আমরা দেশভাগ বলছি সেই প্রশ্নগুলো খুব একটি উত্থাপন করি না। সম্ভবত গত শতকে জেগে ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় উজ্জীবিত চিন্তাশীল অংশটি বাংলা ভাগকেই দেশভাগ হিসেবে বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন। সেটি বোঝা যায় গত শতকের শুরুতে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এই চিন্তাশীল অংশের তীব্র প্রতিক্রিয়ার ধরন দেখেই। তাঁরা বঙ্গভঙ্গকে মানেননি। সম্ভবত বাংলা অঞ্চলকে তাঁরা একটি দেশরূপেই কল্পনা করতেন। (বিপরীত মতটিও ভুলে যাচ্ছি না যে, তাঁরা এই বিরোধিতায় নেমেছিলেন সাম্প্রদায়িক মানসিকতার কারণে। এই মতটি খুব প্রবলভাবেই বিদ্যমান, এবং সেটিও হয়তো সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়।) যাহোক, বাংলাভাগ বা দেশভাগের ফলে সৃষ্ট দুটো পৃথক রাষ্ট্রে বাঙালি সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক উপাদান প্রবাহিত হলো পৃথক দুটো ধারায়। এই রচনায় বাংলাদেশের ছোটগল্পের ইতিহাস এবং উত্তরাধিকারের পরিপ্রেক্ষিতটি— এর সাফল্য-ব্যর্থতা, অর্জন-অক্ষমতা— খুবই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার মতো বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাস ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহ্যও প্রবাহিত হতে লাগলো দুটো সমান্তরাল ধারায়। দেশভাগের ষাট বছর পর বাংলা ছোটগল্পের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের স্থান কোথায়? চল্লিশ দশকের সেই বিহ্বল সময়ে হাতে গোনা যে কজন নবীন লেখক ভাগ হয়ে যাওয়া দুটো ধারার একটির দায়িত্ব সযত্নে তুলে নিয়েছিলেন নিজেদের কাঁধে, তাদেরই তো উত্তরাধিকার আজকের বাংলাদেশের সাহিত্য। কতটকু এগিয়েছি আমরা? এইসব প্রশ্নেরও একটা সুলুক-সন্ধান করার চেষ্টা থাকবে এই লেখায়।

রবীন্দ্রনাথ থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলা গল্পের স্বর্ণ-সময়

বাংলা ছোটগল্পের সৌভাগ্য যে, এর জন্ম হয়েছিল এবং শৈশব-কৈশোরে এটি পরিচর্যিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মতো এক মহান শিল্পীর হাতে। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। বাংলা উপন্যাসের জন্মই হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মতো একজন জাতশিল্পীর হাতে। এই একটি ক্ষেত্রে বাংলা কথাসাহিত্য পৃথিবীর যে-কোনো দেশের কথাসাহিত্য থেকে আলাদা, ইউনিক। আর কোনো দেশে গল্প বা উপন্যাসের জন্ম এককভাবে কোনো লেখকের হাতে হয়নি, জন্মেই এতটা পরিচর্যা পায়নি, এত দ্রুত পত্রপল্লবে বিকশিতও হয়নি। এ-কথা নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবেন না যে, বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের মতো আর কোনো শিল্পমাধ্যমই এত দ্রুত এমন মানসম্পন্ন ও মর্যাদার আসন তৈরী করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাদীপ্ত মমতা ও ভালোবাসায় বেড়ে উঠছিল বলেই হয়তো বাংলা ছোটগল্প অতি অল্প সময়ে পাঠকদের যথেষ্ঠ মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথের গল্প-চর্চার সময়কাল খুব বেশি নয়— অথচ এই সময়ের মধ্যেই বহুবিচিত্র বিষয় ও চরিত্র, আর নির্মাণ কৌশলের চমৎকারিত্বে ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠেছিল বাংলা গল্পের ভুবন।

রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই এ প্রশ্ন জাগে যে, কোনোরকম পূর্ব-ঐতিহ্য ছাড়াই হঠাৎ করে তিনি গল্প লেখা শুরু করলেন কীভাবে? কীভাবেই বা এতটা সফল হলেন? ওরকমটি মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ করে গল্প লেখা শুরু করেননি। তাঁর প্রথম গল্প-প্রচেষ্টার চিহ্ন রয়েছে ১২৮৪ বাংলা সনের ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভিখারিণী' আখ্যানে। কিন্তু বিষণ্ন-রোমান্টিক এই আখ্যানটি গল্প হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিল। এর বছর-সাতেক পর প্রকাশিত হয় তাঁর আরও দুটো 'গল্প'— 'রাজপথের কথা' এবং 'ঘাটের গল্প'। কিন্তু এ দুটো গল্পেও 'ছোটগল্পশিল্পী' রবীন্দ্রনাথের কোনো চিহ্ন মেলে না। তাঁর প্রথম শিল্পসফল গল্প 'দেনাপাওনা' প্রকাশিত হয় ১২৯৮ সালে। অর্থাৎ প্রথম গল্প-চেষ্টার ১৪ বছর পর তিনি প্রথমবারের মতো একটি সফল গল্প লিখতে সক্ষম হন এবং তারপর থেকেই তাঁর গল্প রচনার জোয়ার আসে। মনে হয়, যেন এতদিনে তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত আঙ্গিকটি খুঁজে পেয়েছেন। শুধু ১২৯৮-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩০২ এই পাঁচবছরের মধ্যেই তাঁর ৪৪টি গল্প সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে অনেকগুলোই পরবর্তীকালে পাঠকদের কাছে গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। 'পোস্টমাস্টার' 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' 'কঙ্কাল' 'একরাত্রি' 'কাবুলিওয়ালা' 'ছুটি' 'মধ্যবর্তিনী' 'সমাপ্তি' 'নিশীথে' 'দিদি' 'ক্ষুধিত পাষাণ' 'অতিথি' 'ইচ্ছাপূরণ' প্রভৃতি এই সময়েরই গল্প। পরবর্তী ১৫ বছরে তাঁর রচনার সংখ্যা যেমন কমে আসে (মাত্র ২১টি), তেমনি মানসম্পন্ন গল্পের সংখ্যাও কমে আসে। এই সময়ে রচিত গল্পগুলোর মধ্যে 'নষ্টনীড়' 'মণিহারা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এরপর 'সবুজপত্র'কে কেন্দ্র করে ১৩২১-১৩২৪ সাল সময়কালের মধ্যে লেখা তাঁর গল্পগুলোতে বিষয় ও আঙ্গিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন আসে, শিল্পকুশলতায়ও ধরা পড়ে অধিকতর সচেতনতার ছাপ। 'হৈমন্তী' 'স্ত্রীর পত্র' 'শেষের রাত্রি' 'অপরিচিতা' প্রভৃতি এই সময়েরই রচনা। এরপর থেকেই তাঁর গল্প রচনার ঝোঁক কমে আসে, এবং ১৩২৫ থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গল্প তিনি রচনাও করেননি। এই সময়ে রচিত ১৪টি গল্পের মধ্যে পরবর্তীকালের পাঠকদের মধ্যে 'বলাই' আর 'ল্যাবরেটরি' ছাড়া আর কোনো গল্প তেমন গুরুত্ব পায়নি। একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, গল্পচর্চা শুরু করার আগেই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনা শুরু করেছিলেন এবং 'বউঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' উপন্যাস দুটো প্রকাশ করেছিলেন। এরপর তাঁর উপন্যাস রচনায় দীর্ঘ বিরতি লক্ষ করা যায়, এবং গল্প রচনার জোয়ার আসে। প্রথম উপন্যাস প্রকাশের প্রায় ১৬ বছর পর যখন তাঁর 'চোখের বালি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ততদিনে তিনি অনেকগুলো সার্থক ছোটগল্প লিখে ফেলেছেন, এবং গল্প লেখার সেই জোয়ারকাল পার করে এসেছেন। মনে কি হয় না, উপন্যাসের চেয়ে গল্পেই তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন, যার ফল— পাঁচ বছরে ৪৪টি গল্প?

আরেকটি প্রসঙ্গও উত্থাপন করা দরকার। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আগে ছোটগল্প রচিত হয়নি বলে যে ধারণাটি সাধারণ্যে প্রচলিত আছে, সেটি সর্বাংশে সত্য নয়। ১৮৯২ সালে প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'সংগ্রহ' এবং একই বছরে প্রকাশিত স্বর্ণকুমারী দেবীর 'নব কাহিনী বা ছোট ছোট গল্প' বই দুটোই বাংলা সাহিত্যের প্রথম গল্প রচনার চেষ্টা। তবে এই দুই লেখক হয়তো গল্পের শিল্পমূল্যের ব্যাপারে খুব বেশি নিশ্চিত ছিলেন না, আঙ্গিক সম্বন্ধেও সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি বলেই মনে হয়। তবু তাঁদের নাম উল্লেখিত হওয়ার দাবি রাখে এজন্যই যে, তাঁরাই প্রথম এই শিল্পমাধ্যমটি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিপুল প্রভাবের কাছে তাঁর সমসাময়িক প্রায় সবার নামই ডুবে গেছে, ফলে এই দুজনও যথার্থ মর্যাদা পাননি।

রবীন্দ্রনাথ এই শিল্পমাধ্যমটির কথা কেন-কীভাবে ভেবেছিলেন সেই প্রশ্নের সুরাহা করা সহজ নয়। তাঁর তো কোনো পূর্ব-ঐতিহ্য ছিল না, সম্পূর্ণ নিজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্যোগে একটি নতুন শিল্পমাধ্যমের জন্ম দেয়া তো কঠিন ব্যাপার। তিনি এটা সম্ভবপর করে তুলেছিলেন কীভাবে? তিনি কি বিশ্বসাহিত্যের ছোটগল্প সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, সেসবের প্রভাব কি তাঁর ওপর পড়েছিল? রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে, আলোচনায়, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিভিন্ন স্মৃতিকথায় এই তথ্য নিশ্চিতভাবেই জানা গেছে যে তিনি গোগোল, চেকভ, টুর্গেনিভ, টলস্টয়, গোর্কি, দস্তয়েভস্কি, মোপাঁসা, বালজাক, ফ্রাঁস, স্কট, ডিকেন্স, আরভিং, অ্যালান পো, মার্ক টোয়েন প্রমুখের গল্পের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। এমনকি কারো-কারো গল্প তিনি রীতিমতো দাগ দিয়ে পড়েছিলেন! তাছাড়া নিজের বাড়িতে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়মিত গল্প পড়ে শোনাতেন বলে তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ আছে। সব মিলিয়ে বাংলায় কোনো গল্প না পেলেও বিশ্বসাহিত্যে গল্প নিয়ে যা কিছু হচ্ছিল সেটি তিনি ভালো করেই জানতেন। ছোটগল্পের শিল্পকৌশল সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা ছিল পরিষ্কার।

সাহিত্যের পাঠকদের কাছে রবীন্দ্রনাথের গল্প সম্বন্ধে বলাটা বাতুলতা মাত্র। রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে একজন ভারতীয় লেখক, অমিত চৌধুরী, একবার মন্তব্য করেছিলেন— 'রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এরকম বলা হয় যে প্রতিটি ভাব, প্রতিটি অনুভূতি, যা একজন বাঙালী সারা জীবনে অনুভব করেছে তা সবই তিনি তাঁর গানে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমি এ ছাড়াও আরও কিছু অনুভব করি— আলোর প্রতিটি ডুবে যাওয়া এবং ভেসে ওঠা, পথিকের প্রত্যেকটি পথ, ভোরের ফুল, যা সেই পথে পড়েছিল আর অজানিতে পথিকের পায়ের আঘাতে এলোমেলো হয়ে গেছে, প্রত্যেক হাওয়া, প্রত্যেক মৃদু বাতাস যা দীপশিখাকে বিচলিত করে— এ সমস্তই রবীন্দ্রনাথের গানে গোপন জায়গা নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্রনাথের গল্প সম্বন্ধেও বোধ হয় একই কথা বলা যেতে পারে। এত বিষয়-বৈচিত্র্য, এত ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র; অনুভূতির এত ব্যাপক বিভিন্নতার ব্যবহার তাঁর গল্পে ঘটেছে যে, এর তুলনা মেলা কঠিন।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের এক প্রধান অংশ জুড়ে আছে নিসর্গ, নিসর্গের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের আচরণের ওপর নিসর্গের প্রভাব ইত্যাদি (যেমন— পোস্টমাস্টার, একরাত্রি প্রভৃতি)। কিছু গল্পের মূল বিষয় প্রেম (যেমন— দুরাশা, সমাপ্তি, মাল্যদান, একরাত্রি, নষ্টনীড় প্রভৃতি)। তবে এর কোনোটিই আমি-তুমি, তুমি-আমি মার্কা প্রেমের গল্প নয়, বরং এসব গল্পে জটিল মানবচরিত্রের উন্মোচন আছে, আছে মানব-মনের রহস্যময় আচার-আচরণের শিল্পিত প্রকাশ। দিদি, পণরক্ষা, মাস্টারমশাই, শেষের রাত্রি, শাস্তি, রাসমণির ছেলে প্রভৃতি গল্পের মূল বিষয় পারিবারিক সম্পর্ক (শরৎচন্দ্রের ওপর কি এইসব গল্পের প্রভাব পড়েছিল?)। কিছু গল্পে আবার সামাজিক সংস্কার ও প্রথাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতেও ছাড়েননি তিনি (যেমন— প্রায়শ্চিত্ত, অপরিচিতা, স্ত্রীর পত্র, নামঞ্জুর, একটি আষাঢ়ে গল্প,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পত্তি সমর্পণ প্রভৃতি)। 'নিশিথে' 'মণিহারা' 'ক্ষুধিত পাষাণ' অতিপ্রাকৃত গল্প। রবীন্দ্রনাথের গল্পে একটা উল্লেখযোগ্য জায়গা দখল করে আছে শিশু-কিশোররা। কখনো তিনি কিশোরদের চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে চেয়েছেন, কখনো-বা তাদের চোখের ভেতরে যে লুকায়িত জগৎ আর স্বপ্ন তার ছবি আঁকতে চেয়েছেন। কখনো হয়তো তাদের চোখেই পৃথিবীকে দেখাতে চেয়েছেন তাঁর পাঠককে। এসব গল্পে কিশোররাই প্রধান চরিত্র, যেমন— 'অতিথি', 'ছুটি', 'বলাই' প্রভৃতি। আবার কোনো কোনো গল্পে কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তরণের যে রহস্যময় ক্রান্তিকাল তাকে বুঝতে চেয়েছেন, বোঝাতে চেয়েছেন; দেখতে চেয়েছেন এই বয়ঃসন্ধিকালের অন্তর্গত আনন্দ ও বেদনা, সুখ ও দুঃখ; যেমন— 'সমাপ্তি' বা 'পোস্টমাস্টার'। শুধু তাই নয়, কখনো তিনি দেখিয়েছেন— শিশুদের কর্মকাণ্ড কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে বড়োদের জীবন ও জগৎ, উন্মোচন করে একেকজন বয়স্ক মানুষের অচেনা রূপ ও বৈশিষ্ট্য, কীভাবে নিজেদের অজান্তেই প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠে শিশুরা; যেমন— 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' বা 'কাবুলিওয়ালা'।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিষয়, চরিত্র-চিত্রণ, নির্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি—

> 'গল্পগুচ্ছ আমাদের গ্রাম ও শহরের সবরকম মানুষের পরিচয় দিয়েছে। জমিদার, মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষ কেউ বাকি নেই। এবং অসাম্প্রদায়িক উদার শিল্পবোধ সবসময়েই কাজ করেছে। মানুষের স্নেহ-মমতা-বাৎসল্য, নিঃসঙ্গতা, যন্ত্রণা, উৎপীড়ন, অত্যাচার, বিদ্রোহ, মুক্তিচেষ্টা ও আত্মসচেতনার বিচিত্র স্থান তাঁর গল্পে আছে। আছে নারীর যন্ত্রণা, সমবেত আত্মত্যাগ, প্রতিবাদ ও মুক্তির ছবি, দেহগত সতীত্বকে ঠেলে দিয়ে ভয়ংকর স্বাতন্ত্রে দাঁড়াবার চেষ্টা।...গল্পের বর্ণনাভঙ্গিতেও রবীন্দ্রনাথ নানারকম বৈচিত্র্য এনেছেন। কখনো বক্তা-লেখক, কখনো আত্মকথনের ভঙ্গি, কখনো বক্তা-লেখক থেকে শুরু করেছেন পরে নায়ক আত্মকথনে চলে গেছে, কখনো কিছুটা বর্ণনা, কিছুটা চিঠি, কখনো নাট্যকারের লেখা, কখনো বা ফ্যান্টাসি বা রূপকথার ছলে সামাজিক প্রথা বা কোনো অমানুষিক প্রবৃত্তির দিকে পয়েন্টিং ফিঙ্গার।'

মনে কি হচ্ছে না, প্রিয় পাঠক, এখনো আমাদের গল্পে প্রধানত এই বিষয়গুলোই চর্চিত হয়ে থাকে?

রবীন্দ্রনাথের পর প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্র-প্রমথ চৌধুরীর হাত পেরিয়ে, কল্লোল গোষ্ঠীর 'বিদ্রোহী' তরুণদের প্রতিভাদীপ্ত সৃষ্টিশীলতা আর তিরিশের লেখকদের অসাধারণ স্পর্শ ও যত্নে বাংলা গল্পের বড়ো হয়ে ওঠা। বিশ শতকের শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে চল্লিশ দশক— বাংলা ছোটগল্পের এই স্বর্ণসময়ে কত ভাবেই না এর বাঁক পরিবর্তন ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের আগেই নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং স্বর্ণকুমারী দেবী গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন— সে কথা আগেই বলেছি। পরবর্তীকালে স্বর্ণকুমারী দেবীর কোনো ধারাবাহিকতা আমাদের চোখে না পড়লেও এখন পর্যন্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত অন্তত একটি বিষয়ে পিতৃপুরুষের মর্যাদা দাবি করতে পারেন। সেটি হলো বাংলা রহস্যগল্প বা গোয়েন্দাগল্প। তিনিই প্রথম এই ধরনের গল্প লিখতে শুরু করেন। হয়তো সেগুলো খুব বেশি শিল্পসফল ছিল না, কিন্তু পরবর্তীকালের এই ধারার লেখকরা নিশ্চয়ই তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করবেন। পরবর্তীকালে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি দে, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও পরে সত্যজিত রায় এই ধরনের গল্প রচনায় সাফল্য দেখিয়েছেন।

একইভাবে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ব্যঙ্গগল্প বা স্যাটেয়ারধর্মী গল্পের জনক হিসেবে অভিহিত হতে পারেন। 'ডমরুচরিত' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আর ডমরুধর এখন পর্যন্ত ধুরন্ধর-চালবাজ-ধাপ্পাবাজ চরিত্র হিসেবে বাংলা গল্পে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আছে। পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খানিকটা স্যাটায়ারধর্মী গল্প লিখে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, যদিও এর সবচেয়ে সফল প্রয়োগ ঘটে পরশুরামের গল্পে। পরশুরাম অবশ্য নানাদিক থেকেই তীক্ষ্ণ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। সনাতন মূল্যবোধে বিশ্বাসী এই লেখক একসময় রঙ্গ-ব্যঙ্গের মধ্য দিয়েই সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিকে তীব্রভাবে আঘাত করেছেন। হাস্য-রসাত্মক গল্প রচনায় শিবরাম চক্রবর্তীর সাফল্যও ছিল তুঙ্গস্পর্শী।

রবীন্দ্র সমসাময়িককালে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় খুবই পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। তাঁর ছিল স্বল্প পরিসরে গল্প জমিয়ে ফেলার দক্ষতা, বিষয়-বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি, হাস্য-কৌতুকের সঙ্গে মানুষের প্রতি এক গভীর মমতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে তিনি পাঠক-হৃদয় জয় করেছিলেন। তাঁর কথক ভঙ্গিটিও লক্ষ করার মতো। তাঁর গল্পে, পাঠকের কৌতূহলের কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়ার একটা প্রবণতাও চোখে পড়ে। পরবর্তীকালে লেখকরা এই বিষয়টিকে পুরোপুরিভাবে পাঠকের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। এমনকি, যে-কোনো তথ্য, হোক তা দুর্লভ, ব্যবহার করলেও লেখকরা এখন আর তার ব্যাখ্যা বা পরিচিতি দিতে বাধ্যবাধকতা বোধ করেন না— প্রভাতকুমার যা করতেন। পরবর্তীকালে বৈঠকি ঢঙের গল্পে পরশুরাম এবং প্রমথনাথ বিশী চমৎকারিত্ব দেখিয়েছিলেন।

প্রভাতকুমারের পর বাংলা সাহিত্যের আরেক বিস্ময়জাগানিয়া শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভাবিত পাঠকপ্রিয়তার বিষয়টি নিয়ে ভাবার অবকাশ আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁকে উপেক্ষা করাটা এখন একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু যিনি প্রায় এক শতাব্দী ধরে একটি ভাষার আপামর পাঠকগোষ্ঠীকে মোহমুগ্ধ করে রাখতে পারেন— তাঁর ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। সম্ভবত বাংলাসাহিত্যে তিনিই প্রথম এবং এখন পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী পাঠকপ্রিয় লেখক। তিনি তাঁর জীবনকালেই যেমন এই জনপ্রিয়তার স্বাদ পেয়েছিলেন, তেমনি মৃত্যুর এই এতদিন পরও তাঁর জনপ্রিয়তায় এতটুকু ভাটা পড়েনি। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে সম্ভবত এমন একটি বাড়িও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে একজন-দুজন শিক্ষিত লোক আছেন অথচ শরৎচন্দ্রের একটি-দুটি লেখা পড়েননি। এই বিস্ময়কর পাঠকপ্রিয়তার কারণ কি? এ-কথা সবাই স্বীকার করবেন যে, শরৎচন্দ্রের বিষয়-নির্বাচন এবং বর্ণনাভঙ্গিতে এমন এক জাদু আছে যে পাঠককে তা আবেগপ্রবণ করে তুলবেই। তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়বেন আর চোখের কোণে জল জমবে না— এমন পাষাণ-হৃদয় পাঠক এখনো বাঙালি জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেনি, হয়তো করবেও না। তাঁর লেখা পড়ে ওই সময়ও পাঠকরা কেঁদেছে, আজও কাঁদে, ধারণা করি আগামীতেও কাঁদবে। জানি, অজর-অনড়-পক্বকেশ অধ্যাপকরা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলবেন— পাঠককে কাঁদানো কোনো লেখকের উদ্দেশ্য হতে পারে না, কেউ তা করতে সক্ষম হলেও সেটাকে লেখকের সাফল্য বলে বর্ণনা করা উচিত নয়! মানছি এ কথা। কিন্তু ওই দাঁত-মুখ খিচানো বুদ্ধিজীবীও যে শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ে কেঁদেছেন (হয়তো কিশোর-কিশোরীদের মতো বা নরম মনের তরুণ-তরুণীদের মতো বা জীবনযুদ্ধে পরাজিত পরিণত বয়সের বিপন্ন মানুষটির মতো কেঁদে বুক ভাসাননি, কিন্তু তার চোখ যে ভিজে উঠেছে সে ব্যাপারে আমি শতভাগ নিশ্চিত), এর ব্যাখ্যা কী? মোট কথা— পাঠক যে ধরনেরই হোন না কেন, শরৎচন্দ্রের লেখা যে তার কোমল অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে সেটা অস্বীকার করা যাবে না। আর তাঁর সাফল্য ওখানেই। সম্ভবত শরৎচন্দ্রই প্রথম লেখক যিনি বাঙালির আবেগ-আকাঙ্ক্ষার স্থানগুলো সূক্ষ্মভাবে চিহ্নিত করে সেগুলোকে নিপুণ দক্ষতায় ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। একজন মানুষের যেমন কিছু স্পর্শকাতর বিন্দু থাকে, সে-সব বিন্দুতে আঘাত পেলে, এমনকি স্পর্শ পেলেও, সে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে— রেগে যায়, স্মৃতিকাতর হয়, উচ্ছ্বসিত হয়, বা চোখ ভিজে ওঠে; একটি জাতিরও তেমন কিছু স্পর্শকাতর-আবেগবিন্দু থাকে। সেই আবেগবিন্দুগুলোকে চিনে নেয়া অত্যন্ত দুরূহ কাজ। শরৎচন্দ্র হচ্ছেন বিশ্বসাহিত্যের সেই বিরলতম লেখক যিনি একটি জাতির তেমনই একটি আবেগবিন্দুকে খুব ভালোভাবে শনাক্ত করেছিলেন আর নিজের করণ-কৌশলকে সেই বিন্দুর অনুগামী করে তুলেছিলেন। তিনি জেনে ফেলেছিলেন, ঠিক কোন বিন্দুতে টোকা পড়লে বাঙালির চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। আর এই জাতির অন্তর্গত পাঠকরা তাঁর লেখায় নিজেদের আবেগ-বিন্দুটিকে আবিষ্কার করে বলেই শরৎচন্দ্র এখনো এত বিপুলভাবে পঠিত হন। তিনি যে শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবেগকে উসকে দেয়ার জন্যেই লিখেছেন এ কথা বললেও তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। বরং পারিবারিক-সামাজিক জীবনপ্রবাহের দৃশ্যবহুল বর্ণনা দিয়েছেন, প্রয়োজন মতো বিষয়গুলোকে নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, বাংলার গ্রাম, বাংলার নিসর্গ অনুপুঙ্খ বর্ণনায় ধরা পড়েছে তাঁর লেখায়, সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসগুলোকে নির্মমভাবে আঘাত করেছেন। তবু আমার মনে হয়, তাঁর সাফল্য নিহিত আছে বাঙালির আবেগকে চমৎকারভাবে ধারণ করার মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের পর বাংলা ছোটগল্প প্রথমবারের মতো বাঁক পরিবর্তন করলো কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণদের হাতে। এঁরা ছিলেন আধুনিক মনস্ক, জীবনের ক্লেদাক্ত চিহ্নগুলোও উপেক্ষা করার মতো বিষয় ছিল না তাঁদের কাছে, নর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে শরীরই যে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে— একথা বলতে দ্বিধা করলেন না তাঁরা। মূলত তাঁরা ছিলেন পাশ্চাত্য-দর্শন প্রভাবিত যুবক— মার্কসীয় দর্শন, ফ্রয়েডের যৌন-মনস্তত্ত্ব, স্বদেশের মাটিতে স্বাধীনতাকামী যুবকদের সশস্ত্র আন্দোলন নিশ্চয়ই তাঁদেরকে আলোড়িত করেছিল। এ সময়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসু— এই তিন প্রতিভাবান তরুণের সঙ্গে জুটেছিলেন জগদীশ গুপ্তের মতো এক আশ্চর্য গল্পকার। আরও ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও মনীশ ঘটক। একটি বিষয় লক্ষ করার মতো— বাংলা গল্পের জন্ম হয়েছিল একজন কবির হাতে, আবার প্রথমবারের মতো বাঁক পরিবর্তনে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁরাও (প্রেমেন্দ্র, অচিন্তকুমার, বুদ্ধদেব) সকলেই কবি। কাকতালীয়! হতে পারে। কিন্তু এর কোনো প্রভাব কি বাংলা গল্পে পড়েছে? জন্মমুহূর্তে এবং প্রাথমিক বয়সে কবিদের হাতে চর্চিত হয়েছে বলেই কি বাংলা গল্পের ভাষায় গদ্যের খটখটানির চেয়ে কবিতার মাধুর্য ঝরে পড়ে? বিষয়টি ভেবে দেখার মতো।

যাহোক, প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনের ক্লেদাক্ত অভিজ্ঞতা, অবক্ষয় ও হতাশার মধ্যেও মানুষের সম্ভাবনাকে খুঁজেছেন, ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেননি মোটেই, চরিত্র-চিত্রণে ছিলেন অস্বাভাবিক-রকমের সচেতন, প্রকরণে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর গল্পের বিষয় ও প্রকরণ বহুমাত্রিকতার প্রচুর চিহ্ন রেখে গেছে। নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ, তাদের জীবন ও বাস্তবতা যেমন তাঁর গল্পে জায়গা করে নিয়েছে তেমনি এক অতলপ্রবাহী রোমান্টিকতা তাঁর গল্পকে করে তুলেছে মাধুর্যময়। তাঁর 'তেলেনপোতা আবিষ্কার' গল্পটি এর নির্মাণ-শৈলীর কারণেই তুলনারহিত হয়ে আছে। এর আগে বা পরে এমন আর একটি গল্পও লেখা হয়নি বাংলা সাহিত্যে। 'পুন্নাম' 'গোপনচারিণী' 'শুধু কেরানী' 'স্টোভ' 'ভূমিকম্প' 'রবিনসন ক্রুসো মেয়ে ছিলেন' 'পোনাঘাট পেরিয়ে' 'সাগর সঙ্গম' প্রভৃতি গল্পও তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের অবচেতন মনোজগতের খুঁটিনাটি বুদ্ধদেব বসুর কলমে উঠে আসতো এক আশ্চর্য কুশলতায়, আর তাঁর ছিল সেই অসামান্য ভাষামাধুর্য— যে-কোনো লেখকের জন্যই যা ঈর্ষার বস্তু। সেই সংস্কারাচ্ছন্ন সময়টিতে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বিতর্কিত লেখক। অশ্লীলতার অভিযোগে তুমুলভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন বুদ্ধদেব। 'প্রত্যক্ষ কামক্রীড়ার চিত্র' তিনি আঁকেননি 'কিন্তু স্বগত চিন্তায়, সম্ভোগ বাসনার বর্ণনায় এবং প্রায় শরীর-ছোঁয়া ভাষার যে দুঃসাহসী পরীক্ষা তিনি করেছেন, সে যুগের শালীনতাবোধ ও রুচিকে সেই পুঙ্খানুপুঙ্খতা ঘা দিয়েছে।' অবশ্য মানুষের যৌনজীবন ভাবনায় বাংলা গল্পে বুদ্ধদেবই প্রথম নন, এর আগে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং মণীন্দ্রলাল বসু এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন। এ দুজনকে কল্লোল গোষ্ঠীর পূর্বসুরীও বলা যায়। সম্ভবত বাংলা কথাসাহিত্যে নরেশচন্দ্রই প্রথম 'যৌন-আবেগ ও অপরাধ মনস্তত্ত্বের' সার্থক চিত্র তুলে ধরেন, আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় গল্পে আঞ্চলিক ভাষার ব্যহার করতে শুরু করেন এবং যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। এর প্রভাব কি তারাশঙ্করের ওপর পড়েছিল? সাঁওতালদের জীবন নিয়ে তিনি যে গল্পগুলো লিখেছিলেন সেগুলো তখন পর্যন্ত বাংলা গল্পে অপরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে মহাশ্বেতা দেবী এই ধারায় প্রচুর কাজ করেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর গল্পগুলোও মনস্তাত্ত্বিক— সেই সঙ্গে তাঁর ভাষা ছিল 'আলঙ্কারিক'। সবদিক দিয়েই তাঁর গল্পের বহুমাত্রিকতা পাঠককে দীর্ঘকাল ধরে মুগ্ধ করে রেখেছে।

জগদীশ গুপ্ত ছিলেন এ সময়ের এক আশ্চর্য লেখক। একজন লেখক কীভাবে সারাজীবন ধরে শুধু জীবনের ক্লেদাক্ত-পরাজিত-জঘন্য-নির্মম-নিষ্ঠুর অর্থাৎ যাবতীয় নেতিবাচক পরিণতির কথা এত নির্মোহ-নিরাসক্ত ভঙ্গিতে লিখে যেতে পারেন— ভাবলে অবাক হতে হয়। প্রেম ও মমতা, স্বপ্ন ও সম্ভাবনা, আদর্শ ও মূল্যবোধ, সুস্থতা ও সৌন্দর্যবোধ এইসব যাবতীয় ভালো ভালো কথাবার্তা তাঁর গল্পে চিরদিনই নির্মমভাবে উপেক্ষিত থেকে গেছে। তাঁর আগে বা পরে এইরকম আপাদমস্তক নৈরাশ্যমণ্ডিত লেখকের কথা আর মনে পড়ে না। 'দিবসের শেষে' 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' 'আদিকথার একটি' 'কলঙ্কিত সম্পর্ক' এইরকম আরও বহু গল্প তাঁর নৈরাশ্যপীড়িত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়।

প্রকরণের দিক থেকে বনফুল যে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছিলেন, তাঁর আগে বা পরে এরকমটি আর কখনো বাংলা গল্পে দেখা যায়নি। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে— 'পোস্টকার্ড সাইজের'— এসব গল্পে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-পরিহাস-উপহাসের ছলে তিনি এঁকেছিলেন মানব জীবনের পতন ও মুখোশের ছবি, শুধু আঁকাটুকুই, আর কিছু নয়। কোনো ইঙ্গিত নেই, কোনো ক্ষোভও নেই যেন, শুধুই দেখিয়ে দেয়া, হয়তো পাঠককে একটু সচেতন করে তোলার মনোবাসনাও থেকে থাকবে, তবে তা প্রকট নয়, শুধু এইটুকু জানানো— এই হচ্ছে পতন ও পাপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময়ের আরেক লেখক মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) তাঁর গল্পে অন্তজ শ্রেণীর, বিশেষ করে অপরাধী বলে পরিচিত মানুষদের নিয়ে নিরাসক্ত বর্ণনায় যেসব গল্প লিখেছিলেন সেগুলোকে বলা যায় 'বিশ-তিরিশের দশকের কলকাতার অসামাজিক মানুষের মানবিক দলিল।' পরবর্তীকালে সমরেশ বসুর ওপর এই গল্পগুলোর প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয়। সব মিলিয়ে এই সময়ের লেখকরা যেমন রূঢ় বাস্তবতাকে তুলে আনতে চেয়েছেন তেমনি রোমান্টিকতাকেও বিসর্জন দেননি। বলা যায়, বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্টিকতার একধরনের সুষম সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা।

কল্লোল গোষ্ঠীর আগে-পরে আরও কয়েকজন গল্পকারের নামোল্লেখ করা যেতে পারে— উপরোক্তদের মতো এতটা গভীর প্রভাববিস্তারী না হলেও গল্পচর্চায় যাঁদের আন্তরিকতার অভাব ছিল না। এঁরা হচ্ছেন— নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, জলধর সেন, আবদুল ওদুদ, কাজী নজরুল ইসলাম, দীনেশরঞ্জন দাশ, মনীন্দ্রলাল বসু, মনোজ বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, এমদাদ আলী, ইমদাদুল হক প্রমুখ।

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে এই সময়টি এক অসামান্য সৃষ্টিশীলতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রতিভাদীপ্ত ও মেধাবী গল্পশিল্পীরা আসর জমালেন এই সময়েই। গড়ে তুললেন ছোটগল্পের সমৃদ্ধ ভুবন। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের তুমুল সক্রিয়তার সময়েই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ ঘটলো তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দোপাধ্যায়ের।

এ তিনজনই একে অপর থেকে যথেষ্ট রকমের আলাদা, কিন্তু তাঁরা সম্মিলিতভাবেই যেন তৈরী করছিলেন এক সমগ্রতার বোধ— এ বোধ মানবস্বভাব, সমাজ-জীবন ও দার্শনিক উপলব্ধির। একই সময়ে ক্রিয়াশীল অন্যান্য লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, এই তিন বন্দোপাধ্যায় উত্তরকালে বাঙালি পাঠককে এত তুমুলভাবে আলোড়িত করেছেন যে, এর তুলনা মেলা ভার।

গল্পকার হিসেবে তারাশঙ্করের সাফল্য অবশ্য আমার কাছে খুব ঈর্ষণীয় মনে হয় না (উপন্যাসে তিনি এর চেয়ে অনেক বেশ স্বচ্ছন্দবিহারী, সুদূরপ্রসারী ও সফল), তবু তিনি পাঠককে নতুন একটি আস্বাদ দিতে পেরেছিলেন। গ্রামীণ জীবনকে উপজীব্য করেছিলেন তিনি, তার রূপায়নে যথেষ্ট মনোযোগীও ছিলেন এবং প্রথমবারের মতো ব্যবহার করেছিলেন আঞ্চলিক শব্দাবলি অসাধারণ এক কুশলতায়। অবশ্য আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে শৈলজানন্দের কথাও স্মরণ করতে হয়।

এই সময়ের লেখকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ যেন খানিকটা ব্যতিক্রম। বিষয়বস্তু হিসেবে তিনিও বেছে নিয়েছিলেন গ্রামকেই, তবু তার গ্রামগুলো যেন একটু আলাদা। সেখানে দ্বন্দ-সংঘাতমুখর বাস্তবতার চেয়ে 'ছায়া-সুনিবিড় গ্রামখানি'র চিত্রই বেশি চোখে পড়ে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের জীবনে দারিদ্র আছে, গ্লানি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাজয় আছে, কিন্তু বেঁচে থাকার প্রেরণাও আছে। নিত্যদিনের ক্লেদাক্ত জীবন-যাপনের চেয়ে তাঁর কাছে বৃহত্তর জীবনবোধই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ফলে তাঁর চরিত্রগুলো কোনো-না-কোনোভাবে তাদের সমস্যাগুলো পাশ কাটিয়ে বেঁচে থাকার প্রেরণায় জারিত হয়। এক গভীর মমতা ও ভালোবাসায় তাঁর চরিত্রগুলো নির্মিত হয়, গ্রামগুলো চিত্রিত হয়— যা পাঠককে আবিষ্ট করে তোলে।

রবীন্দ্রনাথের পর এসব উজ্জ্বল লেখকদের হাতেই নির্মিত হচ্ছিল বাংলা গল্পের বহু-বিচিত্র ভুবন। এঁদের প্রতিভাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই— আর তাঁদের প্রতি সেই শ্রদ্ধা রেখেই লিখছি— মানিক বন্দোপাধ্যায়ের মেধা-প্রতিভা-শিল্পবোধ-সমাজচেতনা যে-কোনো সাহিত্যশিল্পীর চেয়ে ঈর্ষণীয়ভাবে ব্যতিক্রম— অন্তত কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর শিল্প চেতনাকে আমার কাছে অনন্য বলে মনে হয়েছে। এত স্বল্প পরিসরে তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করা থেকে সঙ্গত কারণেই বিরত থেকে আনন্দ বাগচীর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি—

> 'মার্কসীয় অন্বয় এবং বিজ্ঞান বোধের অন্বীক্ষা নিয়ে যুগপৎ 'কেন'র উত্তর খুঁজেছেন তিনি। প্রায় আত্মঘাতী দুঃসাহসে ক্লেদপঙ্কিল জীবন ছুঁয়ে ছেনে দেখেছেন। যে চোরাকুঠুরির রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে সহবাসী জীবন ও যৌনতা পরস্পরের টুটি ছিঁড়ে নিতে উদ্যত মানিকের সজাগ কলমে তার চতুস্কোন উদ্ভাসিত।... তাঁর গল্পের একটিই তুলনা যেন যথার্থ হয়, *অমৃত— বিষের পাত্রে।*'

কল্লোল ও বন্দোপাধ্যায়ত্রয়ের পথ ধরেই এলো চল্লিশের দশক। গল্পকার হিসেবে এলেন সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সতীনাথ ভাদুড়ী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। এর পরপরই এলেন বিমল মিত্র, গৌরকিশোর ঘোষ, বিমল কর, সমরেশ বসু, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। সুখের বিষয়— এই সময়কালেই বাংলাদেশের কথাসাহিত্য ও শিল্পরুচি নির্মাণের প্রাথমিক দায়িত্ব নিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, শওকত ওসমান, আবু ইসহাক, সরদার জয়েনউদদীন, মাহবুব-উল-আলম, আবু রুশদ, সোমেন চন্দ, আবু জাফর শামসুদ্দিন, শাহেদ আলী, রশীদ করীম, শামসুদ্দিন আবুল কালাম প্রমুখ।

একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন— '৪০ দশকের আগ পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যে পূর্ববঙ্গের মানুষ ও তাদের জীবন প্রায় উপেক্ষিতই ছিল। বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর কোনো উল্লেখযোগ্য উপস্থাপনা এই সময়ে চোখে পড়ে না। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জলধর সেন, আবদুল ওদুদ, এমদাদ আলী, ইমদাদুল হক প্রমুখের লেখায় মুসলমান জনজীবনের চিত্র খানিকটা ধরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়লেও সমগ্র বাংলা কথাসাহিত্যের তুলনায় তা ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, অনুল্লেখযোগ্য। অন্তত এই সময়ের লেখা পড়লে বাঙালি জাতির অর্ধেক অংশকে খুঁজে পাওয়া যাবে না— যেন তাদের কোনো অস্তিত্বই নেই। এর কারণও হয়তো ছিল। মুসলমান জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকে তেমন কোনো শক্তিমান কথাশিল্পী '৪০ দশকের আগে আত্মপ্রকাশ করেননি, অন্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের কাছে এই জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ-বিশ্বাস-সংস্কার সবই অচেনা ছিল। একটি 'লালসালু' লেখার জন্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যোগ্যতম লেখক, এমনকি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষেও সেটি লেখা সম্ভব ছিল না। তো, '৪০ দশক থেকে পূর্ববাংলার মানুষ এবং বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠী নিজেদের ছবি দেখতে শুরু করলো বাংলা কথাসাহিত্যে। এই দিক থেকে সময়টি বাংলা কথাসাহিত্যের জন্য আরেকটি টার্নিং পয়েন্ট। আর এই বাঁক ফেরার মুহূর্তে, চল্লিশ দশকের সেই বিহ্বল সময়ে, বাঙালী মুসলমান যখন অতিক্রম করছে এক অভূতপূর্ব ক্রান্তিকাল— দ্বিজাতিতত্ত্বের আফিম খেয়ে ভুল স্বপ্নে মেতে ওঠা এক বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠীর স্বপ্ন-কল্পনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংস্কার, মূল্যবোধ ও জীবনাচরণের সচিত্র সচল উপস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র সাহিত্যকর্মী। কবিতা ও কথাশিল্পে এই প্রথম একসঙ্গে কয়েকজন মেধাবী, অঙ্গীকারাবদ্ধ, সৃষ্টিশীল, আধুনিক-মনস্ক তরুণ পাওয়া গেল এই অঞ্চলে— যাঁদের নাম একটু আগেই উল্লেখ করেছি।। এঁদের ছিল ঈর্ষা করার মতো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গল্প-উপন্যাস সম্ভার, কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না— তাঁদের সামনে খুব গভীর একটি সমস্যাও ছিল। একটি নতুন রাষ্ট্র আর তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা স্বপ্ন, মানুষের জীবনাচরণে নব্য রাষ্ট্রের নতুন ধরনের খবরদারি ভূমিকায় সৃষ্ট দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এত সহজে রূপায়ন করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, যেহেতু এ অঞ্চলের মানুষ, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান, এতদিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মোটামুটিভাবে উপেক্ষিতই ছিল, ফলে এক্ষেত্রে কোনো ঐতিহ্যের ভাগীদার তাঁরা হতে পারেননি। ততোদিনে বাংলা গল্প তার শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে সম্ভাবনাময় ও দিব্যকান্তি তরুণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই সময়কালে যাঁরা এলেন পেছনে ফিরে তাকানোর কোনো পথই তাঁদের জন্য খোলা ছিল না— সামনেই ছিল তাঁদের দৃষ্টি। এঁদের গল্পের শিল্পচেতনা, জীবনবোধ ও সাহিত্যমূল্য সেই প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং বাংলাদেশের গল্প

রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তিরিশের দশক পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্পে যা-কিছু কাজ হয়েছে, সেই উত্তরাধিকারকে ধারণ করেই চল্লিশের দশকে যাত্রা শুরু করেছিলেন পূর্ব বাংলার তরুণ লেখকরা। তারপর প্রায় ষাট বছরের ইতিহাস। এরই মধ্যে বাংলাদেশের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এসেছে গভীর ও ব্যাপক পরিবর্তন। ভাষা আন্দোলনের মতো অনন্য ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের মতো অসামান্য ত্যাগের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে। বাঙালির জন্য সৃষ্টি হয়েছে এক পৃথক আবাসভূমি— বাংলাদেশ। অথচ এত ত্যাগ ও সংগ্রামের পরও দেশটি নানাদিক থেকেই অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। এতসব বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়নি পশ্চিম বাংলার লেখকদের। ফলে দুই ধারায় প্রবাহিত বাংলা সাহিত্য এখন নিশ্চিতভাবেই পৃথক চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে। এই রচনায় বাংলাদেশের ছোটগল্পের সেই গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি খুঁজতে চেষ্টা করেছি।

প্রাথমিকপর্ব

প্রতিটি জাতির জীবনে ক্রান্তিকাল আসে, আর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়— কতিপয় আলোকপ্রাপ্ত মানুষ ওই ক্রান্তিকালে নিজেদের কাঁধে তুলে নেন এমন সব দায়িত্ব যা সেই জাতির ভবিষ্যৎ চলার পথ তৈরি করে দেয়। গত শতকের ৪০-এর দশক পূর্ব বাঙালিদের জীবনে ছিল তেমনই এক ক্রান্তিকাল। দেশভাগের সেই বিহ্বল সময়ে যে কজন আলোকপ্রাপ্ত অগ্রসর মানুষ বাঙালি মুসলমানের শিল্পবোধ, সাহিত্যচেতনা, দর্শনচিন্তা ও জাতিসত্তার স্বরূপ নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁদের অন্যতম এবং অবশ্যই উজ্জ্বলতর, সচেতন, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ও লক্ষ্যমুখী। হাজার বছরের ঐতিহ্য ও আঘাতে লালিত ও বিক্ষিপ্ত এই জনপদের মানুষগুলো তাদের সমস্ত সংস্কার ও বিশ্বাস, সংকট ও সম্ভাবনা, স্বপ্ন ও হতাশা, অর্থাৎ সমস্ত ইতি ও নেতিবাচকতাসহ এই প্রথম ঠাঁই পেলো কোনো শক্তিমান সাহিত্যশিল্পীর সৃষ্টিতে। এই প্রথম কোনো লেখক প্রায় পূর্ব-ঐতিহ্য ছাড়াই এদেরকে তাঁর চিন্তা ও স্বপ্ন ও সৃষ্টির অর্ন্তগত করে নিলেন। তাঁর আগে বাঙালি মুসলমান লেখকের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন এবং কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কেউই এতটা শক্তিমত্তার পরিচয় দেননি। বাংলা কথাসাহিত্য যখন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের যুগ পেরিয়ে মানিক, বিভূতি, তারাশঙ্করের অসামান্য প্রতিভায় উদ্ভাসিত— বাঙালি মুসলমান তখন রচনা করছে 'আনোয়ারা' বা 'আব্দুল্লাহ'র মতো উপন্যাস! সমকাল থেকে এ যে কতটা পিছিয়ে থাকা, ভাবা যায় না। এই অবস্থার মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এসে জানিয়ে দিলেন, পূর্ব বাঙালিদের পিছিয়ে থাকার যুগ শেষ হয়েছে— এখন থেকে রচিত হবে বাংলা সাহিত্যের নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস! মাত্র তিনটে উপন্যাস— 'লাল সালু', 'কাঁদো নদী কাঁদো' ও 'চাঁদের অমাবস্যা', দুটো গল্পগ্রন্থ— 'নয়ন চারা' ও 'দুই তীর', দুটো নাটক— 'তরঙ্গভঙ্গ' ও 'বহিপীর', বত্রিশটি অগ্রন্থিত গল্প, একটি কিশোর নাটক ও একটি একাঙ্কিকা এবং আরও কিছু অগ্রন্থিত রচনা, এই নিয়েই তিনি যে আমাদের প্রধান লেখক, উত্তরকাল যে তাঁকে বরাবরই দেখেছে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের চোখে— তার কারণ তো শুধুমাত্র এই নয় যে, তিনি শুধুই একজন কথাশিল্পী। তিনি বরং তৎকালীন পূর্ববাংলা আর আজকের বাংলাদেশের কথাসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে পালন করেছেন পিতৃপুরুষের ভূমিকা। বাংলা সাহিত্যের আবহমান ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার ধারণ করেও অচিরেই তিনি বুঝে গিয়েছিলেন— পূর্ববাংলার মানুষের জীবন-যাপন, তাদের সংস্কৃতি ও ভাষা পশ্চিমবঙ্গীয় জীবন-যাপন, সংস্কৃতি ও ভাষা থেকে বেশ খানিকটা আলাদা। লক্ষ্যমুখী ছিলেন তিনি, সচেতন তো বটেই, ফলে আমরা দেখতে পাই— বিভাগ-পূর্বকালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থে ব্যবহৃত পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষারীতি থেকে সচেতনভাবেই নিজেকে সরিয়ে এনেছেন তিনি। তিনিই প্রথম— অত্যন্ত সফলভাবে এবং নিপুণ কুশলতায়— এতদিন পর্যন্ত সাহিত্যে উপেক্ষিত এ অঞ্চলের মানুষকে তাঁর সাহিত্যে তুলে আনলেন তাদের মৌলিক ও দৈনন্দিন জীবনাচরণসহই— এমনকি তাদের মুখের ভাষাটিও আর উপেক্ষিত রইলো না। কী হবে আমাদের ভাষারীতি, ক্রিয়াপদের ব্যবহারে কীভাবে পরিবর্তন আনা যায়— অবিলম্বে এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে এই অঞ্চলের জন্য তিনি তৈরী করেছিলেন এক গ্রহণযোগ্য ভাষারীতি এবং ব্যবহার করেছিলেন সংখ্যাহীন আঞ্চলিক শব্দ, যা ছাড়া এই জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ সঠিকভাবে ফোটে না, যা তাঁকে পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্য ঐতিহ্য থেকে স্পষ্টতই আলাদা করে ফেললো। এজন্য তাঁকে পেরোতে হয়েছে এক রুক্ষ, অমসৃণ, দীর্ঘপথ। তাঁর গল্পসমগ্র পড়লে অন্তত এ-কথাই মনে হয়। নিজের গন্তব্য সম্বন্ধে ছিলেন সচেতন— কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন, এ বিষয়ে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না, সংশয় ছিল না। পাকিস্তানি ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধের যখন জয়জয়কার চলছে এ দেশে, এ জাতিকে কেবলই মুসলমান হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে, তখন তিনি বাঙালি মুসলমানের বাঙালিত্বকেই বড়ো করে দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন, এই অঞ্চলের আবহমান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ছায়ায় বেড়ে ওঠা জাতিটি শুধু মুসলমানই নয়— বরং বাঙালিত্বই তাদের প্রধান পরিচয়। তিনি তাই তাঁর পাঠকদেরকে অন্যান্য অনেকের মতো আরব-মুসলমানের গৌরব-গাঁথা শোনাননি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন যথার্থই আধুনিক, সবকিছু মিলিয়ে এই যে জনগোষ্ঠী, তিনি তাদেরকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে।

গ্রন্থিত-অগ্রন্থিতসহ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্প সংখ্যা পঞ্চাশটির মতো। সমাজ সচেতন ছিলেন তিনি, রিয়্যালিস্টিক, পরে অস্তিত্ববাদের দিকে ঝোঁক দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলেও, তাঁকে এ অঞ্চলের প্রথম সফল রিয়্যালিস্টিক কথাশিল্পী বললে ভুল হয় না। কিন্তু এক জায়গায় থেমে থাকেননি তিনি। উপন্যাসে যেমন—'লাল সালু' ও 'কাঁদো নদী কাদো'র মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, গল্পেও তাই। ফলে 'নয়নচারা'য় দুর্ভিক্ষপীড়িত বিপন্ন মানুষ যেমন তার গল্পের চরিত্র হলো কিংবা 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে দেশভাগের ফলে শেকড়হারা মানুষ, তেমনি 'দুই তীর' গল্পে প্রেমহীন সংসার জীবনের ক্লান্ত মানুষ। তাঁর গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি সবচেয়ে ভালোভাবে টের পাওয়া যায় অগ্রন্থিত গল্পগুলো পড়লে। বাঙালি মুসলমানের নানাবিধ জীবনচিত্র এসব গল্পে রূপায়িত, কিন্তু বোঝা যায়— কখনো-কখনো কোনো-কোনো বিষয়ে তিনি যেন সিদ্ধান্তহীনও। ঠিক কীভাবে এই জনগোষ্ঠী গল্পের বিষয়বস্তু হতে পারে— এ নিয়ে যেন বেশ খানিকটা চিন্তিত দেখা যায় তাঁকে। ফলে 'চৈত্র দিনের এক দ্বিপ্রহরে', 'ঝোড়ো সন্ধ্যা', 'প্রাস্থানিক', 'পথ বেঁধে দিল' প্রভৃতির মতো দুর্বল গল্পও তাঁকে লিখতে দেখা যায়। এসব গল্প ওয়ালীউল্লাহর লেখা ভাবতে কষ্ট হয়, কিন্তু আমরা যদি তাঁর সময়টিকে বিবেচনা করি, তাহলে হয়তো এর একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানো সম্ভব হতে পারে। একটি জনগোষ্ঠীকে যেহেতু প্রায় পূর্ব-ঐতিহ্যহীনভাবে তিনি তাঁর গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু করতে চাইছেন— এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর জন্য প্রয়োজন ছিল। অতএব মানুষ তার সংকট-সম্ভাবনা-পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের ব্যক্তি জীবনের সূক্ষ্ম অনুভব, এমনকি গদগদ প্রেমের পরিপ্রেক্ষিতটিও এলো। ওই একই সময়ে তিনি নির্মাণ করেছেন ওইসব দুর্বল গল্প, আবার রচনা করেছেন 'ছায়া', 'দ্বীপ', 'মানুষ', 'রক্ত ও আকাশ' প্রভৃতি অ্যাবস্ট্রাক্ট বর্ণনাসমৃদ্ধ ধ্রুপদী গল্প, যেগুলো যে-কোনো সময়কালে যে-কোনো স্থানের জন্যই প্রযোজ্য। এসব গল্পের এক ধরনের বিশ্বজনীন গ্রহণযোগ্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। 'স্বপ্ন নেবে এসেছিল' র মতো অদ্ভুত প্রেমের গল্প, 'ও আর তারা'র মতো ফর্ম ও ভাষা সচেতন প্রেমের গল্প, 'নকল', 'স্বপ্নের অধ্যায়'র মতো নতুন দেশ প্রাপ্তির ফলশ্রুতিতে মানুষের পরিবর্তিত স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার গল্প, 'মাঝি'র মতো মানব স্বভাবের চমৎকার ব্যাখ্যা সম্বলিত গল্প—এই রকম আরও অনেক ধরনের বিষয় ভাবনা ও চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে দিয়ে তিনি বাংলাদেশের গল্পের জন্য একটি চমৎকার ভবিষ্যৎ গড়ে দিলেন। পরবর্তী জীবনে উপন্যাসের দিকে ঝুঁকে পড়া, প্রবাস জীবনের ফলে দেশের সাহিত্যের সঙ্গে এক ধরনের স্বেচ্ছা-বিচ্ছিন্নতা, ও লেখার পরিমাণ কমিয়ে আনার ফলে তাঁর গল্প-চর্চায় ভাটা পড়ে। তবু বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ভুবনে তিনি পালন করেছেন পিতৃপুরুষের ভূমিকা। ওই সময়কালে এত সচেতন, লক্ষ্যমুখী, ও প্রতিভাবান লেখক আর চোখে পড়ে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কয়েকটি গল্প বেশ দুর্বল ও অগভীর। যেমন : 'সীমাহীন এক নিমিষে', 'চৈত্র দিনের এক দ্বিপ্রহরে', 'ঝোড়ো সন্ধ্যা', 'প্রাস্থানিক', 'পথ বেধে দিলো...', 'অনুবৃত্তি', 'সাত বোন পারুল', 'স্বপ্ন নেবে এসেছিল', 'কালচার', 'বংশের জের', 'মৃত্যু', 'সতীন', 'স্বগত' প্রভৃতি। এসব গল্পে আমাদের চেনা ওয়ালীউল্লাহর ভাষাভঙ্গি, ঋজুতা, মানসিক টানা-পোড়েন নির্মাণে দক্ষতা, সচেতনতা, চরিত্র-চিত্রণের কুশলতা, শিল্পমূল্যের ব্যাপারে তীক্ষ্ণ সচেতনতা ইত্যাদি খুব একটা চোখে পড়ে না। বরং চোখে পড়ে হালকা চালে ইচ্ছাপূরণের প্রবণতা, চরিত্রের ওপর উৎকট জীবনবোধ আরোপের চেষ্টাও খুবই দৃষ্টিকটুভাবে সহজলভ্য, আর অদ্ভুত অমনোযোগিতা পাঠককে প্রায় বিরক্ত করে তোলে। আবার কিছু গল্প আছে মাঝারি মানের। যেমন, 'সেই পৃথিবী', 'পরাজয়', 'খুনী', 'রক্ত', 'খণ্ড চাঁদের বক্রতায়', 'দুই তীর', 'পাগড়ি', 'মালেকা', 'চিরন্তন পৃথিবী', 'প্রবল হাওয়া ও ঝাউ গাছ', 'হোমেরা', 'স্থাবর', 'সূর্যালোক', 'অবসর কাব্য', 'স্বপ্নের অধ্যায়', 'সবুজ মাঠ', 'নানীর বাড়ির কেল্লা' প্রভৃতি। এসব গল্পে তিনি জীবন সম্বন্ধে যেন একটি উপলব্ধিতে উপনীত হতে চেয়েছেন, নিজের বৈশিষ্ট্যগুলোকে উজ্জ্বল করে তুলতে চেয়েছেন পাঠকের কাছে; জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে, সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপন করে পাঠককে ভাবিয়ে তুলেছেন। মনে হয় যেন তিনি এগিয়ে চলেছেন তাঁর ঋজু ও দৃঢ় সংবদ্ধ ভাষারীতি ও বিশ্লেষণী স্বভাবের দিকে, যা দিয়ে উত্তরকালের সমস্ত পাঠককে চমকে দেবেন। আর অন্য গল্পগুলো গভীর জীবনদর্শনসমৃদ্ধ ও উন্নত শিল্পমানসম্পন্ন— যেমন, 'নয়নচারা', 'জাহাজী', 'মৃত্যুযাত্রা', 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী', 'গ্রীষ্মের ছুটি', 'স্তন', 'কেরায়া', 'মতিনউদ্দিনের প্রেম', 'মানুষ', 'ছায়া', 'দ্বীপ', 'মানসিকতা', 'ও আর তারা', 'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা', 'মাঝি', 'নকল', 'রক্ত ও আকাশ', 'না কান্দে বুবু' প্রভৃতি। এগুলোর কোনো-কোনোটি সব মিলিয়ে সৃষ্টি করে জীবন সম্বন্ধে এক গভীর দার্শনিক বোধ, কোনো-কোনোটির রচনারীতি ও নির্মাণকৌশলের চমৎকারিত্ব পাঠকের দৃষ্টি কাড়ে, কোনোটি আবার উত্থাপন করে চিরন্তন প্রশ্ন। এর যে-কোনো একটি কারণেই একটি গল্প শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারে এবং পাঠক হৃদয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব তৈরি সৃষ্টি করতে পারে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মৃত্যুর আগে প্রকাশিত দুটো গল্পগ্রন্থে তাঁর মাত্র সতেরটি গল্প গ্রন্থিত হয়েছিল। ধারণা করি, তাঁর অগ্রন্থিত গল্পগুলোর মধ্যে অনেকগুলো তিনি নিজেই বাতিল করে দিতেন— অন্তত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থদুটোর গল্প নির্বাচনের দিকে তাকালে সে কথাই মনে হয়— কিন্তু অসামান্য কিছু গল্প তিনি কেন গ্রন্থভুক্ত করেননি সেটা বোঝা দায়। সম্ভবত গল্পগুলোকে তিনি খানিকটা দলছুট বলেই বিবেচনা করতেন। 'মানুষ', 'ছায়া', 'দ্বীপ', 'রক্ত ও আকাশ', 'না কান্দে বুবু' প্রভৃতি গল্প তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা পাল্টে দেয়। এসব গল্পের গভীর রহস্যময়তা, কুশলী প্রতীকময়তা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসামান্য দার্শনিকতা, চমৎকার নির্মাণশৈলী আজও পাঠককে আপ্লুত করে। তার জীবনকালে গ্রন্থিত গল্পগুলো ঠিক এসব বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেনি। কোনো সুনির্দিষ্ট ধারাভূক্ত না হলেও মূলত সৈয়দের মনোবিশ্লেষণের প্রবণতা গ্রন্থভূক্ত গল্পগুলোতে বেশ ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে। তাঁর চরিত্ররা যে শ্রেণী-পেশারই হোক না কেন— তাদের দৈনন্দিন জীবনের নির্মম বাস্তবতার চেয়ে তাঁর কাছে তাদের মানস-জগৎটিই অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। 'নয়নচারা', 'জাহাজী', 'মৃত্যুযাত্রা', 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী', 'গ্রীষ্মের ছুটি', 'স্তন', 'মতিনউদ্দিনের প্রেম' প্রভৃতি গল্পে তিনি যতটা না বাস্তবতা নির্মাণের কারিগর, তারচেয়েও বেশি মনোবিশ্লেষক— যদিও তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাটি ঠিক এর উল্টো। আবার 'স্বপ্নের অধ্যায়' গল্পে এই জাতি সম্বন্ধে তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার রূপায়ন দেখি। গল্পটি রচিত হয়েছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই, কিন্তু সেখানে তিনি পাকিস্তানি ভাবাদর্শে লালিত মুসলমানের কথা শোনাননি, শোনাননি আরব-মুসলমানের গৌরবগাঁথাও, এ জাতিকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বিবেচনা করে তাকে সংস্কারমুক্ত, উদার, প্রগতিশীল করে গড়ে তোলার স্বপ্ন তাঁর এ গল্পে ধরা পড়েছে। তবে স্বীকার করে নেয়া ভালো যে, তাঁর গল্পে রাজনীতি-ভাবনা বা সচেতনতা খুব সুলভ নয়। বরং তাঁকে বলা যেতে পারে বাংলাদেশের প্রথম এবং প্রধানতম দার্শনিক কথাশিল্পী। আর তাঁর গল্পের গুরুত্ব এখানেই। মানুষের মনোজগতের নানাবিধ কার্যকলাপ আর দার্শনিক ভাবনাচিন্তা রূপায়নে তাঁর সাফল্য প্রশ্নাতীত। বলা যেতে পারে এ-কথাও, একটি নতুন দেশে তিনি খুলেছিলেন কথাসাহিত্যের এক নতুন স্কুল যার ভাষা-বিষয়-দার্শনিক প্রতীতী ছিল তাঁর পূর্বসুরীদের চেয়ে আলাদা— আজকের বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকরা সেই স্কুলেরই গর্বিত ছাত্র।

আবু ইসহাকও এসময়ের শক্তিমান গল্পকার। তাঁর গল্পে সমাজের ম্লিবিত্ত-শ্রমজীবী-সংগ্রামী মানুষের জীবনযাপনের সূক্ষাতিসূক্ষ চিত্র খুব সফলভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। শ্রেণী সচেতন ছিলেন তিনি, সামাজিক বৈষম্যগুলো খুব ভালো ধরতে পারতেন— 'জোঁক'-এর মতো এমন সফল প্রতীকী গল্পের মাধ্যমে শোষণের সর্বগ্রাসী রূপটিকে চিহ্নিত করার উদাহরণ বাংলা গল্পে খুব বেশি নেই। মাত্র একুশ বছর বয়সে, ১৯৪৬ সালে, তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস— 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'। প্রকাশক না পেয়ে বছর-পাঁচেক পরে লেখেন রহস্যোপন্যাস 'জাল'— কিন্তু সেটি প্রকাশের আগেই 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র প্রকাশ ঘটে, এবং অচিরেই পরিণত হন দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লেখকে। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, খুব বেশি সামনেও তাকাননি তিনি। যে পরিমাণ সক্রিয়তা-সচলতা-নিরবিচ্ছিন্নতা থাকলে একজন লেখকের পক্ষে সব-সময় পাঠক এবং সহযাত্রী ও উত্তরসূরি লেখকদের মনোযোগের কেন্দ্রে থাকা সম্ভব হয়, তা তাঁর ছিল না কোনোদিন। তিনি যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতখানি অনিয়মিত ছিলেন, সেটি তাঁর গ্রন্থগুলোর প্রকাশকালের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'। এরপর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'হারেম' ১৯৬২ সালে। কিন্তু পাঠকরা বইটির মুখ দেখার আগেই তা পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়— এই সংবাদ লেখক আমাদেরকে জানাচ্ছেন বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের সময়, কুড়ি বছর পর, ১৯৮২ সালে! তা, এতদিন লাগলো কেন দ্বিতীয় সংস্করণ হতে? লেখক জানাচ্ছেন— তাঁর কাছে পান্ডুলিপিটির কোনো কপি ছিল না, অতএব নানা জায়গা থেকে গল্পগুলো জোগাড় করতে করতে বিশ বছর চলে গেছে! প্রথম গল্পগ্রন্থের এই পরিণতির ফলেই হয়তো দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থটি একটু তাড়াতাড়ি আলোর মুখ দেখেছিল। ১৯৬৩ সালে এটি— 'মহাপতঙ্গ'— প্রকাশিত হয়। তারপর দীর্ঘ এক বিরতি। ১৯৮২ সালে 'হারেম'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ— এক অর্থে প্রথম সংস্করণই, কারণ এটিই পাঠকের কাছে পৌঁছেছিল, তারপর ১৯৮৬ সালে দ্বিতীয় উপন্যাস 'পদ্মার পলিদ্বীপ'। এটির মুখবন্ধে লেখক আবার আমাদের জানাচ্ছেন— উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৬০ থেকে ১৯৮৫! পঁচিশ বছর! এক অর্থে এটিই তাঁর শেষ রচনা। কারণ ১৯৮৯ সালে তার রহস্যোপন্যাস 'জাল' প্রকাশিত হলেও এটি তিনি লিখেছিলেন সেই ৫০ দশকের গোড়ার দিকে। তাঁর শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ— 'স্মৃতি বিচিত্রা', প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে। সাকুল্যে এই তাঁর রচনা। অর্থাৎ দুটো উপন্যাস, দুটো গল্পগ্রন্থ, একটি রহস্যোপন্যাস, একটি স্মৃতিকথা। প্রায় ষাট বছরের দীর্ঘ লেখক জীবনে এই রচনার পরিমাণকে আমরা কি বলবো— সামান্য, নাকি নগণ্য? অবশ্য সেই ৬০-দশক থেকেই তিনি একটি বড় কাজ করছিলেন— *আঞ্চলিক বাংলা অভিধান* রচনার কাজ— মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে করে গেছেন। একটি কথা এখানে বলা দরকার, আবু ইসহাকের দুটো উপন্যাসেরই— 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' ও 'পদ্মার পলিদ্বীপ'— বিষয়বস্তু গ্রামের মানুষ, গ্রামীণ সমাজ ও জীবন বলে অনেকেরই ধারণা যে, তিনি শুধু গ্রাম নিয়েই লিখতেন। বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে সেরকম নয়, গল্পে তিনি কাজ করেছেন বিবিধ বিষয় নিয়ে। কখনো-কখনো বিষয় হিসেবে এসেছে ধর্মীয় কুসংস্কার কিংবা নিম্নবিত্তের মানুষের মানবিক আচরণ, কখনো-বা নাগরিক জীবন। তাঁর দুটো গল্পগ্রন্থভূক্ত একুশটি গল্পের মধ্যে 'জোক' এবং 'আবর্ত'— মাত্র এই দুটো গল্পে তীব্রভাবে গ্রামীণ জীবন এসেছে। 'দাদীর নদীদর্শন', 'শয়তানের ঝাড়ু', 'বোম্বাই হাজী' প্রভৃতি গল্পে গ্রামীণ সমাজের দেখা মিললেও এগুলোর মূল উদ্দেশ্য গ্রামীণ সমাজ ও জীবনের বর্ণনা নয়— ধর্মীয় কুসংস্কারের জালে বন্দি মানুষের গল্প বলা হয়েছে এগুলোতে। অন্যদিকে 'উত্তরণ', 'কানাভুলা', 'বিস্ফোরণ' প্রভৃতি গল্প নিম্নবিত্তের মানুষ নিয়ে লেখা হলেও তাদের দৈনন্দিন জীবনের বহুবিধ সংকটের বর্ণনা নেই এসব গল্পে, রয়েছে সাধারণ মানুষদের মধ্যে অসাধারণ মানবিক বোধের উন্মোচনের গল্প। যেমন 'কানাভুলা'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্পে ধর্মীয় কুসংস্কারের (পীরপ্রথা, ঝাড়ফুক, তাবিজ-কবজ ইত্যাদি) বিরুদ্ধে সুকৌশল প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে এক রিকশাচালকের মাধ্যমে। কিংবা 'উত্তরণ' গল্পে এক প্রতারক দুধ-বিক্রেতার ভেতরে পিতৃস্নেহের উন্মোচন চমৎকার একটি গল্পের মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আবার 'বনমানুষ', 'প্রতিবিম্ব', 'বর্ণচোর' প্রভৃতি গল্পের বিষয়বস্তু নাগরিক জীবন। নাগরিক জীবন নিয়ে তাঁর গল্পগুলো গতানুগতিক নয়— শহুরে মানুষ ও জীবনের মধ্যে লুকায়িত ভন্ডামি ও শঠতার উন্মোচন রয়েছে কোনো-কোনো গল্পে, কোনো গল্পে রয়েছে নাগরিক যন্ত্রণার চমৎকার বিবরণ। তবে প্রায় সব গল্পেরই বর্ণনার মধ্যে রয়েছে একটু কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। আর এই বর্ণনাই তাঁর গল্পকে উপভোগ্য করে তোলে পাঠকের কাছে। উদাহরণ হিসেবে 'বন মানুষ'-এর কথা বলা যেতে পারে। গল্পটি ১৯৪৭ সালে লেখা, কলকাতা শহরের পটভূমিতে। এক যুবক বনবিভাগের চাকরি ছেড়ে নতুন চাকরি নিয়ে এসেছে শহরে, দ্বিগুণ মাইনে ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ে। গল্পটিতে ওই যুবকের ভাষ্যে রচিত হয়েছে কলকাতা শহরে তার একটি দিন কাটানোর অভিজ্ঞতার কথা। অত্যন্ত কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে লেখক দেখেছেন নাগরিক কার্টেসি, ম্যানার, ফর্মালিটিজ ইত্যাদিকে এবং কৌতুকপূর্ণ বর্ণনাতেই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, কোথাও কোনো ইতিবাচকতা নেই এই শহরে— কেবলই আতংক, যন্ত্রণা, শত্রুতা। এই বর্ণনার কারণেই গল্পটি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠলেও আমাদের মনে জেগে থাকে শহরের এই নিষ্ঠুরতার কথা। আমাদের তিনি জানিয়ে দেন এই জীবনের অন্তর্নিহিত অন্তসারশূন্যতার কথা, নির্মমতার কথা। বহিরঙ্গের চাকচিক্য নয়, ডুবুরির মতো তিনি গভীর থেকে তুলে আনেন শহুরে জীবনের গ্লানি। গ্লানিময় এই জীবনের চিত্র আছে 'প্রতিবিম্ব' গল্পেও। বেশ কিছু গল্পে আবু ইসহাক ধর্মীয় কুসংস্কারকে তীব্রভাবে বিদ্রুপ করেছেন যেমন— 'কানাভুলা', 'প্রতিষেধক', 'বোম্বাই হাজী', 'শয়তানের ঝাড়ু', 'সাবীল' প্রভৃতি। কিন্তু এ-ধরনের গল্পের মধ্যে 'দাদীর নদীদর্শন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সবগুলো গল্পেই বিদ্রুপ আছে বটে, কিন্তু তা গল্পের মধ্যে এত সূক্ষভাবে, এমন সুকৌশলে প্রবিষ্ট যে, কখনো সেগুলোকে আরোপিত বা উচ্চকিত বলে মনে হয় না, মেসেজটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিছক একটি গল্পপাঠের আনন্দও পাঠকের মনে সমানভাবে জেগে থাকে। 'দাদীর নদীদর্শন' গল্পের 'মৌলবী দাদী' তার ষাট বছরের জীবনে কোনোদিন নদী দেখেননি। জীবনের শেষে এসে তার নদী দেখার সুযোগ ঘটে, আর এই বিপুল উত্তাল বহমান স্রোতধারাই তার কাল হয়, দাদী অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান। নদী যেন এখানে বহমান-চলমান-অগ্রসর জীবনের প্রতীক, ধর্মীয় কুসংস্কারে বন্দি দাদীর সঙ্গে যার দেখা হয়নি কোনোদিন। আর যখন দেখা হলো— তিনি তার ভার সইতে পারলেন না, জীবনের ইতি ঘটলো তার। প্রতীকের ব্যবহার শুধু এই গল্পেই নয়, আরও অনেক গল্পেই অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে ব্যবহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন আবু ইসহাক। তাঁর অতি বিখ্যাত গল্প 'জোক' শুধু এর অসাধারণ প্রতীকময়তার কারণেই স্মরণীয় হয়ে আছে বহু বছর ধরে। ভাগচাষীরা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ফসল ফলায়, কিন্তু অর্ধেকই দিয়ে দিতে হয় মালিককে। নানাভাবে তারা প্রতারিত হয়, অনুভব করে— জোকের মতই এরাও তাদের রক্ত চুষে খাচ্ছে। পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে পাট তোলার সময় জোকের রক্ত চুষে খাওয়ার প্রতীকে এই গল্পে আবু ইসহাক এক অসামান্য কুশলতায় শ্রেণীবিভক্ত এই সমাজের শোষণের চিত্রটি এঁকেছেন। গল্পটিতে পাটচাষের বিভিন্ন পর্যায়ের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা আছে, সেটা একমাত্র একজন অভিজ্ঞ কৃষকের পক্ষেই দেয়া সম্ভব। আবু ইসহাক কত গভীরভাবে ওই জীবনকে চিনতেন এই একটি গল্পেই তার সাক্ষ্য রয়েছে। মনে হয় ওই কৃষকের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ডুব দিয়ে দেখেছেন পাট কাটার দৃশ্য, কিংবা কে জানে হয়তো নিজেও কেটেছেন তাদের সঙ্গে। আবু ইসহাকের দেখার অতলস্পর্শী চোখ আমাদেরকে এমনটি ভাবার জন্য প্রলুব্ধ করে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এবং আবু ইসহাক দুজনই বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' এবং ইসহাকের 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাস দুটোই প্রথম বাংলা সাহিত্যের পাশ ফেরার ইঙ্গিত দেয়। পূর্ববাংলার যে জনজীবন, বিশেষ করে বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর যে জীবন এতদিন ধরে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রায় উপেক্ষিত ছিল, এই দুটো উপন্যাস সেই জীবনকেই উপজীব্য করে তুলেছিল। সাহিত্যভুবনে নবাগত এই জনগোষ্ঠী হাজির হয়েছিল তাদের নতুন ধরনের জীবনপদ্ধতি নিয়ে। তাদের ভাষাও ছিল বাংলাসাহিত্যে নতুন, ফলে অনিবার্যভাবে আঙ্গিকও পাল্টে গিয়েছিল। এর আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের কোনো পাঠক এই জীবন পাঠের অভিজ্ঞতা পাননি।

শওকত ওসমানও এই সময়েরই লেখক, প্রাথমিকপর্বের সাহিত্যচর্চায় তিনিও পালন করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাঁর 'জননী' উপন্যাসটিও '৪০ দশকে রচিত ও প্রকাশিত, কিন্তু 'লালসালু' বা 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র মতো শক্তিশালী উপন্যাস নয় এটি। শওকত ওসমান আমাদের সাহিত্যভুবনে নানা কারণে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন, অন্যদিকে আবু ইসহাক ছিলেন নির্জতা প্রিয় লেখক, ওয়ালীউল্লাহর মৃত্যুবরণ করেন ১৯৭১ সালেই, ফলে শওকত ওসমান একাই বহুদিন ধরে শাসন করেছেন বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের জগৎ— যতটা না তাঁর লেখার শক্তির কারণে, তারচেয়ে বেশি রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কারণে। 'ক্রীতদাসের হাসি' ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস যেমন নেই, তেমনি তাঁকে কখনো আমার কাছে ছোটগল্পের শিল্পী বলে মনেই হয়নি। প্রথম জীবনে রচিত তাঁর পুরনো গল্প সম্বলিত 'নির্বাচিত গল্প' গ্রন্থটি খানিকটা হতাশাই তৈরি করে। এক বাক্যে উল্লেখ করার

পুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো গল্প তিনি রচনা করতে পারেননি। যদিও কেউ কেউ শওকত ওসমানের নামের সঙ্গে 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী'কে সমার্থক করে দেখতে চান, তবু আশির দশকে রচিত এই প্রতীকী গল্পটিকেও খুব সফল কোনো সৃষ্টি বলে মনে হয়নি আমার। বাংলাদেশের যে সময়কাল নিয়ে গল্পটি রচিত সেই পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখলে, গল্পের প্রধান চরিত্রের সঙ্গে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাযুস্য লক্ষ্য করা যায়— উভয়েই ফু দিয়েই দেশ থেকে বালা-মুসিবত দূর করতে চায়। কিন্তু গল্পের চরিত্রটিকে অস্বাভাবিক এবং বিকারগ্রস্থ হিসেবে উপস্থাপন এবং পরিণতিতে তার প্রশ্নবোধক মৃত্যুর ফলে স্বয়ং ব্যবহৃত প্রতীকটিই প্রশ্নের মুখোমুখি পড়ে যায়। শওকত ওসমানের গ্রহণযোগ্যতার কারণ সম্ভবত তাঁর গল্প নয়— বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ভুবনে সবচেয়ে দীর্ঘসময় ধরে পরিভ্রমণ, 'ক্রীতদাসের হাসি'র মতো আলোচিত উপন্যাস, সর্বোপরি তাঁর রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী ভাবমূর্তি— তাঁকে অন্যতম আলোচিত লেখকে পরিণত করেছে।

এই সময়ের আরেকটি সফল গল্পের কথা পাঠকদের মনে পড়বে— শাহেদ আলীর 'জীব্রাইলের ডানা'। এই একটি গল্পের জন্যই শাহেদ আলীর নামটি বারবার উচ্চারিত হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, গল্পটি অত্যন্ত উঁচুমানের, কিন্তু সব মিলিয়ে শাহেদ আলীকে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ লেখক বলে মনে হয় না। এই গল্পটির আগে-পরে আরও বেশ কিছু গল্প লিখলেও তেমন সফল গল্প আর নেই তাঁর। সত্যি বলতে কি, 'জীব্রাইলের ডানা' বাদ দিলে শাহেদ আলী আর শাহেদ আলীই থাকেন না। তাঁর গ্রহণযোগ্যতার কারণও রাজনৈতিক। মৌলবাদী-প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীটি তাঁকে নিজেদের মানুষ বলে মনে করতো বলেই তারা এই লেখক সম্বন্ধে অনেক উদ্ভট তত্ত্ব ও তথ্য প্রচার করেছে— এমনকি আবদুল মান্নান সৈয়দের মতো শক্তিশালী লেখককেও এই প্রচারণায় অংশ নিতে দেখা গেছে!

আবু রুশদ আমাদের প্রথম গল্পকার যিনি নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনকে বিষয়বস্তু করেছিলেন। ১৯৩৮ ও ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম দুটো গল্পগ্রন্থ 'রাজধানীতে ঝড়' ও 'প্রথম যৌবন'-এর গল্পগুলো বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। গল্পগুলোর পাত্রপাত্রীরা বাঙালি মুসলমান এবং নাগরিক মধ্যবিত্ত। এইসব গল্পের পুরুষ চরিত্রগুলোর প্রায় সবাই উচ্চশিক্ষিত, কোলকাতাবাসী, চাকরিজীবী, স্মার্ট, প্রাণবন্ত, আধুনিক তরুণ। শুধু তাই নয় নারী-চরিত্রগুলোও শিক্ষিত, স্মার্ট, আধুনিক, আত্মসচেতন, সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা তরুণী। নারী-পুরুষের সম্পর্কও সহজ, মুক্ত। যে সময়ে এসব গল্প রচিত হয়েছিল তখন নিশ্চয়ই মুসলমান মধ্যবিত্তের গড়পরতা চেহারা এমন ছিল না, তবে এসব চরিত্রের মধ্যে লেখকের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ধরা পড়ে। তিনি হয়তো মুসলমান নাগরিক মধ্যবিত্তকে এভাবেই দেখতে চেয়েছেন। অবশ্য তাঁর পরিণত বয়সের লেখা গল্পগুলোতে এসবের দেখা মেলে না, বরং অনেক বেশি শিল্পিত হয়ে ওঠে তাঁর গল্পগুলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পিথাগোরাস', 'রদবদল', 'খালাস', 'বেড়া', 'বিকল্প বেহেস্ত', 'পাবনা-রাজশাহী এক্সপ্রেস', 'দাহন', 'শাড়ী বাড়ী গাড়ী' কিংবা 'ছিনতাই' প্রভৃতি গল্প তাঁর উজ্জ্বল শিল্পকুশলতার নিদর্শন হয়ে আছে।

রশীদ করীম উপন্যাসে অসাধারণ সাফল্য দেখালেও গল্পে তেমন স্বচ্ছন্দ নন। তাঁর 'আমার যত গ্লানির' মতো উপন্যাস খুব বেশি লেখা হয়নি বাংলা সাহিত্যে। এত উইট-হিউমার-স্যাটেয়ার সম্বলিত বর্ণনা সহযোগে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অনুপুঙ্খ চিত্রায়ণ সত্যিই দুর্লভ। তাঁর 'উত্তম পুরুষ'ও নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস কিন্তু গল্পে তিনি তেমন মনোযোগী ছিলেন না বলেই হয়তো তাঁর উল্লেখযোগ্য কোনো গল্প নেই।

বয়সের দিক থেকে উপরোক্তদের চেয়ে একটু অগ্রজ আবু জাফর শামসুদ্দিনও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ব্যক্তি ও সমাজ সম্বন্ধে, রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্বন্ধে, জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁর উদার-অসাম্প্রদায়িক-স্বচ্ছ-মুক্ত-প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তাঁর প্রবন্ধের মতো গল্পেও রেখেছেন তিনি। 'রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা' তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প। আরেক অগ্রজ আবুল মনসুর আহমদ তাঁর গল্পে নিয়ে এসেছিলেন ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, হাস্য-কৌতুক। 'হুযুর কেবলা', 'নায়েবে নবী' প্রভৃতি গল্পে তিনি যেমন ধর্ম-ব্যবসায়ীদের বিদ্রুপ করেছেন, তেমনি 'ফুড কনফারেন্স', 'লঙ্গরখানা', 'রিলিফ ওয়ার্ক', 'জনসেবা য়ুনিভার্সিটি' প্রভৃতি গল্পে রাজনীতির নামে ভন্ডামিকে ব্যঙ্গ করেছেন। ওই সময়ে একমাত্র তিনিই এই ধারায় চমৎকার সাফল্য দেখাতে পেরেছিলেন। কিন্তু বাংলাভাষা সম্বন্ধে তাঁর অবস্থান তাঁকে এখন পর্যন্ত বিতর্কের মধ্যে রেখেছে। তিনি একটি মুসলমানি ভাষা তৈরি করতে চেয়েছিলেন, এর পক্ষে লিখেছেন, কাজ করেছেন। যে সময়ে পাকিস্তানিরা আমাদের ভাষাকে কলুষিত করার জন্য নানারকম উদ্যোগ নিচ্ছিল, তখন তাদের পক্ষে এই অবস্থান তাঁর নিজের জন্য ইতিবাচক হয়নি। এই সময়ের আরও দু-একটি উল্লেখযোগ্য গল্পের কথা বলা যায়— ফজলুল হকের 'মাছধরা', সরদার জয়েনউদ্দিনের 'নয়ান ঢুলি', 'ক্রুশে বিদ্ধ যীশুদের প্রার্থনা', সামসুদ্দিন আবুল কালামের 'পথ জানা নেই' প্রভৃতি। এঁরা সবাই মোটামুটিভাবে মিডিওকার গল্পকার, তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এঁদের সবারই দু-একটি করে উঁচুমানের গল্পে আছে। সকাল দেখে যেমন বোঝা যায় দিনটি কেমন যাবে, তেমনই আমাদের প্রাথমিক পর্বের এই বৈশিষ্ট্যটি পরবর্তী প্রজন্মসমূহের মধ্যেও প্রবাহিত হয়েছে— যাঁরাই গল্প লিখেছেন (তাঁদের সকলে হয়ত প্রতিভাবান গল্পকার নন), তাঁদের প্রত্যেকেই অন্তত একটি-দুটি ভালো গল্প লিখেছেন। যাহোক, প্রাথমিক পর্বের গল্পচর্চায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ছাড়া অন্যদের সামগ্রিক অর্জন তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও সেই সময়ের প্রেক্ষিতে পূর্ব বাঙলার জীবনচিত্র নির্মাণে এদের সবারই স্বচ্ছন্দ বিহার হয়তো বাংলাদেশের গল্পের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছিল। তাছাড়া এ-কথাও মানতেই হয় যে, তাঁদের আন্তরিক ও চিন্তাশীল ও লক্ষ্যমুখী পদচারণা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নির্মাণ করে দিয়েছিল একটি সম্ভাবনাময় পথ।

বাংলাদেশের গল্পের ভিত্তিভূমি যখন তৈরি হচ্ছে, ওই একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে এলেন সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সতীনাথ ভাদুড়ী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, গৌরকিশোর ঘোষ, বিমল কর, সমরেশ বসু প্রমুখ। আমরা চকিতে তাঁদের গল্প নিয়েও কিছু কথা বলতে পারি। তার আগে একটি কথা বলা দরকার— দেশভাগের আগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য মোটামুটি কলকাতাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে; আমাদের প্রথম প্রজন্মের লেখকদের অনেকেই কলকাতায় ছিলেন, ওখানকার পত্রপত্রিকায় লেখালেখিও করেছেন। কিন্তু এ তো ঠিক যে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর পটভূমি আর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর পটভূমি একই রকম ছিল না। তাঁরা একই সাহিত্যের উত্তরাধিকার বটে, কিন্তু পশ্চিমবাংলার লেখকরা যে জনগোষ্ঠীর মুখপাত্র, সেই জনগোষ্ঠী কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়েছে বঙ্কিমের সময় থেকে, ফলে তাঁদের ছিল অর্ধশতাব্দীর ঐতিহ্য ও অঙ্গিকার, অন্যদিকে পূর্ববাংলার লেখকদের যে বিষয়বস্তু-ভাষা-জীবন সেগুলো ছিল একেবারেই নতুন, ঐতিহ্যের ভাগিদার তাঁরা হতে পারেননি। ফলে ওপার বাংলার লেখকদের সঙ্গে এই বাংলার লেখকদের তুলনা করা অন্তত তখন পর্যন্ত সুবিবেচনাপ্রসূত ছিল না।

যাহোক, ওইসময় পশ্চিমবাংলার গল্পকাররাও নানা ধরনের গল্প লিখেছেন। সুবোধ ঘোষের বহুবিচিত্র চরিত্র ও অভিজ্ঞতার গল্প, অনবদ্য ভাষাভঙ্গি ও শিল্পরীতি তাঁকে বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল। তাঁর 'জতুগৃহ', 'পরশুরামের কুঠার', 'অযান্ত্রিক', 'সুন্দরম' প্রভৃতি গল্প এখন পর্যন্ত পাঠকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সন্তোষ কুমার ঘোষও ভাষা ও ফর্ম নিয়ে নিরীক্ষাপ্রবণ ছিলেন। অনেক নতুন শব্দ যেমন তৈরি করেছেন তিনি, পুরনো শব্দের নতুন ধরনের ব্যবহারেও দেখিয়েছেন চমক। 'কস্তুরিমৃগ', 'ধাত্রী', 'কানাকড়ি', 'যাদুঘর' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প। মধ্যবিত্ত জীবনের নানাবিধ টানাপোড়েন নিয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছিলেন চমৎকার কিছু সরল-সহজবোধ্য গল্প। এই সময়ের খুব শক্তিশালী দুজন গল্পকার— সতীনাথ ভাদুড়ী ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। এঁদের মধ্যে মিলটি হলো— দুজনেই এক আশ্চর্য নির্মোহতায় বর্ণনা করে গেছেন জীবনযাপনের নানা খুঁটিনাটি চিত্র। সতীনাথের প্রথম দিকের গল্পগুলো পড়লে তাঁর ভাষার অদ্ভুত সারল্য ভ্রূ কুঁচকে দেয়। এমন সারল্য অর্জন করা দুরূহ নিঃসন্দেহে। জীবন যেমন, ঠিক তেমন করেই বর্ণনা করতে চান তিনি— যেন কোনো বিষয়েই তাঁর বিশেষ কোনো আবেগ বা আসক্তি নেই। জীবনবোধে, বর্ণনা কৌশলে এতটা নিরাসক্তি আজও পাঠককে বিস্মিত করে তোলে। তাঁর 'আন্টা বাংলা', 'চকাচকি', 'বন্যা',

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চরণদাস এমএলএ' প্রভৃতি গল্প তাঁর অভূতপূর্ব শিল্পভাবনার নিদর্শন হয়ে আছে। কিন্তু গল্পের চেয়ে উপন্যাসেই তাঁর অধিকতর সিদ্ধিলাভ ঘটেছে। 'জাগরী' এবং 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এখন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সেরা উপন্যাসগুলোর মধ্যে গণ্য করা হয়। জ্যোতিরিন্দ্রও এক অনন্য গল্পশিল্পী। তাঁর শিল্প চেতনাকে অর্জিত বলার চেয়ে সহজাত বলাটাই অধিকতর সঙ্গত। নইলে, তাঁর নির্লিপ্ত ভাষারীতি, নিরাসক্ত জীবন-ভাবনা, অ্যাবস্ট্রাক্ট অথচ সচিত্র বর্ণনাভঙ্গির কোনো উত্তরাধিকার আজও দুর্লভ হবে কেন? তাঁর গল্পে ঘটনা প্রধান নয়, নাটকীয়তাও নেই কোনো, বরং ধীর লয়ে চরিত্রের হৃদয় খুঁড়ে একটি একটি করে সরাতে থাকেন রহস্যের পর্দা। তাঁর 'রাইচরণের বাবরি', 'সমুদ্র', 'গণনায়ক', 'বন্ধুপত্নী', 'গিরগিটি', 'পতঙ্গ', 'সোনার চাঁদ' 'সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু' প্রভৃতি গল্প এখন বিস্ময় জাগায়। শুধু গল্পই নয়, 'বারো ঘর এক উঠান'-এর মতো উপন্যাসও তো বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই!

এঁদের পর বিমল কর ও সমরেশ বসু— এ দুজন দুভাবে বাংলা গল্পকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। সমরেশ তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতন; তীক্ষ্ণ তাঁর লেখনি, দুঃসাহসিক বর্ণনায় পাঠককে প্রায় বজ্রাহত করে তোলেন। 'আদাব', 'স্বীকারোক্তি', 'পাড়ি', 'জোয়ারভাটা', 'কে নেবে মোরে', 'পেলে লেগে যা', 'দুলে বাড়ির ভাত', 'নররাক্ষস', 'উজান, 'কিছু নয়' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প। অন্যদিকে বিমল কর যেন সমাহিত, রোমান্টিকও। প্রকৃতিকে জীবনের সঙ্গে প্রায় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেন তিনি। 'যযাতি', 'আত্মজা', 'পার্ক রোডের সেই বাড়ি', 'জননী', 'সুধাময়', 'অশ্বত্থ' প্রভৃতি গল্প তাঁর শিল্পকুশলতার পরিচয়চিহ্ন ধারণ করে আছে। এঁদের সঙ্গেই অবশ্য রমাপদ চৌধুরীর নামও এসে যায়— বিষয়-বৈচিত্র্যে বহুমাত্রিক এই লেখক তাঁর রোমান্টিক চেতনা দিয়ে জীবনের নেতিবাচক পরিণতিগুলো নিপুণ কুশলতায় ধরেছিলেন। 'দরবারী', 'রেবেকা সোরেনের কবর', 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী' প্রভৃতি গল্পে সাঁওতাল পরগনার মানুষ ও জীবন, 'আমি আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া', 'ডাইনিং টেবল', 'ফ্রিজ', 'চাবি' প্রভৃতি গল্পে প্রধানত মধ্যবিত্ত জীবনের কুশলী চিত্রায়ণ তাঁর ক্ষমতার প্রমাণ দেয়।

একটি কথা বলে এই পর্ব শেষ করবো। পশ্চিমবাংলায় সমালোচনা সাহিত্যের একটি চমৎকার ধারা গড়ে ওঠায় ওখানে সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়েই প্রচুর আলোচনা হয়, গল্প নিয়েও হয়েছে এবং হচ্ছে। বাংলাদেশে সেই কাজটি তেমনভাবে হয়নি। গল্পে বা উপন্যাসে বা কবিতায় আমাদের সামগ্রিক অর্জনটি নিয়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সৃজনশীল বা অ্যাকাডেমিক লেখা পাওয়া যায় না। অথচ যে-কোনো সাহিত্যের জন্যেই ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন ব্যাপারটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের লেখকরা সেটি পান না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চিম বাংলায় এই ধরনের ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনের উদাহরণ হিসেবে আনন্দ বাগচীর 'ছোটগল্পের রূপান্তর' লেখাটি থেকে খুব সামান্য একটি অংশ তুলে দিচ্ছি (এই অংশটুকুতে তিনি বিমল কর ও সমরেশ বসু সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন)। বলার অপেক্ষা রাখে না এরকম উদাহরণ আরও অসংখ্য দেয়া যায়—

> 'রোমান্টিক স্বভাবের তলায় মিস্টিক চেতনা বিমল করের মধ্যে প্রথমাধিই ছিল। তাঁকে সোলমিস্টিজিম বলাই ভালো। প্রাকৃতিক নিঃসঙ্গতার মধ্যে তিনি যেন আত্মাকেই খুঁজে চলেছিলেন এই দুঃখের সংসারে। পরিশীলিত আভিজাত্যের সহচর প্রশান্ত কৌতুক আর মিতবাক নম্রতা মিশেছে তাঁর ভাষায়, অথচ কলমে খরদৃষ্টি। খণ্ড প্রকৃতির কণ্ঠস্বরকে জীবন ভাবনার মধ্যে এমন অলক্ষ্যে নৈপুণ্যে গুলে মেশাতে কদাচিৎ কেউ পারেন। চরাচর বিচ্ছিন্ন নিকট পরিপার্শ্বের মধ্যে মানুষের চেহারার খুঁটিনাটি প্রায় অন্যমনস্ক আঁচড়ে এমন ধরে দেন, তার নিঃশ্বাস, নড়াচড়া, কিংবা ভাবাবিষ্ট বসে থাকা পর্যন্ত এমন নিপুণতায় যে মনে হয় সেই সংলাপহীন নিঃস্তব্ধতায়, অবলোকিত অন্ধকারে, বিকল্পহীন একাকিত্বের মধ্যেও সময়ের আর একটি মাত্রা যুক্ত হলো যা কেবল বোধের মধ্যেই ধরা দেয়। কবিত্বের এই সংহত জাদুই বিমল করের ভাষার জিয়নশক্তি।...সমরেশ বসু ঠিক এর বিপরীত। জীবন ও সমাজচেতনায় তিনি তীব্র, তীক্ষ্ণ। নানা তলের ও তালের মানুষের নিরন্তর বাঁচার লড়াই তাঁর গল্পের উপজীব্য। আহরণ ও স্বীকরণক্ষমতায় তিনি অসামান্য, অপরিহার্য। এ যুগের সবচেয়ে ভাইটাল লেখক। দুরন্ত দুঃসাহসিকতার সঙ্গে তিনি রক্তমাংসের জীবনকে নানা কোণ থেকে ছুঁয়েছেন। ভয়ঙ্কর সুন্দর জীবনের মধ্যে এমন নিমজ্জন, বিচিত্রচারি জগতের এমন সরেজমিন অভিজ্ঞতা, সমকামী আবেগের সঙ্গে এমন সাংবাদিক অবজেকটিভ ভঙ্গি, এমন ভিটাচড অনুপুঙ্খতায় ব্যবচ্ছেদ তাঁর অজস্র গল্পের মধ্যে যেমন মুহুর্মুহু রূপ বদলেছে তা অবিস্মরণীয়। পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পকে তিনি নানাভাবে প্রলুব্ধ ও প্রভাবিত করেছে।'

হায়, বাংলাদেশের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বা আবু ইসহাক একই সময়ের লেখক হয়েও এবং বিপুল শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েও এরকম অ্যাপ্রিসিয়েশন পাননি!

কৈশোরকাল

বাংলাদেশের গল্প প্রাথমিক পর্ব পেরিয়ে কৈশোরে পা রাখলো পঞ্চাশের দশকে। সময়টি ছিল নানা দিক থেকেই বিহ্বলতার। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ আর ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষত তখনও শুকোয়নি, রয়েছে দেশভাগজনিত আবেগ-বিহ্বলতা ও হাহাকার। দু-বাংলার শেকড়হীন মানুষ— উদ্বাস্তু, অসহায়; নতুন দেশে বসবাসের জন্য যাদের চোখ— স্বপ্নে নয়— বেদনায় ম্লান। মানুষ কীভাবে তার শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিবাহী জন্মভূমি, নদী, আকাশ আর প্রান্তর ছেড়ে ভালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকবে? এরই মধ্যে ঘটে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বব্যাপি দীর্ঘদিনের লালিত মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে; হতাশা-অবক্ষয় বাড়ছে, চারদিকে ধ্বংসযজ্ঞ, মানবতার নির্মম পদদলন, মূল্যবোধ বলতে বা আশাবাদী হওয়ার মতো কোথাও আর কিছু অবশিষ্ট নেই, বেঁচে থাকাটাই যেন এক বেদনাদায়ক, ক্লান্তিকর, গ্লানিময় অভিজ্ঞতা আর অস্তিত্ব হয়ে উঠছে এক ভীষণ অর্থহীন বিষয়— মানুষ যেন হঠাৎই উপস্থিত হয়েছে তার চূড়ান্ত পরিণতির সামনে। সামাজিক-রাজনৈতিক-বৈশ্বিক পরিস্থিতি বোধহয় সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে একজন লেখকের ওপরেই। যে অদ্ভুত সময়ে পঞ্চাশের লেখকরা লিখতে শুরু করেছিলেন, সহজ ছিল না সময়টিকে সাহিত্যে ধারণ করার— অন্তর্গত রক্তক্ষরণ যতই হোক না কেন! তাঁদের দায়িত্বও ছিল অনেক। বাংলাসাহিত্যের ঐতিহ্যবাহী ধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার এবং পাকিস্তান নামক অতি-অদ্ভুত ও উদ্ভট একটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হওয়ায় তথাকথিত ইসলামি জাতিয়তাবাদের কবল থেকে নিজস্ব সঠিক পরিচয়টা উদ্ধার ও রক্ষা করার সুকঠিন দায়িত্ব। এক বিস্ময়কর বিপন্নতা ঘিরে ছিল তাঁদের, কারণ রাষ্ট্রযন্ত্র এবং তখনকার আবেগ-মূল্যবোধগুলো ছিল এসবের বিরুদ্ধে। নতুন রাষ্ট্রপ্রাপ্তির আফিমমার্কা মোহ অবশ্য ততদিনে কাটতে শুরু করেছে, পূর্ব বাংলার মানুষ জারিত হচ্ছে তাদের প্রকৃত জাতিসত্তার অহংকারে, প্রস্তুত হচ্ছে ভাষা আন্দোলনের মতো অনন্য ইতিহাস নির্মাণ করার জন্য। পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ভাষা আন্দোলনের সূচনা এ অঞ্চলের মানুষের প্রকৃত জাতিসত্তাকেই মূর্ত করে তুলেছিল, আর এই জাতির বিকাশ ও মনন চর্চায় অবদান রাখার জন্য অনিবার্যভাবে মেধাবী সাহিত্যশিল্পীদের আগমনও ঘটেছিল। সৈয়দ শামসুল হক, শহীদ সাবের, মিরজা আবদুল হাই, আহমদ মীর, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবু বকর সিদ্দিক, শহীদুল্লাহ কায়সার, জহির রায়হান, সুচরিত চৌধুরী, আব্দুল গাফফার চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, শওকত আলী প্রমুখ কথাশিল্পী এলেন এ সময়েই। এই সময়ে যাঁরা এলেন তাঁরা অনেকটা নীরবেই একটি যুদ্ধ করে গেছেন— রাষ্ট্রের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল উপেক্ষা করে নিজ ভাষাকে টিকিয়ে রাখার, নিজের ভাষায় সাহিত্য রচনার এবং এর একটি মানসম্মত রূপদান করার যুদ্ধ।

এটা বললে নিশ্চয়ই অতিশোয়োক্তি হবে না যে, পঞ্চাশের সবচেয়ে প্রতিভাবান গল্পকার সৈয়দ শামসুল হক। যে যুদ্ধের কথা একটু আগে বলেছি—নিজ ভাষাকে টিকিয়ে রাখার, নিজের ভাষায় সাহিত্য রচনার এবং এর একটি মানসম্মত রূপদান করার যুদ্ধ—সৈয়দ হক সেই যুদ্ধের অন্যতম সৈনিক। পঞ্চাশের সবাই পারেননি, অনেকেই স্তব্ধ হয়ে গেছেন, কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক তাঁর অসাধারণ মেধা, প্রজ্ঞা ও প্রতিভায় আজও নিজেকে রেখেছেন বিপুলভাবে সক্রিয়। বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠী তখন নানামাত্রিক নতুন, অভিনব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি—সৃষ্টি হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যবিত্ত শ্রেণী, গড়ে উঠছে নগর। সৈয়দ হকই প্রথমবারের মতো সেই নাগরিক মধ্যবিত্তের সংকট-সম্ভাবনা, হতাশা-আকাঙ্ক্ষাকে সফলভাবে তাঁর গল্পের উপজীব্য করলেন। তাঁর ছিল সূক্ষ্ম দৃষ্টি; 'শীতবিকেল', 'ফিরে আসে', 'রক্ত গোলাপ', 'কালামাঝির চড়নদার', 'নেপেন দারোগার দায়ভার' প্রভৃতি গল্প তাঁর মতো শিল্পীর পক্ষেই লেখা সম্ভব। তিনি অবশ্য কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে থাকেননি। ছুটে বেড়িয়েছেন জীবনের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার সন্ধানে, ক্রমাগত নিজেকে ভেঙেচুরে নিজেকেই অতিক্রম করে গেছেন ঈর্ষণীয়ভাবে। মানব-জীবন, মানব-স্বভাব, সমাজ-জীবন প্রভৃতির প্রতিটি চেনা-অচেনা কোণে উজ্জ্বল আলো ফেলে দেখিয়েছেন সেগুলোর অর্ন্তগত চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য। যদিও গল্প দিয়েই যাত্রা শুরু করেছিলেন সৈয়দ শামসুল হক কিন্তু থেমে থাকেননি সেখানেই। একে একে তিনি বিচরণ করেছেন সাহিত্যের প্রায় সমস্ত শাখায়— কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে। যেখানেই হাত দিয়েছেন, সফল হয়েছেন তিনি। তাঁর সাহিত্যকর্ম—তা গল্প বা উপন্যাসই হোক, অথবা কবিতা বা নাটকই হোক— তুমুলভাবে আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে সময়ে সময়ে। তাঁর অসংখ্য রচনাকর্মের মধ্যে যেগুলো বহুলভাবে আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে— উপন্যাস: 'খেলারাম খেলে যা', 'নিষিদ্ধ লোবান', 'দূরত্ব', 'এক যুবকের ছায়াপথ', 'ইহা মানুষ', 'স্তব্ধতার অনুবাদ', 'স্মৃতিমেধ', 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী', 'ত্রাহি', 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ'; কাব্যগ্রন্থ: 'বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালা', 'পরানের গহিন ভিতর', 'বুনোবৃষ্টির গান'; কাব্যনাটক: 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'নূরলদীনের সারাজীবন', 'গণনায়ক', 'ঈর্ষা' প্রভৃতি। এসবের মধ্যে অনেকগুলোই প্রচুর প্রশংসা লাভ করেছে, কিন্তু ভুলভাবে সমালোচিতও হয়েছে প্রচুর। এসব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। শুধু একটি কথা তাঁর সম্বন্ধে নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে— আমাদের সাহিত্যজগৎ সমৃদ্ধ করার কৃতিত্ব যাঁরা দাবি করতে পারেন, তাঁদের মধ্যে সৈয়দ শামসুল হক প্রথম সারির একজন। সৈয়দ হকের বিচরণক্ষেত্র যে সীমাবদ্ধ নয় বরং ক্রমাগত নিজেকে বদলে ফেলেছেন তিনি, অতিক্রম করে গেছেন নিজেকেই সেটি তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্ম পড়া না থাকলেও, শুধুমাত্র গল্প পড়েই উপলব্ধি করা সম্ভব। তাঁর গল্পে চিত্রিত হয় সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের সমগ্র জীবনচিত্র— একদিকে মানুষের প্রেম, কাম, আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে তার বেঁচে থাকার সংগ্রাম, বিদ্রোহ, রাজনৈতিক চেতনা, তার ভালোবাসা, মমতা ও মহত্ত্ব। বহু ধরনের গল্প লিখেছেন সৈয়দ শামসুল হক, বিষয় আর প্রকরণের বৈচিত্র্যে ভরা এসব গল্পের এক প্রধান অংশ জুড়ে আছে মানুষের রাজনৈতিক বিশ্বাস, তার বিপ্লব-বিদ্রোহ ও বেঁচে থাকার যুদ্ধ। প্রচুর লিখেছেন তিনি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। কিন্তু গল্পের স্বল্প-পরিসরে বোধহয় তিনি এসব নিয়ে বিস্তৃত কাজ করতে চাননি। তাঁর গল্পে মুক্তিযুদ্ধকে তেমন তীব্রভাবে চিত্রিত হতে দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় না— স্মৃতিচারণ আছে, অংশগ্রহণ নেই, মূলত এই তাঁর এ-ধরনের গল্পগুলোর বৈশিষ্ট্য। তবু একধরনের প্রতীকী আবহে গল্পগুলোতে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস, চেতনা ও বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। 'প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান', 'ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে', 'জমিরউদ্দিনের মৃত্যু বিবরণ', 'আরও একজন' প্রভৃতি এই ধরনের গল্প। সৈয়দ হকের অনেকগুলো গল্পের বিষয়বস্তু নাগরিক মানুষ ও তাদের জীবন। নাগরিক মানুষ যেন আর স্বাভাবিক নেই। যে নিষ্পাপ সরলতা-সহজতা নিয়ে মানুষের জন্ম হয়, নগরের সংস্পর্শে তা ক্ষয়ে যেতে থাকে। যান্ত্রিকতা, জীবনের দুর্মর জটিলতা, অনিবার্য বিচ্ছিন্নতা— এসবই দখল করে নেয় মানুষের যাবতীয় শুভ সম্পর্ক, তার বিশ্বাস ও মানবিক অনুভূতি, সর্বোপরি তার সমস্ত আশ্রয়। মানুষ হয়ে ওঠে নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন; গতানুগতিকতা আর পৌনঃপুনিকতায় আক্রান্ত এক আনন্দহীন ও যন্ত্রণাদগ্ধ জীবন লাভ করে সে। সৈয়দ হকের এ ধরনের গল্পগুলোতে এসবেরই প্রতীকী চিত্রায়ন দেখতে পাই। 'আনন্দের মৃত্যু', 'মানুষ', 'পূর্ণিমায় বেচাকেনা', 'স্বপ্নের ভেতর বসবাস' প্রভৃতি গল্পে এসবের প্রমাণ রেখেছেন তিনি। সৈয়দ শামসুল হকের অন্যান্য গল্পের মতোই প্রেমের গল্পগুলোও পাঠকের কাছে ভিন্নমাত্রা নিয়ে হাজির হয়। গতানুগতিক পুতুপুতু-মার্কা কোনো প্রেম নেই এসব গল্পে, যে প্রেম আছে তা এতটা অগভীর নয় যে সহজেই তার সবটুকু পড়ে ফেলা যাবে, আবেগ আছে কিন্তু সেই আবেগেরও রাশ টেনে ধরে রাখেন তিনি, তীব্র অনুভূতি আছে কিন্তু তা শুধু ওই প্রেমকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খায় না, সমগ্র জীবনটাই চলে আসে সেখানে; সংলাপগুলোতেও তিনি দার্শনিক উপলব্ধির এবং গভীর জীবনবোধের প্রমাণ রাখেন। 'ফিরে আসে', 'রুটি ও গোলাপ', 'গাধা জোৎস্নার পূর্বাপর' প্রভৃতি তাঁর সফল প্রেমের গল্পের উদাহরণ। শুধু বিষয়েই নয় ভাষা, আঙ্গিক, উপস্থাপনা প্রভৃতি নানা দিক থেকেও নিজেকে বারবার বদলে ফেলেছেন তিনি। ধীরে ধীরে তৈরি করেছেন নিজস্ব একটি ভঙ্গী— কী ভাষায়, কী প্রকরণে— তাঁর লেখাটি যে সৈয়দ হকেরই লেখা সেটি চিহ্নিত করতে পাঠককে কোনোরকম কষ্টই করতে হয় না। তাঁর গল্পগুলোতে রচনাকাল দেয়া নেই কিন্তু গল্প থেকেই অনেক ক্ষেত্রে সময়কে নির্ণয় করা সম্ভব এবং পাঠক লক্ষ না করে পারেন না যে, তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলোর চেয়ে সাম্প্রতিক কালের গল্পগুলোর ভাষা ও আঙ্গিক কী অসাধারণ কুশলতায় বদলে গেছে। 'ফিরে আসে' বা 'রুটি ও গোলাপ' গল্পের যে ভাষা ও উপস্থাপনা 'গাধা জ্যোৎস্নার পূর্বাপর' গল্পের ভাষা ও উপস্থাপনা তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অন্যদিকে প্রথমদিকের গল্পগুলোতে তিনি আখ্যান-বর্ণনার দিকে যতটা মনোযোগী ছিলেন, পরবর্তীকালে সেটিও পাল্টে ফেলেছেন। বিশেষ করে আঙ্গিকে এমন এক পরিবর্তন এনেছেন যে, মনে হয়, লেখক কেবল গল্পটিই বলছেন না, বরং পাঠকদের সঙ্গেও কথা বলছেন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছেন, আখ্যানের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পৃক্ত করে তোলার জন্য পাঠককে সরাসরি সম্বোধন করছেন, যেন পাঠক কেবল শ্রোতা-দর্শকের অবস্থানে না থেকে নিজেও অংশগ্রহণ করতে পারে। বিশেষ করে রাজনৈতিক ধারার গল্পগুলোতে তাঁর এই কৌশল বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এসব গল্পকে অবশ্য তিনি নিজে শুধুমাত্র 'গল্প' না বলে 'গল্পপ্রবন্ধ' নামে অভিহিত করে থাকেন, কিন্তু এগুলো পাঠ করে একটি 'গল্প' পাঠেরই আনন্দ হয়। গল্পকে তিনি স্রেফ ঘটনা-বর্ণনার দায় থেকে মুক্ত রেখেছেন বটে, কিন্তু 'গল্পহীনতা'র দায়ও নেননি, আবার একটি মেসেজ দিতে গিয়ে সেটিকে শ্লোগান-সর্বস্বও করে তোলেননি— শিল্পমানের ব্যাপারে এই আপোসহীন অবস্থান তাঁর গল্পকে অধিকতর সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে। সৈয়দ হক তাঁর গদ্যভাষাকে একটি উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। শব্দের ব্যবহার ও বাক্যের গঠনে তিনি এমন গভীর সচেতনতার পরিচয় দেন যার তুলনা মেলা ভার। আবার কিছু গল্পে, বিশেষ করে যেসব গল্পে উত্তরবঙ্গ উঠে এসেছে, তাঁর ডায়ালেক্টের ব্যবহার ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। গল্পগুলোতে ঐ অঞ্চলের মানুষ ও তাদের জীবনকে চিত্রিত করার জন্য তাদের মুখের ভাষা হুবহু তুলে এনে তিনি যে বিশ্বাসযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। সৈয়দ হকের গল্পে প্রতীকের প্রবল প্রচুর ব্যবহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেক গল্পেই তিনি প্রতীক ব্যবহার করেন অতি কুশলতার সঙ্গে। যে-কথাটি তিনি বলতে চান সেটি সরাসরি না বলে প্রতীক ব্যবহার করার ফলে পাঠক কোনো-একটি চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তে আবদ্ধ না হয়ে বহুমাত্রিক ভাবনায় আন্দোলিত হতে পারেন। মানুষ এবং তার জীবন ও পরিপার্শ্ব, কর্ম ও ভাবনাকে কখনো একক সংজ্ঞা দিয়ে আবদ্ধ যায় না, গল্পে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা তাই পাঠককে দূরে ঠেলে দেয়। সৈয়দ হক সেই সত্যটি জানেন, তাঁর প্রতীক ব্যবহার তাই এতটা কুশলী ও মোহনীয় হয়ে ওঠে। এবং এই সবকিছু এবং আরও অনেককিছু নিয়েই তিনি হয়ে উঠেছেন আমাদের প্রধান লেখকদের একজন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর লেখালেখির শুরুর দিকে ছিলেন শ্রেণী সচেতন, সমাজবাদী লেখক। বাংলাদেশে আজাদই এই ধারার পথিকৃৎ। উপরিকাঠামোর চেয়ে সমাজের অন্তর্কাঠামো চিত্রায়ণে তাঁর ঝোঁক স্পষ্ট। তবে 'শ্রেণী সচেতন' লেখক হিসেবে খ্যাতি পেলেও তাঁর গল্প-উপন্যাসে তথাকথিত বিপ্লবী উপাদান নেই, বরং অতলপ্রবাহী এক রোমান্টিকতা তাঁর রচনার ছত্রে-ছত্রে ছড়িয়ে আছে। সম্ভবত তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতা তাঁকে খ্যাতিমান করে তুলেছিল। বাংলাদেশের সাহিত্য জগতে লেখকের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি (যা হয়তো তাঁর রচনায় তেমন প্রবলভাবে দৃশ্যমান নয়) ওই লেখকের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রভাব সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। আজাদ যে সময়ের লেখক সেই সময়ে এই অঞ্চলে প্রগতিশীল রাজনীতির চর্চা শুরু হয়েছিল, লেখক হিসেবে তিনি ছিলেন সেই রাজনীতির প্রথম সারির প্রতিনিধি। শওকত ওসমান যেমনভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘকাল তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রেখেছিলেন (এর আগে সে-কথা বলেছি), একইভাবে আজাদও অনেকদিন পর্যন্ত তেমন প্রভাব ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কোনো এক রহস্যময় কারণে তিনি দীর্ঘদিন সাহিত্যজগৎ থেকে দূরে সরে থাকার ফলে এই প্রভাব-বলয় নষ্ট হয়ে যায়। তাঁর সফল গল্পের (এবং উপন্যাসেরও) সংখ্যা খুব বেশি নয়। 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস, আর 'বৃষ্টি' গল্পটি বাংলা গল্পের ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত মাইলফলক হয়ে আছে। 'ছাতা', 'কমলালেবু' প্রভৃতিও তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প।

আবু বকর সিদ্দিক এবং শওকত আলীর গল্পে প্রধানত নিম্নবর্গের মানুষ পরম মমতায় চিত্রিত হয়েছে। দুজনের গল্পেই শ্রেণীচেতনা তীব্রভাবে প্রকাশিত, শওকত আলীর গল্পে আরেক ধাপ এগিয়ে সেটি শ্রেণীসংগ্রামে গিয়ে পৌঁছায়। শ্রেণী সচেতন তিনি, শ্রেণী সংগ্রামেও বিশ্বাসী— মানুষের পরাজয়ের কথা জেনেও পরাজয় নয় বরং তার ক্রোধ, ক্ষোভ ও সংগ্রামকেই বড় করে দেখেন ও দেখান। কখনো-কখনো এই সংগ্রাম আরোপিত বলেও মনে হয়। গল্প-উপন্যাসে জোতদারের আড়তে আগুন লাগিয়ে দেয়া যায় বটে, কেউ তাতে আপত্তি করবে না— কিন্তু বাস্তব খুব নির্মম, সেখানে নিপীড়িতরা নিপীড়িতই থাকে, লেখকের কলমে পুবের আকাশে লাল সূর্য উঠলেও তাদের জীবন জুড়ে থাকে প্রগাঢ় অন্ধকার। শওকত আলীর গল্পের এক প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গের মানুষ। বিশেষ করে আদিবাসী (সাঁওতাল) জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংস্কার-বিশ্বাস প্রভৃতি কুশলতার সঙ্গে চিত্রায়িত হয়েছে। তাঁর গল্পের আরেকটি বৈশিষ্ট্য যৌনতার খোলামেলা বর্ণনা। 'শুন হে লখিন্দর', 'কপিলদাস মুর্মুর শেষ কাজ', 'লেলিহান সাধ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প।

জহির রায়হান গল্পকার হিসেবে বর্তমান কাল পর্যন্ত এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ। বিশেষ করে তাঁর গল্প বলার কৌশলটি এখনো পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর গল্প যেন চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য। একেকটি শব্দ দিয়েই একেকটি চিত্র নির্মাণ করেন তিনি— এই একটি শব্দেই একটি বাক্য, একটি সম্পূর্ণ অনুভূতি, একটি বর্ণিল দৃশ্য। তাঁর অকাল মৃত্যু আমাদের সাহিত্যকে কিছু অভিনব গল্পের যোগান থেকে বঞ্চিত করেছে। শহীদুল্লাহ কায়সার উপন্যাসে যতটা স্বচ্ছন্দ, গল্পে তা নন। আল মাহমুদ প্রচুর লিখেছেন, যদিও তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পের সংখ্যা সামান্য। তবে একটি কারণে তিনি একটু বিশেষভাবেই দৃষ্টি কেড়েছেন, সেটি তাঁর গল্পের যৌনচেতনা। তাঁর বিখ্যাত গল্প 'পানকৌড়ির রক্ত', 'জলবেশ্যা' বা 'কালো নৌকা' পড়লে মনে হয় এসব গল্পের চরিত্রগুলোর জীবনে যৌনতা ছাড়া আর কিছু নেই। এরকম প্রখর যৌনচেতনা যে-কোনো কথাশিল্পীর পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন, তিনি সেটি করতে সক্ষম হয়েছেন। আরেকজন গল্পশিল্পীর কথা না বললে পঞ্চাশের গল্পচর্চার বিষয়টি সম্পূর্ণ হয় না। তিনি— সাইয়িদ আতীকুল্লাহ। যদিও তাঁর পরিচিতি কবি হিসেবেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং দীর্ঘকাল তিনি গল্পচর্চা থেকে বিরত ছিলেন, তবু তাঁর একমাত্র গল্পগ্রন্থ 'বুধবার রাতে' আজও পাঠককে বিস্ময়াভিভূত করে তোলে। তাঁর রাজনীতি সচেতনতা সম্বন্ধে আবদুল মান্নান সৈয়দ 'পশুর মতো তীক্ষ্ণ' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছিলেন। এত তীক্ষ্ণ সমাজ ও রাজনীতি সচেতনতা, প্রতীকের এমন অসামান্য কুশলী ব্যবহার তাঁর আগে আর কোনো গল্পকারের মধ্যে দেখা যায়নি।

পঞ্চাশের অধিকাংশ গল্পকারই নানা কারণে তাদের গল্পচর্চার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি। এর একটি প্রধান কারণ হয়তো এই যে, তাঁরা শুধুমাত্র গল্পকারই ছিলেন না, আরও বহু কাজ তাঁদেরকে করতে হয়েছে। নতুন দেশে পাকিস্তানি প্রভুদের আধিপত্যবাদী সংস্কৃতিচিন্তার বিপরীতে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের সবটুকু শক্তি নিয়ে। শুধুমাত্র কথাসাহিত্য রচনা করে সেই কাজ হয়তো করা সম্ভব ছিল না। হয়তো সেজন্যই এই সময়ের অনেক লেখকেরই প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল। সরদার ফজলুল করিম, শহীদ সাবের, মুনির চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার, আলাউদ্দিন আল আজাদ সহ আরও অনেকেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। এঁদের সবাই অবশ্য কথাশিল্পী ছিলেন না। কিন্তু যে শাখায়ই কাজ করুন না কেন, সাহিত্যই যে তাঁদের কর্মকাণ্ডের একমাত্র ক্ষেত্র ছিল না, এই রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতা তা প্রমাণ করে দেয়। জহির রায়হান কথাসাহিত্য চর্চায় বিরতি দিয়ে চলচ্চিত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন, নির্মাণ করেছেন 'জীবন থেকে নেয়া'র মতো অসামান্য চলচ্চিত্র। আইয়ুব শাহীর সামরিক শাসনামলে এ-রকম রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত প্রতীকী চলচ্চিত্র নির্মাণ তাঁর মূল প্রবণতার পরিচয় দেয়। শহীদ সাবের জেলবন্দি হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন; মুনীর, সরদার বা আজাদও জেলবন্দি ছিলেন অনেকদিন। মুক্তিযুদ্ধের সময় শহীদ সাবের, শহীদুল্লাহ কায়সার শহীদ হয়েছেন, জহির রায়হানও সদ্য স্বাধীন দেশে রহস্যময়ভাবে নিখোঁজ হয়েছেন। মিরজা আবদুল হাই মাত্র দুটো গল্পগ্রন্থেই গল্পচর্চার সমাপ্তি টেনেছেন; টিপু সুলতানও মাত্র একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশের পর আর গল্প লেখেননি; হাসান হাফিজুর রহমান কবিতা লেখা, পত্রিকা সম্পাদনা, মুক্তিযুদ্ধের দলিল সম্পাদনায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন; আব্দুল গাফফার চৌধুরী প্রবাস জীবন বেছে নিয়েছেন এবং ফালতু কলাম লেখকে পরিণত হয়েছেন— এই সব নানাবিধ কারণে পঞ্চাশের গল্প তেমন এগোয়নি। শুধুমাত্র সৈয়দ শামসুল হক, আলাউদ্দিন আল আজাদ এবং শওকত আলীই শেষ পর্যন্ত সচল রেখেছেন নিজেদেরকে। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। এই সময়ের কথা-লেখকদের মধ্যে অনেকেই মূলত কবি। সৈয়দ শামসুল হক, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবু বকর সিদ্দিক, হাসান হাফিজুর রহমান, আল মাহমুদ, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ—সবারই কবি-পরিচয়টিই প্রধান। এ দিক থেকে দেখতে গেলে একমাত্র শওকত আলীই এ সময়ে বিশুদ্ধভাবে কথাসাহিত্য চর্চা করে গেছেন। পরবর্তীতে আমরা দেখবো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষাটের দশকে এসে গদ্যকাররা স্পষ্টতই কবিতা থেকে সরে গেছেন বা বিশুদ্ধভাবে গদ্যচর্চায়ই মনোনিবেশ করেছেন। পঞ্চাশের আরও কয়েকজন গল্পকারের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে— আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, মাফরুহা চৌধুরী, রাজিয়া খান, টিপু সুলতান, রাবেয়া খাতুন, আহমদ মীর, আনিস চৌধুরী, শহীদ আখন্দ, হুমায়ুন কাদির, আফলাতুন প্রমুখ। গল্পচর্চায় এদের আন্তরিকতা থাকলেও অর্জনটি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

বাংলাদেশে যখন ভাষাকে টিকিয়ে রাখার যুদ্ধ করছেন লেখকরা, তখন পশ্চিমবাংলায় লেখকরা 'নতুন রীতির ছোটগল্প' আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত। বিমল করের নেতৃত্বে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল বাংলা গল্পের মূল প্রবণতা— আখ্যানপ্রধান গল্প— থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই। এই তরুণ লেখকরা এমন সব গল্প লিখতে চাইলেন যা অনুভূতিকে জাগিয়ে দেয়, প্রশ্ন উত্থাপন করে, মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এই ধারায় প্রচুর গল্প লিখেছেন। এঁদের মধ্যে সন্দীপনের শক্তিমত্তা সন্দেহাতীতভাবে বেশি। তাঁর 'অন্ধ স্কুলে ঘণ্টা বাজবে কখন' শিরোনামের এক পৃষ্ঠার ছোট্ট গল্পটি যদি তরুণ লেখকরা কষ্ট করে পড়ে দেখেন তাহলে উপকৃত হবেন বলে ধারণা করি। মানব জীবনের নিষ্ফল ও অর্থহীন প্রতীক্ষার যন্ত্রণা, হাহাকার, অসহায়ত্ব, হতাশা, অর্থহীনতা, অনিশ্চয়তা, দুর্বিসহ পৌনঃপুনিকতা, জীবনের জটিল ও দুর্বহ ভার, প্রগাঢ় ক্লান্তি ইত্যাদির এমন অসামান্য প্রতীকী নির্মাণ আর কোনো গল্পে ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। এটি ছাড়াও তাঁর আরও বহু গল্প শিল্পকুশলতার চূড়া স্পর্শ করেছে। এ প্রসঙ্গে 'বিজনের রক্তমাংস', 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী', 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী', 'বেঁটে লোকের ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে এর মানে সূর্যাস্ত আসন্ন', 'যখন সবাই ছিল গর্ভবতী', 'স্মৃতি, শুকরনন্দিনী, কথা বলো...', 'মাঝখানের দরজা', 'মাতৃস্তোত্র' প্রভৃতি গল্পের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।

এই লেখকদের বাইরেও পশ্চিমবাংলায় ওই সময় একদল শক্তিমান কথাশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা এখন পর্যন্ত ওখানকার সবচেয়ে প্রভাবশালী লেখক। অমিয়ভূষণ মজুমদার, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, কমলকুমার মজুমদার, প্রফুল্ল রায়, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মতি নন্দী, শচীন ভৌমিক, প্রফুল্ল গুপ্ত, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু পালিত, আনন্দ বাগচী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, কবিতা সিংহ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ এলেন এই সময়েই।

পশ্চিম বাংলায় পঞ্চাশের লেখকেরা কথাসাহিত্যকে স্পষ্টই দুটো ধারায় ভাগ করে ফেলেছেন। সুনীল-শীর্ষেন্দুরা প্রধানত সরল ভঙ্গিতে সহজবোধ্য ভাষায় জনচিত্তের কথা মাথায় রেখে লিখেছেন অসংখ্য মন ভোলানো কাহিনী। অন্যদিকে অমিয়ভূষণ, দেবেশ এবং কমলকুমার প্রমুখ সচেতনভাবেই নিজেদের ভাষাটিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে তুলেছেন নন-কমিউনিকেটিভ; মানুষ, মানব-জীবন ও পৃথিবীর খুব গভীরে চোখ ফেলে তুলে এনেছেন ছড়ানো মণিমুক্তা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে তারুণ্যের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা যেমন আসে, তেমনি গ্রামের দারিদ্রপীড়িত মানুষ নিয়েও গল্প আছে তাঁর, 'কখনো-কখনো ছোট্ট একটি পাখির ডাকও তাঁর গল্পের বিষয় হয়ে ওঠে'। সহজ-সরল ভঙ্গি, মেদহীন ভাষা তাঁর গদ্যের বৈশিষ্ট্য। কবি হয়েও তিনি কবিতার প্রভাব পড়তে দেননি তাঁর গল্প বা উপন্যাসে। শুধু গল্পেই নয়, উপন্যাসেও তিনি প্রভাব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর 'একা এবং কয়েকজন' বাংলা সাহিত্যের এক মাইলফলক উপন্যাস। সেই তুলনায় তাঁর অতি বিখ্যাত ট্রিলজি 'পূর্ব পশ্চিম', 'সেই সময়', 'প্রথম আলো' দুর্বল রচনা। যদিও 'পূর্ব পশ্চিম' উপন্যাসের আঙ্গিক পরবর্তীকালের অনেক লেখককে প্রভাবিত করেছে। এটি তাঁর স্বভাবের বাইরের একটি উপন্যাস। এটিকে উপন্যাস না বলে ইতিহাসের সাংবাদিক ডকুমেন্টেশন বলাই ভালো। অথচ এই উপন্যাসের আঙ্গিক কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বাংলাদেশের লেখকদের পছন্দ হয়ে গেছে। হুমায়ূন আহমেদের 'জোছনা ও জননীর গল্প', আনিসুল হকের 'মা' এই ধারার উপন্যাস। এমনকি সৈয়দ হকের 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' প্রথম সংস্করণে যেমন ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে তেমনটি নেই, *পূর্ব পশ্চিমের* আঙ্গিক গ্রহণ করা হয়েছে এই উপন্যাসেও। অর্থাৎ, সুনীল নিজেই শুধু একটি ব্যর্থ-দুর্বল উপন্যাসের জন্ম দেননি, আরও কিছু অসফল উপন্যাসের জন্ম-প্রক্রিয়াকে তরান্বিত ও উৎসাহিত করেছেন। আর এখানেই সুনীলের প্রভাব-প্রতিপত্তি টের পাওয়া যায়। একজন লেখকের অসফল একটি উপন্যাসের যদি এতখানি অনুকরণ হয়, তাহলে তাঁর প্রভাব যে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সেটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তীব্র সমাজ ও রাজনীতি সচেতন লেখক ছিলেন অমিয়ভূষণ মজুমদার। নানা ধরনের বিষয় নিয়ে গল্প লিখলেও তাঁর গল্পবিষয়ক আলোচনায় প্রাধান্য পাবে আঙ্গিক ও নির্মাণকৌশলের বিষয়টিই। তিনি খুব সচেতনভাবেই এমন এক ভাষা তৈরি করেছিলেন যেটি জটিলতাপূর্ণ, মেদহীন, অকাব্যিক অথচ নান্দনিক। শ্লথ-শিথিল কথার ধারে-কাছে যাননি তিনি। আর এই ভাষার মারপ্যাঁচেই তিনি হাজির করেছেন অপরিপক্ক মধ্যবিত্ত সম্বন্ধে তাঁর অবজ্ঞা আর অন্তজ শ্রেণীর মানুষদের প্রতি তাঁর মমতা। তাঁর চরিত্রগুলোও এমন যে তারা শুধু নিজেরাই ভাবে না, পাঠকদেরকেও ভাবতে বাধ্য করে, তারা নিজেরাও লেখকের মিতকথনের প্রতি মুগ্ধ হয়েই হয়তো ন্যূনকথনে বিশ্বাস করে। 'তাঁতী বউ', 'দুলারহিন্‌দের উপকথা', 'অ্যাভলনের সরাই', 'উরুণ্ডী', 'এপস্ অ্যান্ড পিকক্' প্রভৃতি গল্প তাঁর এইসব চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। দেবেশ রায়ও রাজনীতি সচেতন লেখক। মানুষের জীবন যে নানাভাবে রাজনীতি-শাসিত, রাজনীতি-পীড়িত, রাজনীতি-প্রভাবিত; এবং এজন্যই রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফয়সালা দরকার— এই বিষয়টি দেবেশ বুঝে নিয়েছিলেন। 'পশ্চাৎভূমি', 'উদ্বাস্তু', 'পা', 'আহ্নিকগতি ও মাঝখানের দরজা' প্রভৃতি গল্পে এসবের চিহ্ন আছে। তাঁর ভাষাটিও নন-কমিউনিকেটিভ, কখনো-কখনো কষ্টকল্পিত বলেও মনে হয়, যেমনটি হয় অমিয়ভূষণের ক্ষেত্রেও। তবে দেবেশের সাফল্য ও স্বীকৃতি এসেছে প্রধানত উপন্যাসের পথ ধরেই। 'তিস্তাপারের বিত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাস দুটোকে বাংলা সাহিত্যের প্রধান উপন্যাগুলোর মধ্যে গণ্য করতে হবে আরও বহুদিন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় গল্প লিখেছেন প্রথাগত ভঙ্গির বাইরে গিয়ে। তাঁর গল্পের বিষয় প্রধানত গ্রামের মানুষ অথবা শহুরে শ্রমজীবী মানুষ। তাঁর চিত্রকল্পময় বর্ণনায় মিশে থাকে প্রচ্ছন্ন কৌতুক। 'কলকেপুরের রেলপুকুর', 'ছায়াপূর্বগামিনী', 'পরী', 'হাজরা নস্করের যাত্রাসঙ্গী' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প। অন্তজ শ্রেণীর, বিশেষ করে আদিবাসীদের, জীবন নিয়ে প্রচুর কাজ করেছেন মহাশ্বেতা দেবী। তাদের জীবনযাপন, তাদের আবেগ, তাদের জঙ্গমতা এমন এক অনবদ্য ভাষায় রূপায়ন করেছেন তিনি যার উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে আর নেই। 'স্তনদায়িনী', 'বেহুলা', 'দ্রৌপদী', 'নুন' প্রভৃতি গল্প তাঁর শক্তিমত্তার প্রমাণ দেয়।

পশ্চিমবাংলায় পঞ্চাশের এই লেখকরা দিনে দিনে এতটাই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছেন যে, পরবর্তীকালের কথাসাত্যিকদের এই প্রভাব-বলয় থেকে বেরুনোই কঠিন হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশে ঘটেছে ভিন্ন ঘটনা। চল্লিশ-পঞ্চাশের লেখকদের প্রভাব-বলয় থেকে বেরিয়ে এখানে ষাট দশকের লেখকদের হাতে কথাসাহিত্যের বিপুল উত্থান ঘটে। তৈরি হয় নতুন যাত্রাপথ। এ বিষয়ে পরে কথা বলার ইচ্ছে রইলো।

এ রচনার এই অংশ আমরা এখানেই থামিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আরেকজন অতি বিস্ময়কর লেখক—কমল কুমার মজুমদার—কে নিয়ে অন্তত কয়েকটি পংক্তি না লিখলে উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গটি অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। কমল কুমারের আবির্ভাব পঞ্চাশের দশকে হলেও তাঁর মতো আর কোনো লেখকই প্রায় ব্যাখ্যাহীনভাবে দেশভাগ-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের প্রবাহমান দুটো ধারায় এত বিপুল ও গভীর আলোচনার জন্ম দিতে পারেননি। 'বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম ধাঁধা' এই লেখককে নিয়ে কোনোদিনই কেউ নিশ্চিত ব্যাখা দিতে সাহসী হননি। ফলে, আমার মনে হয়, ব্যাখ্যাহীন অজ্ঞাত কারণেই তিনি বারবার—বিশেষ করে তাঁর পরবর্তীকালের প্রায় সমস্ত তরুণ লেখককে—বিস্ময়করভাবে ঘোরগ্রস্ত করে রেখেছেন, অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও। কমলকুমার বাংলা সাহিত্যে একাই একটি প্রতিষ্ঠান, তাঁর আগে-পরে তাঁর মতো লেখক আর আসেননি। এখন পর্যন্ত অনেককিছুই অব্যাখ্যাত থেকে গেছে কমলকুমারের। যেমন, তাঁর পূর্ববর্তীকালের লেখকেরা যখন সাধুভাষা দিয়ে শুরু করে চলতি ভাষায় শেষ করেছিলেন, তিনি হেঁটেছিলেন এর উল্টো দিকে। অর্থাৎ প্রথমদিকে চলতি ভাষায় লিখলেও পরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে সাধুভাষায় প্রত্যাবর্তন করেন তিনি এবং ক্রমশ সেই ভাষা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে, এবং শেষ পর্যন্ত এমন এক ভাষারীতি নির্মাণ করেন যা শুধু তাঁকেই চিনিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হয় না, বরং হয়ে ওঠে অননুকরণীয়, নির্বিকল্প। তরুণ বয়স থেকে যতই তিনি পরিণত বয়সের দিকে এগিয়েছেন তত বেশি নীরিক্ষাপ্রবণ হয়ে উঠেছেন। প্রথমদিকের গল্প 'লাল জুতো' বা 'মধু'র সঙ্গে 'নিম অন্নপূর্ণা' বা 'কয়েদখানার' তুলনা করলেই এর সত্যতা টের পাওয়া যাবে। তাঁর গল্পে এদেশের ক্লিষ্ট-বিপন্ন দীনদরিদ্র মানুষগুলো গভীর সম্মানের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। মানুষের প্রতি সহানুভূতির বদলে তার ছিল মর্যাদাবোধ, ফলে ছঁকে বাঁধা সহানুভূতির গল্প; করুণার গল্প তিনি লেখেননি। 'মতিলাল পাদরী', 'তাহাদের কথা', 'নিম অন্নপূর্ণা', 'কয়েদখানা', 'মল্লিকা বাহার', 'গোলাপ সুন্দরী', 'অন্তর্জলি যাত্রা', 'অনিত্যের দায়ভাগ' প্রভৃতির কোনো তুলনা হয় না। যাহোক, তাঁর সম্বন্ধে তাঁরই সতীর্থ লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বরং এ প্রসঙ্গের ইতি টানা যাক—

> 'কমল কুমার মজুমদার বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম ধাঁধা। এরকম কোনো লেখক হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়, অথচ সত্যিই কমল কুমার মজুমদার নামে একজন লেখক বেশ কয়েক বছর বাংলা সাহিত্যে দাপটের সঙ্গে বিচরণ করে গেছেন। সাহিত্য নিয়ে তিনি কি ছেলেখেলা করতে চেয়েছিলেন, না সাহিত্য তার অস্থিমজ্জায় মিশে হৃদপিন্ডের ধমনির সঙ্গে সমন্বিত হয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ নয়। আমি তাকে প্রায় কৈশোর বয়েস থেকে দেখেছি, বহু বছর তার সঙ্গ লাভ করেছি, তবু মানুষটিকে ঠিক বুঝতে পারিনি। তার রচনাগুলির মতো রচয়িতাটিও দুর্বোধ্য ও রহস্যময়।... দু'একটি উপন্যাস ও বেশ কয়েকটি ছোটগল্পে যখন কমলকুমার আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছেন, আমাদের মনে হয়েছে এমন বর্ণাঢ্য, এমন উচ্চস্তরের রস, সম্পূর্ণ বাক-বিভূতিসম্পন্ন রচনা আমাদের অভিজ্ঞতায় আর নেই, তখনই কমলকুমার যেন ইচ্ছে করে তাঁর পাঠকদের দূরে সরিয়ে দিতে চাইলেন। পুরস্কার কিংবা অর্থাগম সম্পর্কে নির্লোভ এবং মোহমুক্ত থাকতে পারেন কোনো-কোনো লেখক, কিন্তু এমন লেখক কি সম্ভব, যিনি পাঠক চান না? ... মোট পঁয়ষট্টি বছর বেঁচেছিলেন কমলকুমার। এর মধ্যে সাহিত্যে মনোনিবেশ করেছিলেন শেষ কুড়ি বছর। গল্প লিখেছেন মাত্র তিরিশটি, তাও দু'তিনটি অসমাপ্ত। এর মধ্যে অর্ধেক গল্প ভাবনার ঐশ্বর্যে, পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্মিতিতে, কাব্য ও চিত্রশিল্পের মেলবন্ধনে বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। আর দ্বিতীয়ার্ধের গল্পগুলি ভাষার কঠিন ব্যূহের কারণে ঠিক মতন বিচার করা যায় না। সেগুলি কি এক লেখকের খামখেয়াল না আরও বড় সম্পদ তা কে জানে! আমি সেই গল্পগুলির রসের সন্ধান এখনো পাইনি। মাঝে-মাঝেই সেগুলি পড়ি, হয়তো সারাজীবনই পড়ে যেতে হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁক পরিবর্তনের গল্প

বাংলাদেশের গল্প প্রথমবারের মতো দৃষ্টিগ্রাহ্য বাঁক পরিবর্তন করে ষাটের দশকে। অস্থিরতার সময় ছিল সেটি; কী আমাদের পরিচয়—এই প্রশ্ন প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল তখন। ততদিনে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রতত্ত্বের মোহ কেটে গেছে, ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে পাকিস্তানিদের প্রকৃত স্বরূপ, বাঙালি দাঁড়িয়ে আছে তার আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন সামনে নিয়ে, ভাবতে শুরু করেছে স্বাধিকারের কথাও। একদিকে সামরিক শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে সমস্ত মানবতা অন্যদিকে চলছে আন্দোলন-সংগ্রাম-প্রতিরোধ। একদিকে জাতীয়তাবোধ ও স্বাতন্ত্র্যবোধ নির্মাণের প্রবল-প্রচুর প্রক্রিয়া, অন্যদিকে বাঙালির বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্র। পূর্ববর্তী অর্থাৎ পঞ্চাশের লেখকরা যেন কিছুটা হতভম্ব ছিলেন নতুন রাষ্ট্রপ্রাপ্তিতে, ষাটের লেখকরা অনেক বেশি স্থির হয়ে উঠেছিলেন আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে। এই অর্থে সময়টি নানাদিক থেকে সংকট ও নির্মাণেরও বটে। সাহিত্যের ভূমিটি তখনো ছিল কিছুটা নরম-কর্দমাক্ত। বীজক্ষেত্র কিভাবে নির্মিত হবে সেটি নির্ভর করছিল লেখকদের ওপরই। এই দ্বন্দ্ব ও সংকটমুখর সময়ে ষাটের সাহিত্যকর্মীরা নিয়ে এসেছিলেন প্রথা ভাঙার অঙ্গীকার, নতুন কিছু নির্মাণের আন্তরিক-উদ্দাম-উচ্ছল প্রচেষ্টা। এর জন্য যে দীপ্ত-উজ্জ্বল তরুণ গোষ্ঠী প্রয়োজন, ষাটের তা ছিলও। সত্যি কথা বলতে কি, ষাটের দশক বাংলাদেশের সাহিত্যে উপহার দিয়েছিল এক ঝাঁক উজ্জ্বল সাহিত্যকর্মী— কী কথাসাহিত্যে, কী কবিতায়, কী প্রবন্ধ বা সমালোচনায়— এক সঙ্গে এত অধিক সংখ্যক শক্তিশালী লেখকের আগমন আর কোনো সময় ঘটেনি। একটু আগে-পরে বাংলাদেশের গল্পের কয়েকজন দিকপাল— হাসান আজিজুল হক, মাহমুদুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও আব্দুল মান্নান সৈয়দ— এলেন এই সময়েই। এঁরা সবাই অসামান্য প্রতিভাবান, জাতশিল্পী। শুধু এঁরা নন, ষাটের লেখকদের তালিকায় আরও কয়েকজনের নাম শ্রদ্ধা পেতে পারে— জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, হাসনাত আবদুল হাই, রাহাত খান, রিজিয়া রহমান, আবুশ শাকুর, পুরবী বসু, কায়েস আহমেদ, বশীর আল হেলাল, বিপ্রদাশ বড়ুয়া, আহমদ ছফা, সুব্রত বড়ুয়া, রশীদ হায়দার, সেলিনা হোসেন, সাযযাদ কাদির, শহীদুর রহমান, হুমায়ন চৌধুরী প্রমুখ। এঁদের হাত ধরেই বাংলাদেশের গল্প প্রথমবারের মতো দৃষ্টিগ্রাহ্য বাঁক পরিবর্তন করে।

হাসান আজিজুল হক বাংলাদেশের সাহিত্য-রুচির প্রেক্ষাপটে এক বিস্ময়কর চরিত্র। তিনি শুধুই গল্পকার, উপন্যাসের ধারে-কাছে খুব একটা যাননি (এই কিছুদিন আগে কেবল তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস লিখলেন), শুধুমাত্র গল্পচর্চা করেও যে দেশের অন্যতম প্রধান লেখকে পরিণত হওয়া যায় তিনি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সমাজের ক্ষয়ে যাওয়া, নিষ্প্রভ, সম্ভাবনাহীন, পরাজিত মানুষ তার গল্প-ভুবনের প্রধান অনুষঙ্গ। শ্রেণী-বৈষম্যের এই সমাজে তাঁর গল্পের প্রাসঙ্গিকতা তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনস্বীকার্য। আর শুধু শ্রেণী-সচেতনতার কথাই বা বলি কেন, তিনি তাঁর গল্পে কতভাবে যে ভেঙেচুরে জীবন ও পৃথিবীকে দেখিয়েছেন, কতগুলো কোণ থেকে যে জীবনের ওপর আলো ফেলেছেন তার কোনো হিসেব-নিকেশ নেই। তাঁর গল্পে সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে কোনো ভাববিলাস নেই, যেভাবে দেখেন ঠিক তেমন করেই তুলে আনতে প্রয়াসী হন। এতটুকু আবেগ নেই কোথাও, স্বপ্ন আছে বটে, নেই স্বপ্ন নিয়ে মোহগ্রস্ততা। এবং তাঁর ভাষা— এ এমন এক সম্পদ যে তাঁর গল্প পাঠের সময় কবিতা পাঠের আনন্দ হয়, গদ্যভাষাকে তিনি এমনই এক উঁচু পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। ১৯৩৯-এ জন্ম হাসান আজিজুল হকের, আর লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ষাটের দশকে। কৈশোরেই প্রত্যক্ষ করেছেন দেশভাগের মতো মর্মদন্ত ঘটনা, দুই বঙ্গের মানুষের দেশত্যাগের বেদনা— তিনি নিজেও স্বদেশ ছেড়ে এই বাংলায় থিতু হয়েছেন, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দিয়ে একটি জাতির পরিচয় নির্মাণের চেষ্টা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা-দুর্ভিক্ষ, মানুষের করুণ বেঁচে থাকা, আর এ-সব কিছুর মধ্যে বাঙালির প্রতিরোধ চেতনার স্ফূরণ ও বিকাশ। বাঙালির এই সংকটমুখর সময়ে, ভাঙন ও নির্মাণের এই প্রক্রিয়ায় হাসান এবং তাঁর সহযাত্রীরা বরাবর যথার্থ সাড়া দিয়েছেন। এ-সব কিছুর চিহ্ন পাওয়া যাবে তাঁর গল্পে, নানাভাবে, নানা মাত্রায়।

বাঙালির জীবনে অনেক কবিতা যেমন স্মৃতির অন্তর্গত হয়ে গেছে, তেমনি গেছে হাসানের কয়েকটি গল্পও। এমন কোনো গল্প-পাঠক নেই যিনি 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' অসংখ্যবার পড়েননি, কারণে-অকারণে গল্পটির কথা তার মনে পড়েনি। পৃথিবীর সকল সফল লেখকই আসলে স্মরণযোগ্য লেখক, উদ্ধৃতিযোগ্য লেখক। কোনো-কোনো লেখককে যে জীবনের নানা পর্যায়ে, নানা প্রয়োজনে আমরা উদ্ধৃত করি, তার কারণ— তাঁদের লেখাগুলো আমাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে, আমাদের জীবনকে কোনো-না-কোনোভাবে প্রভাবিত করেছে। হাসানও তেমন লেখক। ওই গল্পটি ছাড়াও আরও অনেক গল্পের কথাই এক নিঃশ্বাসে বলে যাওয়া যায়, যেগুলো, ধারণা করি— বাংলা কথাসাহিত্যে ইতিমধ্যেই স্থায়ী আসন গেড়ে নিয়েছে। যেমন— 'তৃষ্ণা', 'মন তার শঙ্খিনী', 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'আমৃত্যু আজীবন', 'শোনিত সেতু', 'খাঁচা', 'জীবন ঘষে আগুন', 'নামহীন গোত্রহীন', 'সাক্ষাৎকার', 'পাবলিক সার্ভেন্ট', 'মা-মেয়ের সংসার' প্রভৃতি।

আগেই বলেছি, বাঙালির ইতিহাসের নানা পর্বে হাসান সাড়া দিয়েছেন, লিখেছেন চমৎকার সব গল্প। দেশভাগ নিয়ে 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'খাঁচা', 'উত্তর বসন্তে', 'একটি নির্জল কথা', সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে 'পরবাসী', ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট নিয়ে 'শোনিত সেতু', মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে 'নামহীন গোত্রহীন', 'কৃষ্ণপক্ষের দিন', 'ফেরা' প্রভৃতি গল্পে তাঁর এই সাড়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচয় পাওয়া যাবে। আবার 'পাতালে হাসপাতালে', 'পাবলিক সার্ভেন্ট', 'খনন' প্রভৃতি গল্পে হাসান আজিজুল হক তাঁর রাজনীতি-মনস্কতার পরিচয় রেখেছেন। শুধু রাজনৈতিকই নয়, তাঁর গল্পে ধরা পড়েছে এই বাংলার দীর্ঘ একটি সময়ের সামাজিক ইতিহাসও। যদিও প্রধানত সমাজের ভঙ্গুর ও ক্ষয়িষ্ণু রূপ এবং মানুষগুলোর দুর্দশাগ্রস্থ জীবনযাপনই তাঁর অধিকাংশ গল্পের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে তবু, সমাজ ও এর ভেতরে বাস করা মানুষগুলোর সংকট ও সম্ভাবনা, তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও বেদনা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, ক্ষয়ে যাওয়া ও গড়ে তোলা এসবকিছুই নিপুণ কুশলতায় এঁকেছেন তিনি। দেখিয়েছেন, সমস্ত সংকট, হতাশা, আর ভাঙন নিয়েও মানুষগুলোর বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা কী তীব্র! 'তৃষ্ণা', 'মা ও মেয়ের সংসার', 'মাটি-পাষাণের বৃত্তান্ত', 'বিলি ব্যবস্থা' প্রভৃতি গল্প এর প্রমাণ দেয়।

হাসান আজিজুল হকের গল্প এত বহুমাত্রিক, এত অসংখ্য দিক নিয়ে কথা বলা যায় তাঁর গল্প সম্বন্ধে যে, একটি মাত্র লেখায় তা প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁর গল্পে ধরা পড়েছে বাঙালির প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর ইতিহাস। শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, ব্যক্তির ইতিহাস— তার ভাঙা-গড়া, তার দুঃখ-কষ্ট-হতাশা, তার সংগ্রাম, তার আকাঙ্ক্ষা, তার জীবন-যাপন; সামাজিক ইতিহাস—তার পতন, বিকার ও বিকাশ, তার পরিবর্তন, তার সম্ভাবনা ও সম্ভব-না এই সবকিছু। তাঁর গল্পেই তিনি বলে দিয়েছেন—ইঙ্গিতে ও ইশারায়, শিল্পিত কুশলতায়—কোন ধরনের সমাজ তাঁর কাম্য। যে প্রচণ্ড ধ্বংসের ছবি আঁকেন তিনি, সেটি কেবল বাস্তবতার শিল্পিত রূপ দেয়ার জন্যই নয় বরং এইসব বর্ণনা দিয়ে তিনি পাঠক-মনে জাগিয়ে তোলেন ক্ষোভ ও বেদনা, বুঝিয়ে দেন—এরকম সমাজ আমাদের কাম্য হতে পারে না, মানুষের জন্য আমরা চাই একটি শোষণমুক্ত-দারিদ্রমুক্ত-দুর্দশামুক্ত-উজ্জ্বল-প্রাণবন্ত-মানবিক সমাজ। তাঁর গল্প তাই শেষ পর্যন্ত কেবল গল্প হয়েই থাকে না, হয়ে ওঠে বাঙালির ইতিহাসের এবং বাঙালির আকাঙ্ক্ষার প্রামাণ্য দলিল।

এ সময়েরই আরেকজন জাতশিল্পী মাহমুদুল হক। তাঁর খ্যাতি ও সাফল্য উপন্যাসের পথ বেয়ে এলেও তাঁর দুটিমাত্র গল্পগ্রন্থ 'প্রতিদিন একটি রুমাল' ও 'নির্বাচিত গল্প' এবং আরও কিছু অগ্রন্থিত গল্প পাঠকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মাহমুদুল হক হচ্ছেন সেই রহস্যময় লেখকদের একজন যাঁর প্রতিটি রচনা পাঠককে আলোড়িত করে, যাঁর গ্রন্থপ্রকাশ মনস্ক পাঠকদের কাছে একটি সুসংবাদ বয়ে আনে। খুব বেশি গল্প লেখেননি তিনি, তবু তাঁকে ছাড়া আমাদের গল্পের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মাহমুদুল হক তাঁর গল্পে খুব বেশি কথা বলেন না কখনো, বরং তাঁকে বলা যায় সংযমী, আবেগের রাশ টেনে ধরা লেখক। অন্যান্য লেখকরা যে দৃশ্যপটের বিস্তৃত বর্ণনার লোভ সামলাতে পারেন না, সেরকম দৃশ্যের বর্ণনায়ও তিনি থাকেন নিরাসক্ত; এবং পছন্দ করেন ইঙ্গিত দিতে— কখনো-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো একেকটি ইঙ্গিতই তাঁর গল্প হয়ে ওঠে, কখনো একটি মাত্র বাক্য গল্পের পরিণতি নির্ধারণ করে, কখনো-বা একটি মাত্র দৃশ্যকল্প গল্পের প্রেক্ষাপট পাল্টে দেয়। মাহমুদুল হকের চরিত্রগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবন যাপনে ম্লান-ম্রিয়মান-ব্যর্থ ও নিঃস্ব। তাদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, হাবভাব স্পষ্টতই বলে দেয়— তাদের জীবনে কোনো একটা অঘটন ঘটে গেছে কিংবা প্রতিনিয়ত অঘটন ঘটেই চলেছে। এই চরিত্রগুলো বিষণ্ন ও নিঃসঙ্গ, জীবনের প্রাত্যাহিকতায় বেমানান ও বেখাপ্পা— অনুজ্জ্বল ও সম্ভাবনাহীন তাদের জীবনযাপন। ফলে দেখা যায়, দৈনন্দিন ব্যর্থতা ও দুঃখবোধ ঢাকতে তারা আশ্রয় নেয় তাদের ফেলে আসা সোনার শৈশবে। কখনো-কখনো হয়তো শৈশবটিও স্বর্ণালী নয়, তবু তারা ফিরতে চায় সেখানেই— কারণ ওখানে আশ্রয় আছে, অবোধ আনন্দ আছে, দুঃখবোধের বিপরীতে সুখের বিশাল আকাশ আছে। যত কিছুই ঘটুক— মানুষ খুব ভালো, মানুষ খুব সুন্দর— এই হচ্ছে পাঠকের কাছে মাহমুদুল হকের মেসেজ। সমস্ত গল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর পাঠকদের কাছে প্রধানত এই কথাটিই বলতে চান— সব কিছুর পরও মানুষ ইতিবাচক প্রাণী। মানবতার পক্ষে, মানুষের পক্ষে, মানবজীবনের পক্ষে মাহমুদুল হকের এই দৃঢ় অবস্থানই তাঁর গল্পের প্রাণ। 'হৈরব ও ভৈরব', 'কালো মাফলার', 'বুলু ও চড়ুই', 'প্রতিদিন একটি রুমাল', 'মনসা মাগো' প্রভৃতি গল্প তাঁর প্রতিভার পরিচয় বহন করছে। উপন্যাসেও তিনি দেখিয়েছেন অসাধারণ সাফল্য। 'কালো বরফ' বাংলা সাহিত্যের আরেকটি মাইলফলক উপন্যাস; 'জীবন আমার বোন', 'অনুর পাঠশালা' এবং 'খেলাঘর' উপন্যাসগুলোও নানা কারণে আরও বহুকাল পর্যন্ত উপন্যাস-পাঠকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে।

আরেকটি কারণে মাহমুদুল হক বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষভাবে গুরুত্ব পাবেন। তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে আমাদের চারপাশে যে ভাষাহীন বিপুল জগৎ রয়েছে তাদেরকে দিয়ে কথা বলিয়েছেন। তাঁর রচনায় পাখি কথা বলে, কথা বলে বৃক্ষ ও নদী, ফুল ও পাতা, এমনকি জড়জগৎকেও তিনি করে তোলেন অনুভূতিসম্পন্ন। দু-একটি উদাহরণ দেয়া যাক—

> '...গোটাগ্রাম জুড়ে ছিল কদমের বন, বর্ষার নদী ধীরে মন্থর গতিতে ফেঁপে ফেঁপে উঠে শেষে কদমের বনে গিয়ে ইচ্ছে করে পথ হারিয়ে 'এ আমার কি হল গো' ভান ধরে ছেলেমানুষিতে মেতে উঠতো। এখন গ্রাম কি গ্রাম উজার; দেশলাইয়ের কারখানা গিলে ফেলেছে সবকিছু। কদমের সে বনও নেই, নদীর সেই ছেলেমানুষিও নেই; এখন ইচ্ছে হলো তো এক ধারসে সব ভাসিয়ে দিলো, সবকিছু ধ্বংস করে দিলো, 'আমি তোমাদের কে, আমার যা ইচ্ছে তাই করবো' ভাবখানা এমন।' *(হৈরব ও ভৈরব/ প্রতিদিনি একটি রুমাল)*।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই অংশটি পড়ে কি মনে হয় না, এই নদীরও প্রাণ আছে, আছে তীব্র অনুভূতি? এরকম নমুনা আরও প্রচুর দেয়া যাবে, আর না বাড়িয়ে বরং আর একটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করি—

> 'যহন মনিষ্যি আছিল না, তহন বাজনা আছিল, পর্বত বাইজা উঠছে, জল বাইজা উঠছে, মাটি বাইজা উঠছে, ধরিত্রি বাইজা উঠছে, বাইজা উঠছে আকাশ বাইজা উঠছে মনুষ্যজন্ম, বাইজা উঠছে মনুষ্যধর্ম, বাইজা উঠছে মানবজীবন, ...বাবু হুনতাছেন? ঢাকে কেমনে কথা কইতাছে হুইনা দ্যাহেন। দশখুশি বাবু, চৌদ্দমাত্রা, মানবজীবন কথা কইতাছে বাবু! দশখুশি বাবু, চৌদ্দমাত্রা, মনুষ্যধর্ম বোল তুলতাছে, আখিজলে আখিজলে, টলমল টলমল, ধরাতর ধরাতল, রসাতল, হা..." *(হৈরব ও ভৈরব/ প্রতিদিন একটি রুমাল)*

প্রিয় পাঠক, আমি দু-একটিমাত্র উদাহরণ দিয়ে বিষয়টির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আপনারা একটু লক্ষ করলেই এরকম আরও অসংখ্য উদাহরণ খুঁজে পাবেন। আমাদের চারপাশের এই বিপুল সৃষ্টিজগৎ— যা কিছু নিঃশব্দ, যা কিছু শব্দময়, যা কিছু দৃশ্যগোচর, দৃশ্যাতীত— তার সব কিছুরই যে নিজস্ব ভাষা আছে, আমরাই কেবল তা বুঝতে পারি না; তিনি যেমন সেদিকে আমাদের চোখ ফিরিয়েছেন তেমনি সেই ভাষাটিকে বুঝতে চেয়েছেন, চেয়েছেন এই সৃষ্টিজগতের সঙ্গে মানুষের অলিখিত দিব্যকান্তি সম্পর্কটি আবিষ্কার করতে। এই একটি জায়গায় মাহমুদুল হক একেবারেই ইউনিক, এরকম উদাহরণ আর একটিও পাওয়া যাবে না।

লেখালেখির প্রাথমিক পর্বে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প অন্তর্মুখী আত্মকথনে ভরপুর, আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর এই প্রবণতাকে মর্বিডিটি বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু, আমরা দেখি, প্রায় এক যুগের এক রহস্যময় বিরতির পর সত্তরের মাঝামাঝিতে যখন আবার লেখালেখিতে ফিরলেন ইলিয়াস, ততদিনে নিজেকে আমূল বদলে ফেলেছেন তিনি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলোর মধ্যে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' ছাড়া আর কোনোটিতেই প্রাথমিক পর্বের নিদর্শন নেই, সেটি প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অন্য ঘরে অন্য স্বর'-এ সংকলিত, আর ওই একই গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'উৎসব'-ই তাঁর বদলে যাওয়ার পরিচয় বহন করছে। পরবর্তীকালে তিনি সমাজ-বাস্তবতার ধ্রুপদী চিত্রকর এবং প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের পর এই ধারায় তাঁর মতো এতো সূক্ষ্মদর্শী নিপুণ গল্পশিল্পী বিরল। সমাজের আপাদমস্তক তুলে এনেছেন তিনি। বাস্তবতার চিত্রণে আপোসহীন, তবু পাঠকের ওপরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেননি, চরিত্রগুলোর ওপরে অহেতুক আরোপ করেননি বিপ্লবের বোঝা। তাঁর গল্প পড়লে পাঠকের মনে হতে বাধ্য যে, এই সমাজ ব্যবস্থা, এই জীবন-পদ্ধতি কোনোভাবেই কাম্য নয়— কিন্তু কোনটি কাম্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও গ্রহণযোগ্য, সে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তিনি পাঠকের বিবেচনার ওপরই ছেড়ে দিতে চান। আর এ জন্যই তাঁর গল্প হয়ে ওঠে পাঠকের নিজস্ব সম্পদ এবং একটি সফল কালজয়ী গল্পের এটিই প্রধান বৈশিষ্ট্য যে সে পাঠকের একান্ত সঙ্গী হয়ে ওঠে। বিরলপ্রজ ছিলেন ইলিয়াস। প্রায় তিরিশ বছরের সাহিত্য জীবনে তাঁর গল্পসংখ্যা পঁচিশ। খুব বেশি লেখেননি বটে, কিন্তু যা লিখেছেন তার প্রতিটি শব্দও যেন গভীর চিন্তাভাবনা করে লিখেছেন তিনি। তাঁর গল্পের বিষয়ও অভিনব। তিনি, এমনকি, যখন নাগরিক মানুষ নিয়ে লিখেছেন তখন ওই বহুল ব্যবহৃত মধ্যবিত্তদের ধার ধারেননি, বরং পুরনো ঢাকার নানা শ্রেণী-পেশার বাসিন্দারা তাঁর গল্পে উঠে এসেছে। এই গল্পগুলোর স্বাদ একেবারেই আলাদা, অন্য কোথাও পাঠকরা এই স্বাদ পাবেন না। মধ্যবিত্ত জীবন নিয়েও তিনি দু-একটি গল্প লিখেছেন বটে, কিন্তু সেগুলোতে তাদের নিত্যদিনের দুঃখকষ্ট, হা-হুতাশ, আহাজারি ইত্যাদির দেখা পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় এক নগ্ন-বীভৎস মধ্যবিত্তকে— যার সুন্দর ফুরফুরে শার্টের নিচে লুকিয়ে আছে কুষ্ঠরোগীর মতো দগদগে-বিশ্রি-কুৎসিৎ ঘা। যাহোক, এত অল্প লিখে সাহিত্যজগতে নিজের নামটি যিনি স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখার যোগ্যতা রাখেন, তাঁর দিকে মনোযোগ না দিয়ে উপায় থাকে না। আর মনোযোগ দিলে আমরা দেখি— কী বিষয়-ভাবনা, কী চরিত্র-চিত্রণ, কী বর্ণনাভঙ্গি সবকিছুতেই ইলিয়াস নির্মাণ করেছিলেন এক আশ্চর্য ব্যতিক্রমী জগৎ। জীবনকে তিনি দেখেছিলেন গভীরভাবে— একেবারে ডুবুরির চোখ নিয়ে, এবং তার সবটুকুই বর্ণনা করেছেন এমন এক ভঙ্গিতে যেন চোখের সামনেই ঘটছে এত সবকিছু; চরিত্র চিত্রণে তথাকথিত আভিজাত্য তিনি মানেননি কোনোদিন এবং ব্যবহার করেছেন এমন এক ভাষা যা দৈনন্দিন জীবন থেকে এতটুকু আলাদা নয়। সাহসী তিনি— জীবনকে ভয়ংকর নগ্নভাবে তুলে ধরতে তাঁর কুণ্ঠা নেই কোনো— কুশলী তো বটেই, মনস্ক পাঠকের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা তাই প্রশ্নাতীত। মানুষ এবং তার জীবনযাত্রা এবং তার পরিপার্শ্ব তাঁর কলমে চিত্রিত হয় সকল সম্ভাবনাসহ— তার প্রেম-কাম-ভালোবাসা-স্নেহ-মমতা-ক্রোধ-হতাশা-প্রতিশোধস্পৃহা-প্রত্যাশা কিংবা হাসিকান্না সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনার মতো অনুভূতিসঞ্জাত বিষয়গুলো যেমন, তেমনি তার থুথু-কাশি-মল-মূত্রসহ। যা কিছু নির্মিত হয় তাঁর হাতে— হয় প্রায় নিপুণ পরিপূর্ণতায়। ইলিয়াসের 'মিলির হাতে স্টেনগান', 'উৎসব', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'যুগলবন্দি', 'কান্না', 'দুধভাতে উৎপাত', 'কীটনাশকের কীর্তি', 'খোঁয়ারি', 'দোজখের ওম', 'অপঘাত', 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' প্রভৃতি গল্প আরও বহুকাল বাংলা গল্পকে গৌরব দেবে। শুধু গল্পেই নয়, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে মাত্র দুটো উপন্যাস—'চিলেকোঠার সেপাই' এবং 'খোয়াবনামা'— দিয়েই তিনি নিজের নামটি স্থায়ী করে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আব্দুল মান্নান সৈয়দ সমাজ বাস্তবতার ধারে-কাছেও যাননি। তাঁর গল্প ধ্রুপদী মাত্রা পেয়েছে মানুষের অন্তর্লোক চিত্রায়ণের কুশলী সফলতায়। মানব-মনের বহুবিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূক্ষ্ম চিত্রণে তার তুলনা মেলা ভার। সমাজ-বাস্তবতার আবহমান ধারা থেকে কিছুটা সরে দাঁড়িয়ে তিনি প্রধানত মানুষকে তুলে এনেছেন তার অন্তর্লোকের পরিপ্রেক্ষিতে, তার সমস্ত আকুলতা-আকুতি, আবেগ-আবেশ, বিস্ময়-বিভিন্নতা, ভয়-ভাবনা আর এসবের অদ্ভুত-অসাধারণ ব্যাখ্যাসহ। এদিক থেকে দেখলে ইলিয়াসের বিপরীত মেরুতে তাঁর অবস্থান। বস্তুত ইলিয়াস ও মান্নান সৈয়দ গল্প সাহিত্যের দুটো শাখায় নেতৃত্ব দিয়েছেন আপন যোগ্যতায়। তাঁর 'চাবি', 'মাছ', 'মাতৃহননের নান্দীপাঠ', 'অস্তিত্ব অন্যত্র' প্রভৃতি গল্প শিল্পকুশলতার পরিচয় দেয়। সাহিত্যের নানা শাখায় কাজ করায়, বিশেষ করে গবেষণায় অতিরিক্ত সময় ব্যয় করার কারণে তাঁর সৃজনশীল কাজগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করি আমি। তাঁর মতো একজন শক্তিমান কবি ও গল্পকার কেন আবদুস সাত্তারের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করে সময় নষ্ট করবেন সেটি বোঝা সত্যিই মুশকিল।

ষাটের দশকের যে তরুণ লেখকরা লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয়েছিলেন, ভিন্ন কণ্ঠস্বর নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন, নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাংলাদেশের গল্পে এনেছিলেন নতুনত্বের স্বাদ, রাহাত খান তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। এই ধারার বাইরে থেকেই তিনি তাঁর নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান নির্মাণ করতে পেরেছিলেন। তিনি ষাটের অন্যান্য লেখক থেকে আলাদা, সম্ভবত তাঁর বিকাশের জন্য সত্তরই প্রযোজ্য ছিল, কিন্তু এ সময়ে এসে দেখা গেল—কী বিষয়ে কী প্রকরণে বা ভাষায় তাঁকে যেমন ষাটের চরিত্রের সঙ্গে মেলানো যাচ্ছে না, যাচ্ছে না সত্তরের সঙ্গেও—যেন এক নিঃসঙ্গ চিত্রকর নির্জনে এঁকে চলেছেন তাঁর পরিপার্শ্বের চিত্র। এক অসামান্য নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে রাহাত খান তাঁর গল্পে তুলে এনেছেন তাঁর সমকাল ও পরিপার্শ্বের চিত্র এর সমস্ত আলো-অন্ধকারসহ, সংকট-সম্ভাবনাসহ আর এর মধ্যে জীবনযাপন করা মানুষগুলো উঠে এসেছে তাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-কষ্ট-ক্লান্তি-ভালোবাসা-মমতা-নিস্পৃহতা-বিচ্ছিন্নতাসহ। তারুণ্যের হতাশা, পরাজয়, প্রেম ও আকাঙ্ক্ষা, মুক্তিযুদ্ধের প্রাপ্তি ও হারানোর চিত্র নিপুণ কুশলতায় তুলে আনেন তিনি। তাঁর গল্প সমান দক্ষতায় গ্রাম ও নগরজীবনকে ধারণ করতে পারে। নাগরিক ঔদাসিন্য ও নিরাসক্তি যেমন, তেমনি গ্রামীণ জীবনের আবহমান ক্ষুধার হাহাকার তিনি সমান মুন্সিয়ানায় তুলে আনেন। 'চুড়ি', 'ভালো মন্দের টাকা' বা 'আমাদের বিষবৃক্ষ' কিংবা 'ইমান আলীর মৃত্যু'র মতো গল্প খুব শক্তিশালী লেখক না হলে লেখা সম্ভব নয়।

বাংলা গল্প তার জন্মের পর থেকেই প্রধানত আখ্যানপ্রধান। গল্পকাররা তাঁদের গল্পে যা কিছু বলতে চান তা বলেন একটি 'গল্প'কে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ গল্পে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি 'গল্প' বা আখ্যান থাকবে এটাই বাংলা গল্পের জনপ্রিয় এবং সর্বাধিক প্রচলিত রীতি। কিন্তু এই রীতির বাইরেও কিছু গল্প লেখা হয়েছে বাংলাদেশে যেগুলোতে আখ্যানকে প্রধান করে তোলা হয়নি, বরং প্রাধান্য দেয়া হয়েছে অনুভূতিকে। এই গল্পগুলোকে আমি অনুভূতি-প্রধান গল্প হিসেবে অভিহিত করতে চাই। ইলিয়াসের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' সেই ধরনের গল্প। এই গল্পে তেমন কোনো সুসংহত 'গল্প' নেই, কিন্তু রয়েছে এমন কিছু যা পড়লে পাঠকের হৃদয় এক কোমল গভীর অনুভূতিতে আক্রান্ত হয়, বারবার গল্পটি পড়তে ইচ্ছে করে, পড়লে এক ধরনের ঘোর-ও তৈরি হয়। মাহমুদুল হকের 'হৈরব ও ভৈরব' গল্পটির ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে। এই গল্পে একটি 'গল্প' থাকা সত্ত্বেও প্রধান হয়ে ওঠে অনুভূতি। তবে এগুলো বিচ্ছিন্ন উদাহরণ— অনুভূতিপ্রধান গল্প লেখা ইলিয়াস কিংবা মাহমুদুল হকের মূল প্রবণতা নয়। এই ধারায় বরং অনেক বেশি কাজ করেছেন জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত। বলা যায়, এই ধারার গল্প রচনার ক্ষেত্রে তিনি দুই বাংলার প্রেক্ষাপটেই গুরুত্বপূর্ণ। আখ্যানের দিকে যে তাঁর খুব একটা মনোযোগ বা আগ্রহ নেই, গল্পগুলোর আয়তন দেখলেই সেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়— তাঁর অধিকাংশ গল্পই ছোটমাপের। কিন্তু এই ধরনের গল্পের একটা অসুবিধা হলো— লেখকের অন্বিষ্ট অনুভূতিটি পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে না পারলে গল্পটি শেষ পর্যন্ত তার গুরুত্ব হারায়। অন্যদিকে অনুভূতিটি যথার্থভাবে সঞ্চার করতে পারলে তা দীর্ঘদিনের জন্য পাঠকের মনে গেঁথে যায়— এক্ষেত্রে লেখককে ওই পাঠক সময়ে-অসময়ে কারণে-অকারণে নিজেই স্মরণ করেন, উদ্ধৃত করেন— আর আগেই বলেছি পৃথিবীর সকল সফল লেখকই আসলে স্মরণযোগ্য লেখক, উদ্ধৃতযোগ্য লেখক। এই ধরনের গল্প লেখার আরেকটি বিপত্তি হলো, এগুলো সমালোচকদের মনোযোগ দাবি করতে ব্যর্থ হয়। সমালোচকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ একটি অনুভূতিপ্রধান গল্প নিয়ে তারা কী-ই বা বলতে পারেন? অনুভূতিকে ব্যাখ্যা করার উপায় কী? আখ্যানকে ব্যাখ্যা করা যায়, চরিত্রগুলোর আচার-আচরণকেও আখ্যানের প্রেক্ষিতে ফেলে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, কিন্তু অনুভূতিকে? একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। জ্যোতিপ্রকাশের চেয়ে ইলিয়াস অনেক বেশি পঠিত হয়েছেন, ব্যাখ্যাত হয়েছেন— বিশেষত তাঁর মৃত্যুর পর। কিন্তু 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' নিয়ে খুব বেশি আলোচনা চোখে পড়েনি আমাদের, তাঁর আলোচকরা গল্পটিকে কোনো এক অজানা কারণে এড়িয়ে যান। এর কারণটি বোঝা যায়— তাঁরা আসলে গল্পটিকে ব্যাখ্যা করার ঝুঁকি নিতে চান না। তাঁর মৃত্যুর পর শুধুমাত্র এই গল্পটিকে নিয়ে *বাংলাবাজার পত্রিকা*'র সাহিত্য সাময়িকীতে দেড়-পৃষ্ঠাব্যাপি আলোচনা করেছিলেন ফরহাদ মজহার— কিন্তু একটি গল্প নিয়ে এত দীর্ঘ আলোচনা করেও শেষ পর্যন্ত এমন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন যে, গল্পটি আসলে কী বোঝাতে চায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসান আজিজুল হকও গল্পটি সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন— 'গল্পটি ধাঁধার গা ঘেঁসে গেছে। বলতে দ্বিধা নেই, এমন আত্মকরুণায় ভরপুর লেখার মধ্যে যে দুর্বোধ্য ও কঠিন আবরণ আছে পাঠকদের পক্ষে তা ভেদ করা শক্ত।' জ্যোতিপ্রকাশের ক্ষেত্রেও তেমনটিই ঘটেছে। তাঁর অধিকাংশ গল্প অনুভূতিপ্রধান হওয়ায় এবং গল্পগুলোর নির্মাণ-কৌশলে অ্যাবস্ট্রাকশনের আধিক্য থাকায় সমালোচকরা তাঁর ধারে-কাছে যাওয়ার ঝুঁকি নেননি। অনুভূতিকে ব্যাখ্যা করার সাহস রাখেন এমন কোনো সমালোচক তাঁর গল্পগুলোকে নিয়ে আলোচনা করলে আমাদের গল্পসাহিত্যের এই ম্রিয়মাণ ধারাটি সম্বন্ধে আমরা একটি ধারণা পেতে পারি— আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই সাহস রাখি না, বিনয়ের সঙ্গে সেটা স্বীকার করে নিচ্ছি। অবশ্য জ্যোতিপ্রকাশ যে কেবল ওই ধরনের গল্পই রচনা করেছেন তা নয়, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকেও অবহেলা করেননি তিনি— 'রংরাজ ফেরে না' গল্পটি সেই প্রমাণ দেয়। এবং এই গল্পটির বিপুল গ্রহণযোগ্যতা এ-ও বুঝিয়ে দেয়, রিয়েলিস্টিক ও আখ্যানপ্রধান গল্পেও তিনি সমান পারঙ্গম।

ষাট দশকে একসঙ্গে কয়েকজন নারী লেখকের আগমন ঘটেছিল— সেলিনা হোসেন তাঁদের অন্যতম। গ্রামীণ জীবনের খুঁটিনাটি তাঁর গল্পে আশ্চর্য দক্ষতায় উঠে আসে কিন্তু নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনও তিনি খুব ভালো করে চেনেন— একথা তাঁর গল্পই বলে দেয়। তাঁর তৃতীয় গল্পগ্রন্থ 'খোল করতাল'-এ তিনি যে প্রতিভার সাক্ষর রেখেছিলেন, অজ্ঞাত কারণে এর আগে-পরে তিনি আর ও পথে হাঁটেননি। সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন— ওটা তাঁর পথ নয়, যদিও আমার মনে হয়েছে, ওই পথেই তিনি গন্তব্যে পৌঁছতে পারতেন। গ্রামীণ জনপদে ব্যবহৃত অসংখ্য অপরিচিত আটপৌরে শব্দ তুলে আনার জন্য হলেও তাঁর এই গ্রন্থটি ভবিষ্যতে বিশেষ মর্যাদা পাবে বলে ধারণা করি। গ্রাম-জীবনের সঙ্গে খুব গভীর পরিচয় না থাকলে এ-রকম একটি কাজ কোনোভাবেই করা সম্ভব নয়, তিনি কীভাবে সেটি করেছিলেন ভাবলে এখনো বিস্ময় জাগে।

রিজিয়া রহমান প্রধানত ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাবলি নিয়ে গল্প লিখে নিজেকে তাঁর সমকালীন লেখকদের থেকে আলাদা করে ফেলেছেন। এই একটি জায়গায় তাঁর অনন্যতা স্বীকার করে নিতে হবে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ, গদ্যভাষা নির্মেদ ও আকর্ষণীয়, পরিমিতিবোধ যথেষ্ট। 'অগ্নি-স্বাক্ষরা', 'সিন্ধুপতন', 'প্রেম একটি নদী' প্রভৃতি গল্পে এবং 'বং থেকে বাঙলা' উপন্যাসে তাঁর ইতিহাস-মনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আহমদ ছফা গল্পে তেমন স্বচ্ছন্দ নন, খুব বেশি গল্প তিনি লেখেনওনি। তবু বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় তাঁর নামটি নানা কারণে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপিত হবে। তিনি আমাদের প্রধান সারির চিন্তাবিদদের একজন। তাঁর মৌলিক চিন্তাসমৃদ্ধ প্রবন্ধগুলো বাংলাদেশের চিন্তার জগতে নতুন আকাশ উন্মোচন করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাঙালী মুসলমানের মন' এবং 'বঙ্কিমচন্দ্র: শতবর্ষের ফেরারী' প্রবন্ধ দুটোর কোনো তুলনীয় লেখা খুঁজে পাওয়াই কঠিন। শুধু তাই নয়, তাঁর চিন্তার অভিঘাত আমাদের সাহিত্য সমাজে এমনভাবে পড়েছে যে তাঁর উদ্ভাবিত 'বাঙালি মুসলমান' টার্মটি সাহিত্য আলোচনার এক অনিবার্য বিষয় উঠেছে। তবে তাঁকে ভুলভাবে ব্যবহারের একটি প্রবণতাও সাহিত্য জগতে বিদ্যমান। তিনি বেঁচে থাকতে তাঁর কাছে আমি একবার এই আশংকা প্রকাশ করেছিলাম যে, তাঁর লেখাগুলো শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলবাদী গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। তিনি আমার আশংকা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তিনি তো আছেন, এটি তিনি ঘটতে দেবেন না। কিন্তু তিনি যখন থাকবেন না তখন কী হবে সেটি ভাবেননি। ফলে, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তাঁকে ব্যবহার করে বাঙালি মুসলমানকে একটি আলাদা জাতি হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এটি পাকিস্তানি জাতিয়তাবাদেরই নামান্তর, ছফা নিজে কখনো এই ধরনের জাতিয়তাবাদকে স্বীকার করতেন না। যে নির্মোহ বিশ্লেষণ দিয়ে তিনি বাঙালি মুসলমানের মনকে বুঝতে চেয়েছিলেন, সেখানে কোনো প্রতিক্রিয়াশীল উপাদান নেই। আছে এই জনগোষ্ঠীর মানসকাঠামোর বদ্ধতা এবং তার ঐতিহাসিক কার্যকারণ সম্বন্ধে চমকপ্রদ বিশ্লেষণ। যাহোক, ছফা শুধু প্রবন্ধেই নয়, উপন্যাসেও তাঁর প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন। তাঁর 'ওঙ্কার', 'গাভী বিত্তান্ত', 'পুষ্প বৃক্ষ বিহঙ্গ পূরাণ' প্রভৃতি উপন্যাস সেই প্রমাণ দেয়।

হাসনাত আবদুল হাই তাঁর গল্পে নাগরিক চৈতন্যকে যেমন ধরেছেন, তেমনি গ্রামের অন্তজ শ্রেণীর মানুষ ও তাদের জীবনকে মমতার সঙ্গে তুলে এনেছেন। মানুষের নানবিধ নেতিবাচকতা নিয়ে কাজ করলেও, জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটি ইতিবাচক। আবদুশ শাকুর প্রধানত উচ্চবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত জীবনের সফল রূপকার। কিন্তু তাঁর কাজ নিয়ে আমাদের সাহিত্যে খুব বেশি আলোচনা হয়নি। আমাদের সাহিত্য সমাজে লেবেল আঁটার যে প্রবণতা আছে, তিনিও সেটির শিকার হয়েছেন। 'রম্য লেখক' হিসেবে যে অমোচনীয় লেবেল এঁটে গেছে তাঁর গায়ে, সেটি থেকে তিনি আর বেরোতে পারেননি। অথচ তাঁর 'গোলাপ সংগ্রহ', বা 'সংগীত সংগীত' গ্রন্থগুলোর কোনো বিকল্প বাংলা সাহিত্যে কেউ দেখাতে পারবেন বলে মনে হয় না। সাযযাদ কাদির তাঁর গল্পে শরীরছোঁয়া বর্ণনার যে দুঃসাহসিক নিরীক্ষা করেছিলেন—আজ পর্যন্ত তার তুলনা খুব সুলভ নয়। সমকাম নিয়ে, ভাইবোনের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া পারস্পরিক যৌন-অনুভূতির বর্ণনা-সমৃদ্ধ যে গল্পগুলো তিনি লিখেছিলেন, আমার ধারণা—আজকের তরুণরাও সে-রকম গল্প লেখার সাহস করে উঠতে পারবেন না। মানুষের অন্তর্লোক আবিষ্কারে তিনি দেখিয়েছেন কুশলী সাফল্য। সম্ভবত কবি-পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি গল্প মাধ্যমটিকে অবহেলা করেছেন, যেমনটি করেছিলেন সাইয়িদ আতীকুল্লাহ। নইলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনিও তাঁর সময়ের একজন অন্যতম প্রধান গল্পকার হিসেবে গণ্য হতেন। বিপ্রদাশ বড়ুয়া উপকূল অঞ্চলের অন্তজ শ্রেণীর পেশাজীবী মানুষের জীবন চিত্রণে সাফল্য দেখিয়েছেন। রশীদ হায়দারও মনোজগতকেই প্রাধান্য দেন, যদিও সমাজ ও রাজনীতি তাঁর গল্পে অনায়াসসাধ্য দক্ষতায় রূপায়িত হয়। সুব্রত বড়ুয়াও এই একই ধারায় সাফল্যবিহারী—তাঁর গল্পের শরীরে এক কোমল-হৃদয়গ্রাহী অনুভূতি জড়িয়ে থাকে।

ষাটের লেখকরা এমন কিছু বিষয় সাহিত্যে নিয়ে এসেছিলেন যা এর আগে বাংলাদেশের সাহিত্যে দেখা যায়নি। আমার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে (ভোরের কাগজ, ২৭ নভেম্বর ১৯৯৮) মান্নান সৈয়দ বলেছিলেন— 'সম্ভবত বাংলাদেশের সাহিত্যে আমাদের লেখাগুলোই প্রথম যৌনতা এসেছিল, শরীরী বর্ণনা এসেছিল।...যত সহজে আপনারা এখন এসব লিখতে পারছেন, তখন বিষয়টা এত সহজ ছিল না।' কিন্তু শুধু শরীরী বর্ণনা নয়, এর বাইরে ব্যক্তিমানুষের সংকটকে রূপায়ন করার যে চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন সেটিকেও আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে হয়। সেই ব্যক্তি আবার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, সময় থেকে বিযুক্ত, ফলে বিপন্ন ও অসহায়। ওই সময়ে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সম্পাদনায় 'সাম্প্রতিক ধারার গল্প' শিরোনামে যে সংকলনটি বেরিয়েছিল, সেটির সূচীপত্রের দিকে তাকালেই এর সত্যতা মিলবে। জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের 'কেষ্টযাত্রা', মান্নান সৈয়দের 'মাতৃহননের নান্দিপাঠ', ইলিয়াসের 'স্বগতমৃত্যুর পটভূমি', শহীদুর রহমানের 'বিড়াল', হাসান আজিজুল হকের 'বৃত্তায়ন'— ওই সংকলনেই প্রথমবারের মতো গ্রন্থিত হয়। এর সবগুলো গল্পেই ব্যক্তির বিপন্নতা ও অসহায়ত্ব, বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা ও অস্তিত্বের সংকটকে ধারণ করার চেষ্টা রয়েছে। পরবর্তীকালে মান্নান সৈয়দ ছাড়া আর সবাই এই ধারার গল্প রচনা থেকে সরে আসেন। এমনকি হাসান বহুদিন পর্যন্ত 'বৃত্তায়ন'কে স্বীকারই করেননি, তাঁর কোনো গ্রন্থে গল্পটি দেননি— সাম্প্রতিক ধারার গল্প সংকলনে এটি অন্তর্ভুক্ত করতেও তাঁর আপত্তি ছিল বলে তিনি নিজেই জানিয়েছেন। ইলিয়াসের গল্পগ্রন্থ আলোচনা করতে গিয়েও তিনি এই ধরনের গদ্যচর্চা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—

> 'ছয়ের দশকের প্রথম দিকে ধাঁধা রচনার মতো গদ্যের একটা ধরন চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তাতে আমাদের গল্পের উপকার হয়েছে এমন কথা আজ আর কেউ বলে না।...বলতে কি তাঁর প্রথম গল্প 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' 'স্বগতমৃত্যুর পটভূমি'র উত্তরাধিকার বহন করছে। গল্পের চরিত্রের সংকীর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করার যে মূল প্রবণতা আছে ইলিয়াসের লেখায়, এই গল্পে তা দেখা দিয়েছে চরমভাবে.. ষাটের দশকের প্রথমদিকের গল্পের মতোই এই গল্পটি ধাঁধার গা ঘেঁসে গেছে। বলতে দ্বিধা নেই, এমন আত্মকরুণায় ভরপুর লেখার মধ্যে যে দুর্বোধ্য ও কঠিন আবরণ আছে পাঠকদের পক্ষে তা ভেদ করা শক্ত। ব্যক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবেগ, ইচ্ছা, ভালোবাসা, ঘৃণা ইত্যাদির মধ্যে যে অদ্ভুত নিজস্ব ন্যায় আছে তা পরিস্ফুট করে তোলার মতো স্বচ্ছ প্রকাশক্ষমতা আমাদের এখানে লেখকদের মধ্যে কৃচিৎ দেখা গেছে। এর একটি কারণ, সমাজের যে জটিল সংগঠন থেকে এমন লেখা তৈরি হতে পারে, তেমন জটিলতা এখনো দেখা দেয়নি।... 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র ভাষা ধোঁয়াটে, পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থ; মনের উপর দিয়ে ভেসে চলে যায়। অথচ এটাও বোঝা যায়, লেখক গল্পটির নায়কের সঙ্গে মিশে গেছেন, অন্তত যে সময়ে গল্পটি লিখেছিলেন, সে সময়ে রঞ্জুর অভিমান, যন্ত্রণা, অবোধ করুণ অনুভূতিগুলি তাঁর কাছে খুবই গুরুত্ব পেয়েছিল।"

ব্যক্তিমানুষের সংকট, তাদের নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা, ও বিপন্নতা নিয়ে লেখা গল্পগুলো নিয়ে এখনো পর্যন্ত এ-রকম মতই প্রচলিত। হাসানের মতো আমার অনেক সহযাত্রী লেখক বন্ধুও মনে করেন— এই ধরনের সংকট আমাদের সমাজে অনুপস্থিত এবং এটি ইউরোপ থেকে আমদানি করা। এই মতামতগুলোকে আমার একপেশে বলে মনে হয়। আমাদের 'সমাজ-সচেতন' গল্পকাররা কখনো ব্যক্তিমানুষের দিকে তাকিয়ে দেখেন না, তাঁদের গল্পে যে মানুষ উপস্থিত হয় সে ব্যক্তিমানুষ নয়, সামাজিক মানুষ, ফলে অবয়বহীন এবং গড়পরতা। ষাটের দশকের গল্পকাররা যে এই ধরনের গল্পচর্চা শুরু করেছিলেন সেটা অকারণে নয়। তাঁদের বেড়ে ওঠার সময়টি ছিল সামরিক শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট। সামরিক শাসনকে অমানবিক বললেও কম বলা হয়, এটি এক ধরনের জান্তব শাসন। এরকম একটি সময়ে যে তরুণরা বেড়ে ওঠেন তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। লেখকরা তো সমাজের সবচেয়ে স্পর্শকাতর আর সংবেদনশীল মানুষ, তাঁরা যখন দেখেন তাঁদের সমাজটি তলিয়ে যাচ্ছে আলোর ইশারাবিহীন অতল অন্ধকারে তখন তাঁরা নিজেরাও ক্রমশ গুটিয়ে যেতে থাকেন, তৈরি হয় সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং ফলত হয়ে পড়েন নিঃসঙ্গ ও বিপন্ন— যদি না একটি কার্যকর প্রতিরোধ তাঁদের পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব হয়। ষাটের লেখকরা ওই সময়ের সামরিক শাসন বিরোধী জাতিয়তাবাদী আন্দোলনে প্রকাশ্যে সাড়া দিয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং গুটিয়ে নিয়েছিলেন নিজেদেরকে এ-সব কিছু থেকে। এর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের একটি স্মৃতিকথা থেকে। 'ভালোবাসার সাম্পান'-এ তিনি জানাচ্ছেন— ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে— ঢাকায় তখন গেরিলা আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে— তিনি আর আবদুল মান্নান সৈয়দ ঘরে বসে ঘোরমত্ত হয়ে 'কুমারসম্ভব' পড়ছিলেন! দেশ-জাতি-সমাজ ও জনজীবনের সঙ্গে কী পরিমাণ বিচ্ছিন্নতা তৈরি হলে এটি সম্ভব হতে পারে, পাঠকদের তা বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করি। এবং এ-রকম কোনো লেখক যদি 'বৃত্তায়ন' বা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' লেখেন আমরা তা অস্বীকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবো কেন, কেন বলবো এগুলো আমদানী করা অনুভূতি? হাসান যে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' সম্বন্ধে বলেছেন— 'বোঝা যায়, লেখক গল্পটির নায়কের সঙ্গে মিশে গেছেন'— সেটা কীভাবে সম্ভব হলো, যদি লেখক নিজেই ওই অনুভূতিতে আক্রান্ত না হন?

তবে ষাটের অধিকাংশ লেখকই ওই ধারা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন— বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তাদেরকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করেছিল বলে বিশ্বাস করি আমি। ষাট দশকের আন্দোলন-সংগ্রাম ও গণ-অভ্যুত্থানের প্রভাবে হাসান সাড়া দিয়েছিলেন 'শোনিত সেতু' লিখে। স্বাধীনতার পর ইলিয়াস যখন দীর্ঘ-বিরতি শেষে আবার গল্পে ফিরলেন তখন তাঁর পরিবর্তনও খুব তীব্রভাবেই চোখে পড়লো। কায়েস আহমেদের প্রথমদিকের গল্প যেভাবে ব্যক্তিমানুষের দিকে মনোযোগী ছিল, পরবর্তীকালে তা আর রইলো না, তিনিও হয়ে উঠলেন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও জনজীবনের প্রতি দায়বদ্ধ লেখক। মাহমুদুল হক অবশ্য বরাবরই এই দুটো দিককে সমন্বয় করে চলেছেন, ফলে তাঁকে আর নতুন করে বদলাতে হয়নি। শুধু ষাটের লেখকরাই নন, মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাত পড়েছিল পঞ্চাশের লেখকদের ওপরেও। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী লেখাগুলোতে যে পরিমাণ রাজনীতি ও সমাজ-মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন, আগের লেখাগুলোতে তার কণামাত্রও নেই। অন্যদিকে যাঁরা এই পরিবর্তনে সাড়া দেননি তাঁরা আর লিখতেও পারেননি— মান্নান সৈয়দের প্রধান গল্পগুলো ষাটের দশকেই লেখা, পরবর্তীকালে তাঁকে গল্পে তেমন একটা মনোযোগী দেখা যায়নি, যা লিখেছেন তা-ও তেমন উত্তীর্ণ হয়নি। 'বিড়াল' মীথের জনক শহীদুর রহমানও আর লেখেননি।

ষাটের লেখকেরা আরেকটি কারণে কথাশিল্পীদের কাছে অগ্রগণ্য হয়ে থাকবেন— সেটি হলো তাঁদের গদ্যভাষা। বাংলাদেশের সাহিত্যের জন্য একটি নিজস্ব গদ্যভাষা নির্মাণের যে কাজটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ শুরু করেছিলেন সেটিই সৈয়দ হকের হাত ঘুরে ষাটের লেখকদের হাতে পরিণতি পেয়েছে। বিশেষ করে হাসান, মাহমুদুল হক, মান্নান ও ইলিয়াসের গদ্য যেন জাদুময়তায় ভরা— যেন এক মোহনীয় রূপসী তরুণী, যার আকর্ষণ উপেক্ষা করা অসম্ভব।

বাংলাদেশের সাহিত্যে ষাটের লেখকেরা পালন করেছেন পথিকৃতের ভূমিকা। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তাঁরাই আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় এবং প্রভাবশালী হয়ে আছেন। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, তাঁদের সক্রিয়তা ও সৃজনশীলতা আমাদের সাহিত্যের গতিমুখ ঠিক করে দিয়েছিল, তবে এই প্রভাবের পেছনের কারণটি যে শুধু তাঁদের সৃজনশীলতা এবং বিরামহীন সাহিত্যচর্চা— তা নয়, ষাটের লেখকরা অবিরাম নিজেদের সময় এবং সহযাত্রী লেখকদের সম্বন্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে গেছেন, এখনো বলে যাচ্ছেন। যূথবদ্ধ হয়ে তাঁরা শুরু করেছিলেন এবং এখন পর্যন্ত যূথবদ্ধই আছেন— নিজেদের কথা নিজেরা বলার ক্ষেত্রে ষাটের জুড়ি নেই, এবং বলতে বলতেই নিজেদের সময় সম্বন্ধে এমন একটা ইমেজ তাঁরা দাঁড় করিয়েছেন যে, মনে হয়— তাঁদের প্রতিভাকে অতিক্রম করার যোগ্যতা আর কারো নেই। এমনকি কখনো-কখনো এটাও মনে হয়, তাঁরাই বুঝি বাংলাদেশের সাহিত্যের জনক ও রূপকার। কথাটি একেবারেই সত্য নয়। তাঁদের আগেই চল্লিশ ও পঞ্চাশের লেখকেরা বাংলাদেশের সাহিত্যের জন্য পালন করেছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রকৃতপক্ষে, আজকের যে বাংলাদেশের সাহিত্য, তার যাত্রা শুরু হয়েছিল চল্লিশের দশকেই। কিন্তু ষাটের লেখকদের কাছ থেকে তাঁদের পূর্বসূরীদের ব্যাপারে তেমন কোনো ইতিবাচক মূল্যায়ন আমরা জানতে পারিনি। নিজেদের নিয়ে তাঁরা এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে, ওসব বিষয়ে মনোযোগ দেননি। উল্টো নিজেদের সময়ের কম শক্তিমান লেখকেরও প্রশংসা করেছেন এমন ভাষায় যে, মনে হয়েছে এঁরা সবাই প্রবল পরাক্রমশালী লেখক। আর এভাবেই ষাট দশকের নানা বিষয়— কবি ও কবিতা, গল্প ও গল্পকার, পত্রিকা ও সম্পাদক— নিয়ে তৈরি হয়েছে মীথ। এই মীথের কারণেই আমাদের সাহিত্যজগতে ষাট দশক নিয়ে খানিকটা অতি-উচ্ছ্বাস আছে; তাঁদেরকে নিয়ে, যাকে বলে ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস, হয়নি বললেই চলে। আমাদের বোধহয় সেই কাজটি করে দেখার সময় হয়েছে। এবং কাজটি করা গেলে আরও পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে যে, সব মিলিয়ে ষাটের গল্পকারদের অর্জন গভীর ও মহান— এই দশকেই নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশের গল্পের বহুমাত্রিক গতিমুখ যা উত্তরকালের গল্পশিল্পীদের দ্বিধাহীন গল্পচর্চায় প্রেরণা জুগিয়েছে।

ঠিক এই সময়ে পশ্চিম বাংলায় কী ঘটছিল, চকিতে একবার সেটিও দেখে নিতে পারি আমরা। পশ্চিমবাংলায় পঞ্চাশের লেখকরা দিনে দিনে এতটাই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছেন যে, ওখানে পরবর্তীকালের কথাসাহিত্যিকদের এই প্রভাব-বলয় থেকে বেরুনোই কঠিন হয়ে উঠেছে। ষাটের দশকে পশ্চিম বাংলায় যাঁরা এলেন তাঁদের নামগুলো উল্লেখ করলেই এর সত্যতা বোঝা যাবে। বুদ্ধদেব গুহ, হিমানীশ গোস্বামী, অভ্র রায়, কবিতা সিংহ, সুধাংশু ঘোষ, সমীর রক্ষিত, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, জীবন সরকার, সুনীল দাশ, কল্যাণ মজুমদার, তুলসী সেনগুপ্ত, অশোক কুমার সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র দত্ত, কণা বসু মিশ্র, সমরেশ মজুমদার, কল্যাণশ্রী চক্রবর্তী, শিবশম্ভু পাল, রাধানাথ মণ্ডল, শেখর বসু, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মিত্র, মলয় রায় চৌধুরী, সমীর রায় চৌধুরী, সুব্রত সেনগুপ্ত, অতীন্দ্রীয় পাঠক, সুবিমল মিশ্র প্রমুখ পশ্চিম বাংলার ষাট দশকের গল্পকার। বাংলাদেশের মতোই ওখানেও এদের কেউ কেউ প্রথাবিরোধী আন্দোলনে নেমেছিলেন। বিখ্যাত 'হাংরি জেনারেশন' আন্দোলন ব্যক্তির সংকট, ক্ষয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপন্নতা, বিচ্ছিন্নতা আর নিঃসঙ্গতাতে তুলে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু এঁদের দীর্ঘস্থায়ী কোনো প্রভাব তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। যদিও সুবিমল মিশ্র তাঁর গল্প-আঙ্গিকে যে ঢঙটির প্রবর্তন করেছিলেন সেটি পরবর্তীকালে বাংলাদেশের কোনো কোনো তরুণ গল্পকারকে প্রভাবিত করেছে। সে প্রসঙ্গ পরে।

বাংলা সাহিত্যের একটি বিষয় প্রায় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। সেটি হলো—কোনো একটি প্রজন্ম যদি খুব প্রভাবশালী হয়ে ওঠে তাহলে পরবর্তী প্রজন্মগুলোর পক্ষে সেই প্রভাব-বলয় থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ে। পরবর্তী প্রজন্মের অনেক শক্তিমান লেখকও তাঁদের প্রভাবের জন্য ম্লান হয়ে থাকেন। পশ্চিমবাংলায় পঞ্চাশের লেখকরা যেমন এরকম একটি প্রভাব-বলয় তৈরি করতে পেরেছিলেন, তেমনি বাংলাদেশে ষাটের লেখকরাও সেটি করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালের, বিশেষ করে সত্তরের, লেখকরা বলা যায় ষাটের প্রভাব-দুর্যোগের মধ্যেই তাঁদের যৌবন কাটিয়েছেন! এবং এই প্রভাব বিপুলভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে যে পর্যন্ত না আশির লেখকরা একটি প্রতিবাদী অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং নব্বইয়ের লেখকরা তাদের বিপুল কর্মযজ্ঞ দিয়ে ষাটের এই প্রভাব-বলয় খর্ব করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। একটু পরই এ নিয়ে বিস্তারিত কথা বলার ইচ্ছে রইলো।

অভূতপূর্ব সময়, অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা

সত্তরের দশক বাংলাদেশের জন্য নিয়ে এসেছিল এক অভূতপূর্ব ও অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও সত্তরের প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাসের দাগ তখনো শুকোয়নি এই দেশ থেকে—তার মধ্যেই এলো একাত্তর। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। শতাব্দীতে এরকম ঘটনা একবারই ঘটে। সুমহান ত্যাগ ও বীরত্বের গৌরবে ভাস্বর, আকাশ-সমান স্বপ্ন, অপরিমেয় রক্তপাত ও নারীর সম্ভ্রমহানী, নিরীহ-নিরস্ত্র একটি জাতির হঠাৎ যোদ্ধা হয়ে ওঠার অভূতপূর্ব ঘটনা, একটি শোষণহীন মানবিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার প্রত্যয়—এসব নিয়েই তো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। যে বিশাল স্বপ্ন নিয়ে এই জাতি অংশ নিয়েছিল যুদ্ধে, তা কি পূরণ হয়েছে? হয়নি তো! মূলত সত্তর ছিল এক দ্বন্দ্বমুখর বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার দশক। ত্যাগ ও স্বপ্ন মিলে জাতীয় জীবনে যে আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছিল—স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছর-খানেকের মধ্যে শাসককূলের বর্বরতার ফলে তাতে ধুলো জমতে থাকে। আকাশ-সমান স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, অন্তসারশূন্য রাজনীতি, বিশৃঙ্খলা, নেতৃত্বের ব্যর্থতা, শাসকগোষ্ঠীর সীমাহীন দুর্নীতি ও বর্বরতা, রক্তাক্ত যুদ্ধজয়ের পরও প্রিয় স্বদেশভূমিতে বিতর্কিত রক্তপাত, হতাশা, অবক্ষয়, হাহাকার, ক্ষুধা, মানবতার হৃদয়হীন পদদলন, প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহকদের ওপর শাসকদের প্রতিহিংসাপরায়ণ রোষ, একাত্তরের ঘাতকদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, দুর্ভিক্ষ, একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করে গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক মৃত্যু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোষণা, সর্বোপরি স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাত্র চার বছরের মাথায় স্বাধীনতার প্রধান স্থপতির মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড— ইত্যাদি সংখ্যাহীন নেতিবাচক ঘটনা প্রবল আঘাত হানলো সংবেদনশীল মানুষদের মননে ও চেতনায়। যে সামরিক শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বাংলাদেশ যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল সেই সামরিক জান্তাই ভিন্ন রূপ নিয়ে দখল করলো এই দেশ। ক্ষমতার মসনদে সদম্ভ প্রত্যাবর্তন ঘটলো ঘাতকদের। এসব মিলিয়ে সত্তর ছিল প্রায় সম্ভাবনাহীন নেতিবাচকতার দশক।

এমন একটি সময়েই বেড়ে উঠছিলেন সত্তরের লেখকরা। কে না স্বীকার করবেন যে, লেখকরাই সমাজের সবচেয়ে স্পর্শকাতর গোষ্ঠী; আর তার সঙ্গে যদি যোগ হয় অসহায় তারুণ্য— অসহায়, কারণ এসব নেতিবাচকতার বিরুদ্ধে তাদের করার ছিল না কিছুই— তাহলে এসব ঘটনা কতটা অস্থিরতা ও বিপন্নতা তৈরি করতে পারে, তা তো বলাই বাহুল্য। সেই সময়ে সাহিত্যভুবনেও পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছিল। ততদিনে ষাটের লেখকরা তারুণ্যের অহম মুছে স্থির হয়েছেন, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের পিতৃপুরুষ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মৃত্যু ঘটেছে প্রবাসেই, অনেক অগ্রজ লেখক নানা কারণে প্রবাসী, মুক্তিযুদ্ধের শেষ লগ্নে ঘটেছে বুদ্ধিজীবী হত্যার মতো জঘন্য ও হৃদয়বিদারক ঘটনা। তবু থেমে থাকে না কিছুই, কারো জন্য। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে এলো নতুন মুখ, নতুন কলম— আতা সরকার, আফসান চৌধুরী, আবু সাইদ জুবেরী, আলমগীর রেজা চৌধুরী, আহমদ বশীর, ইমদাদুল হক মিলন, ইসহাক খান, জাফর তালুকদার, তাপস মজুমদার, নকিব ফিরোজ, বারেক আবদুল্লাহ, বুলবুল চৌধুরী, ভাস্কর চৌধুরী, মঈনুল আহসান সাবের, মঞ্জু সরকার, মনিরা কায়েস, মুস্তাফা পান্না, রেজোয়ান সিদ্দিকি, শাহরিয়ার কবীর, শেখর ইমতিয়াজ, সারোয়ার কবির, সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ ইকবাল, সৈয়দ কামরুল হাসান, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সুশান্ত মজুমদার, হরিপদ দত্ত, হাবিব আনিসুর রহমান, হেলাল আহমেদ, হুমায়ূন আহমেদ প্রমুখ।

কিন্তু যে বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এঁদের বেড়ে ওঠা, তার কতটুকু ধারণ করতে পেরেছেন তাঁরা, তাঁদের রচনায়? অবশ্য এরকম প্রশ্ন তোলাটা খুব বেশি বিবেচনাপ্রসূত নয়। একজন লেখক যে সবসময়ই তার লেখায় সমকালকে ধারণ করবেন এমন কোনো বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। সাহিত্য তো বহুমাত্রিক— সমকালকে ধারণ করা তার একটি উপাদান মাত্র। সবদিক বিবেচনা করলে এই সময়ের কয়েকজন লেখকের অর্জন উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে; কিন্তু এই সময়েই সাহিত্যক্ষেত্রে যে গুণগত পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে গেছে তার দায়-দায়িত্বও তাঁদের ওপরই বর্তায়। বিশেষ করে হুমায়ূন আহমেদ ও ইমদাদুল হক মিলনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাহিত্যে জনপ্রিয়তার যে ক্ষতিকর ধারাটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তার প্রতিক্রিয়া বেশ দীর্ঘস্থায়ী হবারই কথা। এই সময়ে অসংখ্য সাহিত্যবোধহীন রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, পাঠকের কাছে পৌঁছেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে দ্রুত। সাহিত্যের পাঠক বাড়ানোর যে ক্রেডিট তাঁদেরকে দেয়া হয়, সেইসব পাঠক হুমায়ূন বা মিলন ছাড়া আর কিছু পড়েন কী না সন্দেহ করি। তাহলে আর সাহিত্যের পাঠক বাড়লো কোথায়? এমনকি তারা হুমায়ূন বা মিলনের উন্নত শিল্পমূল্যসম্পন্ন লেখাগুলো পড়েন কী না, তা নিয়েও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এই দুই লেখকের পাঠকরা তাদের প্রিয় লেখকদের উন্নত রচনাগুলো যদি একটু উল্টেপাল্টে দেখতেন তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের সাহিত্যসংক্রান্ত ধারণাগুলো কিছুটা হলেও পাল্টে যেত।

হুমায়ূন আহমেদ বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রথম দুটো উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' এবং 'শঙ্খনীল কারাগার' আমাদেরকে যে ছবি উপহার দিয়েছিল সেটি এর আগে আর কখনো বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়নি। মধ্যবিত্ত জীবনের এমন ছোটখাটো অনুষঙ্গও যে উপন্যাসের বিষয় হতে পারে, সেটি এই উপন্যাস দুটোর আগে কে-ই বা ভাবতে পেরেছিল? আর এই জীবনকে এর খুঁটিনাটিসহ এমন গভীরভাবে চেনার প্রমাণই বা আর কে দিতে পেরেছিলেন, হুমায়ূনের আগে? আমাদের সাহিত্য জগতে মধ্যবিত্তরা তো অবহেলিত চরিত্রই ছিল, যেন তারা কোনো মানুষই নয়, তাদের কোনো সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা নেই, আর বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের কাছে তো তারা রীতিমতো ভিলেন। হুমায়ূন এসে দেখালেন— মধ্যবিত্তরা যন্ত্র নয়, ভিলেনও নয়, বাংলার কথাশিল্পীদের প্রিয় চরিত্রদের— দরিদ্র মানুষদের— চেয়ে তাদের দুর্দশা এবং সংকটও কম নয়। প্রথা ভেঙে একটি শ্রেণীর দিকে মানবিক চোখে তাকিয়েছিলেন তিনি, মমতা ও সহানুভূতি দিয়ে এঁকেছিলেন তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ কথা। শুধু তাই নয়, তাঁর মধ্যে একজন ভার্সেটাইল লেখক হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও ছিল। তিনি যখন সায়েন্স ফিকশন লিখেছেন সেগুলোকে নিয়ে গেছেন এক ভিন্নতর উচ্চতায়। সেগুলো শুধু বিজ্ঞান বা ফিকশন থাকেনি, তাঁর হাতে পড়ে হয়ে উঠেছে মানবিক অনুভূতির দলিল। তাঁর রচিত সায়েন্স ফিকশন এই একটি জায়গায় পৃথিবীর অন্য সব সায়েন্স ফিকশন থেকে আলাদা। 'তোমাদের জন্য ভালোবাসা' 'শূন্য' 'নি' প্রভৃতি উপন্যাস সেই প্রমাণ দেবে। আবার মানবমনের গূঢ়-অপার রহস্য নিয়ে তিনি যে মিসির আলী সিরিজ রচনা করেছিলেন, প্রথম দিকে তা-ও ছিল এক গভীর মানবতাবোধে উজ্জীবিত। শুধু তাই নয়, মনোবিজ্ঞান যে তিনি কত গভীরভাবে বোঝেন তার প্রমাণও ধরে রেখেছেন 'যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমির চাঁদ' উপন্যাসে। এটি যে হুমায়ূন আহমেদের রচনা, তা বিশ্বাস করাই কঠিন। সাম্প্রতিককালের 'মনোবৈজ্ঞানিক (!) উপন্যাসের' লেখকরা হুমায়ূনের এই উপন্যাসটি পড়ে শিখে নিতে পারেন, মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস বলতে আসলে কী বোঝায়। এমনকি তাঁর হিমু চরিত্র দিয়ে তিনি প্রথমদিকে খুঁজতে চেয়েছিলেন প্রকৃতির অব্যাখ্যাত রহস্য। জীবন নামক একটি ঘরে যদি দুটো দরজা থাকে, তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি দরজা বিজ্ঞান ও যুক্তি ও দর্শন ও ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞানের, যেগুলো দিয়ে এই জীবনকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলছে হাজার হাজার বছর ধরে; আর অন্য দরজাটি এখনো খোলাই হয়নি, সেটি রহস্যময়তায় ভরা, হুমায়ূন সেই দরজাটি খুলতে চেয়েছিলেন হিমুকে দিয়ে। কিন্তু এই কথাগুলো বলা হলো তাঁর প্রথমদিকের রচনা সম্বন্ধে। পরবর্তীকালে জনপ্রিয়তার পিচ্ছিল পথ তাঁকে নিয়ে গেছে পতনের দিকে, তাঁর অপরিণত-অপরিপক্ব টিনএজ পাঠকগোষ্ঠীর মন জুগিয়ে লিখতে গিয়ে করেছেন ক্ষমতার অপব্যবহার। এমনকি হিমুকে তিনি শেষ পর্যন্ত বানিয়ে ফেললেন এইসব তরুণদের উদ্ভট আনন্দফূর্তির সঙ্গী। শুধু উপন্যাসেই নয়, গল্পেও তিনি বহুমাত্রিক কাজের সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন। তাঁর রয়েছে নানান ধরনের গল্প লেখার অভিজ্ঞতা— *অদ্ভুত গল্প, ভৌতিক গল্প, অতিপ্রাকৃত গল্প* প্রভৃতি শিরোনাম দিয়ে তিনি যে গল্পগুলো লিখেছেন, বাংলাদেশের গল্পসাহিত্যে তা পুরোপুরি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাংলা সাহিত্য থেকে তো এই ধরনের গল্পগুলো হারিয়েই গিয়েছিল, তিনি সেগুলোকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন। 'ছায়াসঙ্গী' 'ভয়' 'পিপড়া' 'সে' 'কুকুর' 'আয়না' প্রভৃতি গল্পের উদাহরণ বাংলা গল্পের দীর্ঘ ইতিহাসে খুব সুলভ নয়। শুধু এগুলোই নয়— মধ্যবিত্ত জীবন নিয়েও তাঁর রয়েছে চমৎকার কিছু গল্প। সত্যি কথা বলতে কি, হুমায়ূনের লেখাতেই আমরা প্রথমবারের মতো মধ্যবিত্তকে পেলাম তাদের নিত্যদিনের সমস্যা-সংকট-আনন্দ-বেদনা-হাসি-কান্না সহ। অবশ্য তাঁর স্বভাবজাত হালকা মেজাজটি সব ক্ষেত্রেই পুরোমাত্রায় উপস্থিত, তবু অল্প কথায় জীবনের ছোটখাটো সুখ-দুঃখগুলো তাঁর গল্পে চমৎকার কুশলতায় ধরা পড়েছে। বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের স্পর্শকাতর বিন্দুগুলো হুমায়ূনের মতো এত ভালো করে আর কেউ চেনেননি। এইখানটায় আমি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিল খুঁজে পাই। শরৎচন্দ্র যেমন বাঙালি জাতির আবেগপ্রধান স্পর্শকাতর বিন্দুগুলোকে চিনতেন (এ বিষয়ে আগেই কথা বলেছি), হুমায়ূন আহমেদ অতখানি না হলেও বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের হাসি-কান্নার বিন্দুগুলো চেনেন, অনায়াসসাধ্য দক্ষতায় তিনি তাঁর পাঠক-দর্শকদের হাসিয়ে-কাঁদিয়ে চলেছেন। হুমায়ূনের বিপুল গ্রহণযোগ্যতার কারণও এটি। 'নিশিকাব্য' 'জীবনযাপন' 'খাদক' 'চোখ' 'অচিন বৃক্ষ' প্রভৃতি গল্পে তিনি তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, তিনি তাঁর এই বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে না লাগিয়ে বরং জনরুচির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তিনি সবসময়ই বলে এসেছেন— তিনি নিজের আনন্দের জন্য লেখেন। সেটি সব লেখকই লেখেন, কিন্তু তাঁর এখনকার লেখাগুলো পড়লে মনে হয়— নিজের আনন্দের জন্য নয়, তিনি লেখেন জনরুচির চাহিদা মেটাতে, ফলে, তাঁর বর্তমানকালের লেখাগুলোতে প্রচুর অমনোযোগিতা চোখে পড়ে, এমনকি, বাক্য গঠন পর্যন্ত শিথিল ও অশুদ্ধ হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইমদাদুল হক মিলন ঠিক কতগুলো জনপ্রিয় উপন্যাস লিখেছেন সেটি হয়তো তিনি নিজেও ঠিক জানেন না। অথচ তারই *শ্রেষ্ঠ গল্প* গ্রন্থভূক্ত গল্পগুলো পড়লে বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করতে হয় যে, তাঁর হওয়ার কথা ছিল একজন সফল গল্পকার। মিলন ওই 'জনপ্রিয় উপন্যাস'গুলো না লিখে যদি শুধুমাত্র এই গল্পগুলোই লিখতেন, তাঁকে হয়তো মর্যাদা দেয়া হতো একজন প্রধান গল্পকারের। তাঁর গল্পকার পরিচিতিটি তেমন গড়ে ওঠেনি, অথচ তাঁর সমাজ ও জীবন অবলোকনের দৃষ্টিভঙ্গি, নানা ধরনের চরিত্র চিত্রণের দক্ষতা, তাঁর ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি ঈর্ষণীয় সাফল্যের দাবিদার। অর্থাৎ একজন সফল ও গুরুত্বপূর্ণ লেখকের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যই তাঁর করতলগত। গ্রামীণ জীবন নিয়ে তিনি লিখেছেন অসামান্য কিছু গল্প; সত্যি কথা বলতে কি, গ্রামের জীবন মিলনের আগে একমাত্র আবু ইসহাকই এত কুশলতার সঙ্গে তুলে আনতে পেরেছিলেন, আর কেউ নন। 'গাহে অচিন পাখি' তো ইতিমধ্যেই কালজয়ী মাত্রা অর্জন করেছে। 'বদ্যি বুড়োর জীবনকথা' 'নিরন্নের কাল' 'নেতা যে রাতে নিহত হলেন' 'রাজার চিঠি'র মতো অসাধারণ সব গল্পের জনক তিনি। 'জোয়ারের দিন'-এর মতো অসামান্য প্রতীকী গল্পও খুব বেশি লেখা হয়নি বাংলাদেশে। বেশ কিছু উপন্যাসেও তিনি তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ আঞ্চলিক ভাষায় লেখা তাঁর 'কালাকাল' উপন্যাসের তুলনা কি সহজে পাওয়া যাবে? 'পরাধীনতা' 'যাবজ্জীবন' 'ভূমিপুত্র' উপন্যাসগুলোও তো উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে। যে-সব পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি এবং হুমায়ুন আহমেদ রাশি রাশি 'কেচ্ছাকাহিনী' উৎপাদন করেন, সেইসব পাঠকরা কি এই উপন্যাসগুলো পড়েন? পড়েন না। আমি নিশ্চিত, সেটি জানেন এই লেখকরাও। নইলে 'জোছনা ও জননীর গল্প' পড়ার জন্য হুমায়ূন আর 'নূরজাহান' পড়ার জন্য মিলন বারবার তাঁদের পাঠককে কাতর মিনতি জানাতেন না। যাহোক, প্রতিভার এই অপচয় শুধু যে আমাদের সাহিত্যের ক্ষতি করেছে তাই নয়, ক্ষতি করেছে তাঁদেরও। নিজেদের উৎপাদিত এইসব তুচ্ছ রচনা তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে, এ ব্যাপারে অন্তত আমার কোনো সন্দেহ নেই।

এই সময়ের সবচেয়ে সফল ও গুরুত্বপূর্ণ গল্পকার মঈনুল আহসান সাবের। মাঝে কিছুদিন জনপ্রিয় সাহিত্যের প্রতি আনুগত্যের ফলে তাঁর গায়েও জনপ্রিয়তার সিলটি পড়েছিল বটে কিন্তু তাঁকে কখনোই পুরোপুরি এই ধারার লেখক হিসেবে মনে হয়নি আমার। অবশ্য তার গল্পকার পরিচিতিটি উপেক্ষা পেয়েছে অনেকগুলো উপন্যাস রচনার কারণে, তবু মনোযোগী পাঠক জানেন, বাংলা গল্পের দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় এত সফলভাবে, এত সূক্ষ্মভাবে আর কেউ নাগরিক জীবনকে তুলে আনতে পারেননি, তাঁর মতো। সাবেরই এ সময়ের সবচেয়ে বহুমাত্রিক গল্পকার। জীবন ও পৃথিবীর চেনা-অচেনা কোণগুলোতে তিনি অবিরাম আলো ফেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছেন। রচনা করেছেন এমন কিছু গল্প যা নিয়ে গৌরব করা চলে। মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের সংকট ও স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতা ও ক্লান্তি ও অবসাদ তাঁর গল্পেই সর্বাধিক কুশলতায় ধরা পড়েছে। 'বৃত্ত'র মতো খুব বেশি গল্প লেখা হয়নি আমাদের সাহিত্যে। 'লাফ' 'জীবনযাপন' 'পুলিশ আসবে'র মতো জীবনবোধ সম্পন্ন গল্প; 'মৃদু নীল আলো' 'আশ্চর্য প্রদীপ'-এর মতো প্রতীকী ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার গল্প; 'মুখোশ' 'গ্রাস'-এর মতো হুমকিগ্রস্ত নাগরিক জীবনের গল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে। নাগরিক মানুষের অবসাদ ও ক্লান্তি নিয়ে, সেই সঙ্গে এর থেকে মুক্তির জন্য তাদের কার্যকলাপ নিয়ে তিনি আসামান্য কিছু গল্প লিখেছেন। 'অবসাদ ও আড়মোড়ার গল্প' সব অর্থেই বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। শুধু 'অবসাদ ও আড়মোড়ার গল্প'ই নয়, আরো কিছু সিরিজ গল্প রচনায় অসামান্য সাফল্য দেখিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উপরোক্তটি ছাড়াও তাঁর 'সীমাবদ্ধ' 'রেল স্টেশনে শোনা গল্প' 'এটা আমার একার গল্প' এবং 'ব্যক্তিগত' গ্রন্থগুলোর কথা পাঠকের মনে পড়বে। এ ধরনের গল্প পাঠের অভিজ্ঞতা দুই বাংলার কোনো পাঠকেরই এর আগে হয়নি। উপন্যাসের ক্ষেত্রে অন্তত একটি বিষয়ে তিনি অন্য সবার থেকে আলাদা। প্রধানত মানব জীবনের দার্শনিক প্রশ্ন ও সংকট নিয়ে লেখা তাঁর 'মানুষ যেখানে যায় না' এবং 'ঠাট্টা' সত্যিই অভিনব সংযোজন। সমাজ, সময়, সমকাল আর রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে তাঁর 'কবেজ লেঠেল' 'সুকুমারের লজ্জা' 'এই দেখা যায় বাংলাদেশ' উপন্যাসগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে। সাবেরের একটিই সীমাবদ্ধতা। তাঁ গদ্যভাষাটি খানিকটা শিথিল, যদিও তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিষয় টানটান আঁটসাট গদ্য দাবি করে।

হরিপদ দত্ত এবং মঞ্জু সরকার দুজনেই শ্রেণীসচেতন গল্পকার। এই সময়ে এ দুজনই এই ধারাটিকে সবচেয়ে সফলভাবে ধারণ করতে পেরেছেন, তবে এই ধারার গল্পগুলোর শিল্পমূল্য নিয়ে প্রশ্ন সম্ভবত থেকেই যাবে। আমাদের সাহিত্যজগতে যাদের গায়ে মার্কসবাদের লেবেল আঁটা থাকে তাঁরা একটু বিশেষ মর্যাদা ভোগ করেন। এ দুজনও সেটি পেয়েছেন। তবে হরিপদ দত্তের গল্পে এই শ্রেণীসংগ্রাম যতটা উচ্চকিত রূপে এসেছে, মঞ্জু সরকার ততটা উচ্চকিত নন। হরিপদের অধিকাংশ গল্পের বিষয়— শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং তাদের সংগ্রাম ও বিদ্রোহ। কোনো-কোনো গল্পে তিনি রীতিমতো বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন। জোতদারের খাদ্যভাণ্ডারে আগুন লাগানোর বিষয়টি ('অগ্নিভূক অজগর') যেমন তাঁর গল্পে এসেছে, এসেছে মঞ্জুর গল্পেও ('অবিনাশী আয়োজন')। 'করোটির অন্ধকারে নৃত্য' 'আজরাইলের চোখ' 'সূর্যের ঘ্রাণে ফেরা' 'নরমাংসের স্বাদ' 'জোয়াল ভাঙার পালা' 'সোনার মশা' প্রভৃতি গল্পে হরিপদ দত্ত যেমন সামাজিক শোষণ-নিপীড়নের চিত্র এঁকেছেন, একইসঙ্গে এঁকেছেন শোষিত-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদের চিত্রও, এমনকি এই প্রতিবাদ কখনো কখনো হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছায়! এইসব গল্প কখনো-কখনো বাস্তবতাকে ছাপিয়ে লেখকের আকাঙ্ক্ষাকে অধিকতর মূর্ত করে তোলে, কখনো-কখনো এমন প্রশ্নও জাগে যে, এর কতটুকু লেখক সত্যিকার অর্থেই ধারণ করেন আর কতটুকু বিশ্বাসের কারণে আরোপ করেন। শুধু গল্পেই নয়, হরিপদ দত্ত উপন্যাসেও তাঁর তীব্র শ্রেণীচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। 'অজগর' তাঁর অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। মঞ্জু সরকার অবশ্য পরবর্তীকালে এই ধারা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। প্রথম দিকের গল্পগুলোতে তাঁর শ্রেণীচেতনার প্রকাশ তীব্রভাবেই ঘটতো, কিন্তু ব্যক্তিমানুষকেও উপেক্ষা করেননি তিনি কখনো। প্রধানত গ্রামীণ সমাজ, গ্রামের জীবনকে উপজীব্য করে লেখা তাঁর ওই সময়ের গল্পগুলোর মধ্যেই তাঁর পরবর্তীকালের সাফল্যের ইঙ্গিত ছিল। তিনি যে ব্যক্তিগত সম্পর্কবোধের গল্পগুলোতে অধিকতর সফল সেটি তাঁর 'যৌথ একাকীত্ব'র গল্পগুলো পড়লেই বোঝা যায়।

এ সময়ের সবচেয়ে রাজনীতি সচেতন গল্পকার শেখর ইমতিয়াজ। তাঁর মতো রাজনীতিবোধের তীব্রতা তাঁর আগে বা পরে সাইয়িদ আতীকুল্লাহ ছাড়া আর কারো মধ্যে দেখা যায় না। পাকিস্তান আমলের দমবন্ধ করা সামাজিক বাস্তবতা যেমন একজন সাইয়িদ আতীকুল্লাহর জন্মকে অনিবার্য করে তুলেছিল, তেমনি সত্তরের অবরুদ্ধ সামাজিক বাস্তবতা, আকাশ সমান স্বপ্নের নির্মম মৃত্যু, অবক্ষয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি একজন শেখর ইমতিয়াজের জন্মকে অনিবার্য করে তুলেছিল। রাজনীতি-সচেতনতার সঙ্গে প্রতীকময়তার চমৎকার মেলবন্ধনে যে গল্প নির্মাণ করেন তিনি— পাঠককে তা গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে। তাঁর 'অগ্নিনৃত্যে এইসব মানুষ' এবং 'বিধি নেই অনড় বিধিলিপি' গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলো তার প্রমাণ।

সুশান্ত মজুমদার এই সময়ের সবচেয়ে ফর্ম সচেতন ও ভাষা সচেতন গল্পকার। রাজনীতি-সচেতনতার পরিচয় মেলে তাঁর গল্পেও। তার 'ছেঁড়া খোড়া জমি'র গল্পগুলোতে সামাজিক বাস্তবতা আর 'রাজা আসেনি বাদ্য বাজাও'-এর গল্পগুলোতে রাজনৈতিক বাস্তবতা এক চমৎকার কুশলতায় উঠে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধও এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে তাঁর গল্পে। অবশ্য শুধু সুশান্তই নন, সত্তরের প্রায় সব লেখকই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কমবেশি লিখেছেন। রাজনৈতিক বিষয়-আশয়ও সত্তরের গল্পকারদের গল্পে বারবার ফিরে এসেছে। এমন এক সময়ে তাঁরা বেড়ে উঠেছিলেন যে, এইসব বিষয়ে সাড়া দেয়া ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। সুশান্ত সেই সাড়াকে অধিকতর পরিশীলিত আকারে হাজির করেছেন তাঁর পাঠকের কাছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম শুরু করেছিলেন সত্তরের দশকেই, কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে প্রায় দুই যুগ তিনি গল্পচর্চা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন। ফলে বাংলাদেশের গল্প নিয়ে আলোচনায় তাঁর নাম খুব একটা আসেনি। এমনকি আমি নিজেও ১৯৯৭ সালে রচিত আমার *বাংলাদেশের ছোটগল্প : উত্তরাধিকারের পরিপ্রেক্ষিত* প্রবন্ধে তাঁর কথা উল্লেখ করিনি (আমার এই প্রবন্ধটি বহুবার পুর্নমূদ্রিত হয়েছে, প্রায় সময়ই আমার অনুমতি ছাড়াই, ফলে কোনো সম্পাদনার কথাও আমি ভাবতে পারিনি)। কিন্তু এই সময়ে এসে দেখা যাচ্ছে, আমাদের কথাসাহিত্যে সৈয়দ মনজুর ক্রমশই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছেন। যদিও তাঁর এই দীর্ঘ বিরতির সময়কালের মধ্যেই প্রাবন্ধিক ও সমালোচক হিসেবে তিনি রীতিমতো খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন (তাঁর বিখ্যাত সাহিত্য কলাম *অলস দিনের হাওয়া* একটি প্রজন্মের বেড়ে ওঠায় গভীর প্রভাব ফেলেছে, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না), কিন্তু কথাসাহিত্য রচনায় তিনি ফিরে আসেন নব্বই দশকে ব্রাত্য রাইসুর সঙ্গে যৌথভাবে 'যোগাযোগের সমস্যা নিয়ে কয়েকজন একা একা লোক' শিরোনামের ধারাবাহিক উপন্যাস দিয়ে, যা একটি দৈনিকে প্রকাশিত হচ্ছিল। তখন পর্যন্ত এটিকে একটি শৌখিন কাজ বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু তিনি আর কথাসাহিত্য চর্চা ছাড়েননি, একে একে বেরিয়েছে তাঁর একাধিক গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস। সৈয়দ মনজুরের যে-কোনো রচনার প্রধান গুণ— তাঁর প্রাঞ্জল-কমিউনিকেটিভ গদ্যভাষা। এই গদ্যভাষার কারণেই একটি গল্প পড়া শুরু করলে সেটি ছেড়ে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়; এবং পড়তে গিয়ে মনে হয়, গল্প পড়ছি না, কেউ যেন গল্প বলছে। তাঁর ভঙ্গিটি আসলে যতটা না লেখকের, তারচেয়ে বেশি কথকের, বা বলা যায়, তিনি যতটা না গল্প-লেখক তার চেয়ে বেশি গল্প-কথক। আমরা যখন গল্প 'বলি' তখন দেখা যায়, আমাদের মূল গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে আরও বহু গল্প, আরও বহু প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ, টিকা-টিপ্পনি; তাঁর গল্পেও তেমনটি থাকে। প্রতিটি গল্পেই কথকের ভূমিকা খুব শক্তিশালী ও পরিষ্কার, কোনো নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান থেকে লেখক কথা বলেননি, নেমেছেন সরাসরি কথকের ভূমিকায় এবং সেই কথক খুব কুশলী, কীভাবে 'শ্রোতাদের'কে ধরে রাখতে হয় সেটি খুব ভালোভাবে জানা আছে তাঁর। তাঁর গল্পের বিষয়ও অভিনব এবং বৈচিত্র্যময়। অতীত ও বর্তমানকে, বাস্তবতা, পরাবাস্তবতা, অধিবাস্তবতা আর জাদুবাস্তবতাকে তিনি এমন এক কৌশলে মেশান যে, কোনটা যে কী, কোনটা সত্যি আর কোনটা বিভ্রম বোঝাই দুষ্কর হয়ে ওঠে। কিন্তু তাই বলে গল্পগুলো কখনোই নন-কমিউনিকেটিভ পর্যায়ে নিয়ে যান না তিনি। তারা যে সার্বভৌম সে-কথা সম্ভবত তিনি বিশ্বাস করেন, ফলে গল্পটিকে পাঠকরা যেন নিজের মতো করে নতুনভাবে নির্মাণ করে নিতে পারেন অথবা বুঝে নিতে পারেন সেই সুযোগ রেখে দেন। 'রেশমি রুমাল' 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রয় বিক্রয়' 'ইবনে বতুতার দিনপঞ্জী' প্রভৃতি গল্পে তিনি যেভাবে অতীত-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমানকে মিশিয়েছেন বা 'জলপুরুষের প্রার্থনা' এবং 'জিন্দালাশ' গল্পে বাস্তবতা, পরাবাস্তবতা, অধিবাস্তবতা আর যাদুবাস্তবতাকে এমন এক কৌশলে মিশিয়েছেন তিনি যে বিস্মিত হতে হয়। আবার 'তিন টাকার নোট' 'ডিডেলাসের ঘুড়ি' প্রভৃতি গল্পে সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার ভিন্নমাত্রিক নির্মাণ পাঠককে গভীর ভাবনায় ফেলে দেয়। তাঁর 'কাঁচভাঙা রাতের গল্প' 'সুখ দুঃখের গল্প' এবং 'প্রেম ও প্রার্থনার গল্প' গ্রন্থগুলোতে এসবেরই চিহ্ন আঁকা আছে।

মনিরা কায়েস শক্তিমান গদ্যশিল্পী— টানা আঁটসাট গদ্যভঙ্গি; পাঠককে এক ঘোরলাগা বর্ণনার মধ্যে দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার দুর্দান্ত ক্ষমতা আছে তাঁর। এই যে বর্ণনার সৌন্দর্য—এ-ও গল্পের এক বিশেষ সম্পদ, সব গল্পকারের মধ্যে সেটি থাকে না, মনিরার আছে এবং বেশ প্রবলভাবেই আছে। শুধু আখ্যান বা বর্ণনার সৌন্দর্যই নয়, তাঁর গল্পে আরও কিছু আছে। আছে সমকালের তীক্ষ্ণ আবেদনময় চিত্ররূপ, আছে কিছু তীব্র-তীক্ষ্ণ ইঙ্গিত ও ইশারা। সমকালের দুর্দশাময় ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হন না তিনি, কেন এই দুর্দশা সেই কারণটি সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করেন, তবে সেটি ইঙ্গিতই, অর্থাৎ তিনি পাঠকের বোঝা-না-বোঝার ব্যাপারে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করতে চান না, ইঙ্গিত বা ইশারাতেই থেমে যেতে চান। তাঁর গল্পে আসলে একটি গল্প থাকে না, থাকে একাধিক গল্প, একটি গল্পের মধ্যেই তিনি ঢুকিয়ে দেন আরও অনেক অনুগল্প, প্রতিগল্প, কিংবা আরেকটি পুরো গল্প। এ যেন একটি বৃক্ষ। শুরু হয় গোড়া থেকেই তারপর ক্রমাগত ডালপালা মেলতে থাকে, তবে তাতে মূল গল্পটি হারিয়ে যায় না, শাখাগল্প থেকে একসময় ঠিকই পাঠককে ফিরিয়ে আনেন মূল গল্পে, মাঝখানে যে তিনি এত-এত অনুগল্প বলে নিলেন তার একটিকেও কিন্তু আর বাহুল্য বলে মনে হয় না, যদিও ওসব গল্প বাদ দিলেও মূল গল্পের কোনো ক্ষতি হতো না। যেহেতু অনুগল্পগুলো ছাড়াও গল্পের কোনো ক্ষতি হতো না, তাহলে তিনি সেগুলো বলেন কেন? এর কারণ সম্ভবত দুটো। প্রথমটি— কথক ভঙ্গিটি ধরে রাখার জন্য, দ্বিতীয় কারণটি হতে পারে এই যে, জীবনের কোনো গল্পই আসলে নিরেট নয়, তার অনেক প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ থাকে, তার আগে-পিছে ডানে-বাঁয়ে আরও অনেক গল্প-কাহিনী থাকে, মূল চরিত্রগুলোর চারপাশে আরও অনেক চরিত্র থাকে, যে-কোনো মানুষের যে-কোনো মুহূর্তের চিন্তার মধ্যে কেবল ওই মুহূর্তের চিন্তাই থাকে না, থাকে আরও বহু মুহূর্তের, বহু সময়ের, বহু প্রসঙ্গের চিন্তা। তিনি এ-সব কিছুকেই ধরতে চান এবং ধরেনও, কিন্তু মূল গল্পকে হারিয়ে যেতে দিতে চান না। এ হচ্ছে তাঁর দার্শনিক প্রতীতি। তিনি সম্ভবত মনে করেন— জীবনের গল্পগুলো যতই ডালপালা ছড়াক না কেন, জীবন নিজে লক্ষ্যমুখী, জীবনের একটি গন্তব্য আছে। তিনি যে তাঁর গল্পকে হারিয়ে যেতে না দিয়ে একটি গন্তব্যে পৌঁছে দেন— তারও কারণ হয়তো এই যে, তিনি মনে করেন জীবনের একটি গন্তব্য যেমন থাকে, শিল্পেরও তেমনি একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গন্তব্য থাকা উচিত। মনিরা আসলে সব অর্থেই একজন গন্তব্যমুখী লেখক— সেই গন্তব্য আমাদের শেকড়ের দিকে, আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির দিকে। তাঁর 'মাটি পুরাণ পালা' 'ধূলোমাটির জন্মসূত্র' 'জলডাঙার বায়োস্কোপ' 'কথামনুষ্যপুরাণ' গ্রন্থগুলোতে তিনি এইসব চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছেন।

বুলবুল চৌধুরী তাঁর 'টুকা কাহিনী'র গল্পগুলো দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, এদেশের গ্রামগুলো তাঁর খুব ভালোভাবে চেনা আছে। আতা সরকার 'বিপজ্জনক খেলা সম্বন্ধে রিপোর্ট' গ্রন্থে রাজনীতি ও সমাজ-মনস্কতার পরিচয় রেখেছিলেন। বাহুল্যহীন, নির্মেদ বর্ণনায় সমাজ ও জীবনের সচল নির্মাণ তাঁদের গল্পে চমৎকার কুশলতায় নির্মিত হয়। 'গুলেনবারি সিনড্রোম ও অন্যান্য গল্প' 'পোড়ামাটির জিলিপি ও অন্যান্য গল্প' এবং 'অষ্টনাগ ষোলচিতি'-এ হাবিব আনিসুর রহমান এঁকেছেন পাপ ও পতনের চিত্র, ক্রুর বাস্তবতা ও আশাভঙ্গের চিত্র, একই সঙ্গে বেঁচে থাকার আকুলতা। আবু সাইদ জুবেরীর সেই সম্ভাবনাময় লেখনি চোখে পড়ে না বহুদিন, আহমদ বশিরই বা কোথায় হারিয়ে গেলেন? ইসহাক খান, জাফর তালুকদার, তাপস মজুমদার, মুস্তাফা পান্নাও বিরলপ্রজ। বারেক আবদুল্লাহ পরলোকে, শাহরিয়ার কবীর রাজনীতিতে ব্যস্ত, রেজোয়ান সিদ্দিকীও এখন নিষ্ক্রিয়, সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় অভিবাসী।

এই নাকি সত্তরের চেহারা? তাঁদের বিচার-বিবেচনার জন্য এটা খুব নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হবে। তাঁদের সম্মিলিত অর্জনকে অস্বীকার করার উপায় নেই— কিন্তু তাঁদের সময়ে গড়ে ওঠা জনপ্রিয় সাহিত্যের ডামাডোল এই অর্জনটিকে বুঝে উঠতে দিচ্ছে না।

এর আগে আমি বাংলাদেশের গল্পের পাশাপাশি পশ্চিমবাংলার গল্প নিয়েও দু-চার কথা বলেছি। কিন্তু এই পর্যায়ে এসে সমস্যায় পড়তে হলো। পশ্চিমবাংলার গল্পকারদের মধ্যে কে সত্তরের আর কে আশির সেটি নির্ধারণ করা আমার পক্ষে কঠিন। কারণ, বাংলাদেশে যতটা সুস্পষ্টভাবে এই সীমারেখাটি টানা হয়, ওখানে তা হয় না। তবু এই সময়ে, অর্থাৎ সত্তর ও আশির দশক মিলিয়ে ওখানে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের নামগুলো উল্লেখ করা যাক— অমর মিত্র, আফসার আমেদ, আবুল বাশার, কানাই কুণ্ডু, কিন্নর রায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, তীর্থঙ্কর নন্দী, দীপঙ্কর দাস, নলীনি বেরা, নবকুমার বসু, প্রলয় গুর, বাণী বসু, বাণীব্রত চক্রবর্তী, ভগীরথ মিশ্র, রমানাথ রায়, রাধানাথ মণ্ডল, রাধাপ্রসাদ ঘোষাল, শচীন দাশ, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, শিবতোষ ঘোষ, শেখর বসু, সমরেশ মজুমদার, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, সুবিমল বসাক, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, হর্ষ দত্ত প্রমুখ।

এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সম্ভাবনার পরিচয় দিলেও পূর্বসুরীদের তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর। এঁরা বাংলা সাহিত্যে খুব বড় কোনো অভিঘাত তৈরি করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরেছেন, সেটি নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না। বরং মনে হচ্ছে, যেন, পশ্চিমবাংলায় ছোটগল্পের ধারাটি শুকিয়ে যেতে বসেছে। পশ্চিমবঙ্গ একসময় প্রবল বিক্রমে বাংলা কথাসাহিত্যেকে শাসন করেছে, সেখানে এখন এমন কোনো শক্তিমান লেখক চোখে পড়ছে না যিনি বা যাঁরা ভবিষ্যতের বাংলা কথাসাহিত্যকে নেতৃত্ব দেবেন।

পশ্চিম বাংলায় এই সময়ের পর কথাসাহিত্যে তেমন সম্ভাবনাময় কলম চোখেই পড়ে না। অথচ বাংলাদেশে ঘটেছে উল্টো ঘটনা। আশির দশকে আমাদের এখানে বাংলা গল্প এক নতুন মোড় নেয়, নব্বইয়ের লেখকদের বিপুল কর্মযজ্ঞ সাহিত্যের এই শাখাটিকে আরও স্বাস্থ্যবান করে তোলে, এমনকি নতুন শতকের প্রথম দশকের লেখকদের পদধ্বনিও স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে এখন।

আবার বাঁক পরিবর্তন

ষাটের গল্পকারদের তুমল সক্রিয়তার ফলে গল্পের গতিমুখ নির্ণিত হয়ে যাওয়ার পরও সত্তরের জনপ্রিয় সাহিত্যের ডামাডোলে কিংবা লেখকদের গল্পকার পরিচয়টি ম্রিয়মাণ হয়ে যাওয়ার ফলে স্পর্শকাতর গল্প মাধ্যমটি ঘোর দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আশির দশকে যাঁরা এলেন, প্রথমেই তাঁদের প্রয়োজন হয়ে পড়লো এই নষ্ট স্রোতের বিরুদ্ধে তারুণ্যের দ্রোহ নিয়ে দাঁড়াবার। সে এক অদ্ভুত সময় ছিল। এই দুর্ভাগ্যপীড়িত জাতিটিকে উদ্ধার করার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এক সামরিক মহামানব নাজেল হয়েছিলেন আর নাজেল হয়েই জারি করেছিলেন নানা বিধিনিষেধ। এমনিতেই আমাদের পারিবারিক ও সমাজিক কাঠামোটি এমন যে, নানারকম বাধা-নিষেধের ভিতর দিয়ে আমাদেরকে বড় হয়ে উঠতে হয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাও কেবল নিষেধই করে যায়। এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না, এটা বলা যাবে না, ওটা বলা যাবে না— কী যে করা যাবে, আর কী যে বলা যাবে, সেটা আর বলে না কেউ। তো ওই সময় এইসব নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা। রাষ্ট্রযন্ত্রই বলে দিচ্ছিল—কী কী বলা যাবে না, কী কী করা যাবে না— 'তাঁর' কোনো সমালোচনা করা যাবে না, একসঙ্গে পাঁচজনের বেশি জমায়েতও করা যাবে না, মিছিল-মিটিঙ করা যাবে না, 'তাঁর' বিরুদ্ধে কিছু লেখা যাবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি—কিন্তু কী কী বলা বা করা যাবে, তা আর বলেনি কোনোদিন। সামরিক শাসনের নামে এমনই এক বীভৎস, ভয়ংকর, পৈশাচিক শাসন চেপে বসেছিল জাতির বুকের ওপর। শুধু তো তাই নয়, সময়টি ছিল এমনই যে, সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ছিল অবিশ্বাস-দ্বন্দ্ব-সন্দেহ, যেন কেউ কারো ওপরে আস্থা রাখতে পারছে না, কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আলোর ইশারাবিহীন অতল অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে স্বদেশ, কোথাও কোনো সম্ভাবনা নেই যেন, চারদিকে কেবল গভীর অন্ধকার, কেবল অনিশ্চয়তা, কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতাশা। প্রতিবাদী মিছিলে উঠে যাচ্ছে সামরিক ট্রাক, প্রাচীন রাজনীতিবিদরা তাদের দীর্ঘদিনের ত্যাগ-তিতিক্ষা বিসর্জন দিয়ে লুটিয়ে পড়ছেন সামরিক প্রভুর কদর্য পায়ে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রকম্পিত হচ্ছে অস্ত্রের ঝনঝনানিতে, ছাত্রনেতাদের চারপাশে উড়ছে টাকা আর ক্ষমতা— আর তার লোভে পড়ে আজকের বিপ্লবী কালকেই হয়ে যাচ্ছে প্রভুর চামচা। রাষ্ট্রই উৎসাহিত করছে অসৎ হতে, আদর্শহীন হতে, নীতিহীন হতে। শাসকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ভেঙে দেয়া হচ্ছে জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড— দুর্নীতি করা যে লজ্জা আর অপরাধের ব্যাপার, সেই বোধটুকুকেও কবর দেয়া হচ্ছে। সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যখন-তখন, লেখক-শিল্পী-সংবাদকর্মীরা নিগৃহীত হচ্ছেন অহরহ, আর এসবকিছুর মধ্যে দিয়ে ধূমায়িত হচ্ছে ক্ষোভ। শুধু জাতীয় জীবনেই নয়, আন্তর্জাতিক বিশ্বেও তখন ঘটছে এক বিপুল বিপর্যয়— সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকে দখল করে নিচ্ছে বীভৎস পুঁজিবাদ। একসময় তরুণদের এক বিরাট অংশ ওইসব রাষ্ট্রের আদলে নিজের দেশেও একটি বিপ্লবী পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতো (সেই স্বপ্ন ভুল ছিল কী শুদ্ধ ছিল, সেই তর্কের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো— তরুণদের সামনে ওরকম একটি স্বপ্ন ছিল, ছিল আদর্শ)— এ সময়ে সেই স্বপ্নও ভেঙে যেতে থাকে, পায়ের নিচ থেকে সরে যেতে থাকে দাঁড়াবার মাটি। এমনই এক লক্ষ্যহীন-আদর্শহীন-নীতিহীন-স্বপ্নবিহীন সময় ছিল সেটি। কোথাও ছিল না কিছু আশাবাদী হওয়ার মতো, কোথাও এমন কিছু ছিল না যাকে অবলম্বন করে একজন তরুণ জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলার স্বপ্ন দেখতে পারে। যে বয়সটিতে মানুষের সর্বোচ্চ মানসিক বিকাশ ঘটে, সেই বয়সটি যদি কাটে এমন একটি আবদ্ধ সময়ে ও আবদ্ধ পরিবেশে, তাহলে সে হয়ে ওঠে অসম্পূর্ণ মানুষ। এই সময়টি তাই অসম্পূর্ণ মানুষে ভরতি। আমাদের সাহিত্য-ভুবনের অবস্থাটিই বা কেমন ছিল তখন? সামরিক সরকারের কূটচালে দুর্নীতি যেমন সর্বগ্রাসী রূপে চেপে বসেছে বাংলাদেশে, সাহিত্যভুবনেও পড়েছে তার প্রভাব। সাহিত্যিকরা শিবির বিভক্ত। একদল বঙ্গভবনে, অন্যদল রাজপথে, কবিতা শ্লোগানমুখর, কথাসাহিত্যকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছে 'জনপ্রিয়তা' নামক এক উদ্ভট উট। আগেও বলেছি, এই জনপ্রিয় সাহিত্যের নির্মাতা প্রধানত সত্তরের কয়েকজন লেখক, যাঁদের কাছে 'সাহিত্যমূল্য' নামক ব্যাপারটির চেয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছিল লেখার বাণিজ্যিক মূল্যের বিষয়টি— আর তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন সাহিত্যের জন্য এক 'অদ্ভুত আঁধার।' আশির দশকের লেখকরা এই নষ্ট স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন তারুণ্যের দ্রোহ নিয়ে, প্রধানত লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে। দেশের দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকী ও সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিক ম্যাগাজিনগুলো যখন পাঠক মনোরঞ্জনে ব্যস্ত, জনপ্রিয় ধারার সাহিত্যকে যাবতীয় আশ্রয়-প্রশ্রয়-প্রেরণা দেয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, তখন অনেকটা নিঃশব্দেই লিটল ম্যাগাজিনগুলো আশ্রয় দিয়েছে তরুণ লেখকদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভবত এ কারণেই ষাটের পর আশিতে এসে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এরকম একটি সময়ে গল্প লেখক হিসেবে আগমন ঘটলো অশোক কর, আন্দালিব রাশদী, আবদুল আউয়াল চৌধুরী, আহমাদ কামরুল মীজান, ইমতিয়ার শামীম, ইশতিয়াক আলম, ওয়াসী আহমেদ, ওয়াহিদ রেজা, কাজল শাহনেওয়াজ, জাহিদ নেওয়াজ, জাহিদুর রহিম, ঝর্ণা রহমান, তমিজউদ্দিন লোদী, তপন বড়ুয়া, তারেক শাহরিয়ার, দেবাশিষ ভট্টাচার্য, নাজিব ওয়াদুদ, নাসরিন জাহান, পারভেজ হোসেন, প্রলয় দেব, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, বুলবুল সরওয়ার, মনীষ রায়, মনি হায়দার, মহীবুল আজিজ, মাখরাজ খান, মামুন হুসাইন, মাহবুব মোতানাব্বী, মাহবুব রেজা, মোস্তফা হোসেইন, মুসা কামাল মিহির, মুজতাহিদ ফারুকী, রফিকুর রশীদ, রাশেদ উন নবী, রিশিত খান, শরীফ খান, শহীদুল আলম, শহীদ খান, শহীদুল জহির, শাহ নিসতার জাহান, শুচি সৈয়দ, সামসুল কবির, সারওয়ার-উল-ইসলাম, সঞ্জীব চৌধুরী, সিরাজুল ইমলাম মুনির, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, সেলিম মোরশেদ, সৈয়দ রিয়াজুর রশীদ, স্বপ্না রেজা, হামিদ কায়সার, হাসান জাহিদ, হুমায়ুন মালিক প্রমূখ।

লেখালেখি শুরুর প্রায় দু-যুগ পরেও আশির লেখকদের গল্প নিয়ে মন্তব্য করা একটু কঠিন। এদের অনেকেই এখন একেবারেই লিখছেন না, অনেকের কোনো গ্রন্থও প্রকাশিত হয়নি। কিংবা দু-একটি হলেও তা ইতিমধ্যেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। পত্র-পত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিনগুলো থেকে তাঁদের গল্প উদ্ধার করাও প্রায় অসম্ভব বিষয়। এটি অবশ্য সব দশকেই ঘটেছে। শুরুতে খুব সম্ভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন এমন অনেকেই লেখা থামিয়ে দিয়েছেন, আর ফিরে আসেননি। সততার খাতিরে নামগুলো উল্লেখ করা হয়, কিন্তু উল্লেখ না করলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। এই নিষ্ক্রিয়রা আবার কোনোদিন সক্রিয় হয়ে উঠবেন, এমনটি আশা করা কঠিন। আশির অনেক লেখক লেখালেখিতে দীর্ঘ বিরতি দিয়ে ফিরে এসেছেন আবার, কিন্তু এই বিরতিরও কারণও ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। যাহোক, এই সময়ের গল্পকারদের প্রধান বৈশিষ্ট্য—এঁদের নিরীক্ষা প্রবণতা। সম্ভবত নতুন কিছু সৃষ্টির নেশায় এ সময়ের গল্প-শিল্পীরা নিরীক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। কী বিষয়ে, কী আঙ্গিকে, কী ভাষায় তাঁরা অচিরেই নির্মাণ করেছিলেন স্বতন্ত্র একটি গল্পের ভুবন—পূর্বের গল্প-ঐতিহ্য থেকে যা বেশ খানিকটা আলাদা। ট্র্যাডিশনাল গল্প-চর্চাও যে হয়নি তা নয়, বরং যা হয়েছে তার সংখ্যা বা শিল্পমূল্যও মনোযোগ দাবী করার যোগ্যতা রাখে, কিন্তু প্রধান সারিতে ছিলেন ওই নিরীক্ষাপ্রবণ গল্পকাররাই। আবার এই সময়ের লিটল ম্যাগাজিন-কেন্দ্রিক সাহিত্যান্দোলনের ধারে-কাছেও ছিলেন না এমন লেখকের সংখ্যাও কম নয়, এবং এঁদের কেউ কেউ আশির প্রধান লেখকদের সারিতে স্থান করে নিয়েছেন। যেমন শহীদুল জহির, ওয়াসি আহমেদ, মামুন হুসাইন, ইমতিয়ার শামীম প্রমুখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহীদুল জহির বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে এক বিস্ময়কর লেখক। এরকম আর একজন লেখকও আসেননি দুই বাংলার সাহিত্যে। তাঁর গল্পের (এবং উপন্যাসেরও) বিষয় অভিনব, বর্ণনা-কৌশল অভূতপূর্ব, নির্মাণ-শৈলী বিস্ময়কর। তাঁর গল্প টেনে নিয়ে যায় এর ভাষা ও বর্ণনার গুণে; শেষ করে বুঝে উঠতে একটু সময় লাগলেও কিংবা আদৌ বুঝে ওঠা না গেলেও পাঠ শেষে এক ধরনের ভালোলাগার আবেশ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রতিভাকে 'জাদুবাস্তবতা'র মতো বহুল ব্যবহৃত ক্লিশে একটি শব্দ দিয়ে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে বরাবর, কখনো খুঁজে দেখা হয়নি— এই শব্দবন্ধ দিয়ে আসলে কী বোঝানো হয়। আমাদের জনজীবন, আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা, বিশেষ করে পুরনো ঢাকার মানুষ ও তাদের জীবনকে তিনি বরাবর উপস্থাপন করেছেন এক কৌতুকপূর্ণ ভঙ্গিতে, কিন্তু এই কৌতুকের মধ্যেই লুকানো থাকে এক গভীর বেদনাবোধ। যে বীভৎস বাস্তবতা তাঁর গল্পের চরিত্রগুলোকে দখল করে রাখে, তারা সেটি কোনোভাবেই অতিক্রম করে যেতে পারে না, এক অনতিক্রম্য বৃত্তে ঘুরপাক খেতে থাকে, ফলে তাঁর গল্পে একই ঘটনার বহুবার পুনরাবৃত্তি ঘটে, যেন এই পুনরাবৃত্তি দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতে চান— এই মানুষগুলোর জীবন এমনই, পরিবর্তন যা ঘটে তা খুব সামান্যই, অকিঞ্চিৎকর, ধর্তব্যের প্রায় বাইরেই। তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে টাইমফ্রেমের ধারণাও ভেঙে দিয়েছেন— অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে এক জাদুকরি ভাষায় মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছেন। কখনো কখনো তাই দেখি, বর্তমানের ঘটনা বর্ণনা করে তিনি যখন অতীতের ঘটনায় ফিরে যাচ্ছেন, তখন একটি সেমিকোলন (;) দিয়ে 'ফলে' শব্দটি ব্যবহার করে বর্তমান-অতীতের সংযোগটি স্থাপন করছেন। যেন অতীতের ঘটনাটি ঘটেছিল বর্তমানের এই ঘটনার প্রেক্ষিতে। অথচ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কালের ধারণাটি ঠিক উল্টো। আমরা ভাবি যে, বর্তমানের ঘটনা ঘটে অতীতের ঘটনার প্রেক্ষিতে। (তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'মুখের দিকে দেখি'-এ তিনি এই কাজটি সবচেয়ে কুশলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন।) শুধু টাইমফ্রেম নয়, সময়ের ধারণা পর্যন্ত বদলে দিয়েছিলেন তিনি। সময়কে ভাবা হয় একরৈখিক, শুধু সামনের দিকেই যার যাত্রা। কিন্তু ভারতবর্ষে বহুকাল আগে এমন একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে, সময় বৃত্তাকার। অর্থাৎ সময় তার সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর ফিরিয়ে আনে। শহীদুল জহির এই ধারণাটিকেই ব্যবহার করেছিলেন। ব্যাপারটা ভালোভাবে বোঝা যায়, তাঁর 'চতুর্থমাত্রা' গল্পটি পড়লে। বিজ্ঞানের ভাষায় সময়কেই চতুর্থ মাত্রা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। তিনি যে বিষয়টি জানতেন না তা তো নয়, না জানলে 'চতুর্থ মাত্রা' শব্দটিই তিনি ব্যবহার করতেন না। তো, এই গল্পেও ওই পুনরাবৃত্তির খেলা। যেন একই সময় বারবার ফিরে ফিরে আসছে। এই ব্যাপারটা আরও তীব্রভাবে ধরা পড়েছে 'মনোজগতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁটা' গল্পেও। তাঁর গল্পে ধরা পড়েছে মানবজীবনের রহস্যময়তাও, আর এই রহস্যময়তাকে তিনি উপস্থাপন করেছেন এমন এক ভঙ্গিতে যে, এর সবকিছু বুঝে ওঠা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর সব গল্প বুঝে উঠতে পেরেছেন— এমন দাবি বোধহয় কোনো পাঠকই করবেন না (কিন্তু এমনই এক ঘোরলাগা বর্ণনাকৌশল ব্যবহার করেন তিনি যে, একবার ওই গল্প পড়লে তার আবেশ থেকে বেরুনো কঠিন হয়ে ওঠে)। যেমন, 'ডলু নদীর হাওয়া' গল্পের সমর্তবানু তার স্বামীকে প্রতিদিন দুটো গ্লাস এগিয়ে দেয়, যার একটিতে বিষ, আরেকটিতে বিশুদ্ধ পানি। চল্লিশ বছর ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই ভয়ংকর 'খেলা' চলে এবং স্বামীটি নির্ভুলভাবে প্রতিদিনই পানির গ্লাসটি তুলে নেয়। এটি কীভাবে সম্ভব? এর ব্যাখ্যা কী? কেন কখনোই তার হাতে বিষের গ্লাসটি উঠে আসে না? যাহোক, তাঁর গল্পের একমাত্রিক ব্যাখ্যা করা খুবই বিপদজনক, কারণ এর সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা হাজির করলেও সেটিকে ভুল বলে মনে হয় না। এই বহুমাত্রিকতাই তাঁর গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'মনোজগতের কাঁটা' 'আমাদের কুটিরশিল্পের ইতিহাস' 'চতুর্থ মাত্রা' 'ডলু নদীর হাওয়া' 'ইন্দুর-বিলাই খেলা' 'আমাদের বকুল' 'কোথায় পাব তারে' প্রভৃতি গল্পে তিনি আমাদেরকে যে জগৎ উপহার দিয়েছেন, তা বাংলা গল্পের স্থায়ী সম্পদে পরিণত হবে বলেই বিশ্বাস করি আমি। তাঁর অকাল মৃত্যু এই অভিনব-অলৌকিক পৃথিবী ও সময় পরিভ্রমণ থেকে আমাদেরকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করলো।

ওয়াসি আহমেদ আশির নিরীক্ষাবাদীদের দলে ছিলেন না। খানিকটা ট্র্যাডিশনাল গল্প-চর্চাই করেছেন তিনি। কিন্তু নব্বইয়ের শেষ দিকে এসে মনে হচ্ছে— তাঁর সাফল্য আরও অনেককে ছাড়িয়ে গেছে। গল্পের বুননে, অনাড়ম্বর-কমিউনিকেটিভ ভাষায়, প্রতীকী আবহ নির্মাণে, সর্বোপরি পাঠকের কাছে একটি 'গল্প' বলার ছলে তার কাঙ্ক্ষিত মেসেজটি পৌঁছে দেয়ার কুশলী স্টাইলে তিনি এ সময়ের এক ব্যাতিক্রমী গল্পশিল্পী। তাঁর 'বীজমন্ত্র' গল্পটি প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা, কর্পোরেট-বিরোধিতার জন্য এক মাইলফলক গল্প হয়ে থাকবে। বাস্তব নিয়ে কাজ করেন তিনি, সামাজিক বাস্তবতা, রাজনৈতিক বাস্তবতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সমস্যা-সংকট ও বাস্তবতা সবকিছুই তিনি দেখে নিতে চান তাঁর অনবদ্য কুশলী নির্মাণে। আর নির্মাণ শেষে আমরা দেখি, কী অবলীলায় তিনি বাস্তব থেকে অতিবাস্তবে চলে গেছেন, জীবনের উপরিতল থেকে চলে গেছেন গভীর তলদেশে। 'লোকমান হাকিমের স্বপ্নদর্শন' 'নাগাল' 'ছোঁয়া' 'বনসাইয়ের গল্প' 'শীত-পিপাসার দেও-দানব' 'মেঘসাঁতার' প্রভৃতি গল্প তাঁর প্রতিভার সাক্ষর বহন করছে।

মামুন হুসাইন এ সময়ের এক শক্তিমান গল্পকার। তাঁর গল্প যেমন মুহূর্তে মুহূর্তে স্বপ্ন-কল্পনা-বাস্তবতা-ঘোরগ্রস্ততা-বিমূর্ততায় ঘুরে বেড়ায়, তেমনই পাঠককে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক ঘোরলাগা বর্ণনার মধ্যে দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার দুর্দান্ত ক্ষমতা আছে তাঁর। মেধাবী, মনোযোগী, পরিশ্রমী পাঠক না হলে তাঁর গল্পের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হবেন হয়তো-বা, কিন্তু এর স্বপ্ন-কল্পনা-বাস্তবতার মিলিত জগৎ তাকে দখল করে রাখবে দীর্ঘক্ষণ। আশির দশকে মামুনের মতো এত বেশি ডিটেইলিঙের কাজ আর কেউ করেননি। তাঁর গল্পেও আসলে একটি গল্প থাকে না, থাকে একাধিক গল্প, একটি গল্পের মধ্যেই তিনি ঢুকিয়ে দেন আরও অনেক অনুগল্প, কিংবা আরেকটি পুরো গল্প। এইখানটাতে এসে ইলিয়াস বা মনিরার সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এ যেন একটি বৃক্ষ। শুরু হয় গোড়া থেকেই তারপর ক্রমাগত ডালপালা মেলতে থাকে, তবে মনিরার গল্পে মূল গল্পটি হারিয়ে যায় না, মামুন, এমনকি সেটিও অনুমোদন করেন। কেন তিনি মূল গল্পের প্রতি ততটা অনুগত থাকেন না? তার কারণ হয়তো এই যে, তিনি সম্ভবত মনে করেন— জীবন এরকমই, এইরকম ছড়ানো-ছিটানো, এবং শেষ পর্যন্ত জীবনের কোনো গন্তব্যও নেই, মৃত্যু ছাড়া। মৃত্যু নিয়ে তাঁর ঘোরলাগা সব গল্প আমরা পড়েছি তাঁর 'মানুষের মৃত্যু হলে' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে নিয়ে 'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি' শিরোনামের একটি অসাধারণ গল্প আছে। গল্পটি পড়ে ঘোরলাগে, দেখি ইলিয়াস চলে এসেছেন তাঁর অসামান্য বাগ্মিতা নিয়ে, তাঁর গল্প-উপন্যাস এবং সে-সবের চরিত্রগুলো নিয়ে। দেখি রঞ্জু, ওসমান, হাড্ডি-খিজির, মিলি, মুন্সি, পাকুড়গাছ, কাৎলাহার বিল, যমুনা, খোয়াবনামা, মালতিনগর— সবাই-সবকিছু হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ছে গল্পের মধ্যে। আমাদের ঘোর কাটে না, আমরা বিভ্রান্ত হই, মনে হয় এইমাত্র ইলিয়াসের সমগ্র জীবনটিকে— তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত— দেখে উঠলাম। আমরা ভুলে যাই— এটি একটি গল্প, ভুলে যাই বাস্তব আর কল্পনার পার্থক্য; কোনটা বাস্তব কোনটা কল্পনা, কোনটা ইলিয়াস বলছেন আর কোনটা মামুন হুসাইন ইলিয়াসের মুখে বসিয়ে দিচ্ছেন, সেটা নির্ণয় করা আমাদের জন্য অসম্ভব হয়ে ওঠে। এবং আমরা টের পাই— এই গল্পের লেখক নন, গল্পটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গল্প, গল্পের আখ্যান আর গল্পের চরিত্রগুলো থেকে নিজেকে বিযুক্ত রাখা বা নিজেকে দূরে রাখার যে কুশলতা, তার চমৎকার প্রমাণ আমরা মামুন হুসাইনের মধ্যে দেখে বিস্মিত হই বটে, তবে সেটি গল্প-পাঠের ঘোর কেটে যাওয়ার পর, সমালোচকের চোখে গল্পটি দেখে নেয়ার সময়। একটি গ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার জন্য এরকম একটি গল্প থাকাই যথেষ্ট, কোনো গল্পকারেরই সব গল্প সমান মানের হয় না, 'মানুষের মৃত্যু হলে' গ্রন্থটিও এই একটি গল্পের জন্যই বিশিষ্ট স্থান পাওয়ার দাবিদার। কিন্তু অন্য গল্পগুলোও আমরা অবহেলা করতে পারি না। কারণ এই গ্রন্থের গল্পগুলোর বিষয়ই এমন যে, তা আমাদের নিয়মিতভাবেই দখল করে রাখে। মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যু (বা জীবন) সম্বন্ধে কোনো কথাই শেষ কথা নয়, মামুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটি জানেন, আর তাই মৃত্যু নিয়ে রচিত এই গল্পগুলোতে তিনি মৃত্যু-ভাবনার বহুমাত্রিক, বহুবর্ণিল দিক তুলে ধরেন। মৃত্যু যেন এক মোহন প্রেমিকা, যেন এক প্রিয়তম ভাবনা। আমরা বিভিন্ন গল্পে নানা রূপে সেই প্রেমিকাকে উপস্থিত হতে দেখি, নানা ভাষায় তার কথা শুনি, রচিত হতে দেখি এক মৃত্যুপুরাণ। শুধু এই গ্রন্থেই নন, তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'শান্ত সন্ত্রাসের চাঁদমারি' থেকে শুরু করে 'আমাদের জানা ছিল কিছু' 'নিরুদ্দেশ প্রকল্পের প্রতিভা' 'কয়েকজন সামান্য মানুষ' 'বালক বেলার কৌশল' 'রাষ্ট্র যন্ত্রের খেলাধুলা' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি আমাদেরকে একের-পর-এক বিস্ময় উপহার দিয়ে গেছেন। কিন্তু একটি কথা না বললেই নয়, তাঁর বর্ণনাভঙ্গি কখনো কখনো ক্লান্তিকরও হয়ে ওঠে। পরিশ্রমী পাঠক চান তিনি, ভালো কথা, তা তিনি চাইতেই পারেন, কিন্তু সেটি যদি ছুটির দিনে অফিস করার মতো পরিশ্রম হয়ে যায় তাহলে পাঠকের ওপর একটু বাড়তি চাপই তৈরি করে।

এ সময়ের ভাষা সচেতন ও নিরীক্ষাপ্রবণ গল্পকার সেলিম মোরশেদ তাঁর গল্পচর্চায় দীর্ঘ বিরতি টেনেছিলেন। তাঁর 'নির্বাচিত গল্প' বেরুনোর আগ পর্যন্ত এর এক যুগ আগে প্রকাশিত এবং দুস্প্রাপ্য হয়ে ওঠা 'কাটা সাপের মুণ্ডু'ই ছিল তাঁর একমাত্র গল্পগ্রন্থ। প্রথম গ্রন্থেই রূঢ়-অসহনীয় বাস্তবতার এক অভিনব ছবি এঁকেছিলেন তিনি। 'কাটা সাপের মুণ্ডু' গল্পে তিনি প্রায় অবিশ্বাস্য-অকল্পনীয় এক বাস্তবকে পাঠকের সামনে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিলেন তাঁর স্মার্ট গদ্য আর বর্ণনা-কৌশল দিয়ে। তিনি ব্যক্তির দিকে যেমন মমতার চোখে তাকিয়েছেন, তেমনি তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েছেন সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার দিকেও। বাস্তবতার ফাঁদে আটকে পড়া, পরিত্রাণহীন যন্ত্রণায় দগ্ধ হওয়া মানুষের কথা বলে গেছেন এক কুশলী গদ্যভাষায়, যে ভাষা কখনো-কখনো ব্যাকরণের সীমানাও পেরিয়ে যেতে চেয়েছে। তাঁর 'কান্নাঘর' 'সখিচান', 'কাটা সাপের মুণ্ডু' 'সুব্রত সেনগুপ্ত ও সমকালীন বঙ্গসমাজ' 'লাবণ্য যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে' 'শিলা দৃষ্টান্ত' প্রভৃতি গল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর 'বাঘের ঘরে ঘোগ' গ্রন্থে তিনি দক্ষিণাঞ্চলের চরমপন্থি বাম রাজনীতির এক মনোজ্ঞ বিবরণ উপস্থাপন করেছেন, এবং এই গ্রন্থে এসে মনে হলো, তিনি তাঁর চেনা উপস্থাপন কৌশল থেকে খানিকটা সরেও এসেছেন। 'প্রতিষ্ঠান বিরোধী', একরোখা, জেদি এই লেখক শুধু তাঁর লেখার কারণেই নয়, প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় অবস্থানের কারণেও আরও বহুদিন আলোচনার কেন্দ্রে থাকবেন।

সৈয়দ রিয়াজুর রশীদ এই সময়ের সবচেয়ে নিরীক্ষাপ্রবণ লেখক। বিশেষ করে তাঁর আঙ্গিকের নিরীক্ষা কখনো-কখনো বিষয়কেও ছাপিয়ে ওঠে। শিল্পের ইতিহাস আসলে তার আঙ্গিকের ইতিহাস; নতুন কথা বলার নেই, এর মধ্যেই সব বলা হয়ে গেছে; নতুন কিছু বলতে হলে ওই পুরনো কথাগুলোই বলতে হবে কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কীভাবে তা বলা হচ্ছে সেটার ওপরই নির্ভর করবে শিল্পীর মুন্সিয়ানা— সারা পৃথিবীর আঙ্গিকবাদীরা এইসব কথা বহুকাল ধরেই বলে আসছেন। রিয়াজুর রশীদও হয়তো সেই পথেরই পথিক, ফলে যে গল্পটি সাদামাটাভাবেও বলা যায় সেটিতেও আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য নিয়ে আসেন তিনি। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'আগুনের বিপদ আপদ'-এ তিনি এই নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন, তারপর 'শাদা কাহিনী' 'লাশ নাই' পেরিয়ে 'গল্প ও অন্যান্য ছবিলেখা'-এও সেটি অব্যাহত থেকেছে। এই নিরীক্ষা এতটাই চোখে পড়ে যে, বিষয়ের পরিবর্তনগুলোও গৌণ হয়ে ওঠে। প্রথমদিকে তিনি প্রধানত জনজীবনের দিকে তাকিয়েছিলেন তীর্যক চোখে, বুঝতে চেয়েছিলেন তাদের এই ক্ষয় ও বেদনার উৎস কোথায়। পরের বইতে জনজীবনের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের সম্পর্কগুলো তিনি খতিয়ে দেখতে চাইলেন মমতা দিয়ে, তৃতীয় বইতে খুঁজে দেখলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে। এইভাবে তিনি নিজেকে এগিয়ে নিয়েছেন ক্রমাগত, এখনো নিজেকে অগ্রসরমানই রেখেছেন।

আঙ্গিকের নিরীক্ষা করেছেন মাখরাজ খানও। অসাধারণ কুশলতা ছিল সেইসব নীরিক্ষায়। 'বিজ্ঞাপন ও মানুষের গল্প' এবং 'তাম্রকূট আদমী' তাঁর সেইসব নিরীক্ষা ধরে রেখেছে। কিন্তু শুধুমাত্র নিরীক্ষা দিয়ে বেশিদূর এগোনো যায় না বোধহয়। বহুদিন তাঁর লেখা আর চোখে পড়ছে না আমাদের।

শহীদুল আলম তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ঘুণপোকার সিংহাসন' দিয়েই পাঠকের মনোযোগী দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়েছিলেন। সমকালের ক্লেদ, ক্ষয় আর গভীর গভীরতর অসুখ তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন ব্যক্তিমানুষের চোখ ও মন ও জীবন দিয়ে এবং সেটিতে সাফল্যও দেখিয়েছিলেন। ওই বইয়ের 'রাজেন বৃত্তান্ত' 'রুকু, ডাইনী চাঁদ অথবা পোড়া মন্দিরের গল্প' 'কাফকার স্বপ্ন' প্রভৃতি গল্প তাঁর সাফল্যেরই পরিচয় দেয়। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লাল মোরগের ঝুঁটি'-তে এসে তিনি স্পষ্টতই নিজেকে সরিয়ে এনেছেন পূর্বতন গল্পভাবনা থেকে। জনজীবন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা আর এসবের ভেতরে মানুষের দুঃসহ জীবন এই গ্রন্থে অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু তিনি যে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি মানুষেরই গল্পকার তার প্রমাণও আছে এই গ্রন্থে। 'কুক্কুরধাম' গল্পটি সেই প্রমাণ দেয়। শহীদুলের ভাষা কমিউনিকেটিভ, গল্পের পরিণতি সম্বন্ধে লক্ষ্যমুখী, আর যেসব পাঠক গল্প পড়ে এর মধ্যে 'গল্প' ছাড়াও আরও কিছু খুঁজে পেতে চান তাদের জন্য তিনি রেখে দেন কিছু চমৎকার ইঙ্গিত ও ইশারা।

কাজল শাহনেওয়াজ এই সময়ের এক ব্যতিক্রমী গল্পকার। প্রথমদিকে তাঁর গল্পের পরতে-পরতে ছড়িয়ে থাকতো কবিতার সৌন্দর্য। হয়তো যে গল্প-পাঠে কবিতাপাঠের আনন্দ ও অনুভূতি হয় সেটিই সবচেয়ে শিল্পসফল গল্প। কে জানে! কাজলের 'কাছিমগালা' 'রোকনের মৃত্যু' প্রভৃতি গল্প পাঠককে সেই আনন্দ দিয়েছিল। 'কাছিমগালা'র পর এক দীর্ঘ বিরতি দিয়ে দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'গতকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাল'-এ তিনি আরও গভীরভাবে ফিরে তাকালেন জনজীবনের দিকে, তুলে আনলেন তাদের আনন্দ ও বেদনা, পাপ ও পতন, ক্ষয় ও ক্লান্তিকে— নিজস্ব অনবদ্য ভাষায়।

তপন বড়ুয়াও তাঁর গল্পে কবিতার সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন। তাঁর একমাত্র গল্পগ্রন্থ 'জাপানি শিশু, সহযাত্রী এবং জলভরা কণ্ঠ'-এ তিনি যুদ্ধ, প্রেম আর জীবনকে তুলে এনেছেন কবিতার ভাষায়।

পারভেজ হোসেনের গল্প বেশ কমিউনিকেটিভ। তিনি খুব বেশি নিরীক্ষার দিকে যাননি, এক নিরাসক্ত গদ্য দিয়ে তিনি মানুষের ক্ষয় ও বেদনার গল্প বলে গেছেন। তাঁর অধিকাংশ গল্পের বিষয়বস্তু ব্যক্তিমানুষের সংকট। ব্যক্তির প্রেম ও আকাঙ্ক্ষা, তার হতাশা ও পীড়ন, তার জটিল মনোজগতে পরিপার্শ্বের নানাবিধ ঘটনাবলীর অভিঘাতে সৃষ্ট সংকটসমূহের বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন গল্পে। নানা কারণে এসব সংকট নেমে আসে তাঁর কুশীলবদের জীবনে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংকট উত্তরণে তাদের কিছু করার থাকে না। এক গভীর বিপন্নতা আর অসহায়ত্বে আক্রান্ত হয় তারা, প্রায় নিয়তিতাড়িত এসব মানুষের গল্প আমাদেরকে শুনিয়ে দেন তিনি গভীর মমতায়। সমকাল ও পরিপার্শ্বের ছবি আঁকায়ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। তাঁর উপমাবহুল এবং চিত্রকল্পময় গদ্যভাষাটিও পাঠকদেরকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। তাঁর 'গারদ' 'বৃশ্চিকের জাল' 'ক্ষয়িত রক্তপুতুল' 'হরণ' 'কারবার' 'বিষকাঁটা' প্রভৃতি গল্প স্মরণযোগ্য হয়ে থাকবে বলেই মনে করি।

আশির দশকে লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে যাঁরা জড়ো হয়েছিলেন, তাঁরা খুব সঙ্গত কারণেই সাধারণ পাঠকদের কাছে পৌঁছতে পারেননি যেমন, তেমনই নিয়মিত লেখালেখি থেকে দূরেও থেকেছেন কিছুদিন; হয়ত লিটল ম্যাগাজিনের স্বল্পতা এর একটি বড়ো কারণ। কোনো এক অজ্ঞাত এবং অনির্ণেয় কারণে আশির অনেক লেখকই অনেকদিন পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় ছিলেন। হাতে গোণা কয়েকজন ছাড়া আশির অনেক লেখকই কেন তাঁদের লেখালেখিতে দীর্ঘ ছেদ টানলেন সেটা বোঝা মুশকিল। সেলিম মোরশেদ, শহীদুল আলম, পারভেজ হোসেন, মাখরাজ খান এঁরা সবাই দীর্ঘ বিরতি দিয়েছেন। সামসুল কবির নিষ্ক্রিয়, সঞ্জীব চৌধুরীও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গল্পে নিষ্ক্রিয়ই ছিলেন। এঁদের অসাধারণ সম্ভাবনা— অতি অল্প সময়ে যা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল, এখন একেবারেই ম্রিয়মাণ হয়ে আছে। নিষ্ক্রিয়তার উদাহরণ যেমন আছে, তেমনি তুমুল সক্রিয়তার উদাহরণও আছে এই সময়েই। নাসরীন জাহান ও ইমতিয়ার শামীম নিজেদেরকে নিরন্তর সক্রিয় রেখেছেন। মামুন হুসাইন, হুমায়ুন মালিকও নিয়মিতই লিখে গেছেন। শহীদুল জহির, সৈয়দ রিয়াজুর রশীদ স্বল্পপ্রজ হলেও লেখালেখির সঙ্গেই ছিলেন সবসময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময়ের সবচেয়ে বহুপ্রজ লেখক নাসরীন জাহান। বলা যেতে পারে তিনিই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সক্রিয় রেখেছেন নিজেকে। অবশ্য তাঁর ব্যস্ততা শুধু গল্প নিয়ে নয়, প্রধানত উপন্যাসকে ঘিরেই, তবু তাঁর রয়েছে প্রচুর ও বহুমাত্রিক গল্প লেখার প্রবণতা। গল্পের বিষয় হিসেবে ব্যক্তিমানুষের ক্ষয়, ক্লেদ, মনোবিকলন, নারীর নিজস্ব পৃথিবী, একই সমাজে বাস করা একজন পুরুষের আর একজন নারীর ভিন্ন— প্রায় বিপরীতধর্মী— বাস্তবতা, এই সমস্তকিছু। নাসরীন সবচেয়ে কুশলী চোখে নারীর চোখে বিশ্বকে দেখেছেন, সেই দেখায় নারীবাদী ভাবনার প্রকাশ আছে বটে, কিন্তু তা উচ্চকিত নয়। কোনো মতবাদকেই তিনি শিল্পের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে দেননি। তাঁর বর্ণনার মধ্যে পরাবাস্তবতা আর যাদুবাস্তবতার উপাদান আছে, কিন্তু কখনো-কখনো তাঁর ভাষাটিকে একঘেয়ে, পৌনঃপুনিক ও বিশেষণের অদ্ভুত প্রয়োগের প্রবল-প্রচুর প্রবণতায় আক্রান্ত বলে মনে হয় আমার। 'পুরুষ রাজকুমারী' 'ঈর্ষা' 'কাঠপেঁচা' 'সম্ভ্রম যখন অশ্লীল হয়ে ওঠে' 'পূর্বপুরুষ আর সোনার মাকড়সার গল্প' 'যে অন্ধ লোকটি রঙ দেখতে জানত' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প।

যে রাজনৈতিক বাস্তবতার ভেতর দিয়ে আশির লেখকরা বেড়ে উঠেছিলেন, তার খুব বেশি প্রকাশ দেখা যায়নি তাঁদের লেখায়। ইমতিয়ার শামীম এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম এবং তিনিই এ সময়ের সবচেয়ে বেশি রাজনীতি-সচেতন গল্পকার। যত কিছুই বলা হোক না কেন, মানুষের জীবন যে রাজনীতি-শাসিত, কিংবা রাজনৈতিক বাস্তবতা যে সমষ্টির জীবনকে এমনকি ব্যক্তির জীবনকেও দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে ইমতিয়ার তাঁর গল্পে সেটি খুব ভালোভাবে ধরেছেন। 'শাসনকাল ২০০০' এবং 'শাসনকাল ২০০৩' এই দুটো গল্প-সিরিজে তিনি এই তীব্র রাজনীতি-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সব মিলিয়ে অসাধারণ শিল্পকুশলতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন 'গ্রামায়নের ইতিকথা' গল্পসিরিজে। আমাদের গ্রামগুলো বদলে যাচ্ছে, একথা আমরা সবাই বলি। কথাটির মধ্যে মিথ্যেও নেই। কিন্তু উপরিকাঠামোতে যে পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই, এই পরিবর্তনকে বোঝার জন্য তা কতটুকু যথেষ্ট? ভেতর থেকে কতটুকু পাল্টেছে সবকিছু? শোষণের ধরণ বদলেছে, কিন্তু কমেছে কতটুকু? নাগরিক মানুষের মনোজগতে এই গ্রামই বা কী রূপে অবস্থান করে? এই সমস্তকিছু তিনি খুঁজে দেখেছেন 'গ্রামায়নের ইতিকথা'য়। তবে একটি কথা বলা দরকার— তাঁর একটি নিজস্ব ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি আছে বটে; কিন্তু সেটি প্রায়ই মনোটোনাস অনুভূতির সৃষ্টি করে।

হুমায়ুন মালিকও প্রচুর গল্প লিখেছেন। বরাবরই সিরিয়াস গল্পের লেখক তিনি। জীবন ও পৃথিবী, সমাজ ও মানুষের নানাবিধ অসঙ্গতি-অনাচার-দুরবস্থা-দুর্বিপাক তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে বরাবরই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। ভাষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীক্ষ্ণতা ও বিষয়ের বিভিন্নতা তাঁর আরাধ্য, যদিও তাঁর ভাষাটি দুস্পাচ্য বলে মনে হতে পারে অনেকের কাছে।

হামিদ কায়সার লিখেছেন সমাজের নানারকম মানুষ নিয়ে। অন্তজ শ্রেণীর জীবনকে তিনি বেশ ভালোভাবে চেনেন বলে মনে হয়, সেই তুলনায় মধ্য বা উচ্চবিত্তের জীবন তাঁর কলমে অতটা সফলভাবে চিত্রিত হতে পারে না। নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ নিয়ে কাজ করা এই সমাজ-সচেতন গল্পকারটিও ইতিমধ্যে পাঠকের মনোযোগী দৃষ্টি কেড়েছেন।

সব মিলিয়ে আশির চেহারাটি আসলে কী রকম? যে নিরীক্ষা নিয়ে শুরু করেছিলেন তরুণ লেখকরা; বদলে দিতে চাইছিলেন গল্পের খোলনলচে; ভাষায়, আঙ্গিকে, বর্ণনাভঙ্গিতে আনতে চাইছিলেন দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন; কতটুকু কী হলো তার? সত্যের খাতিরে বলতে হয়— যাঁরা এসব নিরীক্ষা-পরীক্ষায় অধিক মনোযোগী ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই এখন নিস্পৃহ ও নিষ্ক্রিয়। অবশ্য এসব নিরীক্ষার প্রভাব কমবেশি পড়েছিল অন্যান্য লেখকদের ওপরেও। যাঁরা মোটামুটি ট্র্যাডিশনাল ধারায় গল্প রচনার মনোযোগী ছিলেন, তাঁদের গল্পগুলোকে এখন আর ট্র্যাডিশনাল বলা যাচ্ছে না, পূর্ববর্তী অগ্রজদের গল্প থেকে এগুলো নানা দিক থেকেই— ভাষায়, বিষয়ে, প্রকরণে, নির্মাণ-শৈলীতে— আলাদা ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মূলত ওই দ্বিতীয় দলই— নিরীক্ষা থেকে একটু দূরে থেকে যাঁরা গল্প চর্চায় মনোযোগী ছিলেন— এখন আশির প্রধান গল্পকারদের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন। নিরীক্ষাবাদীদের পরিণতি কি শেষ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয়তা? এরকম করে ভাবতে ভালো লাগে না। একটি ভালো গল্প লেখার জন্য একজন লেখকের ভেতরে কতটা যে রক্তক্ষরণ ঘটে যায়, লেখক মাত্রই তা বোঝেন। তিনি যদি হন তরুণ লেখক, আর তাঁর যদি থাকে নতুন কিছু সৃষ্টির নেশা— আমি আমার কথাটি বলতে চাই কিন্তু সবার মতো করে নয়, একটু অন্যভাবে— তাহলে তাঁর রক্তক্ষরণটা হয় সম্ভবত অনেক বেশি। এসব নিরীক্ষার ভেতরে আছে একজন তরুণের রক্তক্ষরণ, এটাকে ব্যর্থ বলে ভাবতে খারাপ লাগে।

আশির লেখকরা সত্তরের জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন দ্রোহ ও প্রতিবাদ নিয়ে। তাঁদের এই প্রতিবাদের একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়েছে আমাদের সাহিত্যজগতে। কিন্তু তাঁরা যে শুধু দ্রোহী এবং সৃজনশীল ছিলেন তাই নয়— একইসঙ্গে ছিলেন নিজেদের সময় ও কাজ নিয়ে অহংকারী; অসহিষ্ণু— সমালোচনা সইতে পারতেন না তাঁরা; উন্নাসিক— বহুদিন পর্যন্ত তাঁরা পরবর্তী লেখকদের দিকে ফিরেও তাকাননি, তাদের গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-উপন্যাস পড়া তো দূরের কথা, খোঁজখবর রাখার বা এমনকি দেখা হলে কথা বলারও প্রয়োজন অনুভব করেননি। ব্যস্ত থেকেছেন নিজেদেরকে নিয়ে, ষাটের মতো তাঁরাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেদের কথা নিজেরাই বলে গেছেন অবিরাম, চারপাশে ফিরে দেখেননি যে, কোথায় কী হচ্ছে। কিন্তু অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে? থাকে না। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের লেখকরা— নব্বইয়ের লেখকরা— তাঁদের উপেক্ষা, তাচ্ছিল্যকে থোড়াইকেয়ার করে সেই প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে দিয়েছেন। এরপর তাঁদের কথা।

বিপুল জঙ্গমতা

নব্বই-এর লেখকরা যখন লিখতে শুরু করলেন তখন আশির লেখকদের তুমুল সক্রিয়তার কাল চলছে, শুধু আশিরই বলি কেন, পূর্ববর্তী সব দশকের লেখকরাই কমবেশি সক্রিয়। কিন্তু আশির উত্তাপ টের পাওয়া যাচ্ছিল প্রবলভাবেই, আর এই উত্তাপ নতুন লিখতে আসা তরুণদের জন্য ছিল একইসঙ্গে স্বস্তির ও অস্বস্তিকর। অস্বস্তির কারণটি আগে বলা যাক। বাংলা সাহিত্যে দশক-বিভাজন নিয়ে বিতর্কটা পুরনো হলেও এখনও এর কোনো সুরাহা হয়নি, এটা ভালো কী মন্দ সে বিষয়ে কোনো মীমাংসায়ও পৌঁছুনো যায়নি। এ-কথা সবারই জানা যে, লেখকদের উন্মেষকাল বা বেড়ে ওঠার সময়টিকে নির্দেশ করার জন্যই এই দশক-বিভাজন করা হয়। বলাইবাহুল্য এরপরও লেখকরা সক্রিয় থাকেন, এবং একজন লেখকের সাহিত্যকর্ম নিয়ে কথা বলতে গেলে আমরা আসলে তার সমগ্র জীবনের কাজ নিয়েই কথা বলি। কিন্তু বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার পরও প্রায় সবাই-ই এর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেন। তা সত্ত্বেও দশক-বিভাজন চলছে এবং আগামীতেও চলবে বলে ধারণা করি। এই বিভাজন একইসঙ্গে সুবিধা ও সংকট তৈরি করেছে, আর এ দুটোই ভোগ করে প্রধানত তরুণ লেখকরা। এখন এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, তরুণদেরকে চিহ্নিত করার জন্য এর কোনো বিকল্প পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু চিহ্নিত করাই নয়, তাদের পরিচিতি পাওয়া সহজ হয় এবং আলোচনায় তাদের নাম উঠে আসে এই বিভাজনের জন্যই। এটুকু তাদের জন্য সুবিধাজনক। আবার অসুবিধাটি হলো— কোনো একটি দশক যদি খুব শক্তিশালী, সৃজনশীল ও ফলবান হয়, বা প্রবলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী দশকের লেখকদের জন্য নিজেদের একটি জায়গা তৈরি করে নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। আগেই বলেছি— আশির উত্তাপ নব্বইয়ের তরুণদের জন্য ছিল অস্বস্তিকর— কারণ, তখনও তারা এমন কিছু বুড়িয়ে যাননি, বরং অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের সমন্বয়ে তখন তারা নবাগত তরুণদের কাছে ঈর্ষণীয় চরিত্র, দাঁড়িয়েও আছেন প্রবলভাবে। তাঁদের একেকটি নাম যেন একেকটি প্রতীক— দ্রোহের ও সৃজনশীলতার। এই প্রবল লেখকদের পাশে সদ্য-তরুণরা দাঁড়াবে কীভাবে? অস্বস্তির কারণটি ছিল এ-ই। কারণ আরও ছিল, একটু আগেই সেটি বলেছি— আশির লেখকরা নিজেদের কাজ নিয়ে ছিলেন অহংকারী; অসহিষ্ণু—; এবং উন্নাসিক— বহুদিন পর্যন্ত তাঁরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরবর্তী লেখকদের দিকে ফিরেও তাকাননি। সুখের কথা— তাঁদের এই তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ তরুণদের মধ্যে হীনমন্যতার জন্ম না দিয়ে জন্ম দিয়েছিল জেদের, তাঁরা তাঁদের মতো করে লিখে গেছেন এবং কেবলমাত্র লেখার মাধ্যমে— কোনোরকম গোষ্ঠীবদ্ধতা বা কোনোরকম আন্দোলন ছাড়াই এই দশকটি ফুলে-ফলে-পত্রপল্লবে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

মোটামুটি এরকম একটা নিয়ম দাঁড়িয়ে গেছে যে, যে-কোনো প্রজন্মের লেখকরা লিখতে এসেই তাদের নিকটবর্তী অগ্রজদের অস্বীকার করে। তিরিশের দশকেই এটা শুরু হয়েছিল। সবাই জানেন— তিরিশের কবিরা রবীন্দ্র-বিরোধিতার নামে মূলত অগ্রজদেরকেই অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের সামনে যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর তেমন কোনো শক্ত প্রতিপক্ষ ছিল না, তাই রবীন্দ্রনাথই টার্গেটে পরিণত হয়েছিলেন। এরকম ঘটনা পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবঙ্গে, এবং ষাটের দশকে দুই বাংলায়ই ঘটেছিল। আরেকটি নিয়মের কথা আগেই বলেছি— কোনো একটি দশক প্রবল হলে পরের দশকটি ম্রিয়মাণ হয়। আশির লেখকরাও তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মকে অস্বীকার করেছিলেন এবং এই অস্বীকারের মধ্যে দিয়েই নিজেদের প্রবল ইমেজ দাঁড় করিয়েছিলেন। রীতি-অনুযায়ী নব্বইয়ের লেখকরা আশিকে অস্বীকার করতে পারতেন, কিন্তু এখানটায় এসে তারা প্রথমবারের মতো নিয়ম ভাঙেন। তারা আশির লেখকদের অস্বীকার তো করেনই নি, বরং বরাবর তাঁদের প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে এসেছেন। অগ্রজরা অবশ্য অনুজদের এই বিষয়টি বুঝতে অনেক দেরি করে ফেলেছেন, ব্যস্ত থেকেছেন নিজেদের নিয়ে, ষাটের মতো তাঁরাও নিজেদের কথা নিজেরাই বলে গেছেন অবিরাম, চারপাশে ফিরে দেখেননি যে কোথায় কী হচ্ছে, ফলে তরুণদের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত সম্পর্কটি গড়ে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয় নিয়মটিও নব্বইয়ের লেখকরাই ভেঙেছেন। প্রতাপশালী আশির পরে নব্বই ম্রিয়মাণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। সেটা হয়নি, বরং এখন, এই এতদিন পর, এসে মনে হচ্ছে— নব্বই আশির চেয়েও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। এর অনেকগুলো কারণের মধ্যে প্রথমটি হলো— নব্বইয়ের লেখকরা কথার চেয়ে কাজ বেশি করেছেন। অর্থাৎ বেশ কয়েকজন কথাশিল্পী ও কবি কোনোদিকে না তাকিয়ে, কোনোকিছুর তোয়াক্কা না করে নিয়মিত লিখে গেছেন, আগাগোড়া সক্রিয় থেকেছেন, এবং একই সময়ে কোনো এক অজ্ঞাত এবং অনির্ণেয় কারণে আশির অধিকাংশ লেখকই নিষ্ক্রিয় ছিলেন। নব্বইয়ের লেখকদের মধ্যে কখনো তেমন কোনো গোষ্ঠীবদ্ধতা তৈরি হয়নি। একসঙ্গে মিলেমিশে কোনো একটা কিছু করে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমনকি পারস্পরিক পরিচয়টিও হয়েছে অনেক দেরিতে, বন্ধুত্ব তো আরও পরের ঘটনা। কিন্তু একবার সেটি গড়ে ওঠার পর সহসা সেটি ভেঙেও যায়নি, এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত নব্বইয়ের লেখকদের মধ্যে পাম্পরিক বন্ধুত্ব ও বোঝাপড়া অন্যদের কাছে ঈর্ষণীয় বিষয়।

পূর্বসুরীদের সকল অর্জন স্বীকার করে নিয়েই ৯০-এর গল্পকার হিসেবে এলেন একদল তরুণ— অদিতি ফাল্গুনী, অনিন্দ্য জসীম, আকমল হোসেন নিপু, আকিমুন রহমান, আদিত্য কবির, আনোয়ার শাহাদাত, আবু জাফর রাজীব, আহমাদ মোস্তফা কামাল, আহসান ইকবাল, কামাল রহমান, কামরুল হুদা পথিক, কামরুজ্জামান জাহাঙ্গির, খোকন কায়সার, চঞ্চল আশরাফ, জহির হাসান, জাকির তালুকদার, জামশেদ বাবুন্টু, জিয়া হাশান, জিয়াউদ্দিন শিহাব, জেসমিন মুন্নী, তুহিন সমদ্দার, নজরুল কবীর, নাসিমা সেলিম, নাফিজ আশরাফ, পাপড়ি রহমান, পারভীন সুলতানা, প্রশান্ত মৃধা, ফয়জুল ইসলাম, ফাহমিদুল হক, ব্রাত্য রাইসু, মশিউল আলম, মামুন সিদ্দিকি, মাসুদুল হক, মাসুমুল আলম, মাহবুব মোর্শেদ, মাহবুব লীলেন, মোস্তফা তরিকুল আহসান, মোহাম্মদ হোসেন, মির্জা তাহের জামিল, মৃগাঙ্ক সিংহ, মোহাম্মদ ইমরান, মাসুমুল আলম, শামীম কবীর, শাহাদুজ্জামান, শাহ মোহাম্মদ আলম, শাহীন আখতার, শাহনাজ মুন্নী, শহিদুল ইসলাম, শিবব্রত বর্মন, শিমুল মাহমুদ, শৈলজানন্দ রায়, সরকার আশরাফ, সরকার মাসুদ, সাঈদ হাসান দারা, সাদ কামালী, সালাম সালেহউদ্দিন, সুমন রহমান, সুমন লাহিড়ী, সেলিম মোজাহার, ষড়ৈশ্বর্য মুহম্মদ, রনি আহম্মেদ, রবিউল করিম, রাজা সহিদুল আসলাম, রোকন রহমান, রাজীব নূর, রাখাল রাহা, রাশিদা সুলতানা, রায়হান রাইন প্রমুখ। এই সময়ের কয়েকজন কবিও অনিয়মিতভাবে গল্পচর্চা করেছেন– আলফ্রেড খোকন, কবির হুমায়ুন, মুজিব মেহদী, শামীম রেজা, সাইম রানা, সাখাওয়াত টিপু প্রমুখ। (এই তালিকা আরও অনেক দীর্ঘ হতে পারে, ঠিক কতজন লেখক এই সময়ে লিখতে এসেছিলেন তার তালিকা করা কঠিন কাজ, তবে সংখ্যাটি ৭০/৭৫ ছাড়িয়ে যাওয়াটা অসম্ভব নয়। এই সংখ্যার একটি গুরুত্বও আছে। বহুসংখ্যক তরুণ যে এই সময়ে গল্পচর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন এই সংখ্যাটি তার প্রমাণ দেয়)।

এতগুলো নাম দেখে পাঠক ভড়কে যেতে পারেন, কিংবা গল্প নিয়ে খুব আশান্বিত হতে পারেন, যে, এতজন তরুণ যখন এসেছেন গল্পচর্চায়— গল্পের দুর্দশা নিশ্চয়ই কেটে যাবে! প্রকৃত চিত্রটি এত সুন্দর নয়। সততার খাতিরে নামগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, এই সময়ে এদের গল্পচর্চা— অল্প হোক, বেশি হোক— চোখে পড়েছে, কিন্তু এ-ও ঠিক যে, ১৫/১৬ জন ছাড়া এঁদের প্রায় সবাই ইতিমধ্যেই লেখা থামিয়ে দিয়েছেন। হয়ত একটি-দুটি গল্প লিখে খুব প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিলেন কেউ কেউ, কিন্তু তাঁরাই গত দশ বছরে একটি গল্পও লেখেননি। এঁদের সম্বন্ধে আর কী বলা যায়? এই প্রবন্ধের রচয়িতা নিজেও এই সময়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন লেখক, নিজের সময়টিকে বিশ্লেষণ করা খুব কঠিন কাজ— এ কথা নিশ্চয়ই সবাই জানেন।

নব্বইতে যে-কোনো কারণেই হোক না কেন, গল্পকাররা পরস্পর থেকে মোটামুটি বিচ্ছিন্ন। মিলেমিশে কিছু একটা করা তো দূরের কথা, পারস্পরিক যোগাযোগটিও অনেক ক্ষেত্রে নেই। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে বিনিময়টা হয়েছে কম। এই সময়ে বিভিন্ন ধারার গল্প লেখা হয়েছে, কিন্তু একই ধারার দুজন গল্পকারের মধ্যে যোগাযোগ প্রায় ছিলই না। অর্থাৎ তাদের সাদৃশ্যটি নিছক কাকতালীয়। সুতরাং বলা যায়, এই সময়ে যদি কিছু অর্জন ঘটে থাকে তাহলে সেটি ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্ন অর্জন, সম্মিলিত নয়।

এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অন্যান্য দশকের তুলনায় এই সময়ের লেখকরা কিছুটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করেছেন। সাহিত্যচর্চা হয়ে পড়েছে পুরোপুরি দৈনিক পত্রিকা নির্ভর। সাহিত্য সম্পাদকদের বেঁধে দেয়া ছকে ও মাপে কি আর গল্প হয়? তারপরও আছে মিডিয়ার উৎপাত, ছোট লেখককে বড়ো করে দেখানোর প্রবণতা, গল্পগ্রন্থ প্রকাশে প্রকাশকদের সীমাহীন অনীহা; প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ভুল সূত্র (ফলে দেখা যায় 'প্রতিষ্ঠান বিরোধী' উচ্চকণ্ঠ তরুণটি বাঙলা একাডেমীর 'তরুণ লেখক প্রকল্পে' অংশগ্রহণ করছে সানন্দে, বই প্রকাশ করছে, বিলিও করছে নিজ দায়িত্বে— যেন ওটা কোনো প্রতিষ্ঠান নয়। কী অদ্ভুত বৈপরীত্য!) আগেই বলেছি, নব্বইয়ের কোনো সম্মিলিত কণ্ঠস্বর এখনো তৈরি হয়নি। আগের প্রজন্মের মতোই এ সময়ের গল্পকাররা বিভিন্ন ধারার গল্প লেখার চেষ্টা করেছেন— কেউ অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মে, কেউ রিয়্যালিস্টিক ধারায়, কেউ বা আবার এ দুয়ের সম্মিলন ঘটাতে চেয়েছেন।

এই সময়ের গল্প নিয়ে কথা বলার আগে আমি পাঠকের প্রগতিশীলতা নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। সেটি আবার কী জিনিস? কোন লেখক প্রগতিশীল আর কে প্রতিক্রিয়াশীল এ নিয়ে প্রচুর কথা হয়, কিন্তু পাঠকের প্রগতিশীলতা নিয়ে তো প্রশ্ন তোলেনি কেউ কোনোদিন! আমি কেন সেটা তুলছি? আর ওই শব্দগুচ্ছ দিয়ে আমি কী-ই বা বোঝাতে চাই? সব পাঠকেরই নিজস্ব একটি পাঠরুচি আছে— সে তো বলাই বাহুল্য, সেটি নিয়ে আমার কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু সেই রুচি কখনো-কখনো বিধিবদ্ধ ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ে— কবিতা বা গল্প বা উপন্যাস বলতে তারা শুধু সেগুলোকেই বুঝে ও বুঝিয়ে থাকেন যা তাদের রুচির সঙ্গে যায়— অন্য কোনো ধরনের লেখা তাদের কাছে লেখাই নয়। এই ধরনের পাঠকদের মুখে আপনি প্রায়ই শুনতে পাবেন— ওটা কি কোনো কবিতা হলো, এটা কোনো গল্পই নয় ইত্যাদি। কিংবা অমুক আবার লেখক নাকি, ওর লেখা তো কিছু হয় না ইত্যাদি। নিজেদের রুচির সঙ্গে যায় না এমন সব কিছুকে যারা একবাক্যে খারিজ করে দেন, তারা, আর যাই হোক, প্রগতিশীল নন। প্রগতিশীলদের অবশ্যই একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস থাকে, দর্শন থাকে— এবং তারা যে-কোনো নতুন কিছুকে বরণ বা বাতিল করার আগে সেটিকে বিবেচনায় আনেন, আলাপ-আলোচনা করেন, বর্জনীয় মনে হলে যুক্তিসঙ্গ উপায়ে বর্জন করেন, গ্রহণও করেন যুক্তি মেনেই। কিন্তু যিনি বিচার-বিবেচনা ছাড়াই কোনো কিছুকে বাতিল করে দেন, তাকে প্রগতিশীল বলবো কীভাবে? এই বাংলাদেশে গত ৬০/৬৫ বছরে কত ধরনের গল্প যে লেখা হয়েছে, কত দিক থেকে যে লেখকরা জগৎ ও জীবনের ওপর আলো ফেলেছেন, সেটি আমাদের প্রধান কয়েকজন লেখকের গল্প পড়লেই টের পাওয়া যায়— দুঃখজনক বিষয় হলো, এই ধরনের পাঠকরা এই কষ্টটুকুও স্বীকার করতে চান না। ফলে কোনটি গল্প কোনটি গল্প নয়, কোনটি কবিতা কোনটি কবিতা নয়— এ নিয়ে তাদের বিজ্ঞজনোচিত মতামত নিতান্তই হাস্যকর কৌতুকে পরিণত হয়। এই সময়ের গল্প নিয়ে কথা বলার আগে কথাগুলো বলতে হলো, কারণ, এ সময়ের অনেক গল্প নানাদিক থেকেই প্রচলিত গল্পের সীমানা এমনভাবে পেরিয়ে গেছে যে, পাঠক যদি প্রগতিশীল না হন, তাহলে এর রসাস্বাদনে নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থ হবেন। যাহোক, এ প্রসঙ্গ রেখে বরং মূল আলোচনায় যাওয়া যাক।

ব্রাত্য রাইসু, রনি আহম্মেদ, জামশেদ বাবুন্টু, শিবব্রত বর্মন, সুমন লাহিড়ি প্রমুখ অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মের গল্পকার। এদের কাছে গল্প যেন হয়ে উঠেছে ঘোরগ্রস্থ হেঁয়ালিতে পূর্ণ রহস্যময় কথামালা। এঁদের গল্পের বিষয়, ভাষা, প্রকরণ ও নির্মাণ-কৌশল খানিকটা ভ্রূ কুঁচকে দেয়। পাঠকদের কথা মাথায় রেখে লেখেন না তারা, বোঝাই যায়, ফলে কমিউনিকেটিভ বর্ণনাকৌশলের কথা ভাবতে হয় না তাদের। এই নন-কমিউনিকেটিভ ফর্ম সম্বন্ধে জানতে রাইসুকে আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তাঁর গল্প বোঝা যায় না কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন— 'গল্প হচ্ছে ধর্মের মতো। ঈহুদির ধর্ম যেমন মুসলমানরা বোঝে না, তেমনি একজনের গল্প আরেকজন বোঝে না।' অতএব তিনি না বোঝার জন্যই গল্প লেখেন! রাইসুর গল্প-বিষয়ক আরেকটি তত্ত্ব— 'মৃত্যু দিয়ে শেষ হওয়া গল্পগুলো সবসময়ই দুর্বল গল্প।' অতএব মৃত্যু দিয়ে গল্প শেষ করা যাবে না! বলাবাহুল্য, এগুলো রাইসু চমক দেয়ার জন্যই বলতেন, এ ছিল তার সহজাত প্রবণতা। গল্প নিয়ে এত সব মৌলিক ভাবনা থাকলে তিনি এত তাড়াতাড়ি গল্প লেখা ছেড়ে দিতেন না। রাইসুর বিষয়, ভাষা, গল্প-নির্মাণ আঙ্গিক পাঠককে প্রায় চমকে দিয়ে যায়। রনি এবং জামশেদের ভাষাও ভ্রু কুঁচকে দেয় পাঠকের— এ কি কোনো গল্পের ভাষা? কিংবা এসব বিষয় কি কোনো গল্পের বিষয় হতে পারে? রনির সাম্প্রতিক বই 'সেলিমের দুঃখের কাহিনী' পড়লে যে কেউ আবিষ্কার করবেন তাঁর ভাষার অদ্ভুত সারল্য, মাথামুণ্ডুহীন বিষয়, এমনকি কোনো-কোনো গল্পের কোনো বিষয়ও নেই। মনে পড়লো, অনেকদিন আগে তাঁকেও এ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। তাঁর উত্তর ছিল— 'এগুলো ঠিক গল্প নয়, গল্প এরকম হতে পারে না, এগুলো হচ্ছে প্রচলিত গল্পের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমালোচনা।' কথাটির মধ্যে সত্যতা আছে। তাঁদের গল্পে প্রচলিত গল্প-কাঠামোর প্রতি বিদ্রুপ আছে, অস্বীকার করা যাবে না। এ ধারার সবাই বিরলপ্রজ, খুবই কম লিখেছেন, কিন্তু অল্পেই চমকে দেয়ার মতো কিংবা দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো ক্ষমতা তাঁদের ছিল। এঁদের নিষ্ক্রিয়তা এই ধারাটিকে প্রবল হতে দেয়নি।

এই সময়ের অন্যতম শক্তিমান গল্পকার শাহাদুজ্জামান। আগেও বলেছি, বাংলা গল্প তার জন্মের পর থেকেই প্রধানত আখ্যানপ্রধান। গল্পকাররা তাঁদের গল্পে যা কিছু বলতে চান তা বলেন একটি 'গল্প'কে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ গল্পে একটি 'গল্প' বা আখ্যান থাকবে এটাই বাংলা গল্পের জনপ্রিয় এবং সর্বাধিক প্রচলিত রীতি। কিন্তু এই রীতির বাইরেও কিছু গল্প লেখা হয়েছে যেগুলোতে আখ্যানকে প্রধান করে তোলা হয়নি, বরং প্রাধান্য দেয়া হয়েছে অনুভূতিকে। এই গল্পগুলোকে আমি অনুভূতি-প্রধান গল্প হিসেবে অভিহিত করেছি। শাহাদুজ্জামানের গল্প অনুভূতিপ্রধান। কিন্তু আখ্যানের দিকে তাঁর খুব একটা মনোযোগ বা আগ্রহ না থাকলেও তাঁর গল্পে যে 'গল্প'ও থাকে সেটি অস্বীকার করা যাবে না, আর থাকে এক অদ্ভুত উদাসীনতা। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি অন্য সবার থেকে বেশ আলাদা এবং গল্পের মধ্যে একটি 'গল্প' বলার চেয়ে পাঠক-হৃদয়ে কোনো একটি অনুভূতি ছড়িয়ে দিতে ভালোবাসেন তিনি। 'কাগজের এরোপ্লেন' এই ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে গৃহীত হবে বলে ধারণা করি। তাঁর '১৮৯৯' 'খুব স্থির একটি স্থির চিত্র' বা 'এক কাঁঠাল পাতা আর মাটির ঢেলা গল্প'র মতো অভিনব গল্পের উদাহরণও খুব সুলভ নয়। তাঁর অনেকগুলো গল্পের মূল থিম হচ্ছে নিরালম্ব মানুষ। তথাকথিত শিক্ষিত নাগরিক মানুষ যে কতটা নিরালম্ব হতে পারে এবং কীভাবে তারা শেকড়চ্যুত হতে পারে, তিনি তাঁর বেশ কয়েকটি গল্পে অতি চমৎকার কুশলতায় সেটি দেখিয়েছেন। 'ইব্রাহিম বক্সের সার্কাস'এবং 'মিথ্যা তুমি দশ পিঁপড়া' এই ধরনের গল্প। 'ক্যালাইডোস্কোপ' 'হারুনের মঙ্গল হোক' 'স্যুট টাই অথবা নক্ষত্রের দোষ' 'পণ্ডিত' 'উড্ডীন' প্রভৃতি গল্পও উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে।

খোকন কায়সার এ সময়ের এক বিস্ময়কর গল্পকার। তিনি তাঁর গল্পে ঘটিয়েছেন লোকবাক্য, লোকাচার, লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের বিপুল সমাহার, যা তাঁকে ব্যতিক্রমী করে তুলেছে। কিন্তু শুধু এই কারণেই নয়, অন্য আরও কিছু কারণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর গল্প পড়তে হলে পাঠককে প্রগতিশীল হতে হবে, নইলে তাদের শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত-নাগরিক-মার্জিত রুচি ও মূল্যবোধ (যেহেতু আমাদের সাহিত্যের পাঠকরা প্রধানত 'শিক্ষিত' 'মধ্যবিত্ত' 'নাগরিক' ও 'মার্জিত') আহত হতে পারে, ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে লেখককে অকথ্য গালিগালাজ করে বসতে পারেন এবং এতে করে এতদিন পর্যন্ত সযত্নে রক্ষিত ভদ্রতার মুখোশটি খুলে গিয়ে তার প্রকৃত গ্রাম্য রূপটি বেরিয়ে পড়তে পারে। কেন বলছি এ কথা? কী থাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর গল্পে? থাকে বিস্তর ঠাট্টা-মশকরা, ইয়ার্কি-ফাজলামি, গালাগালি, খোঁচা-বিদ্রুপ এবং 'অভিজাত' ও 'মার্জিত' সাহিত্যে প্রচলিত নয় এমন সব শব্দের অবাধ ব্যবহার যা 'ভদ্রলোক'দের সূক্ষ্ম এবং মার্জিত রুচিকে আঘাত ও আহত করতে বাধ্য। রয়েছে তীব্র শ্লেষ আর বিদ্রুপ, এবং কৌতুককর ও মনোগ্রাহী ঠাট্টা-মশকরা। কিন্তু শুধু কি এগুলোই আছে, আর কিছু নেই? আছে, অনেক কিছুই আছে। খোকন কায়সারের গল্পের বিষয় বর্ণনা করা অবশ্য কঠিন— কারণ অধিকাংশ গল্পের বিষয় এমন যে, সেটি নিয়ে কথা বলতে গেলে পুরো গল্পটিই তুলে দিতে ইচ্ছে করে। সমাজের নানারকম অসঙ্গতি, পতন, পাপ, অন্ধত্ব তিনি এত অল্প কথায়, এত সূক্ষ্মভাবে, এমন অপূর্ব ইঙ্গিতময়তায় তুলে এনেছেন যে একমাত্র গল্পগুলো পাঠ করা ছাড়া এর মর্ম বোঝাই কঠিন। খোকন কায়সারের আছে অভূতপূর্ব ও ব্যতিক্রমী এক গদ্যভাষা। এরকম গদ্যভাষায় দু-বাংলার আর কোনো লেখক লেখেন কী না আমার জানা নেই। উদাহরণ দিয়ে এর পরিচয় দেয়া যাবে না— এর স্বাদ পেতে চাইলে আপনাকে পড়ে দেখতে হবে, প্রিয় পাঠক। খোকনের গল্পগুলো আরেকটি বিশেষ কারণে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে— জনজীবনে প্রচলিত অথচ সাহিত্যে অপ্রচলিত শব্দসমূহ কোনোরকম পরিমার্জনা ছাড়াই অবলীলাক্রমে অহরহ ব্যবহার করেন তিনি। এবং এই ব্যবহার স্বতঃস্ফূর্ত, জোর করে বসিয়ে দেন না এগুলো, ফলে মনে হয়— এই শব্দগুলো ছাড়া বাক্যটি বা বাক্যগুলো যথার্থ হতো না। শুধু অন্তজ শ্রেণীর মানুষ নিয়ে লেখা গল্পগুলোতে তিনি অন্য সবার চেয়ে ব্যতিক্রম হয়ে ওঠেন একটি বিশেষ কারণে। ঐ শ্রেণীর মানুষের সংকট যে শুধু ক্ষুধা বা দারিদ্র নয়, তাদেরও যে রয়েছে 'শিক্ষিত' মানুষের মতো কিংবা তাদের চেয়ে বেশি দার্শনিক সংকট ও প্রশ্ন, তিনি তা দেখতে ও দেখাতে জানেন। 'ওস্তাদ' 'রাজার কবিলা' 'খোজাগণ' 'হারানো বিজ্ঞপ্তি' 'সাউন্ডইফেক্ট' 'জবানপির' 'টেটাশ' 'রপ্তানি বাণিজ্য' 'মানবতা রিলোডেড' 'তুলারাশির জাতক' 'ফেরেববাজ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প।

জাকির তালুকদার তাঁর গল্পে ইসলামিক মীথের প্রবল-প্রচুর ব্যবহার করে দেখিয়ে দিয়েছেন— আমাদের চারপাশেই অব্যবহৃত অথচ ব্যবহারযোগ্য কত অসংখ্য উপাদান ছড়িয়ে আছে। তাঁর 'বিশ্বাসের আগুন' খুবই উল্লেখযোগ্য গল্প। আমাদের বদলে যেতে থাকা গ্রাম, আধা-শহর, শহর আর এর মধ্যে জীবন-যাপন করা মানুষগুলোর নানাবিধ সংকট ও সম্ভাবনা, প্রেম ও হতাশা তিনি চমৎকার কুশলতায় তুলে আনতে পারেন। এছাড়াও সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার ফাঁদে পড়া মানুষও তাঁর গল্পে এক হৃদয়গ্রাহী, প্রাঞ্জল, কমিউনিকেটিভ গদ্যে উপস্থাপিত হয়। 'কন্যা ও জলকন্যা' 'পরাণগপ্পি ও হাতঘড়ি বৃত্তান্ত' 'টানাবাবা' প্রভৃতি গল্পে তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহনাজ মুন্নীও তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'জ্বিনের কন্যা'য় জনজীবনে প্রবহমান নানারকম মীথ ব্যবহার করেছিলেন। পরের গল্পগ্রন্থগুলোতে সেটি কমে এলেও একবারে হারিয়ে গেছে তা বলা যাবে না। তবে তাঁর পরবর্তী গল্পগ্রন্থগুলো তাঁর দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তনকে মূর্ত করে তোলে। তিনি প্রধানত অনুভূতি-প্রধান গল্প লেখেন, যদিও গল্পের শরীরটি তিনি বর্জন করেননি। স্বল্প পরিসরে, অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি ভাষাভঙ্গিতে তিনি যেসব গল্প রচনা করেন, সেগুলোতে 'গল্প' থাকলেও শেষ পর্যন্ত পাঠকের অনুভূতিকে গভীরভাবে স্পর্শ করে যায়। তার বর্ণনায় আছে এমন এক জাদুময়তা যে পাঠকের মনে এক ধরনের ইল্যুশন তৈরি হয়। 'আমার জুতো জীবন' 'তুলারাশি' 'নানার কাহিনী' 'সুন্দর সাহেবের সাবান' 'পা' 'মাটির ট্রানজিস্টার' প্রভৃতি গল্প তাঁর বহুবিচিত্র গল্পরচনার প্রমাণ দেয়।

মশিউল আলম এই সময়ের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ গল্পকার। তিনি গল্প লেখেন প্রায় কথক ভঙ্গিতে। কীভাবে একটি গল্প বললে তা সব পাঠকের কাছে দ্রুত এবং সহজে পৌঁছে যাবে সেটি খুব ভালো জানেন তিনি। তাঁর গল্পের বিষয় গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে নগর, নগর থেকে বিদেশ-বিভুঁই পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। নাগরিক জীবনের অবসাদ, ক্লান্তি ও অ্যাবসার্ডিটি যেমন তাঁর গল্পে কুশলতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়, তেমনি হয় গ্রামীণ জীবনও। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'মাংসের কারবার'-এ তিনি এক নিরাসক্ত-নির্মোহ গদ্যে রূঢ় বাস্তবতা আর সমকালীন বাংলাদেশের এক বীভৎস চিত্র অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে এঁকেছেন। 'দুধ' 'বিষ' 'মাংসের কারবার' বিভীষিকার ভগ্নাংশ' 'আবেদালির মৃত্যুর পর' 'আন্ডারপাস' প্রভৃতি গল্পে তিনি যেন একটুকরো বাংলাদেশকেই নির্মাণ করতে চেয়েছেন।

প্রশান্ত মৃধার ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গিও লক্ষ করার মতো। নব্বই দশকে তার মতো ডিটেইলিঙের কাজ আর কেউ করেছেন বলে আমার মনে হয় না। তাঁর দৃষ্টিটি প্রায় মাইক্রোস্কোপিক। খালি চোখে যা ধরা পড়ে না বা ধরার পড়ার কল্পনাই করা যায় না, সেটি যেমন মাইক্রোস্কোপে ধরা পড়ে, তেমনি অন্য কোনো গল্পকার তার গল্পে যে মুহূর্তটিকে ধরার কল্পনাই করেন না, প্রশান্ত সেটিকেও ধরেন। ফলে অনিবার্যভাবেই তাঁর ডিটেইলিঙের কাজ বেড়ে যায়, তবে মাঝে-মাঝে যে সেটি একঘেঁয়ে ও ক্লান্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি করে না, তা-ও নয়। অবশ্য তিনি যে এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন, তার প্রমাণও রেখেছেন তাঁর 'শারদোৎসব' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে শুধু বর্ণনাভঙ্গিতেই পরিবর্তন আনেননি তিনি, একইসঙ্গে তীক্ষ্ণ রাজনীতিমনস্কতার পরিচয়ও দিয়েছেন। তাঁর 'বুড়ির গাছ' 'বুড়ো কবিতা লিখতেন' 'শব্দ নৈঃশব্দ্য' 'মেয়েটা বেঁচে যাবে' 'উমা-পার্বতী সংবাদ' গল্পগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে।

অদিতি ফাল্গুনীও এই সময়ে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গল্পের বিষয় বহুমাত্রিক, এর মধ্যে আদিবাসী জীবন নিয়ে লেখা গল্পগুলো বিশেষভাবে পাঠকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টি কেড়েছে। জীবন ও পৃথিবীর দিকে তিনি তাকিয়েছেন মমতার চোখে, অন্তজ শ্রেণীর মানুষের জীবনকেও তিনি মর্যাদাপূর্ণ করে তুলতে চেয়েছেন, কোনো করুণার গল্প তাই তিনি লেখেননি। কিন্তু বিষয়ের চেয়ে আঙ্গিকের দিকে অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় মনোযোগ দেয়ার ফলে তার 'গল্প' প্রায় হারিয়েই যায়, দৃষ্টিকটুভাবে জেগে থাকে আঙ্গিক। তিনি গল্পে তার গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত থেকে শুরু করে সংবাদপত্রের কাটিং সবই ব্যবহার করেন। সব সময় এই ধরনের 'ফিউশন' যে সফল হয় তা নয়, তাছাড়া ফিউশন তার চরিত্রানুযায়ী তাৎক্ষণিক আকর্ষণ তৈরি করলেও এর কোনো দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব থাকে না। তার এই ফিউশন-প্রবণতা আসলে প্রতিভার অপচয়। তার গল্প পড়ে মনে হয়— শিল্পবোধের দিক থেকে তিনি সৃষ্টি বা ক্রিয়েশনের চেয়ে নির্মাণ বা কন্সট্রাকশনকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। অদিতি বরং প্রচলিত আঙ্গিকের গল্পেই অধিকতর স্বচ্ছন্দ, তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন 'সৌভাগ্যের রজনী' 'ইমানুয়েলের গৃহপ্রবেশ' 'টি. ইএইচ. এম নাজমুল হক' প্রভৃতি গল্পে।

রাজীব নূর তাঁর 'হরিণা' সিরিজ দিয়ে বাস্তব চরিত্র নিয়ে কত চমৎকার গল্প লেখা যায় তার প্রমাণ দিয়েছিলেন। কিন্তু এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ তাঁর 'সোনার তরী সকাল' সিরিজ। তীব্র অনুভূতিসঞ্জাত এই গল্পগুলোতে সেই অর্থে কোনো গল্প নেই, বরং এগুলো কবিতা পাঠের আনন্দ দেয়। এই সময়ে এরকম গল্প রাজীব ছাড়া আর কেউই লেখেননি।

রোকন রহমান মূলত লিটল ম্যাগাজিনের লেখক বলে সাধারণ পাঠকের কাছে পরিচিতি কম, কিন্তু মনোযোগী পাঠকের কাছে তার পরিচিতি শক্তিমান গল্পকার হিসেবেই। শক্তিশালী গদ্যভাষা, আঙ্গিক ও বর্ণনাভঙ্গির ধরনই বলে দেয়, গল্প লেখার ক্ষেত্রে তিনি অভিনিবেশী, এবং পারফেকশনে বিশ্বাস করেন। অপ্রচলিত বিষয়, নানা ধরনের চরিত্র, আর তাদের ক্লিষ্ট জীবনযাপনের মধ্যেও নিঃশব্দে জেগে থাকা ক্রোধ ও ক্ষোভকে তিনি কুশলতার সঙ্গে তুলে আনেন। তাঁর 'জটিলের জটিলতাজনিত জটিলতা' ও 'টেরর হান্ট' বই দুটোতে তিনি এর প্রমাণ রেখেছেন।

আকমল হোসেন নিপুর গল্পে অন্তজ শ্রেণীর মানুষ উঠে আসে নিপুণ কুশলতায়। এই শ্রেণীর মানুষকে তিনি চেনেন খুব ভালো করে। তার গল্প নির্মাণ কৌশলটিও লক্ষ করবার মতো। প্রকৃতি আর মানুষ আর সমাজ জীবন তাঁর গল্পে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। অন্তজ শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে খুব গভীরভাবে চেনার সাক্ষর রেখেছেন কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরও, তাঁর গল্পগুলোতে। রবিউল করিম নাগরিক সমস্যাগুলো ভালো বোঝেন, নাগরিক নিঃসঙ্গতা ও ক্লান্তি তাঁর গল্পে চমৎকার কুশলতায় নির্মিত হয়। অবশ্য শুধু এটাই তার কৃতিত্বের একমাত্র জায়গা নয়, রূপকথার আদলে বা যাদুবাস্তবতার ব্যবহার করে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখেছেন কয়েকটি চমৎকার গল্প— তাঁর গল্পগ্রন্থ 'পৃথিবী কিংবা নরকের গল্প'-এ এসবের দেখা মিলবে। তবে তার ভাষাটি বেশ খানিকটা শিথিল, এই সীমাবদ্ধতাটুকু কাটিয়ে উঠতে পারাটা তার জন্য খুব জরুরী। চঞ্চল আশরাফ লেখেন ব্যক্তিমানুষের ক্ষয় ও পতনের গল্প। যে তীব্র অ্যাবসার্ডিটির মধ্যে নাগরিক মানুষের বসবাস, চঞ্চলের গল্পে তার এক কাব্যিক রূপায়ন দেখতে পাওয়া যায়। 'শূন্যতার বিরুদ্ধে মানুষের জয়ধ্বনি' এবং 'সেই স্বপ্ন যেখানে মানুষের মৃত্যু ঘটে' গ্রন্থদুটো এইসব অ্যাবসার্ডিটির পরিচয় ধরে রেখেছে। রাশিদা সুলতানা তার গল্পে জটিল মানবিক সম্পর্কের চমৎকার বয়ান শোনান। এক্ষেত্রে তার মুন্সিয়ানা চোখে পড়ার মতো। পাপড়ি রহমানের গল্পে অন্তজ শ্রেণীর মানুষ গভীর মমতায় চিত্রিত হয়। সরকার আশরাফ তাঁর একটি মাত্র গ্রন্থেই— 'পুনর্বাসন একটি রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম'— তীব্র রাজনৈতিক সচেতনতা আর অপূর্ব নির্মাণশৈলীর পরিচয় রেখেছেন। তুহিন সমদ্দারও তাঁর গ্রন্থ 'সোমপ্রকাশ বাড়িতে নেই'-এ দারুণ সম্ভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন। রাখাল রাহা তাঁর গল্পে লোকজ জীবনকে এঁকেছেন দারুণ কুশলতায়। মাহবুব মোর্শেদের রয়েছে তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা, কিন্তু এর শ্লোগানধর্মী ব্যবহারে বিশ্বাস করেন না তিনি। বরং খুব কৌশলে, কখনো-কখনো প্রতীকের আড়াল নিয়ে তিনি মূল বিষয়টিকে উপস্থাপন করেন। তার কিছু গল্পে যৌনতার শিল্পোত্তীর্ণ ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। 'ব্যক্তিগত বসন্তদিন' গ্রন্থে তিনি তাঁর বহুমুখি প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন।

খুব স্বল্প পরিসরে নব্বই-এর গল্প সম্বন্ধে মন্তব্য করা হলো, এই মন্তব্য থেকে এই সময়টিকে পুরোপুরি বোঝা যাবে না। এই সময়ের লেখালেখি সম্বন্ধে এতটুকু বলা যায় যে, কেউ যদি নব্বইয়ের ৭/৮ জন গল্পকারের গল্প খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েন, তাহলে বাংলাদেশের গল্প কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সে সম্বন্ধে একটা ধারণা পেয়ে যাবেন তিনি।

নব্বই দশক শেষ হয়ে গেছে, এসেছে নতুন দশক, নতুন লেখক, নতুন কলম। এ পর্যন্ত কম বেশি যাঁদের লেখা চোখে পড়েছে তাঁরা হলেন— অনন্ত সুজন, অনন্ত মাহফুজ, অভিজিৎ দাশ, অভীক সোবহান, অশোক দাশগুপ্ত, অরণ্য প্রভা, আজহারুন নবী, আনিফ রুবেদ, আনোয়ার সাদী, আবু তাহের সরফরাজ, আহমেদ ফিরোজ, ইউনুস কানন, ঈশান সামী, উম্মে মুসলিমা, এম আসলাম লিটন, এমদাদ রহমান, এমরান কবির, কামরুল আহসান, চন্দন আনোয়ার, চন্দন চৌধুরী, জাহানারা নূরী, জাহেদ মোতালেব, জ্যোৎস্না লিপি, তামের কবির, তৌহিন হাসান, তৌহিদ এনাম, নীলিমা আফরোজ, পল প্রমিত, প্রবীর পাল, প্রান্তিক অরণ্য, ফারুক আহমেদ, বদরুন নাহার, বরকতউল্লাহ মারুফ, বিজয় আহমেদ, মনিরুজ্জামান মন্ডল, মহিউদ্দীন আহমেদ, মাজুল হাসান, মাদল হাসান, মাসউদ আহমাদ, মাহমুদ শাওন, মোর্শেদ শেখ, শফিক হাসান, শাহনেওয়াজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌধুরী, শাহমিকা আগুন, শামীমা রুনা, শেখ লুৎফর, শেখ শফি, শিমুল বাসার, শুভাসিস সিনহা, লাকু রাশমন, লিটু সাখাওয়াত, সফিকুল আলম, সজীব দে, সঞ্জীব পুরোহিত, সবুজ ওয়াহিদ, সাইফুল আমিন, সাগুফতা শারমীন তানিয়া, সালমা বাণী, সালাহউদ্দীন শুভ্র, সুমন সুপান্থ, সোহেল হাসান গালিব, সোলায়মান সুমন, সৈকত এম আরেফিন, সৈয়দ তৌফিক জুহরী, রাহাদ আবির, রেজা ঘটক, রুবাইয়াৎ আহমেদ, রুমানা বৈশাখী, যিশু মোহাম্মদ, হাসান মুমিন, হামীম কামরুল হক প্রমুখ। বলাইবাহুল্য, এটি কোনো চূড়ান্ত তালিকা নয়। এই তালিকার বাইরেও আরও অনেক নাম রয়ে গেছে যেগুলো হয়তো আমার চোখেই পড়েনি। তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ হয়তো আগামী দিনের প্রধান গল্পকারদের সারিতে আসন করে নেবেন। অতএব এই তালিকার ওপর পুরোপুরি নির্ভর না করার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করছি।

অন্যান্য সময়ের মতোই এ সময়ের সব গল্পকার একই বয়সের নন (যেমন হরিপদ দত্ত সত্তরের অন্যান্য গল্পকার থেকে কিংবা শহীদুল জহির আশির অন্যান্য গল্পকার থেকে বয়সের দিক থেকে অগ্রজ), তবে এঁদের সবারই গল্পচর্চার শুরু এই দশকের গোড়ার দিকে। কেউ কেউ আবার ইতিমধ্যেই বেশ খ্যাতিমান হয়ে উঠেছেন। তবে অধিকাংশ গল্পকার কেবল শুরু করেছেন, তাদের দু-একটি করে গল্প হয়তো পড়া হয়েছে, কিন্তু এখনই এ নিয়ে কোনো মন্তব্য না করাই ভালো। লেখালেখি করতে চাইলে ধৈর্যের পরীক্ষায় আগে উত্তীর্ণ হওয়া দরকার। সব কালেই অনেক সম্ভাবনাময় লেখকের অকাল মৃত্যু ঘটেছে শুধুমাত্র নিজেকে চলমান রাখতে পারেননি বলে। নতুন লেখকরা নিজেদের চলমান রাখবেন এবং অচিরেই আমাদের সামনে তুলে ধরবেন তাদের সম্ভাবনার জগৎ, এমনটিই প্রত্যাশা করি।

উপসংহারের পরিবর্তে

এই লেখার শিরোনামে 'বাংলা গল্পের উত্তরাধিকার' শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে যে গল্পের জন্ম, শরৎচন্দ্র, জগদীশগুপ্ত, মানিক, বিভূতি, তারাশংকরের হাতে যে গল্পের বেড়ে ওঠা, তারই উত্তরাধিকার ধারণ করে চল্লিশ দশকের মাত্র কয়েকজন লেখকের হাতে আমাদের দেশে গল্পচর্চার সূচনা হয়েছিল। ছয় দশক পর এতদিনে তা একটি পরিণতি লাভ করেছে। এক নিমেষে উচ্চারণ করার মতো বেশ কয়েকজন গল্পকার, অহংকার করার মতো অসংখ্য গল্প উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছেন এই সময়ের লেখক-পাঠকরা। কতটুকু এগিয়েছি আমরা? এ নিবন্ধের স্বল্প পরিসরে হয়তো সে মীমাংসায় পৌঁছানো যাবে না। এ নিয়ে আরও বহু আলোচনার অবকাশ রয়ে গেছে। তবু যারা মনে করেন 'বাংলাদেশে কিছুই হচ্ছে না', বা বাংলাদেশের গল্প নিয়ে যারা হীনমন্যতায় বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্মসিকতায় ভোগেন তাদের প্রতি একটি প্রশ্ন উচ্চারিত হতে পারে— গল্প বলতে তারা কী বোঝেন? আমার মনে হয়, তুলনামূলক সাহিত্যবিচারের কথা যদি ওঠে— তার আগে কিছু-কিছু বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া উচিত। গল্প বা উপন্যাস বা কবিতা বা নাটক আমরা কেন লিখব, কেন পড়ব, কাকেই বা এসব অভিধা দেবো, এই বিষয়গুলো পরিষ্কার হওয়া ভালো। গল্প যদি কোনো-না-কোনোভাবে জীবনের কথা বলে, সময়কে ধারণ করে, মানুষের ব্যক্তিগত-সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-দার্শনিক পটভূমি ফুটিয়ে তুলতে পারে, চিরন্তন বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন ও ব্যাখ্যা প্রদান করে— অর্থাৎ এগুলোই যদি একটি গল্পের বৈশিষ্ট্য বা প্রধান কাজ হয়ে থাকে, তাহলে বাংলাদেশের অর্ধ-শতাব্দীর গল্পে এর কোন দিকটি ধরা পড়েনি— সে প্রশ্ন উন্নাসিক ও হীনমন্যদের প্রতি উচ্চারণ করা প্রয়োজন। নাকি বাংলাদেশের মানুষ ও সমাজ জীবনকেই তারা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না বলে এসবের চিত্রায়ণ তাদের চোখে পড়ে না? বাংলাদেশের অর্ধ-শতাব্দীর গল্পের মোটামুটি পাঠ শেষে আমার মনে হয়েছে— আমাদের অর্জন খুব সামান্য নয়। জীবন ও পৃথিবীর চেনা-অচেনা কোণে আমাদের লেখকরা ক্রমাগত আলো ফেলেছেন এবং ফেলছেন— এ কাজটি কেন গুরুত্বপূর্ণ হবে না? বিষয়-ভাষা-আঙ্গিক সব দিক বিবেচনা করেই বলি, বাংলাদেশে এমন কিছু গল্প লেখা হয়েছে, যেগুলো বিশ্ব-সাহিত্যের যে-কোনো মানদণ্ডে প্রথম সারিতেই থাকবে। আমাদের গল্পসাহিত্য নিয়ে তাই অনায়াসেই গর্ব করতে পারি আমরা।

রচনাকাল : ফেব্রুয়ারি-মে, ২০০৮

প্রথম প্রকাশ : সাত পর্বের ধারাবাহিক হিসেবে, ৩ এপ্রিল, ১০ এপ্রিল, ১৭ এপ্রিল, ২৪ এপ্রিল, ১ মে এবং ৮ মে, ২০০৮, সাপ্তাহিক কাগজ।

তথ্যসূত্র

১. শতবর্ষের বাঙলা ছোট গল্প : একটি রূপরেখা/উজ্জ্বল কুমার মজুমদার।
২. সাম্প্রতিক বাঙলা গল্পসাহিত্য/ আবদুল মান্নান সৈয়দ।
৩. ছোটগল্পের রূপান্তর / আনন্দ বাগচী।
৪. বাঙলা ছোটগল্পের তিন দিকপাল / সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।
৫. মাঝারি মাপের আয়না / সরোজ বন্দোপাধ্যায়।
৬. বাংলাদেশের নির্বাচিত ছোটগল্প ২য় ও ৩য় খন্ডের ভূমিকা / আবদুল মান্নান সৈয়দ / বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র।
৭. বাংলাদেশের গল্প— সত্তর দশক/ সুশান্ত মজুমদার সম্পাদিত / বাঙলা একাডেমি।
৮. বাংলাদেশের গল্প— আশির দশক/ নাসরীন জাহান সম্পাদিত/বাঙলা একাডেমি।
৯. তরুন প্রজন্মের গল্প/মুসা কামাল মিহির সম্পাদিত/ শব্দশিল্প প্রকাশনী।
১০. নব্বই দশকের গল্প/ রবিউল করিম সম্পাদিত/ব্যাস প্রকাশনা।
১১. বাংলাদেশের ছোটগল্প : উত্তরাধিকারের পরিপ্রেক্ষিত/ আহমাদ মোস্তফা কামাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২. ষাট দশক : আমাদের পথিকৃৎ গল্পকারদের সামান্য মূল্যায়ন/ আহমাদ মোস্তফা কামাল।

১৩. তরুণদের গল্প/ আহমাদ মোস্তফা কামাল।

১৪. আশির দশকের গল্প / আহমাদ মোস্তফা কামাল।

১৫. আমাদের গল্প : ৫০ বছর / আহমাদ মোস্তফা কামাল।

১৬. স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের গল্প / আহমাদ মোস্তফা কামাল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : একজন পিতৃপুরুষের গড়ে ওঠা

প্রাককথন

দেশভাগের সেই বিহ্বল সময়ে যে কজন আলোকপ্রাপ্ত অগ্রসর মানুষ পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীর শিল্পবোধ, সাহিত্যচেতনা, দর্শনচিন্তা ও জাতিসত্তার স্বরূপ নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাদের অন্যতম এবং অবশ্যই উজ্জ্বলতর, সচেতন, সুদুরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ও লক্ষ্যমুখী। হাজার বছরের ঐতিহ্য ও আঘাতে লালিত ও বিক্ষিপ্ত এই জনপদের মানুষগুলো তাদের সমস্ত সংস্কার ও বিশ্বাস, সংকট ও সম্ভাবনা, স্বপ্ন ও হতাশা, অর্থাৎ সমস্ত ইতি ও নেতিবাচকতাসহ এই প্রথম ঠাঁই পেলো কোনো শক্তিমান সাহিত্যশিল্পীর সৃষ্টিতে। এই প্রথম কোনো লেখক প্রায় পূর্ব ঐতিহ্য ছাড়াই এ অঞ্চলের অধিবাসীদের তাঁর চিন্তা ও স্বপ্ন ও সৃষ্টির অর্ন্তগত করে নিলেন। মাত্র তিনটে উপন্যাস, দুটো গল্পগ্রন্থ এবং দুটো নাটক; তাঁর জীবনকালে প্রকাশিত এই কয়েকটিমাত্র গ্রন্থ এবং আরও কিছু অগ্রন্থিত রচনা, এই নিয়েই তিনি যে আমাদের প্রধান লেখক, উত্তরকাল যে তাঁকে বরাবরই দেখেছে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের চোখে— তার কারণ তো শুধুমাত্র এই নয় যে, তিনি শুধুই একজন কথাশিল্পী। তিনি বরং বাংলাদেশের কথাসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে পালন করেছেন পিতৃপুরুষের ভূমিকা। কী হবে আমাদের ভাষারীতি, ক্রিয়াপদের ব্যবহারে কীভাবে পরিবর্তন আনা যায়— অবিলম্বে এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে এই অঞ্চলের জন্য তিনি তৈরী করেছিলেন এক গ্রহণযোগ্য ভাষারীতি এবং ব্যবহার করেছিলেন সংখ্যাহীন আঞ্চলিক শব্দ, যা ছাড়া এই জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ সঠিকভাবে ফোটে না।

লক্ষ্যমুখী ছিলেন তিনি, নিজের গন্তব্য সম্বন্ধে ছিলেন সচেতন— কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন এ বিষয়ে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না, সংশয় ছিল না। পাকিস্তানি ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধের যখন জয়জয়কার চলছে এদেশে, এ জাতিকে কেবলই মুসলমান হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে, তখন তিনি বাঙালি মুসলমানের বাঙালিত্বকেই বড় করে দেখিয়েছেন। তিনি তাই তাঁর পাঠকদেরকে আরব মুসলমানদের গৌরব-গাঁথা শোনাননি, অন্য অনেকের মতো। সৈয়দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন যথার্থই আধুনিক, সবকিছু মিলিয়ে এই যে জনগোষ্ঠী তিনি তাদেরকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে।

মোটামুটিভাবে আড়াই যুগের সাহিত্যচর্চার ফসল হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ যা রেখে গেছেন তার পরিমাণ খুব বেশি নয়। 'লাল সালু', 'কাঁদো নদী কাঁদো' এবং 'চাঁদের অমাবস্যা'— এই তিনটি উপন্যাস, 'নয়ন চারা' ও 'দুই তীর'— এই দুটো গল্পগ্রন্থ , 'তরঙ্গভঙ্গ' এবং 'বহিপীর'— এই দুটো নাটক, বত্রিশটি অগ্রন্থিত গল্প, একটি কিশোর নাটক ও একটি একাঙ্কিকা— সাকুল্যে এই তাঁর রচনা।

উপন্যাসে তিনি প্রথম আধুনিক, নাটকেও। আর গল্প তাঁর গড়ে ওঠার প্রামাণ্য দলিল। বত্রিশটি অগ্রন্থিত গল্পসহ তাঁর মোট ঊনপঞ্চাশটি গল্প বেশ কৌতূহল জাগায়— এখানেই তিনি বারবার বদলে ফেলেছেন নিজেকে, বারবার ভেঙেছেন এবং গড়েছেন। অবশেষে নানা দিক থেকেই তাঁর ঋজু চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও গল্পগুলো (বিশেষ করে অগ্রন্থিত গল্পগুলো) তাঁর নিজেকে ভাঙা-গড়ার দলিল হিসেবেই রয়ে গেছে।

গল্পপ্রসঙ্গ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্পগুলোর মধ্যে অগ্রন্থিত গল্পগুলো বেশ কৌতূহল জাগায়। এর সবগুলোকে সফল গল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায় না বরং কয়েকটি বেশ দুর্বল ও অসফল— ঠিক যেন গল্প হয়ে ওঠেনি। আবার এগুলোর মধ্যেই রয়েছে উঁচুমানের কালজয়ী গল্প। আমাদের মনে রাখতে হচ্ছে, তিনিই নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যরুচি, ফলে তাকে যেতে হয়েছে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে। আর তাছাড়া একজন লেখকের প্রথম জীবনের কটা লেখাই বা শীর্ষছোঁয়া সাফল্য পায়?

আমি তার গল্পগুলোকে অবশ্য তিনভাগে ভাগ করে দেখতে চেয়েছি—– দুর্বল ও অসফল গল্প, মাঝারি মানের গল্প, এবং গভীর জীবনদর্শী উন্নত শিল্পমূল্যের গল্প। গল্পগুলোকে এই শ্রেণী বিভাগের মধ্যে ফেলে বিবেচনা করলে আমাদের অবাক হয়ে লক্ষ করতে হয়, একই সময়ে তিনি রচনা করেছেন দুর্বল ও উন্নত গল্প। একি তাঁর দোদুল্যমানতা? এ বিষয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে শ্রেণীবিভাগটি করে ফেলতে চাই–

দুর্বল ও অসফল গল্প সীমাহীন এক নিমিষে, চৈত্র দিনের এক দ্বিপ্রহরে, ঝোড়ো সন্ধ্যা, প্রাস্থানিক, পথ বেধে দিলো..., অনুবৃত্তি, সাত বোন পারুল, স্বপ্ন নেবে এসেছিল, কালচার, বংশের জের, মৃত্যু, সতীন, স্বগত।

মাঝারি মানের গল্প : সেই পৃথিবী, পরাজয়, খুনী, রক্ত, খণ্ড চাঁদের বক্রতায়, দুই তীর, পাগড়ি, কেরায়া, নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা, মালেকা, চিরন্তন পৃথিবী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবল হাওয়া ও ঝাউ গাছ, হোমেরা, স্থাবর, সূর্যালোক, অবসর কাব্য, স্বপ্নের অধ্যায়, সবুজ মাঠ, নানীর বাড়ির কেল্লা।

গভীর জীবনদর্শী ও উন্নত গল্প নয়নচারা, জাহাজী, মৃত্যুযাত্রা, একটি তুলসীগাছের কাহিনী, গ্রীষ্মের ছুটি, স্তন, মতিনউদ্দিনের প্রেম, মানুষ, ছায়া, দ্বীপ, মানসিকতা, ও আর তারা, মাঝি, নকল, রক্ত ও আকাশ, না কান্দে বুবু।

গল্পের আলোচনায় প্রবেশ করার আগে একটি বিষয় একটু পরিষ্কার করে নিতে চাই। গল্পগুলোর যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে এই লেখকের নিজস্ব মতামত। যে কেউ এ মতের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন এবং সে মতের প্রতিও এই লেখক পূর্ণ শ্রদ্ধা পোষণ করেন। তবে এ আলোচনাটি এই শ্রেণীবিভাগকে সামনে রেখেই করা হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গড়ে ওঠার বিষয়টি বোঝা যায় তাঁর অগ্রন্থিত গল্পগুলো পড়লে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, তিনি প্রথমে দুর্বল গল্পগুলো লিখেছেন, এরপর মাঝারি মানের গল্পগুলো রচনা করে উন্নত ও শিল্পমূল্যসম্পন্ন গল্পগুলো সৃষ্টির ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছেন। প্রকাশকালের দিকে তাকালে বরং একই বছরে 'পথ বেঁধে দিলো' বা 'প্রাস্থানিক'-এর মতো অগভীর গল্প এবং 'ছায়া', 'দ্বীপ' বা 'মানুষ' প্রভৃতির মতো শক্তিশালী গল্প প্রকাশিত হতে দেখা যায়। একই সময়কালে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী গল্প রচনার এই প্রবণতা হয়তো যে-কোনো সফল শিল্পীর গড়ে ওঠার অমসৃণ-রুক্ষ-দ্বন্দ্ববহুল প্রক্রিয়াকেই নির্দেশ করে। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে— এই সময়কালে প্রকাশিত কয়েকটি মাত্র গল্প তিনি গ্রন্থের জন্য নির্বাচন করেছেন যেমন— 'কেরায়া', 'তার প্রেম (গ্রন্থে— 'মতিউদ্দিনের প্রেম'), 'পাগড়ি', 'শত্রু নাই' (গ্রন্থে— 'নিষ্ফল জীবন, নিষ্ফল যাত্রা'), 'খন্ড চাঁদের বক্রতায়' প্রভৃতি। অগ্রন্থিত গল্পগুলোর মধ্যে গভীর ও উঁচু মানের গল্পগুলো নিঃসন্দেহে যে-কোনো লেখকের পক্ষেই শ্লাঘার বিষয় হতে পারে— তবু কেন তিনি এগুলোকে গ্রন্থভুক্ত করেননি, বোঝা যায় না। অন্যদিকে, অগভীর গল্পগুলো কোনো বিচারেই তাঁর মতো লেখকের কোনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, এমনকি সেগুলো সাময়িক পত্রে প্রকাশের প্রয়োজনও সামান্য। তবু এ গল্পগুলো আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এই জন্য যে, এগুলো দিয়েই তাঁর গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি তীব্রভাবে টের পাওয়া যায়।

২

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কয়েকটি গল্প আমি দুর্বল ও অগভীর গল্প হিসেবে চিহ্নিত করেছি। কারণ আমাদের চেনা ওয়ালীউল্লাহর ভাষাভঙ্গি, ঋজুতা, মানসিক টানা-পোড়েন নির্মাণে দক্ষতা, সচেতনতা, চরিত্র চিত্রণের কুশলতা, শিল্পমূল্যের ব্যাপারে তীক্ষ্ণ সচেতনতা ইত্যাদি এসব গল্পে খুব একটা চোখে পড়ে না। বরং চোখে পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হালকা চালে ইচ্ছাপূরণের প্রবণতা, চরিত্রের ওপর উৎকট জীবনবোধ আরোপের চেষ্টা; আর অদ্ভুত অমনোযোগিতা পাঠককে প্রায় বিরক্ত করে তোলে।

এরকম দু-একটি গল্পের কথা বলা যাক। যেমন 'ঝোড়ো সন্ধ্যা'। এই গল্পের বিষয় এক তরুণ দম্পতির দাম্পত্য সংকট, আর এ সংকট ও দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে এক মধ্যবর্তিনীর উপস্থিতি। প্রথম থেকে অনেক দূর পর্যন্ত গল্পটি একটি গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ গল্প হয়ে ওঠার যাবতীয় ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছিল এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর রীতিগুলো উপস্থিত ছিল স্বমহিমায়। প্রায় অসাধারণ একটি চরিত্রের আভাস দেখা যাচ্ছিল আনোয়ারের মধ্যে, দাম্পত্য জীবনের নিয়মবদ্ধ প্রেমকে প্রশ্নবিদ্ধ করছিলেন লেখক, সামাজিক মূল্যবোধ ও বানোয়াট ধারণাগুলোকে কুয়াশাবৃত বলে অভিহিত করে যেন ভবিষ্যৎকালের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকেই প্রতিষ্ঠিত করছিলেন যিনি প্রচলিত রীতি-নীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করবেন ক্রমাগত এবং আরোপিত জীবনবোধ থেকে সরে এসে প্রকৃত সত্যের পক্ষেই দাঁড়াবেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু শেষের দিকে এসে গল্পের ঘটনা প্রবাহ যেভাবে এগিয়ে গেল, পাঠক তাতে হতাশ ও বিরক্ত না হয়ে পারেন না। কী রকম? স্ত্রী রহিমার বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে মধ্যবর্তিনী মমতাজের আগমন এবং নাটকীয় বক্তব্য পেশ— 'আপনি ভুল করছেন আনোয়ার সাহেব'। কী ভুল? আনোয়ারকে মমতাজ ভালোবাসে তবে— 'সে ভালোবাসা ইন্টেলেকচুয়াল বন্ধু হিসেবে, স্বামী হিসেবে নয়।' কিন্তু আনোয়ারের ভুল ধরিয়ে দেয়ার জন্য লেখক নিজেই যে ভুল করে বসলেন তার কী হবে? পাঠক নিশ্চয়ই গল্পটি পাঠের সময় লক্ষ করেছেন, মমতাজ এসে আনোয়ারকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করে— মুহূর্তের মধ্যে সেই সম্বোধন 'আপনি'তে রূপান্তরিত হওয়ার কারণ কি? সৈয়দ কি খুব অমনোযোগী ছিলেন গল্পটি লেখার সময়? যাহোক, এরপরের ঘটনা আরও অদ্ভুত। একটু আগেই যে আনোয়ারকে আমরা দেখেছি অনুতাপহীন, নিজের প্রতি প্রবল আস্থাবান, এই একটি বাক্য শুনেই, এইটুকু সময়ের মধ্যেই তার বোধোদয় ঘটে। সে তার ভুল বুঝতে পারে! এই বোধোদয়ের অদ্ভুত ঘটনাটিও মেনে নেওয়া যেত— কারণ দু-একটি আঘাত অনেক সময়ই মানুষের জীবন ভাবনা পাল্টে দিতে পারে; কিন্তু সৈয়দের চমক তখনও শেষ হয়নি–দু-তিন পংক্তির মধ্যেই জানা গেলো রহিমার মৃত্যু ঘটেছে। এরপর আর পুরো গল্পটির কোনো গুরুত্ব পাঠকের কাছে থাকে না। গল্পটি লেখার সময় সৈয়দ শুধু অমনোযোগীই ছিলেন না, বিভ্রান্তও ছিলেন। যে বিষয়টি নিয়ে তিনি গল্পটি সাজিয়েছিলেন— পরকীয়া প্রেম—তখনকার সমাজে তা গ্রহণযোগ্য ছিল না মোটেই (এখনও কি গ্রহণযোগ্য?), অতএব সৈয়দের প্রয়োজন হয়ে পড়লো আনোয়ারের বোধোদয় ঘটানোর এবং সেখানেই তিনি থামলেন না, তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য রহিমাকে মেরেও ফেললেন! দুটো ঘটনাই অযৌক্তিক, গল্পের জন্য বেমানান এবং আরোপিত। হয়তো পাঠক হৃদয়ে খানিকটা করুণ রস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঞ্চার করার ইচ্ছে তাঁর থেকে থাকবে, যা গল্পের শিল্পমূল্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে।

'প্রাস্থানিক', 'পথ বেঁধে দিলো' প্রভৃতিও ইচ্ছাপূরণের গল্পই। শুধু ইচ্ছাপূরণই নয়, তাঁর অমনোযোগিতাও এক চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে এসব গল্পে। আবার 'চৈত্র দিনের এক দ্বিপ্রহরে' গল্পের আনোয়ারকে কোনোভাবেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর তৈরি কোনো চরিত্র বলে মনে হয় না। চরিত্রের সঙ্গে বেমানান এক উৎকট জীবনদর্শন শুধু ঐ চরিত্রকেই পঙ্গু করে না, গল্পটিরও যে ব্যাপক ক্ষতি করে— এ গল্পটি তার প্রমাণ। 'সীমাহীন এক নিমেষে', 'কালচার', 'বংশের জের', 'মৃত্যু', 'স্বপ্ন নেবে এসেছিলো', 'সতীন'— প্রভৃতি গল্প তাঁর প্রথম দিকের রচনা। এগুলো শিল্পমানের দিক থেকে দুর্বল, অনেক কথা বলতে গিয়েও কিছুই বলে না, অনেক ক্ষেত্রেই বেশ অমনোযোগী ছিলেন লেখক— সেটিও বোঝা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চরিত্রগুলো যা কিছু ধারণ করতে অক্ষম (অথচ লেখক যা বিশ্বাস করেন) সেগুলো তাদের দুর্বল কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে প্রায় পঙ্গু করে ছেড়েছেন তিনি। এতসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এসব গল্পের কোনো-না-কোনো দিকে তাঁর প্রতিভার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কখনো কোনো চরিত্র নির্মাণে (যেমন– 'ঝোড়ো সন্ধ্যা'র আনোয়ার, 'প্রাস্থানিক'-এর আয়েষা প্রভৃতি), কখনো প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ ও সংস্কারকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মাধ্যমে, কখনো অসাধারণ ভাষার কারুকাজ দেখিয়ে (যেমন– 'সীমাহীন এক নিমিষে'), কখনো-বা প্রকরণে ভিন্নতা এনে (যেমন– 'সাত বোন পারুল') তিনি ভবিষ্যতের ওয়ালিউল্লাহকে চিনিয়ে দিচ্ছিলেন।

৩

দুর্বল ও অগভীর গল্পগুলোর কোনো-কোনোটিতে যেমন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বৈশিষ্ট্যগুলো ঝলসে উঠতে দেখা যায়, সেগুলো আরও খানিকটা অগ্রসর হয়ে প্রায় স্থিতি পায় মাঝারি মানের গল্পগুলোতে। এসব গল্পে তিনি জীবন সম্বন্ধে যেন একটি উপলব্ধিতে উপনীত হতে চান, নিজের বৈশিষ্ট্যগুলোকে উজ্জ্বল করে তুলতে চান পাঠকের কাছে; জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে, সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপন করে পাঠককে ভাবিয়ে তোলেন। মনে হয় যেন তিনি এগিয়ে চলেছেন তার ঋজু ও দৃঢ় সংবদ্ধ ভাষারীতি ও বিশ্লেষণী স্বভাবের দিকে যা দিয়ে উত্তরকালের সমস্ত পাঠককে চমকে দেবেন তিনি।

এ-রকম দুয়েকটি গল্প নিয়েও কথা বলা যেতে পারে। 'চিরন্তন পৃথিবী' গল্পটির কথাই ধরা যাক। শহরবাসী যুবক নওয়াজ বাড়ি ফিরে স্ত্রী হোসেনাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে । রোমান্টিক জুটি। অভিমান ও আনন্দ, মধুর অভিযোগ ও প্রেম তাদেরকে আপ্লুত করে তুলেছে। আর তাদের এই মধুর সময়ের সঙ্গী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়াবী প্রকৃতি, সন্ধ্যার সূর্য, বহমান নদী ইত্যাদি তাদেরকে করে তুলেছে আরও আবেগাক্রান্ত, উজ্জ্বল। গল্পটি হঠাৎ ভিন্নদিকে মোড় নেয়ার আগ পর্যন্ত তাদের এ বিহ্বল আচরণ পাঠকের কাছে তেমন গুরুত্ব পায় না। গল্পটি যে এমন মোড় নেবে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তা বোঝাও যায় না। একসময় পাঠক আবিষ্কার করেন— তারা হাঁটতে হাঁটতে 'নদীর খাড়া-ভাঙা পাড়ের নিচে যেখানে জলের রেখা, সেখানে একটা সাদা বস্তু' দেখতে পেয়েছে। ভালো করে দেখার জন্য নওয়াজ এগিয়ে গিয়ে একটি লাশ দেখতে পায়। এ পর্যন্ত এসেও গল্পের কোনো পরিণতি টের পাওয়া যায় না। পরিস্থিতি পাল্টে যায় নওয়াজ তার অপেক্ষমান স্ত্রী কাছে ফিরে এলে— 'হোসেনা ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করলে : কী? কী ওটা? নওয়াজ কোনো উত্তর দিলে না, সেই মুহূর্তে হয়তো দিতে পারতোও না।' এবং কিছুক্ষণ পর এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই 'অতি বিস্মিত ও অতি মৃদু জড়িত কণ্ঠে সে হোসেনাকে প্রশ্ন করলে : তুমি কে?' এখানে এসে পাঠককে নিশ্চিতভাবেই থমকে দাঁড়াতে হয়। এ প্রশ্নের অর্থ কী? এই বিভ্রম, এই ঘোরগ্রস্থ আচরণের ব্যাখ্যাই বা কী? ব্যাখ্যাটি সৈয়দ নিজেও দেন না, বরং— 'হোসেনা নির্বাক, বিমূঢ়। তার চোখে ভয় মিশ্রিত বিস্ময়। এ প্রশ্নের উত্তর সে কি করে দেবে? সে যে মানুষের ক্ষমতার বাইরে।' — বলে গল্প শেষ করে দিলে পাঠকও নির্বাক বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। প্রশ্নটি পাঠকের সামনে উজ্জ্বলভাবে ঝুলে থাকে, গল্প শেষ করেও প্রশ্নটির হাত থেকে রেহাই মেলে না। কী ব্যাখ্যা এই গল্পের? 'তুমি কে?' — প্রশ্নটি কি শুধু হোসেনার উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত? নাকি যার লাশ পড়ে আছে অথবা বেঁচে থাকা সত্ত্বেও যাদের কাছে 'জগৎটা বিরাট ছলনা, শুধু ফাঁকি'— তাদের সবার কাছেই এই প্রশ্ন পৌঁছে যায়, যার উত্তর দেয়া 'মানুষের ক্ষমতার বাইরে?' 'তুমি কে?'— মানুষের প্রতি উচ্চারিত এ এক মৌলিক প্রশ্ন। জীবনের জন্য তোমার এত আয়োজন, এত আনন্দ, এত আবেগ, এত অভিমান, বেঁচে থাকার এত তীব্র আকুলতা অথচ মৃত্যু তোমাকে পরিচয়হীন করে দেয়। 'তুমি' তাহলে কে? কী তোমার পরিচয়? জীবন ও জগৎ ও মানুষের প্রতি এইরকম মৌলিক প্রশ্ন আমরা আরও অনেকবার উচ্চারিত হতে দেখেছি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর রচনায়। বস্তুত এ গল্পের নামকরণই এ প্রশ্নকে একটি সার্বজনীন প্রশ্ন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নইলে এক তরুণ দম্পতির আবেগ-উচ্ছ্বাস-অভিমানমাখা প্রেমের গল্পের নাম 'চিরন্তন পৃথিবী' হবে কেন?

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্পে নিসর্গ নিজেই এক শক্তিশালী চরিত্র। অনেক সময়ই আমরা দেখি— যে-কোনো একটি মানব-চরিত্রের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে প্রকৃতি ও নিসর্গ, নির্ধারণ করছে গল্পের গতিপ্রকৃতি, নিয়ন্ত্রণ করছে চরিত্রগুলোর আচার আচরণ। 'প্রবল হাওয়া ও ঝাউগাছ' গল্পের নওয়াজ ও সাকিনা আপাতদৃষ্টিতে যথারীতি সুখী দম্পতি। সন্ধ্যার রূপ, প্রবল হাওয়া কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝাউগাছের সাড়া তাদেরকে সুখী করে তোলে, কিন্তু ক্রমশ আঁধার ঘন হয়ে এলে, আকাশে 'তারার মালা ঝকঝক' করতে থাকলে—

> 'ওরা ভুলে গেলো পৃথিবীকে, ভুলে গেলো সবকিছু— অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ। ওদের ঝাঁঝালো নেশা হলো, হাওয়ার চেয়েও দুর্বার স্বপ্ন এলো ওদের দেহ জড়িয়ে, অসংখ্য তারার মতো তাদের হৃদয় লক্ষ শিরায় দপদপ করতে থাকলো।' এবং সাকিনা 'চেঁচিয়ে উঠলো— মৃত্যুকে এই মুহূর্তে আমি তুচ্ছ মনে করি। আমি তারার পানে চেয়ে আছি, তোমাকে আর ভালোবাসিনে।'

যেন নিসর্গের প্রবল-গভীর প্রভাব তাদেরকে নগ্ন করে দিয়েছে। আপাত সুখী দাম্পত্য জীবনে যা বলা সম্ভব নয়, সেই বাক্যও তাই অবলীলায় বেরিয়ে আসছে— 'তোমাকে আর ভালোবাসিনে।' এবং হাওয়া থেমে গেলে তারা 'ঘুম থেকে জেগে ওঠার চোখ নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকালো।' কারণ হাওয়া ও সন্ধ্যা ও নক্ষত্র তাদেরকে পরস্পরের কাছে অপরিচিত করে তুলেছে। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করেও যে অপরিচয়ের দূরত্ব ঘোচে না, নিসর্গ সেই সত্যকে প্রকটভাবে প্রকাশ করে দেয়। 'সবুজ মাঠ' গল্পের আকবর ও রাবেয়াও মাঝরাতে ঝড় এলে পরস্পরের কাছে অপরিচিত হয়ে ওঠে আর— 'রাবেয়া আর্তনাদ করে উঠলো কে, কে তুমি?' এবং আকবরের উত্তর 'আমি মানুষ।' কেবলই মানুষ? যে-কোনো মানুষ? যেন রাবেয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন সে, যেন কোনোদিনই তাদের পরিচয় ছিল না। অতঃপর আমরা দেখি— তারা পরস্পরের কাছে অকথিত অধ্যায় বলে চলেছে; যেন এই রাতে, এই হঠাৎ ঝড় নগ্ন করে দিয়েছে তাদের, যেন আর কিছুই লুকানোর নেই পরস্পরের কাছে।

এসব গল্পে নানাভাবেই সৈয়দ জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে নানারকম উপলব্ধির কথা জানান তাঁর পাঠকদের। যে প্রশ্ন তিনি 'চিরন্তন পৃথিবী'তে উত্থাপন করেন, কিংবা মানুষের ওপর তার পরিবেশ-প্রকৃতি ও প্রতিবেশের প্রভাব 'প্রবল হাওয়া ও ঝাউগাছ', 'সবুজ মাঠ' কিংবা 'সূর্যালোক' গল্পে আঁকেন, অথবা 'নানীর বাড়ির কেল্লা'য় একটি কিশোরের মধ্যেমে এই উপলব্ধি ঘটান যে মানুষের জন্য পরম মমতা বা প্রশান্তির আশ্রয় বলতে কিছু নেই, এবং 'অবসর কাব্য'-তে দেখান যে, প্রাত্যহিক জীবন থেকে— বা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, প্রতিদিনের অভ্যাস থেকে— বিচ্যুত হয়ে মানুষ কিছুতেই বেশিদিনের জন্য স্বস্তিদায়ক সময় কাটাতে পারে না, আপাতদৃষ্টিতে তা যতই শান্তির মনে হোক না কেন; উন্নত শিল্পমানসম্পন্ন, গভীর জীবনদৃষ্টি ও জীবনবোধ-সম্পন্ন গল্পগুলোতে এসে এগুলোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চমৎকার মেলবন্ধন ঘটে। এতই অসামান্য কৃতিত্বে এসব গল্প রচিত হয় যে, মনে হয়— মানুষের জন্য এসব প্রশ্ন চিরন্তন যা দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে সব মানুষের জন্য সব কালের প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে।

৪

এই রচনায় যে-সব গল্পকে গভীর জীবনদর্শনসমৃদ্ধ ও উন্নত শিল্পমানসম্পন্ন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলোর কোনো-কোনোটি সব মিলিয়ে সৃষ্টি করেছে জীবন সম্বন্ধে এক গভীর দার্শনিক বোধ, কোনো-কোনোটির রচনারীতি ও নির্মাণকৌশলের চমৎকারিত্ব পাঠকের দৃষ্টি কাড়ে, কোনোটি আবার উত্থাপন করে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নানাবিধ দার্শনিক প্রশ্ন। এর যে-কোনো একটি বৈশিষ্ট্যের জন্যই একটা গল্প শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারে এবং পাঠক হৃদয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

'ছায়া' গল্পটির কথা ধরা যাক। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর অনেক গল্পেই বিভিন্ন মুহূর্তের বর্ণনায়, আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে 'ছায়া' ব্যাপারটিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। কিন্তু এই গল্পে ছায়া হয়ে উঠেছে পুরোপুরি প্রতীকবাহী একটি শব্দ। গল্পের শুরুতে 'থামের আড়ালে ছায়া। সে ছায়ায় ময়লা ও জীর্ণ সবুজ আলখাল্লা গায়ে' 'বৃদ্ধ ফকির বসে ছিল' এবং অচিরেই 'কোমল মুখ রিক্ততায় প্রখর ক্ষীণ দেহ দীনতায় চঞ্চল আর জ্বালায় তীক্ষ্ণ চোখ' নিয়ে একটি 'ছেলে'র আবির্ভাব হলো, যে 'সত্য' খুঁজতে বেরিয়েছে। গল্পের প্রথম কয়েকটি পংক্তিতেই লেখক পাঠকদেরকে আগ্রহী ও কৌতূহলী করে তোলেন। মানুষ যেহেতু কোনো-না-কোনো জীবনসত্য খুঁজে বেড়ায় বুঝে অথবা না বুঝেই, তাই গল্পটি সম্বন্ধে আগ্রহী না হয়ে উপায় থাকে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা জানতে পারি, বৃদ্ধের কাছে সত্য হচ্ছে খোদা। কিন্তু ছেলেটির কাছে? — 'খোদা আমি মানি না। যা আমি দেখতে পাইনে, তা আমার কাছে মিথ্যে।' এবং বৃদ্ধের নানারকম যুক্তিতেও সে অটল— 'যিনি সর্বসাধারণের নন, তিনি আমার কাছে মিথ্যে।' এবং 'যেখানে তর্ক, সেখানে সত্য নেই। সত্য তর্কের অতীত, ভাষার অতীত।' 'খোদা' তাহলে সবার কাছে সত্য নন, তর্কাতীত নন! গল্পটির রচনাকাল ১৯৪৩— ধর্মোন্মাদনার সেই যুগে কথাটি লেখা খুব সহজ ছিল না। যাহোক, যেহেতু সত্য এখানে পাওয়া গেল না, ছেলেটি তাই বেরিয়ে পড়লো— 'তার হাতে লাঠি পিঠে পুটলি।' (এই বাক্যটি যে গল্পের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, প্রথমদিকে তা বোঝা যায়নি।) এবার আমরা তাকে দেখি এক ভিন্ন পরিবেশে— সত্য খুঁজতে বেরিয়ে সে দেখা পেয়েছে এমন এক লোকের যে সব সময় আনন্দে মেতে থাকে; পানাহার, নৃত্য, সংগীত এসবই তার নিত্যসঙ্গী । তার কাছে সত্য হচ্ছে আনন্দ— 'জীবনে আনন্দ ছাড়া আর কিছু নেই, খালি আনন্দ আর আনন্দ।' কিন্তু অচিরেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেটি আবিষ্কার করে— এই আনন্দিত লোকটি বেদনা-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে তার বিগত প্রেমিকার কথা ভেবে। তাহলে জগতে নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ বলে কিছু নেই! অতএব ছেলেটিকে আবার উঠতে হলো এবং 'তার হাতে লাঠি পিঠে পুটলি।' এবার সে দেখা পেলো এক মাঝবয়সী মহিলার যার শান্ত-কোমল-মায়াময় অভিব্যক্তি এমনকি ছেলেটির 'চোখের জ্বালা ও ক্ষুধাকে'ও ধূসর করে তুললো। 'দেহের ঋজুভঙ্গি করে তুললো কোমল ও শিথিল, সে ডুবে গেলো ভাষার অতীত শব্দহীন চিরশান্তিতে।' — 'তোমার এ মহাশান্তির তলায় আমাকে থাকতে দাও চিরকাল, আমি বড় অশান্ত।' কিন্তু এবারেও মুদ্রার অন্যপিঠ আবিষ্কার করতে দেরি হলো না তার। একটি সংবাদ পেয়ে মহিলার ক্রুদ্ধ-হিংস্র রূপ বেরিয়ে পড়লো— 'ওকে মারো, ওকে খুন করো, ওকে পুড়িয়ে ফেলো, ওকে গুঁড়ো করে ফেলো।' — অতএব ছেলেটিকে আবার বেরিয়ে পড়তে হলো, এবং যথারীতি 'তার হাতে লাঠি পিঠে পুটলি।' কিন্তু সত্য খোঁজা শেষ হয়নি তার। এবার তার সঙ্গে দেখা হলো বৈধব্যে ক্লান্ত ক্রন্দনরত এক রমণীর, মৃত স্বামীর স্মৃতিকাতরতায় সে ম্লান, বিষণ্ন, একাকী ও ক্লান্ত। কিন্তু ছেলেটির তরফ থেকে আশ্রয়দানের আশ্বাস পেয়ে যখন তার 'রক্তিম অধরের প্রান্তে একটুখানি মধুর হাসি ফুটে উঠলো' তখন তার বুঝতে বাকি রইলো না যে, মৃত স্বামীর জন্য তার এই বিলাপ স্রেফ বানোয়াট এবং অন্যের সহানুভূতি লাভের জন্যই তা করা হচ্ছে। অতএব 'ছেলেটির চোখে আগুন উঠলো জ্বলে।' এরপর সে আবিষ্কার করলো রোগজর্জরিত যন্ত্রণাকাতর এক বৃদ্ধাকে— জানা গেল তার কাছে একমাত্র জীবনসত্য হচ্ছে দুঃখ। অথচ ছেলেটি একটি স্বর্ণমুদ্রা তার হাতে দিতেই তার মুখে 'আমাকে তুমি যেমন খুশি করলে, খোদাও যেন তোমাকে তেমনি খুশি করেন' শুনে ছেলেটির 'সজল চোখে ছায়া ঘনিয়ে আসলো।' যে দুঃখ সামান্য মুদ্রায় ম্লান হয়ে যায় তা তো জীবনসত্য হতে পারে না! অতএব আবার তাকে 'হাতে লাঠি পিঠে পুটলি' নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হলো সত্যের সন্ধানে। সত্য খুঁজতে বেরিয়ে পড়া ওই তরুণের আদলে আমরা আসলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকেই দেখি। আমরা কৌতূহলী হয়ে উঠি, কী তাঁর সত্য জানার জন্য আমাদের প্রবল আগ্রহ জন্মে। ঈশ্বর নন, আনন্দ নয়, দুঃখ নয়, প্রশান্তিও নয়— তাহলে কোনটি সেই জীবনসত্য যা আমরা জীবনভর খুঁজে বেড়াই? ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এগিয়ে গেলে দেখতে পাই, এবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে এক রহস্যময় তরুণীর। তরুণী তাকে ভালোবাসার কথা বলে, অস্থির তরুণের হৃদয়রাজ্যে প্রেমের মোহনীয় আবেশ ছড়িয়ে পড়ে, হয়তো খানিকটা ঘোরগ্রস্তও হয়ে পড়ে সে। নইলে কোনো কিছুতেই যে সত্য খুঁজে পায় না, সে কেন উচ্চারণ করবে এই বাক্য— 'সত্য লাভ করেছি, তাই আর ভয় করিনে কাউকে, আমার আর মৃত্যু নেই। তোমার কণ্ঠে, তোমার স্পর্শে, তোমার সুধায় আমি সত্য লাভ জেনেছি। তুমি সত্যরূপিনী, তুমি নির্বিশঙ্ক, তুমি অক্ষয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এই ঘোর দীর্ঘস্থায়ী হয় না, অচিরেই 'দিগন্তে' ধুলোর মতো কী উড়তে দেখে অগ্রসরমান 'দস্যুর দলের' আশংকায় সেই সত্যরূপিনী চলে গেল। ছেলেটি আবার একা। প্রেমও সত্য নয় তাহলে? সত্যের জন্য ছেলেটির এইরকম রহস্যময় পরিভ্রমণ চলতে থাকে। হাতে তার লাঠি আর পিঠে পুটলি। গল্পের শেষ পর্যায়ে এসে পরিস্থিতি আরও রহস্যময় ও প্রায় ব্যাখ্যাতীত হয়ে ওঠে। লেখক যেন ইচ্ছে করেই এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন, কারণ মানব জীবনের সব সত্যই ব্যাখ্যাহীন রহস্যে আবৃত, প্রায় কখনোই যে রহস্যকে ভেদ করা যায় না। গল্পের শেষদিকে এসে ছেলেটির সঙ্গে 'রাজপথে গড়াগড়ি' যাওয়া শিশুটির দেখা হয়ে যাওয়াটা প্রায় ব্যাখ্যাতীত বিষয়। শিশুটি যখন তার পুটলি হাতড়ে 'কি যেন একটা' তার হাতের মুঠোয় লুকিয়ে ফেলে তখনও বিষয়টি রহস্যাবৃতই রয়ে যায়, এবং যখন সে বলে যে 'যা সে নিয়েছে তা আর কখনো ফিরিয়ে দেবে না'— তখন রীতিমতো ধাঁধায় পড়তে হয়। কী নিয়েছে সে? এরপর—

> 'হঠাৎ ছেলেটি (শিশুটি) মানুষের মতো কথা কইতে আরম্ভ করলে, বললে : আমাকে শিশু ভাবছো তুমি? আমি শিশু নই, আমি মানুষ। শিশুর দেহে মানুষের মনকে বন্দি করে রাখা হয়েছে বটে, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে আমার মধ্যে নিরন্তর মুক্তিপ্রয়াস চলছে। রাজপথের প্রান্তে একাকী নিষ্কলঙ্ক-নির্বোধ চোখে হঠাৎ ছায়া ঘনিয়ে এলো, ব্যর্থতায় মাথা নুইয়ে এলো, তবু সে জোর করে উঠে দাঁড়িয়ে নীরবে পথ চলতে শুরু করলে, পিঠের পুটলি ধুলোতেই রইলো পড়ে; হাতে তার লাঠি আর পিঠ খালি।'

এখানে এসে পুটলি ও লাঠির রহস্য যেন খানিকটা স্পষ্ট হয়। ছেলেটি সত্য না পেয়ে যতবার ফিরে এসেছে সব-সময়ই তার সঙ্গী ছিল ওই লাঠি আর পুটলি। কিন্তু এবার শিশুটি পুটলি হাতড়ে কি একটা নিয়ে গেলে পুটলির কার্যকারিতা হারিয়ে যায়। বলার অপেক্ষা রাখে না এ দুটো জিনিস তখন প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। তবে কি ও দুটো মানুষের জন্য দুই অনিবার্য প্রসঙ্গ— শরীর (লাঠি) ও প্রাণ (পুটলি)? অল্পক্ষণ পরেই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যায় যখন দেখি— 'মৃত্যুর ভাবশূন্য অর্থহীন আবরণ তাকে আবৃত করে ফেলেছে।' অতঃপর ছেলেটির পছন্দের সেই রহস্যময় মেয়েটি ফিরে আসে এবং— 'ছেলেটির বুকের কাপড় সরিয়ে দেখলে সেখানে একটি আমূল ছোরা বিঁধিয়ে দেয়া হয়েছে, দেখে হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে সে ডুকরে কেঁদে উঠলো।' — সন্দেহের আর অবকাশ থাকে না যে, এ এক প্রাণহীন (পুটলিবিহীন) শরীর (লাঠি) মাত্র। কিন্তু সত্য? যে সত্যের জন্য এই দীর্ঘ পরিভ্রমণ এবং জীবনদান, যুবকটি কি দেখা পেলো তার? গল্পের একবারে শেষের দিকে আমরা দেখি, ওই মেয়েটির ডুকরে কেঁদে ওঠাটাও দীর্ঘস্থায়ী হলো না। কারণ অচিরেই—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সে দেখলে অদূরের একটি ছোট গাছে ফুল ধরেছে অজস্র, বিচিত্র সেগুলোর রঙ দেখে তার অধরের প্রান্তে হঠাৎ অতি মৃদু অতি উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠলো, নয়নে এলো চাঞ্চল্য। দ্রুতভঙ্গিতে মায়ার অবগুণ্ঠন টেনে দিয়ে নূপুরের ঝঙ্কার তুলে লঘুপায়ে সে এগিয়ে গেলো সম্মুখ পানে, পেছনে আর তাকালো না।'

মানুষের জন্য সত্য তাহলে ওটাই— তার নিজের বেঁচে থাকা। মানুষ কেবল বেঁচে থাকতেই চায়, কোনোকিছুই তাকে জীবনের স্বপ্ন-গন্ধময় বর্ণিল আয়োজন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। প্রিয়জনের লাশের ওপর থেকে চোখ তুলে সে দেখতে পায় 'ছোট গাছে ফুল ধরেছে অজস্র।' এ-তো আসলে জীবনেরই প্রতীক, জীবনের কাছে ফিরে আসারই আয়োজন।

এই গল্পটি পুরোপুরিই প্রতীকী— এর ভাষা, আবহ, চরিত্রচিত্রণ, বিষয়বস্তু সবই প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উজ্জ্বল। এই ধরনের প্রতীকী গল্প নির্মাণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাফল্য ঈর্ষণীয়। 'রক্ত ও আকাশ', 'দ্বীপ', 'মানুষ' প্রভৃতিও তাঁর এই ধরনের গল্প।

'রক্ত ও আকাশ' গল্পটি বেশ রহস্যময়— খানিকটা যেন অ্যাবসার্ড নাটকের আদলে রচিত। চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক প্রায় অসংজ্ঞায়িত, তাদের আচরণ প্রায় উদ্ভট, কথাবার্তা পারম্পর্যহীন, পরস্পরের সঙ্গে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনেও যেন অক্ষম তারা। কোনো সুসংবদ্ধ ঘটনা নেই গল্পটিতে, নেই কোনো সম্পর্ক নির্মাণের চেষ্টা। বরং পুরো গল্প জুড়ে তারা একের-পর-এক অর্থহীন সংলাপ বিনিময় করে চলে কিন্তু কিছুতেই পরস্পরকে কমিউনিকেট করতে পারে না। যুবক চরিত্রটি থেকে থেকে কেবল একটি মেয়েকে 'রক্ত ও আকাশের গল্প' শোনাতে চায় কিন্তু শোনায় না এবং গল্পের শেষদিকে বলে— 'দেখো মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে, তোমাকে আমি নিশ্চয়ই সেই রক্ত ও আকাশের গল্প শোনাবো ... যদি তুমি আমাকে তোমার চোখের পানে তাকাতে দাও, তোমার দেহ ছুঁতে দাও। আমার আর কোনো আবিষ্কার করার বাসনা নেই, আমি কেবল বাঁচতে চাই।' 'ছায়া'র মতোই এ গল্পটিও আমাদের জানিয়ে দেয়— বেঁচে থাকাটাই জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। গল্পের একদম শেষ বাক্য— ('নকল সত্যের সন্ধানে যে চোখ এতোক্ষণ চঞ্চল ছিল, খাঁটি সত্যলাভে এই মুহূর্তে সে চোখে মৃত্যু।') — দিয়ে শেষ পর্যন্ত লেখক 'আমি কেবল বেঁচে থাকতে চাই' এই চাওয়াকেই 'খাঁটি সত্য' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। গল্পটির গঠনশৈলীও আমাদের ভাবনার উদ্রেগ করে। পারম্পর্যহীন ওই ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা কি এই যে, আমাদের জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপই পারম্পর্যহীন? অর্থহীন সংলাপের কারণ কি এই যে, আমাদের বেশিরভাগ কথাবার্তাই অর্থহীন, এমনকি তা পরস্পরের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনেও অক্ষম? এই সব অর্থহীন ও প্রয়োজনহীন কার্যকলাপ এবং কথাবার্তার কারণেই কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা আমাদের জীবনের 'খাঁটি সত্য'র সন্ধান পাই না? আমাদের এতসব আয়োজন, এতসব প্রেম-মমতা-হিংসা-বিদ্বেষ-ক্ষোভ-দ্রোহ-যুদ্ধ-সংগ্রাম-বিজয়-পরাজয় এসবের প্রয়োজন কী, মানুষ কি কখনো তা ভেবে দেখেছে? সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এসব গল্পের মাধ্যমে তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যান এই মেসেজ যে, এই এত সব কিছুর আয়োজন কেবলই আমাদের বেঁচে থাকার জন্য, কেবলই আমাদের জীবনকে আরেকটু স্বপ্ন-গন্ধময় ও বর্ণিল করে তোলার জন্য। আমরা দেখেছি, এরপরে এই একই সত্যের প্রকাশ ঘটে আরও অনেক লেখকের লেখায় একেকভাবে। শামসুর রাহমানের কবিতার চরিত্র তাই বন্ধুর লাশ দেখতে গিয়ে বন্ধুর 'রোরুদ্যমান স্ত্রীর ব্লাউজ উপচে পড়া স্তন আড়চোখে' দেখে নেয় আর তার 'অবাধ্য অসভ্য রক্তে ডাকে বারবার লালচক্ষু তৃষিত কোকিল'। এ তৃষ্ণা তো জীবনের জন্যই। মৃতের সৌধের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা রচনা করি জীবনের স্বপ্নিল আয়োজন।

'মানুষ' গল্পটিও প্রতীকী তাৎপর্যময়। আগের গল্প দুটোর মতোই এ গল্পের পরতে পরতে লেখক তৈরি করেন বিস্ময়। গল্পের প্রধান চরিত্র মনির অন্ধ মেয়ে মুলকিকে রঙের ধারণা দেয়। বলে, পৃথিবীতে কালো ছাড়া অন্য কোনো রঙই নেই। একেক সময় মনে হয় মনির এক প্রতারক চরিত্র, নইলে সে লাল রঙের ফুলকে কালো বলে পরিচয় করিয়ে দেবে কেন? কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হয়— সে তো ঠিকই বলেছে, জন্মান্ধ মেয়ের কাছে লাল এমন কি বিশেষ অর্থ বহন করে? তার কাছে তো পুরো জগৎটাই কালো। যাহোক, গল্পের এক পর্যায়ে মুলকির 'তুমি কে?' এই প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়— 'আমি মানুষ। এই পৃথিবীতে জন্মেছি, এই পৃথিবীতেই মরবো; তাই আমরা মানুষেরা শুধু প্রতিশোধ নিতে চাই, কার বিরুদ্ধে জানিনে। আমরা এখানে কামড় দেই, ওখানে আঁচড় কাটি, সত্য চিনিনে বলে থুথু ফেলে মিথ্যে বলি, আর আমরা স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করে সে স্নেহ-মমতা লাথি মেরে ভেঙে দেই, বেদনায় হাসি।' — মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে এ এক চমৎকার বিশ্লেষণ।

'দ্বীপ' গল্পে আমরা কতগুলো জীবন্মৃত মানুষের জীবনাচরণ দেখে শিউরে উঠি। শুধুমাত্র একটি কিশোরী মেয়ে যেন হঠাৎ করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে— বাকি সবাই পাথরের মতো। তারা হাঁটাচলা করে, কাজকর্ম করে কিন্তু তাদের কোনো অনুভূতি নেই। পুরো গল্প জুড়ে এসব অনুভূতিহীন পাথর-সদৃশ মানুষের আচরণ আমাদেরকে হতবাক করে দেয়। ওই একটিমাত্র মেয়ের অনুভূতিপ্রবণ হয়ে ওটাকে রীতিমতো তার দুর্ভাগ্য বলে মনে হয় আমাদের। এইসব পাথর-মানুষের মৃতপ্রায়-ব্যবহারে বিহ্বল হয়ে মেয়েটি যখন আত্মাহুতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, সেই সিদ্ধান্তকেও তখন খুবই স্বাভাবিক ও বিবেচনাপ্রসূত বলে মনে হয়। প্রায় ষাট বছর আগে লেখা এই গল্পটি পড়ে মনে হয়— এ যেন একালের নাগরিক জীবনকে নিয়ে লেখা প্রতীকী গল্প, যখন কারো পক্ষে অনুভূতিপ্রবণ হয়ে ওঠাটাই বিপদজনক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন সব মানুষই প্রায় পাথরে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, যখন আর পাশের মানুষটির কান্নায়ও কারো কিছু যায়-আসে না। ধারণা করি, আরও পঞ্চাশ বছর পর এই গল্প আরও অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে মানুষের জীবনে। অর্থাৎ সৈয়দ যখন গল্পটি লিখেছিলেন তখন তিনি সময়ের চেয়ে কমপক্ষে এক শতাব্দী এগিয়ে ছিলেন।

এই গল্পগুলোর কোনো-কোনোটিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ হয়ে উঠেছিলেন দারুণ আঙ্গিক-সচেতন। নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা এসব গল্পকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। 'ও আর তারা' গল্পের ঘটনা তেমন কিছু নয়, কিন্তু এর বর্ণনা-কৌশল, নির্মাণ-শৈলী ও রসবোধ গল্পটিকে দারুণ উপভোগ্য করে তুলেছে। কিংবা 'না কান্দে বুবু' গল্পের নির্মাণ-শৈলীও পাঠককে দারুণভাবে নাড়া দিয়ে যায়। শুধুমাত্র নির্মাণ-কুশলতার জন্যই গল্পটি পাঠকের কাছে দীর্ঘস্থায়ী আবেদন রেখে যেতে পারে।

নির্মাণ-কুশলতা ছাড়াও এসব গল্পে সৈয়দের মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতা ধ্রুপদী মাত্রা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। যেমন 'মাঝি' গল্পের মাঝি নানাভাবে তার আরোহীদের নদী পাড়ি দিতে নিরুৎসাহী করতে চায় কারণ মাঝপথে ঝড় ওঠার সম্ভাবনা আছে। সে মাঝি, সে যেমন নদী চেনে, চেনে ঝড়কেও— এমনই এক ঝড়ে তার বাপ নদীতেই ডুবে মরেছিল। কিন্তু তার এই শুভ-কামনাকে আরোহীরা সন্দেহের চোখে দেখলে সে নৌকা ছাড়ে ঠিকই, কিন্তু মাঝ নদীতেও যখন ঝড় ওঠে না তখন— 'হঠাৎ কেমন এক আকুলতায় মনিরুদ্দিন মনে মনে বললে, খোদা ঝড় কি আসবো না?' — এই পরিস্থিতি পাঠককে বিপুলভাবে নাড়া দিয়ে যায়। আরোহী তাকে বিশ্বাস করেনি—এই অপমান, এই কষ্ট মাঝিটির কাছে এমনকি মৃত্যুর চেয়েও বিশাল হয়ে ওঠে।

৫

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মৃত্যুর আগে প্রকাশিত দুটো গল্পগ্রন্থে তাঁর মাত্র সতেরটি গল্প গ্রন্থিত হয়েছিল। ধারণা করি, তাঁর অগ্রন্থিত গল্পগুলোর মধ্যে অনেকগুলো তিনি নিজেই বাতিল করে দিতেন— অন্তত প্রকাশিত গ্রন্থ দুটোর গল্প নির্বাচনের দিকে তাকালে সে কথাই মনে হয়— কিন্তু অসামান্য কিছু গল্প তিনি কেন গ্রন্থভুক্ত করেননি সেটি বোঝা কঠিন। সম্ভবত গল্পগুলোকে তিনি খানিকটা দলছুট বলেই বিবেচনা করতেন। 'মানুষ', 'ছায়া', 'দ্বীপ', 'রক্ত ও আকাশ', 'না কান্দে বুবু' প্রভৃতি গল্প তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা পাল্টে দেয়। এসব গল্পের গভীর রহস্যময়তা, কুশলী প্রতীকময়তা, অসামান্য দার্শনিকতা, চমৎকার নির্মাণশৈলী আজো পাঠককে আপ্লুত করে। তার জীবনকালে গ্রন্থিত গল্পগুলো ঠিক এসব বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেনি। কোনো সুনির্দিষ্ট ধারাভুক্ত না হলেও মূলত সৈয়দের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনোবিশ্লেষণের প্রবণতা গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলোতে বেশ ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে। তাঁর চরিত্ররা যে শ্রেণী-পেশারই হোক না কেন— তাদের দৈনন্দিন জীবনের নির্মম বাস্তবতার চেয়ে তাঁর কাছে তাদের মানসজগতটিই অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। 'নয়নচারা', 'জাহাজী', 'মৃত্যুযাত্রা', 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী', 'গ্রীষ্মের ছুটি', 'স্তন', 'মতিনউদ্দিনের প্রেম' প্রভৃতি গল্পে তিনি যতটা না বাস্তবতা নির্মাণের কারিগর, তারচেয়েও বেশি মনোবিশ্লেষক— যদিও তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাটি ঠিক এর উল্টো।

উদাহরণ হিসেবে 'নয়নচারা' গল্পটির কথা বলা যেতে পারে। গল্পের শুরু থেকেই স্মৃতিকাতরতা প্রাধান্য পেয়ে যায়— 'ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে ময়ূরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে।' এবং লেখক জানিয়ে দিচ্ছেন 'মনের চরে ঘুমের বন্যা এলে 'জেলে ডিঙিগুলোর বিন্দু বিন্দু লালচে আলো ঘন আঁধারেও সর্বংসহা আশার মতো মৃদু মৃদু জ্বলে।' কিন্তু পাঠককে খুব বেশি আশার আলো নিয়ে ভাবার সময় না দিয়েই বাস্তবে ফিরিয়ে আনেন লেখক— 'ময়ূরাক্ষী! কোথায় ময়ূরাক্ষী! এখানে তো কেমন ঝাঁপসা গরম হাওয়া।' এবং পরক্ষণেই আমরা দেখতে পাই— 'ফুটপাতে ওরা সব এলিয়ে পড়ে রয়েছে। ছড়ানো খড় যেন। কিন্তু দুপুরের দিকে লঙ্গরখানায় দুটি খেতে পেয়েছিল বলে তবু তাদের ঘুম এসেছে— মৃত্যুর মতো নিঃসাড় নিশ্চল ঘুম।' মাত্র কয়েকটি বাক্যের মধ্যে স্বপ্ন ও বাস্তবতার কী অসামান্য সমন্বয়— ভাবলে অবাক হতে হয়। গল্প এগিয়ে চলে আমুর (গল্পের প্রধান চরিত্র) স্মৃতিকাতরতার মধ্যে দিয়ে। তার অতীত খুব মধুর ছিল এমনটি ভাবার অবকাশ নেই, নইলে এখন এমন দুর্দশায় পতিত হতে হতো না— তবু বর্তমানের কঠোর বাস্তবতায়, দুর্ভিক্ষের সর্বগ্রাসী হা-এর মুখে ওই নিষ্প্রভ অতীতকেও মধুর লাগে, সুন্দর ও কাঙ্ক্ষিত বলে মনে হয়, ফেলে আসা নয়নচারা গাঁ হয়ে ওঠে আমুর স্বপ্নের অংশ। আমুকে তাই চলতে হয় প্রতিমুহূর্তে অতীত ও বর্তমানকে একাকার করে। এই শহরের যা-কিছু সুন্দর তার কাছে তা-ই কোনো না কোনোভাবে নয়নচারার সঙ্গে তুলনীয় হয়ে ওঠে, যা কিছু অসুন্দর, হিংস্র তা কিন্তু কোনোভাবেই নয়নচারার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়— 'শহরের কুকুরের চোখে বৈরিতা নেই। (এখানে মানুষের চোখে, এবং দেশে কুকুরের চোখে বৈরিতা।) ময়রার দোকানে মাছি বোঁ বোঁ করে। তার চোখে এত হিংস্রতা যে মনে হয় চারধারে ঘন অন্ধকারের মধ্যে দু'টো চোখ ধকধক করে জ্বলছে।' পাঠক লক্ষ না করে পারেন না, সারা গল্পে শুধু ওই একটি বাক্যই ব্র্যাকেটবন্দি করে তিনি কী অসামান্য কুশলতায় গাঁয়ের কুকুর ও শহরের মানুষকে একই সমতলে নামিয়ে এনেছেন লেখক। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন দেখি আমুর ভাবনার ধরনটি এরকম— 'ওধারে কুকুরে কুকুরে কামড়া কামড়ি লেগেছে। আমু দূর দূর করে চেঁচিয়ে উঠলো, তারপর জানলো যে ওরা মানুষ, কুকুর নয়! অথবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরে কুকুর, বাইরে কুকুর নয়।' শহর সম্বন্ধে, শহরের মানুষ সম্বন্ধে এই যার দৃষ্টিভঙ্গি সেই ক্ষুধার্ত আমু ঝুলন্ত পাকা কলা দেখে যা তার কাছে 'হলুদ-রঙা স্বপ্নের মতো'— 'কোথায় গো নয়নচারা গাঁ' বলে কেঁদে উঠবে সে আর অস্বাভাবিক কী? কিংবা শহরের একটি মেয়ের সুন্দর চুল দেখে তাকে গাঁয়ের মেয়ে ঝিরার চুল বলে ভেবে নেবে তা-ই বা অবাক করার মতো হবে কেন? এই শহরের যেটুকু তার পছন্দের সেটুকু যে গাঁয়ের বলে ভাবতেই ভালো লাগে। গল্পের শেষে তাই সারাদিন ক্ষুধার্ত ও অভুক্ত থেকে কোনো এক মায়াবতীর কাছ থেকে ভাত পেয়ে দাত্রী মেয়েটিকে— 'নয়নচারা গাঁয়ে কী মায়ের বাড়ি?' বলে সে যে প্রশ্ন করে তা পাঠকের চোখ ভিজিয়ে তুলতে পারে। আমুর এই স্মৃতিকাতরতার অর্থ কী? এ কি বর্তমানের ভয়াবহ বাস্তবতা থেকে পলায়নের মনোবৃত্তি নাকি লেখকের এক ধরনের কৌশল? পুরো গল্পটি লেখা হয়েছে ভয়াবহ মন্বন্তরের পটভূমিতে, অথচ কোথাও তার তেমন কোনো বর্ণনা নেই, বরং আমুর মনোজগতের ভাবনা-কল্পনাই গল্পে প্রধান হয়ে ওঠে। — 'এ সন্ধ্যায় তুমি আমাকে নির্মমভাবে কন্টকাকীর্ণ প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছো। কে তুমি, তুমি কে?'— এই চিন্তা কি কোনো ক্ষুধায় আক্রান্ত মানুষের চিন্তা? তবু আমুর প্রায় দার্শনিক চিন্তাগুলোকে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় না কেবলমাত্র সৈয়দের অসামান্য নির্মাণ কুশলতার কারণে। শুধু 'নয়নচারা'র আমুই নয়, 'জাহাজী'র বৃদ্ধ সারেঙ, 'রক্ত'র খালাসি আবদুল— এরা সবাই অন্তজ শ্রেণীর মানুষ, কিন্তু তাদের জীবন-সংগ্রাম বা বেঁচে থাকার যুদ্ধ বা নিদেনপক্ষে নিত্যদিনের হা-হুতাশের চিত্র গল্পে নেই, তারা নির্মিত তাদের মনোজগতের রহস্যময় কার্যকলাপের প্রেক্ষাপটে। যেন জীবনের একটি পর্যায়ে এসে তারা উপস্থিত হয়েছে গভীর কোনো রহস্যের সামনে, বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের সামনে। অবশ্য শুধু এই কারণেই নয়, বিবিধ কারণে গল্পগুলো পাঠককে নাড়া দিয়ে যায়। একটি 'তুলসিগাছের কাহিনী' গল্পের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও জীবনবোধ এদেশের প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক মানুষকে আরও বহুদিন আলোড়িত করে যাবে, কিংবা 'মৃত্যুযাত্রা'র গভীর জীবনবোধ, 'দুই তীর'-এর অসামান্য মানসিক টানাপোড়েনের চিত্র ইত্যাদি পাঠককে ভাবাবে আরও অনেকদিন।

৬

এই রচনার শুরুতেই যে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম, শেষের দিকে এসে আবারও সেই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করতে চাই। বলা হয়েছিল বাঙালি মুসলমানের শিল্প-সংস্কৃতির বোধ নির্মাণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পালন করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বাঙালি মুসলমানকে তিনি দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন দৃঢ় ভিত্তিভূমির ওপর। 'স্বপ্নের অধ্যায়' গল্পে এই জাতি সম্বন্ধে তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার রূপায়ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখি। গল্পটি রচিত হয়েছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই, কিন্তু সেখানে তিনি পাকিস্তানি ভাবাদর্শে লালিত মুসলমানের কথা শোনাননি, শোনাননি আরব মুসলমানের গৌরব গাঁথাও, এই জনগোষ্ঠীকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বিবেচনা করে তাকে সংস্কারমুক্ত, উদার, প্রগতিশীল করে গড়ে তোলার স্বপ্ন তাঁর এ গল্পে ধরা পড়েছে। তবে স্বীকার করে নেয়া ভালো যে, তাঁর গল্পে রাজনীতি-ভাবনা বা সচেতনতা খুব সুলভ নয়। বরং তাঁকে বলা যেতে পারে বাংলাদেশের প্রথম এবং প্রধানতম দার্শনিক কথাশিল্পী। আর তাঁর গল্পের গুরুত্ব এখানেই। মানুষের মনোজগতের নানাবিধ কার্যকলাপ আর দার্শনিক ভাবনাচিন্তা রূপায়নে তাঁর সাফল্য প্রশ্নাতীত। একটি নতুন দেশে তিনি খুলেছিলেন কথাসাহিত্যের এক নতুন স্কুল যার ভাষা-বিষয়-দার্শনিক প্রতীতি ছিল তাঁর পূর্বসুরীদের চেয়ে আলাদা— আজকের বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকরা সেই স্কুলেরই গর্বিত ছাত্র।

রচনাকাল : মে-জুন, ১৯৯৭
প্রথম প্রকাশ : ১ অক্টোবর, ২০০০, পাক্ষিক শৈলী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবু রুশদ: অগ্রজের পথ চলা

সাতচল্লিশের দেশভাগের পর ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের যে চর্চা শুরু হয় সেটিই এখন বাংলাদেশের সাহিত্য হিসেবে পরিচিত। কেউ-ই অস্বীকার করেন না যে বাংলা সাহিত্যের দুটো শাখাই— ঢাকা ও কোলকাতাকেন্দ্রিক- একই উত্তরাধিকারিত্ব বহন করছে, তবু যেন আমাদের সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি একটু আলাদাই। একটি প্রশ্ন অবশ্য থেকেই যায়- দেশভাগ পরবর্তী সাহিত্যচর্চাই যদি আমাদের সূচনা হয় তাহলে তো পঞ্চাশের দশক থেকেই হিসেব করা উচিত; চল্লিশ কেন গুরুত্বপূর্ণ হবে? কেনই-বা চল্লিশের চর্চা মূলধারার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে আলাদাভাবে বিবেচিত হবে? এ প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে লুকিয়ে আছে বাংলাদেশের সাহিত্যের চরিত্র, গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য। অবিভাজ্য বাংলায় পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠী সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়েছে বটে কিন্তু তা বিচ্ছিন্নভাবে; বলার মতো তেমন কিছু নয়। বিশেষ করে মুসলমান জনগোষ্ঠী, সংখ্যায় মোট বাঙালির প্রায় অর্ধেক হলেও, সাহিত্যে প্রায় অনুপস্থিত ছিলো, আর এ অঞ্চলে লেখক তো প্রায় ছিলেনই না। দু-চারজন যে চেষ্টা করেননি তা নয়, কিন্তু সে-সব সাহিত্য প্রায় সবক্ষেত্রেই বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ঐতিহ্য-মহিমা-বৈশিষ্ট্য থেকে বহু-ক্রোশ দূরে অবস্থান করছিল। চল্লিশের দশকে কতিপয় আধুনিক মনস্ক উন্নত চিন্তা-চেতনার তরুণ সমাজকে, দেশকে ও নিজ জনগোষ্ঠীকে তুলে আনার অভিপ্রায়ে বাংলা শিল্প-সাহিত্যের সমস্ত ঐতিহ্য ও মহিমা ধারণ করেই কলম হাতে নিলেন এবং এই প্রথমবারের মতো পূর্ববাঙলা-কেন্দ্রিক সাহিত্যে নিয়ে এলেন আধুনিকতা, সমসাময়িকতা, যুগযন্ত্রণা ইত্যাদি। আবু রুশদ তাঁদেরই একজন। এর আগে একসঙ্গে এত অঙ্গীকারাবদ্ধ, সৃষ্টিশীল, আধুনিক চেতনাসমৃদ্ধ তরুণকে এক সঙ্গে পাওয়া যায়নি এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে।

একদম নতুন, অভিজ্ঞতাহীন হলেও আমাদের এই লেখকরা সকলেই ছিলেন শক্তিশালী। হয়তো প্রথম দিকে সেটি খুব ভালোভাবে বোঝা যায়নি, তাঁদেরকে এগোতে হয়েছে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে। সমসাময়িক (ওপার বাংলার) জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বা সতিনাথ ভাদুড়ীর পটভূমি আর ওয়ালীউল্লাহ বা আবু রুশদের পটভূমি নিশ্চয়ই এক ছিল না। প্রথমোক্তরা যে জনগোষ্ঠীর মুখপাত্র— সেই জনগোষ্ঠী সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়েছে বঙ্কিমের সময় থেকে, ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁদের সামনে ছিল অর্ধ-শতাব্দীর ফসল, ঐতিহ্য ও অঙ্গীকার— শেষোক্তদের সামনে সে-রকম কিছুই ছিল না। বিশেষ করে মুসলমান জনগোষ্ঠীর জীবন চিত্রায়ণে তাদের জন্য কোন ভাষাটি মানানসই হবে, ঠিক কোন আঙ্গিকে তাঁদেরকে উপস্থাপন করা যায়, সর্বোপরি একটি জনগোষ্ঠী কীভাবে সাহিত্যে প্রথমবারের মতো সফলতার সঙ্গে রূপান্তরিত হতে পারে— এসবই ছিল তাঁদের ওপর নির্ভরশীল। এসব সিদ্ধান্ত তাঁদেরকেই নিতে হয়েছে।

এই লেখকদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এক হলেও তাঁদের বিষয় ও নির্মাণ-কৌশলে ছিল বিস্তর দূরত্ব। শওকত ওসমান বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন আবহমান গ্রাম বাংলা— তখনকার দিনে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় বিষয়; রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-মানিক-তারাশংকর-বিভূতি সকলেই এই পথে হেঁটেছেন শিখরস্পর্শী সাফল্যের সঙ্গে; তবে শওকত ওসমানের চরিত্রগুলো ভিন্ন; তাদের আচার-আচরণ, কথা-বার্তা; স্বপ্ন-কল্পনা; বাস্তবতা ভিন্ন। আবু ইসহাকের বিষয়ও ছিল প্রধানত গ্রামীণ জীবনই। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নিলেন গ্রাম-শহর দুটোই কিন্তু ভয়াবহ বাস্তবতার প্রকট বর্ণনার চেয়ে সেখানে বেশি প্রাধান্য পেলো মনোবিশ্লেষণ। অন্যদিকে আবু রুশদ হাঁটলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং নতুন এক পথে। নতুন জন্ম নেয়া বাঙালি মুসলমান নাগরিক মধ্যবিত্ত হলো তাঁর বিষয়বস্তু। সেই সময়— মধ্যবিত্ত যখন কোনো চেহারাই পায়নি, তখন একে চরিত্র হিসেবে সাহিত্যে উপস্থাপন করা বেশ সাহসের বিষয়— আবু রুশদের সেই সাহস ছিল। রশীদ করীমও হেঁটেছেন একই পথে। সেই অর্থে আজকের যে নাগরিক মধ্যবিত্ত নিয়ে গল্প-উপন্যাস তার প্রথম সার্থক নির্মাতা এ দুজনই।

এই রচনার বিষয় চল্লিশ দশকের সাহিত্য-বিচার নয়; আবু রুশদের গল্প নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। তবে তাঁর কিংবা তাঁর সমসাময়িক যে-কোনো লেখকের বিকাশ ও প্রকৃতি জানতে হলে তৎকালীন পরিবেশটি মনে রাখা প্রয়োজন। এ জন্যই উপরোক্ত ভূমিকা।

আবু রুশদঃ তাঁর সৃষ্টি

একটু আগেই বলা হয়েছে— আবু রুশদ তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে একটু ব্যতিক্রমী পথে হেঁটেছিলেন। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'রাজধানীতে ঝড়' যখন বেরোয় (১৯৩৮ সালে) তখন তিনি ১৯ বছরের সদ্য তরুণ (জন্ম: ডিসেম্বর ২৫, ১৯১৯)। এই বয়সের একজন তরুণের রচনায় যা যা থাকা দরকার— প্রেম-বিস্ময়-আবেগ-উচ্ছ্বাস-বেদনা-সবই ছিল সেইসব গল্পে; কিন্তু এটুকু বললে বোধহয় তাঁর ওপর একটু অবিচারই করা হয়; কারণ এগুলো ছাড়াও এর ভেতরে ছিল ভিন্ন এক সম্ভাবনা। বস্তুত ওই গ্রন্থ যে ইতিপূর্বে রচিত বাঙালি মুসলমান লেখকদের রচনা থেকে বেশ খানিকটা আলাদা তা বুঝতে কারো খুব বেশি বেগ পেতে হলো না—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যি বলতে কী, ওটা আমাদেরকে 'আনোয়ারা' 'আব্দুল্লাহ'র যুগ থেকে উত্তরণের পথ দেখালো। এরপর আরও বহু রকমের কাজ করেছেন তিনি— সমান উৎসাহ ও উদ্দীপনায়— হয়েছেন একাধিক গ্রন্থের জনক। লিখেছেন উপন্যাস– 'এলোমেলো' 'সামনে নতুন দিন' 'ডোবা হলো দিঘি', 'নোঙর', 'অনিশ্চিত রাগিনী', 'স্থগিত দ্বীপ' ইত্যাদি। প্রকাশিত হয়েছে একাধিক গল্পগ্রন্থ— 'রাজধানীতে ঝড়' 'প্রথম যৌবন' 'শাড়ী বাড়ী গাড়ী' 'মহেন্দ্র ভাণ্ডার' 'দিন অমলিন' 'বিয়োগ বাবা' 'স্বনির্বাচিত গল্প' প্রভৃতি। লিখেছেন নজরুলের ওপর আলোকসঞ্চারি গ্রন্থ 'নজরুল বিচিত্রা', অসাধারণ আত্মজীবনী এবং করেছেন অসংখ্য সৃজনশীল অনুবাদ। প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। কিন্তু তাঁর শিখরস্পর্শী সাফল্য সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ধরা পড়েছে ছোটগল্পে। এই লেখায় তাঁর গল্পগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোকপাতের চেষ্টা করেছি।

গল্পপ্রসঙ্গ

অর্ধ-শতাব্দীর অধিককাল ধরে গল্প লিখেছেন আবু রুশদ। এই দীর্ঘসময়ে তাঁর পরিবর্তন ও বিকাশ এত ব্যাপক ও বিস্ময়কর যে আলোচনার সুবিধার্থে তাঁর গল্পগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেয়া প্রয়োজন। প্রথমেই আমরা ভাবতে পারি তাঁর প্রথম জীবনে রচিত গল্পগুলো নিয়ে। তারপর একটু পরিণত বয়সে তাঁর দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন নিয়েও আলোচনা হতে পারে। পরিশেষে, যে পর্যায়ে এসে তিনি সাফল্যের শিখর ছুঁয়েছেন সেটিই হতে পারে এ রচনার মূল উদ্দেশ্য।

প্রথম পর্বের গল্প

কেমন ছিল আবু রুশদের প্রথম জীবনের গল্পগুলো? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে আমরা তাঁর প্রথম দুটো গল্পগ্রন্থ 'রাজধানীতে ঝড়' (প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৮) এবং 'প্রথম যৌবন' (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮) বিবেচনায় আনতে পারি। এ দুটো গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলো তাঁর ৩০ বছর বয়সের মধ্যে লেখা— এবং এগুলো তাঁর প্রথম যৌবনের রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

প্রথম গ্রন্থের নামগল্প 'রাজধানীতে ঝড়'-এর কথাই ধরা যাক। গল্পের নায়ক 'আকবর' 'দিল্লী'তে এসেছে আইসিএস পরীক্ষা দেয়ার জন্য। গল্পের প্রথম বাক্যই— অন্তত তখনকার পাঠকদের জন্য— কৌতূহলোদ্দীপক। প্রথমত, গল্পের নায়ক বাঙালি মুসলমান; দ্বিতীয়ত, এসেছে রাজধানীতে আইসিএস পরীক্ষা দিতে। অর্থাৎ এ হচ্ছে নাগরিক মধ্যবিত্তের গল্প। সেই মধ্যবিত্ত যে কী না সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে সরকারি আমলা হওয়ার স্বপ্ন দ্যাখে! তো সেই শহরে সে একা; দ্রষ্টব্য সবকিছু দেখে নেয়ার আকাঙ্ক্ষায় বাইরে বেরুলে ঝড়ের কবলে পড়ে এবং শহরের অচেনা রাস্তায় দেখা হয়ে যায় বন্ধু রহিমের সঙ্গে, যদিও বন্ধুর সঙ্গে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে যাওয়ার অনুরোধ সে উপেক্ষা করে। তবে দ্বিতীয়বার বন্ধু তাকে ছাড়ে না— নিয়ে যায় বাসায়। সেখানে রহিমের বোন ফিরোজার উপস্থিতি হয়তো পাঠককে বুঝিয়ে দেয়, ঘটনা কোনদিকে গড়াবে। এ হয়তো নিছক প্রেমের গল্প; ১৮/১৯ বছরের একজন তরুণের গল্পে এর উপস্থিতি অস্বাভাবিক নয়; গল্পে অনেক অসামঞ্জস্যও আছে (যেমন : রহিম কর্তৃক দ্বিতীয়বার ঐ বিশাল শহরে আকবরকে খুঁজে পাওয়া; প্রায় অবাস্তব), তবু গল্পটিকে ওই সময়ের প্রেক্ষিতে দেখে নিলে এর একটি ঐতিহাসিক মূল্যও খুঁজে পাওয়া যাবে। গল্পের চরিত্রগুলো সদ্য জন্ম নেয়া বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত— তাদের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ও জীবনাচরণ। এরকম আরেকটি গল্প 'অভাবনীয়'। ফুপুর বাড়িতে বেড়াতে এসে ফুপাত বোন নাজমার প্রেমে পড়ে মুজিবুল। কয়েকটি দিন কাটে উচ্ছলতায়, বিহ্বল উত্তেজনায়, আনন্দে, উচ্ছ্বাসে। নাজমার স্বতঃস্ফূর্ত প্রগলভতা, হাসি-আনন্দ মজিবুলের ভেতরে শিহরণ জাগায়। কলকাতায় ফিরে আসে তারা কিছুদিন পর; অতঃপর গল্পের শেষে দেখা যায়— নাজমার বিয়ে ঠিক হয়েছে অন্য এক যুবকের সঙ্গে। করুণ রসের প্রেমের গল্প— হয়তো আজকের দিনের পাঠকের কাছে 'গল্প' হিসেবে এর আবেদন সামান্যই। কিন্তু আমরা আবারও এটিকে সময়ের প্রেক্ষিতে ফেলে বিবেচনা করতে পারি। আজ থেকে ৫০/৫৫ বছর আগে খুলনার মতো একটি মফস্বল শহরের মেয়ে নাজমা— 'মোটর নিজেই চালিয়ে নিয়ে যায়। আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে বিপরীত দিক হতে ছুটে আসা মিলিটারি লরী ও রাস্তার নির্বিকার জনতা এড়িয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যায় সে ক্ষিপ্রগতিতে।' অস্বাভাবিক লাগে হয়তো এই বর্ণনা। এই একুশ শতকেও, এই রাজধানীতেও, যখন দৃশ্যটি খুব সুলভ নয়— মেয়েরা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে আর রাস্তার জনতা তাতে নির্বিকার— তখন পঞ্চাশ বছর আগে মফস্বল শহরে তা কল্পনা করা আয়াসসাধ্য কাজ। দৃশ্যটি অস্বাভাবিক লাগলেও আমরা তো ভেবে নিতে পারি— লেখক এই শ্রেণীটিকে এভাবেই কল্পনা করতে ভালোবেসেছেন!

প্রথমদিকের গল্পগুলোতে আবু রুশদের চরিত্র-চিত্রণের প্রবণতাটি কৌতূহল জাগায়। তাঁর নায়িকারা প্রায় সবাই উচ্চশিক্ষিত, স্মার্ট, আধুনিক, আত্মসচেতন, সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা তরুণী। 'মেঘাবৃত চাঁদের' মালেকা দাম্পত্য জীবনে অসুখী, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে অভিনয়ে পটু এবং এসব বিষয়ে সে সচেতন। যা করছে ভেবেচিন্তেই করছে সে। ঘটনাক্রমে পূর্ব প্রেমিকের আগমন ঘটলে তার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেও দ্বিধা করে না। 'রাজধানীতে ঝড়'-এর ফিরোজাও কলেজ পড়ুয়া-ছটফটে, সংকোচহীন তরুণী। অনায়াসে প্রেমার্থীর সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারে, গল্পে-তর্কে (সে তর্কে এমনকি আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গও স্থান পায়) মাতিয়ে তুলতে পারে; যেমন পারে 'অভাবনীয়'র নায়িকা নাজমা। অতি সহজে গাড়ি চালিয়ে সিনেমায় যাওয়া তার জন্য কোনো ঘটনাই নয়! 'নবমেঘভার'-এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুলসুম— 'ইঞ্জিনিয়ারের একমাত্র মেয়ে' হয়েও কবিতা ভালোবাসে, অহরহ অবিবাহিত তরুণ নায়ক শাহেদের বাসায় যাওয়া-আসা করে। এই গল্পে অবশ্য নায়িকা সে একা নয় বরং প্রচ্ছন্নে আরও অনেকেই এবং সবার পরিচয়— শাহেদের 'মেয়ে বন্ধু' হিসেবে—

> 'প্রায় সব সম্প্রদায়েই তার মেয়ে বন্ধু আছে। শাহেদের বাসায় তারা ঘনঘন যাওয়া-আসা করে। কোনরকম সংকোচ নেই ...কোন রকম দ্বিধাও নেই। আসে, বসে, গল্পগুজব করে, নিজেরাই চা তৈরি করে এবং দরকার মনে করলে শাহেদকে এক কাপ বাড়িয়ে দেয়। কেউ কেউ বা তার ঘর গুছিয়ে যায়। কেউ বা সিনেমার টিকিট করতে বলে, দু'একজন 'ফার্পো' পর্যন্ত প্রস্তাব তোলে।'

অস্বাভাবিক লাগে হয়তো। তখনকার মুসলমান সমাজ কি তরুণ-তরুণীর এতটা সহজ সম্পর্ক অনুমোদন করতো? শুধু নারী চরিত্র কেন, আমরা দেখতে পারি তাঁর নায়কদেরকেও। তারা সকলেই মোটামুটি উচ্চ-শিক্ষিত, কোলকাতাবাসী, চাকরিজীবী, উচ্ছল, স্মার্ট, আধুনিক, প্রাণবন্ত তরুণ। যে সময়টিতে এসব গল্প রচিত হয়েছিল তখন নিশ্চয়ই মুসলমান মধ্যবিত্তের গড়পরতা চেহারা এমন ছিল না! হয়তো শুধু চরিত্র বিশ্লেষণ করে একটি গল্পের সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ণয় করা অনুচিত; আমরা তা করতেও চাই না; এমনকি এসব গল্পের বিস্তৃত আলোচনায়ও আমরা যাচ্ছি না। মোটামুটিভাবে সরল প্রেমের এসব গল্প খুব বেশি উল্লেখযোগ্যতার দাবি না রাখলেও এগুলোর গুরুত্ব হচ্ছে— এসব গল্পের চরিত্র নির্মাণে লেখকের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার জগৎটি ধরা পড়েছে। তখনকার তরুণ লেখক আবু রুশদ হয়তো বাঙালি মুসলমান নাগরিক মধ্যবিত্তকে এই রূপেই দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রথম-পর্বের গল্পে স্বাভাবিকভাবেই ঘুরে-ফিরে এসেছে প্রেম। কিন্তু অন্য ধরনের গল্পও যে নেই, তা নয়। 'পূর্ণিমা রাতের স্মৃতি' 'হতভাগ্য' 'ভয়' 'দাদী আম্মা' ইত্যাদি একটু ভিন্ন স্বাদের গল্প। এ পর্বের অন্তত দুটো গল্পের কথা একটু বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার— 'হতভাগ্য' ও 'প্রথম যৌবন'। একজন শক্তিশালী লেখকের ছায়া পড়েছে এ দুটো গল্পে। প্রথমটিতে একটি আত্মীয়-পরিজনহীন কিশোরের দুর্ভাগ্যের কাহিনী— অসামান্য মমতা ও কুশলতায় নির্মিত; দ্বিতীয়টিতে বয়ঃসন্ধিকালের অদ্ভুত আচরণ— উন্মত্ত, উচ্ছল, চঞ্চল, দুষ্ট এক কিশোর হঠাৎ এক কিশোরীর কটাক্ষ চাউনিতে বদলে গিয়ে বই-পড়ুয়ায় পরিণত হয়; মেয়েটি চলে গেলে আবার পূর্ব রূপ ফিরে পায়— অসাধারণ ও নিপুণ দক্ষতায় এসব ছবি আঁকা হয়েছে।

এই গল্পগুলোর ঘটনা বা কাহিনীতে জটিলতা নেই; মিষ্টি ও কমিউনিকেটিভ ভাষায় গল্পগুলো রচিত— পাঠককে যা সহজেই আকর্ষণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিণত বয়স ও গল্পের পরিবর্তন

ওপরে বলা হয়েছে, প্রথম পর্বের গল্পগুলো তাঁর ৩০ বছর বয়সের মধ্যে রচিত। একজন লেখক হয়তো এই সময়ের মধ্যেই তাঁর মত ও পথ খুঁজে পান। আবু রুশদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার গল্পও হয়েছে পরিণত; সহজ-সরল প্রেমের গল্পের বদলে এ সময়ে তাঁর গল্পে আসে গভীরতর বোধ ও ভাবনা। বদলে যায় আঙ্গিক ও নির্মাণ কৌশল। শেষ-পর্যন্ত তিনি যে শীর্ষছোঁয়া সাফল্য পাবেন সেই প্রমাণ অবশ্য প্রথম পর্বের দু-একটি গল্পে আগেভাগেই রেখেছিলেন; এই সময় এসে সেটি আরও নিশ্চিত হয়। এই সময় তিনি নজর দেন দাম্পত্য সম্পর্কের গভীরে প্রোথিত অবিশ্বাস-দ্বন্দ্ব ও জটিলতার ওপর; কিছু গল্পে আবার মানব-জীবনে সাফল্য-ব্যর্থতা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বোধ তীব্রভাবে ধরা পড়ে— পাঠককে যা ভাবায়।

প্রথম গ্রন্থের 'মেঘাবৃত চাঁদ' গল্পে দাম্পত্য জীবনের যে জটিলতার দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন, পরবর্তীকালে 'হারজিৎ' 'পলাশ গাছে সাপ' 'ছেদ' 'যোগবিয়োগ' ইত্যাদি গল্পে তার চূড়ান্ত রূপ ধরা পড়ে। অন্যদিকে 'দাহন' 'শাড়ী বাড়ী গাড়ী' প্রভৃতি গল্প তাঁর ব্যতিক্রমী গল্পের নিদর্শন হয়ে আরও বহুদিন বেঁচে থাকবে। উপরোক্ত গল্পগুলো 'শাড়ী বাড়ী গাড়ী' গ্রন্থের। এটি তাঁর তৃতীয় গল্পগ্রন্থ। প্রথম ও দ্বিতীয়টির পর ১৫/২০ বছরে রচিত গল্পগুলো স্থান পেয়েছে এতে।

এসব নিয়ে বলার আগে আমরা 'মেঘাবৃত চাঁদ' গল্পটি একবার ফিরে দেখতে পারি। — 'মালেকা যতই খুশী হবার ভান করুক, এটা সে অনেকদিন থেকেই বুঝেছে যে সে অসুখী।'— গল্পের প্রথম পংক্তিই দাম্পত্য জীবনের ভানস্বর্বস্ব সুখের দিকে এক তীব্র অঙ্গুলি নির্দেশ। দীর্ঘদিন পাশাপাশি থেকেও মালেকা এবং রউফ পরস্পর থেকে দূরে রয়ে যায়, বিচ্ছিন্ন থেকে যায়— এবং অদ্ভুত বিষয়— দুজনেই সেটি খুব ভালো করে বোঝে-জানে। নিজেরটি জানে যেমন, বোঝে অপরের মনোভাবও। তবু এতসব বিচ্ছিন্নতা নিয়েও অনিবার্য নিয়তির মতো সংসার-যাপন করে যায় তারা। অবশেষে দেখা যায়, একজন তৃতীয় পুরুষের অস্তিত্বই তাদের ভেতরে এই অনতিক্রম্য দূরত্বের জন্য দায়ী। একে নিছক ত্রিভুজ প্রেমের গল্প বললে ভুল হবে— হয়তো গল্পের পরিণতির জন্য তৃতীয় চরিত্রটির প্রয়োজন বোধ করেছিলেন লেখক কিন্তু গল্পের প্রধান বিষয় সেটি নয়; বরং একই ঘরে জীবন-যাপন করেও একটি সুনির্দিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও যে দুজন মানুষের ভেতরে অনতিক্রম্য দূরত্ব থেকে যায়— এ তারই বর্ণনা।

এত তীব্রভাবে না হলেও এই ফাঁক ও ফাঁকি দেখা যায় 'প্রত্যাখ্যান' গল্পেও। ইউনুস তার স্ত্রীর সঙ্গে বসে প্রেমের ছবি দেখছে, প্রেমের গান শুনছে কিন্তু— 'যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীব্র দাহন ও সুধা তাতে (প্রেমে) থাকে বলে শুনেছে নিজের অন্তরের মোচড় খেয়ে ইউনুস তা কখনও অনুভব করেনি।' অর্থাৎ তার জীবনে প্রেম নেই। স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম হয় না— প্রেমের অভিনয় হয় শুধু, এ তার বিশ্বাস। বরং সে মরে গেলে বউ তারই গাড়িতে চড়ে, তারই খাটে শুয়ে অন্য পুরুষ নিয়ে 'মওজ' করবে— এই হচ্ছে স্ত্রী সম্বন্ধে তার ধারণা। অথচ আপাতদৃষ্টিতে সে সুখী! এই আপাত সুখের আড়ালে লুকিয়ে থাকে যে অবিশ্বাসের কীট, ঘৃণা ও বেদনা, লেখক তাকে ছিঁড়ে-খুড়ে বের করে আনেন। পারস্পরিক সম্পর্কের ভেতর এইসব সন্দেহ, অবিশ্বাস, ঘৃণা আরও প্রখর হয়ে ধরা পড়ে 'হারজিৎ' গল্পে। কাজের মেয়েকে গর্ভবতী করা শাহেদ অবশ্য ভান জানে না, ব্যাপারটা সরাসরিই জানায় স্ত্রী মনিরুন্নেসাকে। স্বামীর ফষ্টিনষ্টির কথা কিছুটা জানা থাকলেও কাজের মেয়ের সঙ্গে এই কুকর্ম কিছুতেই মানতে পারে না সে। অনেকটা প্রতিশোধ স্পৃহায় সন্তানের গৃহশিক্ষকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে সে এবং— আরও আশ্চর্য— স্বামীকে জানাতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। বিনিময়ে তাকে শুনতে হয় আরও কঠিন তথ্য— শাহেদ তার শালী অর্থাৎ মনিরুন্নেসার বোনকেও ছেড়ে দেয়নি! এ কোন ধরনের দাম্পত্য সম্পর্ক? দাম্পত্য মানেই যেন সন্দেহ, অবিশ্বাস, লাম্পট্য, প্রতারণা। তবে কি শুভ সম্পর্ক বলে কিছু নেই? আবু রুশদ এই পর্যায়ে এসে পায় নিস্পৃহ-নির্বিকারভাবে সকল শুভ সম্পর্কের ওপর বাজ ফেলেছেন; আপাত সুখী-সামাজিক মানুষের ভেতর থেকে বের করে এনেছেন ক্রুর সাপ। যে আবু রুশদের দেখা আমরা তাঁর প্রথম দিকের গল্পে পাই, এখানে তিনি তা নন; সহজ-সরল গল্প আর বলেন না তিনি; মিষ্টি ভাষায় মিলনাত্মক কাহিনী আর তাঁর নয় এখন— বরং নির্মোহ-নিরাসক্ত তিনি এখন মানুষের সকল ভণ্ডামি-বদমাশি-প্রতারণার ছবি আঁকার নিপুণ শিল্পী। মূলত এই পরিবর্তনই আবু রুশদের বৈশিষ্ট্য; পরবর্তীকালে যা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে।

সাফল্যের শিখর-ছোঁয়া গল্প

আগেই বলার চেষ্টা করেছি— আবু রুশদের অর্ধ-শতাব্দীর গল্প-চর্চাকালে তাঁর পরিবর্তন ও বিকাশটি ব্যাপক ও বিস্ময়কর। তাঁর গল্পে ধারাবাহিক পাঠ যে-কোনো পাঠককে বলে দেবে— তিনি সময়ের সঙ্গে হেঁটেছেন সর্বদা, তাঁর রচনা সব-সময়ই একজন তরুণের মতো বৈচিত্র্যপিয়াসী ও সমসাময়িক। তাঁর বিষয় নির্বাচন, ভাষা ও নির্মাণ-শৈলী সবকিছুর মধ্যে রয়েছে বদলে যাওয়া সময়ের চিহ্ন; সমসাময়িকতা ও তারুণ্যের উজ্জ্বল উদাহরণ। নির্দিষ্ট গণ্ডিতে নিজেকে বন্দি করেননি কখনো; ক্রমাগত বদলে ফেলেছেন নিজেরই কণ্ঠস্বর; চল্লিশ দশকের মিষ্টি প্রেমের গল্প-বলা আবু রুশদকে এখন আর চেনাই যায় না। এখন তিনি মানব-স্বভাব, মানব-জীবন, দেশ ও জাতির ধ্রুপদী চিত্রকর; তাঁর কলমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনায়াসসাধ্য দক্ষতায় মূর্ত হয়ে ওঠে মানুষের সকল সম্ভাবনা ও স্বপ্ন ও প্রত্যাশা ও বেদনা ও হাহাকার ও হারিয়ে ফেলার গল্প।

যে গল্পগুলো সম্বন্ধে এসব কথার অবতারণা সেগুলোর প্রায় সবই তাঁর ৫০ থেকে ৬০ বছর বয়সকালের মধ্যে লেখা— যে বয়সটিতে মানুষ জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে তার নিজস্ব দার্শনিক উপলব্ধির চূড়ান্তে পৌঁছেন। আবু রুশদের এসব গল্পে তা-ই দেখা যাবে। কিন্তু শুধু দার্শনিক উপলব্ধিই নয়— গল্পের আখ্যানপর্ব, নির্মাণ-কৌশল, প্রতীকময়তা, রূপকল্প সবই একজন অত্যন্ত শক্তিমান লেখককে তুলে ধরবে। 'পিথাগোরাস' 'রদবদল' 'খালাস' 'বেড়া' 'ছিনতাই' 'বিকল্প বেহেস্ত' 'পাবনা-রাজশাহী এক্সপ্রেস' এই ধরনের গল্প। এর মধ্যে 'বেড়া' এবং 'পাবনা-রাজশাহী এক্সপ্রেস' আবার বিশেষ উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে। 'বিকল্প বেহেস্ত' 'ছিনতাই' 'রদবদল' গল্পগুলো সামান্যের মধ্যে অসামান্যের আভাস দেয়। 'খালাস' মুক্তিযুদ্ধের অনবদ্য চিত্রায়ণ। আমরা একটু বিস্তৃতভাবে গল্পগুলোকে বিবেচনা করে দেখতে পারি।

১

ধরা যাক 'বিকল্প বেহেস্ত' গল্পটির কথা। 'নুরানী চেহারা'র মওলানা শুকুর সাহেব ষাটোর্ধ্ব বয়সেও 'জোয়ানীর তাকত' ধরে রেখেছেন। তার 'বেগম কিন্তু পঞ্চাশ বছর বয়সে চুমসিয়ে গেছেন, কোনো খায়েশ জাগাতে পারেন না। আর পঁয়ত্রিশ বছর ধরে একই পাত্রে বীর্য রাখলে কোন পাত্রকেই আর তত মনোলোভা ঠেকে না।' অতএব মওলানা শুকুর সাহেবকে নতুন 'মনোলোভা পাত্র' খুঁজে নিতে হয়— এক দেহোপজীবীনি। মওলানা সাহেব সবিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র— 'ভক্ত ও মুরীদের সংখ্যাও কম নয়।'—'সাংসারিক ও জাগতিক জ্ঞান' তার 'প্রখর' হলেও মানুষের কাছে থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি-নজরানা পেতে অসুবিধা হয় না। তো এহেন শ্রদ্ধাভাজন মওলানার প্রকৃত স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে ঐ মেয়েটির কাছে। গোপনে লুকিয়ে তিনি তার 'তাকত' প্রদর্শন করেন মেয়েটির কাছে। মেয়েটিও বিস্মিত— 'এই বয়সে এতটা শক্তি আসে কোত্থেকে?' দুই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরিত্র ও অবয়ব নিয়ে শুকুর সাহেব সমান্তরাল জীবন-যাপন করে যান। গল্পের শেষে মেয়েটির বুকেই তার মৃত্যু হয়। কিন্তু—

> 'পরেরদিন ঢাকার প্রত্যেক দৈনিকে খবরটা বেরোয়; মওলানা আবদুস শুকুর সাহেব গতদিন দ্বিপ্রহরে নিজের কায়েৎটুলির বাসভবনে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে...রাজেউন)। গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়াই তাঁহাকে একটু পরিশ্রান্ত লক্ষ করা যাইতেছিল। গতকাল জোহরের নামাজের পরে এবাদৎ করিবার সময় মওলানা সাহেবের শরীর হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ে কিন্তু ডাক্তার আসিবার আগেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিনি এন্তেকাল করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

...এমন ধর্মভীরু ও নিষ্কাম ব্যক্তি আজকাল আর সচরাচর দেখা যায় না।'
(বিকল্প বেহেস্ত/ স্বনির্বাচিত গল্প)

যে দ্বৈতজীবন শুকুর সাহেব যাপন করেছেন, মৃত্যুতেও তারই ছায়া। মৃত্যুসংবাদে 'জোহরের নামাজের পর এবাদৎ করার সময়' তো ডাহা মিথ্যে কথা। ঐ সময় তিনি ছিলেন মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গমরত। তিনি ছিলেন এক, মানুষ জানলো আরেক। কোনটা তার জন্য কিংবা মানুষের জন্য সত্য? গল্পে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। হয়তো উত্তরের প্রয়োজনও নেই; হয়তো মানুষের এই দ্বৈতচরিত্রই— যদিও তা পরস্পর-বিরোধী ও বিপরীতধর্ম— সত্য ও স্বাভাবিক। এই গল্পে লেখক নির্মোহ-নিস্পৃহতায় মওলানা সাহেবের চরিত্র এঁকেছেন— তার দ্বান্দ্বিক দ্বৈতচরিত্র চিত্রায়ণের জন্য নিজ ঘরে যেমন, তেমনই মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গম-দৃশ্যের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। গল্পটি পাঠককে ভাবায়— কেন আপাত দৃষ্টিতে সৎ, নিষ্কাম, ধার্মিক একজন মানুষকে লেখক অন্য একটি রূপে পরিচিত করালেন? আবারও সেই প্রশ্নটি মনে আসে— তিনি কি সকল শুভবোধের ওপর নিরাসক্ত সন্তের মতো বাজ ফেলেই যাবেন?

২

এই দ্বৈত চরিত্রের দেখা মেলে 'খালাস' গল্পেও। মুক্তিযুদ্ধের এক প্রামাণ্য গল্প এটি। গল্পের নায়ক বরকত পাকিস্তানি এক কর্নেলকে 'মদ ও মাগী' সরবরাহ করে। নিজেও সে মদ্যপ ও জুয়ারি; বন্ধু নিখোঁজ হলে বন্ধুস্ত্রীর মর্মভেদী আবেদনেও সাড়া দেয় না সে; বরং 'দুঃখ যখন পরিচিতা ও এক শ্রীময়ী হয়ে দেখা দেয়, যদিও তার নাভি ব্লাউজের তলায় দৃশ্যমান, মনকে কেমন নাড়া দেয়।'— এই নাড়া দেয়ার চেয়ে বন্ধুস্ত্রীর 'ব্লাউজের তলায় নাভি'টিই তার কাছে অধিক আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বকসীবাজারের তালগোল পাকানো দুটা বিভৎস মৃতদেহ দেখেও মনে 'তেমন কোন অনুভূতি' জাগে না তার। নিজের শয্যাসঙ্গিনী প্রেমিকাকে পটিয়ে কর্নেলের কাছে পাঠিয়ে বিনিময়ে একটা 'কন্ট্রাকট যোগাড়ের' ধান্ধা করে। এইরকম ভয়াবহ নেতিবাচক একটি চরিত্র কিন্তু পাকিস্তানিদের খুব ভালো চোখে দেখে না। কর্নেল সম্বন্ধে তার ধারণা— 'বাহনচোদ এক নম্বরের হারামি।' এক সময় বরকত তার কৈশোরকালের স্মৃতিবাহী 'শাহানা আপা'র একটি চিঠি পায়— সাহায্যের জন্য। কৌতূহলবশত সে দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। যাওয়ার পথে নিরালা জনপদ, পুড়ে ছারখার হয়ে যাওয়া বাড়িঘর, আতংকগ্রস্ত মানুষ, রাজাকারদের উল্লাস, পাকিস্তানিদের নির্মম নিপীড়নের নানা নিদর্শন দেখতে দেখতে তার বোধোদয় ঘটে, গভীর গ্লানিতে ভরে ওঠে মন, নিজেকে চরমভাবে অপদস্থ মনে হয়। এই তাহলে আমাদের সম্পর্কে 'ভাইয়া'দের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারণা? 'কী ভ্রমের ফাঁদেই না আমরা নিজেদের গত পঁচিশ বছর ধরে ধরা দিয়েছি! হারামির থুতনিটা যদি থেতলে দেয়া যেত।' অবশেষে বরকত শাহানা আপার কাছে পৌঁছলেও তিনি তাকে দেখা দিতে চান না। কৌতূহলী বরকতকে তবু নাছোড়বান্দা দেখে তিনি যা করেন— বরকতের জন্য তো বটেই, পাঠকের জন্যও তা এক বিরাট আঘাত হিসেবে কাজ করে। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে তিনি বরকতকে ঘরে ডাকেন, তারপর উন্মাদের মতো— 'দেখ, চোখ ভরে দেখ। মিলিটারী পেট কেমন করেছে, খতিয়ে খতিয়ে দেখ। তারপর ফিরে গিয়ে রসিয়ে রসিয়ে গল্প করিস।' বিমূঢ়, কাতর, পরাজিত দৃষ্টিতে বরকত শাহানা আপার দিকে চেয়ে থাকে। এই পরিস্থিতি বরকতকে হয়তো বদলে দেয়। একজন নেতিবাচক মানুষের চোখে মুক্তিযুদ্ধ তখন হয়ে ওঠে অন্যরকম। সে পরাজিত বোধ করে— এই বোধ তার নিজের কাছেই হয়তো নিজের কৃতকর্মের জন্যই। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কি এমনই নয়? নেতিবাচক মানুষকেও যা কাতর, বিমূঢ় ও অনুতাপদগ্ধ করে তুলতে পারে?

৩

এরকম আরেকটি গল্প 'বেড়া'। এই গল্পটি যতটা না আখ্যানের জন্য তারচেয়ে বেশি এর নির্মাণ-কৌশলের জন্য বহুদিন পাঠকের কাছে আদরণীয় হয়ে থাকবে। এরকম আঙ্গিকের গল্প বাংলা সাহিত্যে আর একটিও আছে কী-না জানি না। গল্পের প্রথম বাক্য— 'কায়সার হঠাৎ মাটিতে ঢলে পড়ে মারা গেলো।' খ্যাতিমান ডাক্তার কায়সার এরপর প্রবেশ করে অন্য এক জগতে— আর মৃত্যু-পরবর্তী এ জগৎটিই তার প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরে। ওই জগতে প্রথমেই তার 'দেখা' হয় তারই এক রোগীর সঙ্গে যে রোগগ্রস্ত হয়ে তার কাছে এসেছিল, কিন্তু ফি দিতে পারেনি বলে চিকিৎসা পায়নি। মৃত্যুপথযাত্রী জেনেও তার যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করেনি কায়সার। 'মহৎ পরোপকারী' ডাক্তার কায়সারের ইমেজটি প্রথম ধাক্কাতেই এভাবে ভেঙে পড়ে। ওই রোগীর কাছ থেকেই সে জানতে পারে অনেক তথ্য— তার স্ত্রীর ফষ্টিনষ্টির স্বভাব ইত্যাদি। অতঃপর তার 'দেখা' হয় একটি মেয়ের সঙ্গে— যে তাকে ভালোবেসেছিল; কিন্তু টাকার লোভে কায়সার বিয়ে করেছিল অন্য আরেকজনকে। জানা গেল, সেই স্ত্রীর সঙ্গেও সে প্রতারণা করেছিল। 'ভালো মানুষ' কায়সারের লোভী-প্রতারক চরিত্রটিও এবার পরিষ্কার হলো। এভাবে সে ওই মৃত্যুপরবর্তী জগতে বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় আর তার বহুমাত্রিক চরিত্র পরিষ্কার হয়ে ওঠে। আশ্চর্য কোনো এক উপায়ে নিজ কন্যাকে দেখার সুযোগ পেলে— কন্যার ডায়েরির পাতা পড়ার সুযোগ পায় সে এবং বেদনাহত হয়ে লক্ষ করে— আদর্শ ও মহত্বের মডেল হিসেবে কন্যার কাছে নির্বাচিত হয়েও তার প্রতারণা ও শঠতা ধরা পড়ে গেছে। দুর্বিসহ এই জগৎ তাকে পাগল করে দেয়— প্রতি মুহূর্তে নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে তাকে, নিজেরই যাবতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে— কতক্ষণই বা এসব সহ্য হয়? পালানোর জন্য সে ছুটতে থাকে এবং ছুটতে ছুটতেই সে দেখতে পায়—

> 'সামনে একটা রূপালী বেড়ার উপর সৌম্যদর্শন এক প্রৌঢ় চুপ করে বসে আছে। তার পেছনেই বিরাট এক উঁচু প্রাচীর। পরিষ্কার আলোতে সোনালী হর্ষে এক গ্রহাতীত দ্যুতি ছড়াচ্ছে। সেই উঁচু প্রাচীর ছাড়িয়ে ধবল শুভ্রতায় এক বিশাল গম্বুজ নীল আসমানকে তসলিম জানাচ্ছে। আর কিছু দেখা যায় না, অথচ নিশ্চিত প্রত্যয়ের মত মনে হয়— বেড়ার ওপারে আলাদা এক জগৎ
> – আমাকে একটু বেড়া পার হতে দাও।
> – সময় হলে পেরুবে।
> – এখন যে অবস্থায় আছি মনে হয় তার চেয়ে মওতও ভাল।
> – তুমি কি মনে করো তুমি বেঁচে আছ?
> – বেঁচে নেই! তবে আছি কোথায়? যেখানে আছি তারচেয়ে তো দোজখও ভাল।
> – তুমি কি মনে করো তুমি অন্য কোথাও আছ?

গল্প এখানেই শেষ হয়ে যায়। আর পাঠকরা বিমূঢ় বিস্ময়ে আবিষ্কার করেন— এরকম অনন্যসাধারণ গল্প পাঠের অভিজ্ঞতা তাদের নেই বলতে গেলে।

৪

জীবন এরকমই নাকি? মানুষ ও পৃথিবী ও জীবন এইরকম বীভৎস, ভয়াবহ, হতাশাব্যঞ্জক নাকি যেখান থেকে সকল শুভবোধ অন্তর্হিত হয়ে গেছে? যেখানে শুদ্ধ মানুষ বলতে কিছু নেই, আপাত ভালোমানুষির আড়ালে আছে লাম্পট্য ও প্রতারণা? পৃথিবীর সকল সুন্দর কি হিংস্রতার দ্বারা ছিনতাই হয়ে গেল নাকি— যেমনটি আমরা পাই 'ছিনতাই' গল্পে? এ গল্পে উত্তেজিত জনতা ছিনতাইকারীদের ধাওয়া করতে গিয়ে ভুল এক যুবককে টার্গেট করে। এই যুবকের হাতেও ছিল ছিনতাইকৃত ব্রিফকেসের মত একটি ব্রিফকেস। যুবক যখন টের পায় বিক্ষিপ্ত-উত্তেজিত-মারমুখী জনতা তার দিকে ধেয়ে আসছে, ভয় পেয়ে সে দৌড় দেয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না, ধরা পড়ে গণপিটুনিতে নিহত হয়— তার করুণ আকুতি জনতা কৌতুকের সঙ্গে গ্রহণ করে, যেন বেঁচে থাকার সকল আকাঙ্ক্ষা ও আকুতি আজ কৌতূককর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যুবকের মৃত্যুর পর জনতা ব্রিফকেসটি ছিঁড়ে ফেললে বেরিয়ে পড়ে একটি মেয়ের প্রতিকৃতি। যুবকের প্রেম। জনতা ভুল বুঝতে পারে কিন্তু তা তাদেরকে আদৌ স্পর্শ করে না। বরং যে লোকটি যুবকের 'বিচি' ছিঁড়ে ফেলেছিল আর যুবক তার কাছে করুণ মিনতি জানিয়েছিল ছেড়ে দেয়ার জন্য; সেই লোকের কৌতূককর বর্ণনা জনতাকে হয়তো আনন্দই দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশেষে দেখা যায় 'যুবকের মগজের কিছুটা নাসিমার দুমড়ানো প্রতিকৃতির সঙ্গে সহ-অস্তিত্ব পেয়েছে।' জীবন কি এইরকম বীভৎস? সমস্ত মমতা, ভালোবাসা, সহানুভূতি কি ছিনতাই হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে?

আবু রুশদ কি জীবনকে এভাবেই দেখতে চান? এরকম কোনো সরল সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো হয়তো সমীচীন হবে না। আমরা তো 'দাহন' গল্পটিকেও বিবেচনায় আনতে পারি! এ গল্পে আমরা পরিচিত হই সহপাঠী দুই বন্ধুর সঙ্গে— এই শেষ বয়সে একজন মন্ত্রী, অন্যজন মফস্বলের এক কলেজের অধ্যাপক। রেলস্টেশনে দুজনকেই বিদায় দিতে এসেছে তাঁদের শুভার্থীরা। একজন ফিরছেন রাজধানীতে; অন্যজন বদলি হয়ে যাচ্ছেন অন্যত্র। কিন্তু মন্ত্রীর জন্য যারা এসেছেন তারা সকলেই ধান্দাবাজ, কোনো-না-কোনো মতলবে তারা মন্ত্রী ও তার স্ত্রীকে খুশি করতে তৎপর। স্থূল, স্বার্থপর, মতলববাজ কতগুলো মানুষের খপ্পরে বন্দি মন্ত্রীসাহেব। অন্যদিকে তাঁর অধ্যাপক বন্ধুকে বিদায় দিতে এসেছে গুটিকয়েক ছাত্র। বিদায়-মুহূর্তে মন্ত্রীর শুভার্থীদের মুখে বিদায় সম্ভাষণ আর অধ্যাপকের ছাত্রদের 'চোখের কোণে সজল ঝিকিমিকি।' বৈষয়িক সাফল্যের শিখরে উঠেছেন মন্ত্রীসাহেব, কিন্তু এই একটি বিষয়ে অধ্যাপকের কাছে অন্যভাবে পরাজয় ঘটে তাঁর। বিদায় সম্ভাষণ শুনে— তাদের সম্মিলিত গলার স্বর 'রহমান সাহেবের কানে বড় ফাঁপা, বড় কৃত্রিম মনে হয়। আবেগ নাই, প্রাণ নাই।' অন্যদিকে অধ্যাপকের ছাত্রদের চোখে জল, সেখানে কোনো কৃত্রিমতা নেই, ভান নেই— আছে নিখাদ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

যদিও মন্ত্রী সাহেবের সাফল্য ও ক্ষমতা লোভনীয় বিষয়; তবু এই গল্পে যেন অধ্যাপকের প্রতি ছাত্রদের ঐ অকৃত্রিম ভালোবাসাটিই অধিক কাম্য ও প্রিয় হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে— এমনকি ওই মন্ত্রীর কাছেও। এ-রকমই তো হওয়ার কথা। জীবন ও পৃথিবী শুধু নেতিবাচক ঘটনার সমাহার হবে কেন? অকৃত্রিম-ভানহীন-নিখাদ ভালোবাসাও তো এই জীবন ও পৃথিবীরই সম্পদ!

জীবন আসলে এরকমই। ইতি ও নেতি এখানে পাশাপাশি চলে। আবু রুশদ তার অধিকাংশ গল্পে আসলে এটিই দেখিয়েছেন। নিরেট সত্য ও সততা বলতে যেমন কিছু নেই— তার অন্তরালে থাকে লাম্পট্য ও প্রতারণা, তিনি আসলে তা-ই আবিষ্কার করেছেন। পাশাপাশি ইতিবাচক সমস্তকিছুর প্রতি দেখিয়েছেন পক্ষপাত— 'দাহন' গল্পে যেমন; কিংবা 'শাড়ী বাড়ী গাড়ী' গল্পেও।

পৃথিবীর জীবন আসলে এক সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ। এই ভ্রমণে সকল শ্রেণীর, সমস্ত সম্ভাবনার মানুষ তাদের সমস্ত ইতি ও নেতি নিয়ে, সমস্ত ভালো ও মন্দ নিয়ে অংশগ্রহণ করছে। ভ্রমণটিকে করে তুলছে বিচিত্র, বহুমাত্রিক ও আকর্ষণীয়। 'পাবনা-রাজশাহী এক্সপ্রেস' গল্পে তার এক চমৎকার ও অভিনব বিবরণ পাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা। আর এই বর্ণনা তিনি করেন নির্মোহ সন্তের মতো নিরাসক্তি নিয়ে, নিস্পৃহভাবে।

আবু রুশদের গল্প নিয়ে এত স্বল্প পরিসরে বলে শেষ করা যাবে না; সে চেষ্টাই আসলে অনুচিত; এই রচনাকে সেরকম কোনো চেষ্টা হিসেবে গ্রহণ না করলেই বর্তমান লেখক খুশি হবেন। এ শুধু আবু রুশদের প্রতি এই প্রজন্মের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের চেষ্টা— আরও বহুদিন বেঁচে থাকুন তিনি আমাদের মাঝে, তাঁর সক্রিয় হিরন্ময় কলমটি নিয়ে।

রচনাকাল : ডিসেম্বর, ১৯৯৯
প্রথম প্রকাশ : ১ ফেব্রুয়ারি, ২০০০; পাক্ষিক শৈলী।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবু ইসহাক : ডুবুরীর কৌতুকপূর্ণ চোখ

প্রাককথন

আবু ইসহাক বাংলাদেশের সেই আশ্চর্য লেখক যিনি লেখক-সমাজের প্রথম শ্রেণীর সদস্য হয়েও এই সমাজের সঙ্গে কোনোদিন সম্পর্ক রক্ষা করে চলেননি। শক্তি ছিল তাঁর, বিচ্ছিন্ন থেকেও দেশের অন্যতম প্রধান লেখকে পরিণত হওয়ার ক্ষমতা ছিল, তবু তাঁর নিভৃতিচারিতা তাঁকে পাঠক ও সহযাত্রী লেখকদের মনোযোগের কেন্দ্রে আসতে দেয়নি। আমাদের সাহিত্যের ভুবন এখনও ততটা ঋদ্ধ হয়ে ওঠেনি যে, একজন নিভৃতচারি লেখককে তাঁর শক্তিমত্তার কারণে সামনে নিয়ে আসবে। মাত্র একুশ বছর বয়সে, ১৯৪৬ সালে, তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস— 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'। প্রকাশক না পেয়ে বছর পাঁচেক পরে লেখেন রহস্যোপন্যাস 'জাল'— কিন্তু সেটি প্রকাশের আগেই 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র প্রকাশ ঘটে, এবং অচিরেই পরিণত হন দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লেখকে। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, খুব বেশি সামনেও তাকাননি তিনি। যে পরিমাণ সক্রিয়তা-সচলতা-নিরবিচ্ছিন্নতা থাকলে একজন লেখকের পক্ষে সবসময় পাঠক এবং সহযাত্রী ও উত্তরসূরি লেখকদের মনোযোগের কেন্দ্রে থাকা সম্ভব হয়, তা তাঁর ছিল না কোনোদিন। তিনি যে কতখানি অনিয়মিত ছিলেন সেটি তাঁর গ্রন্থগুলোর প্রকাশ-কালের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সূর্য-দীঘল বাড়ী', এরপর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'হারেম' ১৯৬২ সালে। কিন্তু পাঠকরা বইটির মুখ দেখার আগেই তা পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়— এই সংবাদ লেখক আমাদেরকে জানাচ্ছেন বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের সময়, কুড়ি বছর পর, ১৯৮২ সালে। তা, এতদিন লাগলো কেন দ্বিতীয় সংস্করণ হতে? লেখক জানাচ্ছেন— তাঁর কাছে পাণ্ডুলিপিটির কোনো কপি ছিল না, অতএব নানা জায়গা থেকে গল্পগুলো জোগাড় করতে করতে বিশ বছর চলে গেছে। প্রথম গল্পগ্রন্থের এই পরিণতির ফলেই হয়তো দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থটি একটু তাড়াতাড়ি আলোর মুখ দেখেছিল। ১৯৬৩ সালে এটি— 'মহাপতঙ্গ'— প্রকাশিত হয়। তারপর দীর্ঘ এক বিরতি। ১৯৮২ সালে 'হারেম'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ— এক অর্থে প্রথম সংস্করণই, কারণ এটিই পাঠকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে পৌঁছেছিল, তারপর ১৯৮৬ সালে দ্বিতীয় উপন্যাস 'পদ্মার পলিদ্বীপ'। এটির মুখবন্ধে লেখক আবার আমাদের জানাচ্ছেন— উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৬০ থেকে ১৯৮৫! পঁচিশ বছর! এক অর্থে এটিই তাঁর শেষ রচনা। কারণ ১৯৮৯ সালে তার রহস্যোপন্যাস 'জাল' প্রকাশিত হলেও এটি তিনি লিখেছিলেন সেই ৫০ দশকের গোড়ার দিকে। তাঁর শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ— 'স্মৃতি বিচিত্রা', প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে। সাকুল্যে এই তাঁর রচনা। অর্থাৎ দুটো উপন্যাস, দুটো গল্পগ্রন্থ, একটি রহস্যোপন্যাস, একটি স্মৃতিকথা। প্রায় ষাট বছরের দীর্ঘ লেখক জীবনে এই রচনার পরিমাণকে আমরা কী বলবো? সামান্য না নগণ্য? অবশ্য সেই ৬০-দশক থেকেই তিনি একটি বড়ো কাজ করছিলেন— *আঞ্চলিক বাংলা অভিধান* রচনার কাজ, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে করে গেছেন। যাহোক, প্রশ্ন হচ্ছে— এত বিচ্ছিন্নতা, এত নিভৃতিচারিতা সত্ত্বেও কারো পক্ষে আবু ইসহাককে ভুলে থাকা সম্ভব হয়নি কেন? আমাদের কথাসাহিত্যের কথা উঠলেই কেন অনিবার্যভাবে তাঁর নাম এসে যায়? তারচেয়ে বড় প্রশ্ন— তাঁর এই অনিবার্য অবস্থান সত্ত্বেও তাঁকে আমরা কোথাও ডাকিনি কেন? কেন তাঁকে নিভৃতিচারিতার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে দিয়েছি? এর কারণ হয়তো এই যে, বাংলাদেশের সাহিত্যের যারা পৃষ্টপোষক সেই মধ্যবিত্তদের জন্য তাঁর রচিত সাহিত্যকর্ম কেবল অস্বস্তি আর অশান্তিই উৎপাদন করতো। 'ওসব' পড়ে কোনো 'আরাম' পাওয়া তো দূরের কথা, নিজেদের 'লজ্জাজনক' শেকড় আবিষ্কার করে বরং শিউরে উঠতে হতো। কারণ, আজকের যারা মধ্যবিত্ত, মাত্র কয়েক দশক আগেও তারা স্রেফ এক 'গ্রাম্য' লোক ছাড়া আর কিছুই ছিল না— আবু ইসহাক সেটিই চিহ্নিত করে দেখাতেন।

২

আর ওটাই আসল ব্যাপার। আবু ইসহাক যা লিখে গেছেন তা আমাদের মধ্যবিত্ত সাহিত্যরুচির পক্ষে হজম করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তা, কী লিখেছেন তিনি? সবাই জানেন–তাঁর লেখার, বিশেষ করে উপন্যাসের, প্রধান বিষয় আমাদের গ্রাম— সভ্যতার ছোঁয়াবিহীন সেই প্রাগৈতিহাসিক গ্রাম, গ্রামের মানুষ, গ্রামীণ সমাজ ও জীবন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে— এ আর এমন কী নতুন বিষয়? আমাদের আর কোনো লেখক কি গ্রাম নিয়ে লেখেননি? লিখেছেন, বিস্তর লিখেছেন। কিন্তু অন্য সবার সঙ্গে আবু ইসহাকের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। আমরা যে গ্রাম নিয়ে লিখি— সেটি আমাদের স্মৃতির গ্রাম, শৈশব-কৈশোরের স্বপ্নময় চোখে দেখা মমতাময়ী গ্রাম, আর সেটিকে আমরা স্থাপন করি বর্তমানে। ফলাফল হয় অদ্ভুত। কেউ মিলিয়ে দেখতে গেলে বিপদে পড়ে যান— কারণ বর্তমানের গ্রাম তো আগের মতো নেই, স্মৃতির সেই গ্রামটিকে বর্তমানে স্থাপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলে চলবে কীভাবে? এমনকি ৩০/৪০ বছর আগে দেখা গ্রামটিকে আমরা যেভাবে মনে ধরে রেখেছি, ওই সময়ও হয়তো সেটি ওরকম ছিল না, কৈশোরের স্বপ্নময় চোখে জনজীবনের দুঃসহ বাস্তবতা কিংবা অন্যান্য বীভৎস ব্যাপারগুলো হয়তো ধরাই পড়েনি। সেই গ্রামের প্রকৃত রূপ তাহলে কীভাবে আঁকা যাবে? এই ক্ষেত্রে আবু ইসহাক ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনিও গ্রামকে দেখেছেন শৈশব-কৈশোর-প্রথম যৌবনে। শুধু উপরিতলের দেখাই নয়, গ্রামে বসবাসের ফলে গ্রামের মানুষ, সমাজ ও জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। ভালো-মন্দ-সুন্দর-অসুন্দর কিছুই তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি! কিন্তু সেই গ্রামকে আঁকার সময় ভুল করেও সেটিকে বর্তমানে টেনে আনেননি। গ্রাম-জীবন অনেক বদলে গেছে, বদলে গেছে মানুষ, এসেছে অনেক অবকাঠামোগত পরিবর্তন। কিন্তু তাঁর গ্রামগুলো যেন প্রাগৈতিহাসিক কালের, মানুষগুলো যেন এ যুগের নয়। এ ব্যাপারে তাঁর অবস্থানও যুক্তিসম্মত। তিনি মনে করতেন—মানুষের জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে তা উপরিকাঠামোর পরিবর্তন, মানসজগতে তারা একই রকম রয়ে গেছে। সেই প্রাচীন বিশ্বাস, অনড় মূল্যবোধ, সংস্কার-কুসংস্কার তারা আজও বহন করে চলেছে। এমনকি গ্রামের যে লোকগুলো 'শিক্ষিত' হয়ে শহরবাসী হয়েছে, তারাও মনোজগতে ওই গ্রামের মানুষই। আধুনিক মানুষ হওয়ার একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে বিজ্ঞানমনস্কতা, সেটি এ দেশের মানুষের মধ্যে নেই বললেই চলে। তিনি মনে করতেন— শহুরে শিক্ষিত মানুষগুলোকে বুঝতে হলে আগে ওই প্রাগৈতিহাসিক গ্রামগুলোর প্রাচীন মানুষদেরকে বুঝতে হবে। আমাদের পশ্চাৎপদতা ও অনগ্রসরতার কারণ নইলে বোঝা যাবে না। আর এভাবেই তিনি আজকের শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের শেকড় খুঁজে খুঁজে চলে গেছেন গ্রামে। কী লিখছেন, কেন লিখছেন সেটি তিনি পরিষ্কারভাবে জেনে-বুঝেই লিখেছেন— কিন্তু ভুলে যাননি সাহিত্যের শিল্পমূল্যের কথাও। নিজের মতাদর্শ তাই তিনি চাপাননি কোথাও। তাঁর গল্প-উপন্যাস তাই কোথাও টলে পড়ে না, ঝুঁকে পড়ে না, ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সবসময়।

৩

আবু ইসহাকের দুটো উপন্যাসেরই বিষয়বস্তু গ্রামের মানুষ, গ্রামীণ সমাজ ও জীবন। গল্পে তিনি কাজ করেছেন বিবিধ বিষয় নিয়ে। তাঁর দুটো গল্পগ্রন্থভুক্ত একুশটি গল্পের মধ্যে 'জোক' এবং 'আবর্ত'— মাত্র এই দুটো গল্পে তীব্রভাবে গ্রামীণ জীবন এসেছে। 'দাদীর নদীদর্শন', 'শয়তানের ঝাড়ু', 'বোম্বাই হাজী' ইত্যাদি গল্পে গ্রামীণ সমাজের দেখা মিললেও এগুলোর মূল উদ্দেশ্য গ্রামীণ সমাজ ও জীবনের বর্ণনা নয়— ধর্মীয় কুসংস্কারের জালে বন্দি মানুষের গল্প বলা হয়েছে এগুলোতে। অন্যদিকে 'উত্তরণ', 'কানাভুলা', 'বিস্ফোরণ' প্রভৃতি গল্প অন্তজ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেণীর মানুষ নিয়ে লেখা হলেও তাদের দৈনন্দিন জীবনের বহুবিধ সংকটের বর্ণনা নেই এসব গল্পে, রয়েছে সাধারণ মানুষদের মধ্যে অসাধারণ মানবিক বোধের উন্মোচনের গল্প। যেমন 'কানাভুলা' গল্পে ধর্মীয় কুসংস্কারের (পীরপ্রথা, ঝাড়ফুক, তাবিজ-কবজ ইত্যাদি) বিরুদ্ধে সুকৌশল প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে এক রিকশাচালকের মাধ্যমে। কিংবা 'উত্তরণ' গল্পে এক প্রতারক দুধ-বিক্রেতার মধ্যে পিতৃস্নেহের উন্মোচন চমৎকার একটি গল্পের মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আবার 'বনমানুষ', 'প্রতিবিম্ব', 'বর্ণচোর' প্রভৃতি গল্পের বিষয়বস্তু নাগরিক জীবন।

নাগরিক জীবন নিয়ে তাঁর গল্পগুলো গতানুগতিক নয়— শহুরে মানুষ ও জীবনের মধ্যে লুকায়িত ভন্ডামি ও শঠতার উন্মোচন রয়েছে কোনো-কোনো গল্পে, কোনো গল্পে রয়েছে নাগরিক যন্ত্রণার চমৎকার বিবরণ। উদাহরণ হিসেবে 'বন মানুষ'-এর কথা বলা যেতে পারে। গল্পটি ১৯৪৭ সালে লেখা, কলকাতা শহরের পটভূমিতে। এক যুবক বনবিভাগের চাকরি ছেড়ে নতুন চাকরি নিয়ে এসেছে শহরে, দ্বিগুণ মাইনে ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ে। গল্পটিতে ওই যুবকের ভাষ্যে রচিত হয়েছে কলকাতা শহরে তার একটি দিন কাটানোর অভিজ্ঞতার কথা। অত্যন্ত কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে লেখক দেখেছেন নাগরিক কার্টেসি, ম্যানার, ফর্মালিটিজ ইত্যাদিকে। যেমন সকালে উঠে সেভ করতে হবে, স্যুট-কোট পরে এবং সেগুলোর ভাঁজ অক্ষত রেখে অফিসে যাওয়ার চিন্তা করতে হবে। কিন্তু যেতে হবে পাবলিক বাসের গাদাগাদি ভিড়ে কোনোমতে নিজেকে সেঁধিয়ে দিয়ে, সহযাত্রীদের কাছ থেকে গালাগালি শুনতে শুনতে। তা-ও যদি নিরাপদে বিনা চিন্তায় পৌঁছানো যেত! প্রতিমুহূর্তে কোনো একটি দুর্ঘটনার ভয়, কাউকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, যেন সবাই নিজের শার্টের নিচে লুকিয়ে রেখেছে একেকটি ভয়ংকর ছুরি (ওই সময়টি ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ, তারই এক চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায় গল্পটিতে)। শেষ পর্যন্ত অফিসে গিয়ে পৌঁছতে পারলেও, শান্তি মেলে না। দেরিতে পৌঁছানোর জন্য বিব্রত সে, আসার সময় প্রিয়তম দামি কলমটিও হারিয়ে এসেছে, ওদিকে নতুন মানুষ পেয়ে অধঃস্তনরাও তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে চায় এমন ভঙ্গিতে যেন তারাই উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। অর্থাৎ কোথাও কোনো ইতিবাচকতা নেই এই শহরে— কেবলই আতংক, যন্ত্রণা, শত্রুতা। কৌতুকপূর্ণ বর্ণনার কারণে গল্পটি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠলেও আমাদের মনে জেগে থাকে শহরের এই নিষ্ঠুরতার কথা। আমাদের তিনি জানিয়ে দেন এই জীবনের অন্তর্নিহিত অন্তসারশূন্যতার কথা, নির্মমতার কথা। বহিরঙ্গের চাকচিক্য নয়, ডুবুরির মতো তিনি গভীর থেকে তুলে আনেন শহুরে জীবনের গ্লানি।

গ্লানিময় এই জীবনের চিত্র আছে 'প্রতিবিম্ব' গল্পেও। অফিসের বড় সাহেব ঢিলেঢালা পোশাক পছন্দ করেন না বলে তার মন রক্ষার্থে এই গল্পের নামহীন নায়ক (!) তেতাল্লিশ টাকা দিয়ে একটা কোট কিনে ফেলে, যদিও তার মাসিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেতন আশি টাকা। সংসারে হা-করা দারিদ্র, মশারি নেই, বালিশের ওয়াড় নেই, চুলো জ্বালানোর লাকড়ি পর্যন্ত নেই, তবু 'এ সিম্বল অব স্ট্যাগিশনেস' 'ঢিলে বলদ' 'ল্যাবেন্ডিশ' এইসব অভিধা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কোটটি কেনা ছাড়া উপায় থাকে না তার— কারণ 'ওসব ঘরের জিনিস। না থাকলেও কেউ দেখতে আসবে না।' কিন্তু যথার্থ পোশাক না হলে চাকরি বাঁচানোই দায়। গল্পের প্রায় পুরোটাই জুড়ে আছে এই যুবকের অনটনময় সংসার-জীবন আর উল্টোপিঠে অফিসিয়াল কার্টেসি রক্ষার দায়— এ দুয়ের কৌতুকপূর্ণ বিবরণ। কিন্তু এর পেছনে রয়ে গেছে এক চোখ ভেজানো মানবিক গল্পের উদ্ভাসন। অফিস থেকে ফেরার পথে একটি বাড়ির সামনে দিয়ে আসার সময় একটা ছোট্ট ছেলে এসে তাকে আব্বু বলে জড়িয়ে ধরে। সে ফিরে তাকাতেই বাচ্চাটি বুঝতে পারে যে সে ভুল করে ফেলেছে। কিন্তু যুবকের চোখে বাড়ির ঠিকানাটা আটকে যায়— ১১ নং হিম্মত সরদার লেন— মনে হয় এই ঠিকানা তার চেনা। বাসায় ফিরতে ফিরতে তার মনে পড়ে— কোটের পকেটে সে একটা চিঠি পেয়েছিল, সেখানেই এই ঠিকানাটি লেখা ছিল। চিঠিটি ছিল এই কোটের পুরনো মালিকের লেখা— তার বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে, যদিও সেটি শেষ পর্যন্ত পোস্ট করা হয়নি। সে বাসায় ফিরে চিঠিটি পড়তে পড়তে দেখা পায় এক অশ্রুসিক্ত গল্পের। কোটের পুরনো মালিকও তার অফিসের বড় কর্তাদের মন জুগিয়ে চলতে গিয়ে একের-পর-এক পোশাক পাল্টাতে বাধ্য হচ্ছিল এবং শেষ পর্যন্ত এটাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সন্দেহের দৃষ্টি পড়েছিল তার ওপরে, এত কম মাইনের একজন কেরানি কীভাবে এত বাহারি পোশাক পরে— এই সন্দেহের বলি হয়ে সে চাকরিটা হারিয়েছিল। তারও ছিল ঘরভরতি দারিদ্রের হাহাকার, কিন্তু চাকরি বাঁচানোর তাগিদে পোশাকের দিকে নজর দিতে দিতে নিজেই পড়েছিল এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে, এবং অবশেষে অকালেই মৃত্যুর কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিল। এই গল্পে নাগরিক জীবনে, বিশেষ করে অফিসপাড়ার অহেতুক কার্টেসি, পোশাক-আড়ম্বর এবং ঊর্ধ্বতনদের অমানবিক আচরণকে চাবুকাঘাত করা হয়েছে। একইসঙ্গে গল্পের নামহীন নায়কের অসহায়ত্বও চমৎকার কুশলতায় উঠে এসেছে— ওই যুবক আসলে ওই কোটের পুরনো মালিকের মধ্যে নিজের জীবনের ছায়া দেখতে পায়, অনুভব করে সে-ও ওই একই জীবনের শিকার, হয়তো পরিণতিও হবে একই-রকম।

এদিক থেকে দেখতে গেলে 'ঘুপচি গলির সুখ' গল্পের হানিফের আচরণটিকে এসবের বিরুদ্ধে একটি নীরব প্রতিবাদ হিসেবে দেখা চলে। গল্পের শুরুতেই লেখক আমাদেরকে জানাচ্ছেন— 'পরীক্ষার খাতায় পঁয়ত্রিশ নম্বর আর পঁয়ত্রিশ টাকার চাকরি— এই ছিল হানিফের চরম আকাঙ্ক্ষা।' তার দুটো আকাঙ্ক্ষাই পূরণ হয় এবং 'ক' না-জানা করিমনকে নিয়ে সে 'নাজিরা বাজারের এক ঘুপচি গলির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষে, শাহী নর্দমার পাশে, খানদানী দেয়ালের বেষ্টনীর মধ্যে একটা কোচোয়ানি কুড়েঘরে' জীবন শুরু করে। ৫৩ টাকার চাকরিতে আর কুড়েঘরের জীবনে সে সুখী, কারণ— 'মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই বলে নাকি মানুষ সুখী নয়। তাকে পৃথিবীর অর্ধেক দিয়ে দিলেও নাকি সে খোঁজ করবে— বাকী অর্ধেক কোথায়? জীবনে সুখী হওয়ার জন্যে তাই অনেক সাধ্যসাধনা করে হানিফ আকাঙ্ক্ষা দমনের অনেক কৌশল আয়ত্ব করেছে।' আবু ইসহাকের কৌতুকপূর্ণ বিবরণ তুলে ধরার জন্য এই গল্প থেকে একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

> পোলাও- কোর্মা আমাদের পকেট খালি ও পেট খালাস করে দেয়। তাই ভেবে আমার স্ত্রী তা রাঁধতে শিখেনি। তবে গুঁড়ামাছ, শাক, ডাল আর ভাত রান্নায় সে দক্ষহস্ত। মিলের মোটা শাড়ি তালি দিয়ে দিয়ে পরতে সে অভ্যস্ত। স্বামীর খেদমতে সর্বক্ষণ ব্যস্ত, কারণ তার পায়ের তলায় নাকি বেহেশত। মাসের শেষের দিকে নুন-ভাত খেয়ে তৃপ্ত। মিতব্যয়িতার বুদ্ধিতে দীপ্ত। ম্যালেরিয়া জ্বরে না হয় জব্দ। স্বামীর কটু কথায় না করে শব্দ।

কিংবা—

> স্ত্রী খুশি। কারণ এহেন বাসায় তার পর্দার কোনোরূপ বরখেলাপ হবে না। আর বাচ্চাকাচ্চাদের গায়ে বাও-বাতাস লেগে অসুখ করবে না। হানিফ মহাখুশী। কারণ বেনারসী, জামদানী, ক্রেপ, জর্জেটের ঝলমলানি আর সোনা গয়নার চকমকানি তার স্ত্রীর চোখে জ্বালা ধরাবে না। এসেন্স আর সুবাসিত তেলের সুগন্ধ নর্দমার দুর্গন্ধ ছাপিয়ে তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করবে না। রুজ-লিপস্টিক দূরের কথা, হেজলিন পমেডের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হবে না কোনো দিন। বিজলি বাতির আলো চোখ ধাঁধাবে না। সিনেমার বিজ্ঞাপন অনধিকার প্রবেশ করবে না। আর রেডিওর গান শরিয়ত বরবাদ করবে না। ...

অথবা—

> ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে হানিফ একটুও ভাবে না। বড় ছেলে মেয়ে দুটো ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে পড়ছে। সরকারী খরচে নাম আর নামতা গোণা পর্যন্ত শিখলেই হল, তার বেশি নয়। ...বেশি পড়লেই ছেলেগুলোর চোখ খুলবে, ভ্রু কুঁচকাবে, বড় চাকরির দুরাকাঙ্ক্ষা করবে। কোন মতে একটা বড় চাকরি যদি জুটে যায় কারো, তবে তার আকাঙ্ক্ষার পাখি খুশিমত উড়তে না পারলে খালি হায়-আফসোস করবে – অমুকের তমুক জিনিসটা কিনেছে, তার জিনিসটা বড্ড কদাকার। অমুক জিনিসটা না হলে ইজ্জত বাঁচে না। ...তাই হানিফের মত হচ্ছে–অধিক বিদ্যা ভয়ঙ্করী, অল্প বিদ্যা শুভঙ্করী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকচিক্যপূর্ণ ভোগবিলাসের জীবনের প্রতি এ যেন এক তীব্র বিদ্রুপ। হানিফ তার চারপাশে যে দুর্ভেদ্য দেয়াল গড়ে তুলেছে তা হয়তো ওই জীবনের প্রতি তার অনাগ্রহ নয়, বরং নিজের অক্ষমতার প্রতি সচেতন বলেই এ ছাড়া তার আর করার কিছুই থাকে না। এবং পাঠকের মনে হয়, ওই জীবনের লোভে গ্লানিময় জীবন-যাপনে বাধ্য হওয়ার চেয়ে বরং এরকম দুর্ভেদ্য দেয়াল গড়ে তোলা অনেক ভালো।

৪

বেশ কিছু গল্পে আবু ইসহাক ধর্মীয় কুসংস্কারকে তীব্রভাবে বিদ্রুপ করেছেন যেমন— 'কানাভুলা', 'প্রতিষেধক', 'বোম্বাই হাজী', 'শয়তানের ঝাড়ু', 'সাবীল' ইত্যাদি। এই গল্পগলোতে বিদ্রুপ আছে বটে, কিন্তু তা গল্পের মধ্যে এত সূক্ষভাবে, এমন সুকৌশলে প্রবিষ্ট যে, কখনো সেগুলোকে আরোপিত বা উচ্চকিত বলে মনে হয় না, মেসেজটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিছক একটি গল্পপাঠের আনন্দও পাঠকের মনে সমানভাবে জেগে থাকে। এ-ধরনের গল্পের মধ্যে 'দাদীর নদীদর্শন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গল্পের মৌলবী দাদী তার ষাট বছরের জীবনে কোনোদিন নদী দেখেননি। কারণ (লেখকের কৌতকপূর্ণ বর্ণনায়)—

> 'ছ হাত উঁচু দেয়াল-ঘেরা এ মীরহাবেলী তাঁর বাপের বাড়ি ও শ্বশুর বাড়ি। তাই কৈশোরের পর তাঁকে এ দেয়ালের বাইরে যেতে হয়নি কোনদিন। মীরহাবেলীতে মৌলবী দাদী বলে একজন আছেন, এটুকুই বাইরের লোক জানে। তারা কেউ তাঁকে কখনো চোখে দেখেনি। দেখবে কেমন করে? গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তিনি ভুলেও একবার বাড়ির বৈঠকখানায় ঢোকেননি।...দাদীর পর্দানিষ্ঠার অনেক কাহিনী উপমা হিসেবে মোল্লা-মৌলবিরা তাঁদের ওয়াজে বয়ান করে থাকেন। যেমন বিয়ের আগে চুল আঁচড়ানোর সময় চাচাতো ভাই তাকে দেখে ফেললে তিনি মাথা ন্যাড়া করে ফেলেছিলেন। তিনি ডাক্তারি ওষুধ খান না কারণ হারাম জিনিস ছাড়া নাকি ওষুধই হয় না। ওষুধের মত অনেক কিছুই দাদী খান না। যেমন প্যাকেট করা বিস্কুট, কৌটোয় ভরা মাখন, লেবেল-লাগানো বোতলের চাটনী, মোরব্বা, জেলী আরও কত কি! তার মতে এগুলো বিলেতী। নাম-না-জানা চকমকে ঝলমলে নতুন কিছু হলেই সেটা বিলেতী এবং হারাম।... মীর-গৃহে গৃহ-বিবাদ হয়েছে অনেকবার। এই বিবাদকে দাদী বলেন জেহাদ। জেহাদ হয়েছে ছেলেদের ইংরেজী পড়া নিয়ে, গ্রামোফোন রেডিও বাজানো আর দেয়ালে ছবি টানানো নিয়ে।... একবার মেঘের জন্যে ঈদের চাঁদ দেখা গেল না। রেডিওর ঘোষণা শোনা গেল— বোম্বাইয়ে চাঁদ দেখা গেছে, কাল ঈদ। (কিন্তু দাদী মানলেন না, কারণ) রেড়ু হইল শয়তানের কল। শয়তানই এই খবর দিছে ইনসানকে দাগা দিবার জন্য। মীর হাবেলীতে ঈদ হল ঈদের পরের দিন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এহেন দাদী যে নদী দেখবেন না সে তো বলাইবাহুল্য। কিন্তু নদীই এগিয়ে এলো তাকে দেখা দেয়ার জন্যে। মীরহাবেলী ভেঙে গেলো নদীতে। অবশেষে অন্যদের মতো দাদীকেও নতুন আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য নৌকায় উঠতে হলো। 'ভাদ্র মাস। পদ্মা অসম্ভব ফুলে উঠেছে। দুই পাড় ডুবে যাওয়ায় ধূ-ধূ দেখা যায় অন্য পাড়। দাদী তাঁর ঘোলাটে বুড়ো চোখ মেলে তাকান খিড়কির পর্দা ফাঁক করে। ভয় ও বিস্ময়ের ছাপ তাঁর চোখে মুখে। বলেন, এত পানি! খোদার কি কুদরত! এত পানি কোনখান থিকা আসে, আবার কোথায় যায়, খোদা ছাড়া কেউ জানে না।' এই বিপুল উত্তাল বহমান স্রোতধারাই তার কাল হলো, অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি এবং মারা গেলেন। নদী যেন এখানে বহমান-চলমান-অগ্রসর জীবনের প্রতীক, ধর্মীয় কুসংস্কারে বন্দি দাদীর সঙ্গে যার দেখা হয়নি কোনোদিন। যখন দেখা হলো তিনি তার ভার সইতে পারলেন না, জীবনের ইতি ঘটলো তার।

৫

প্রতীকের ব্যবহার শুধু এই গল্পেই নয় আরও অনেক গল্পেই অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন আবু ইসহাক। তাঁর অতি বিখ্যাত গল্প 'জোক' শুধু এর অসাধারণ প্রতীকময়তার কারণেই স্মরণীয় হয়ে আছে বহুবছর ধরে। ভাগচাষীরা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ফসল ফলায়, কিন্তু অর্ধেকই দিয়ে দিতে হয় মালিককে। তেমনই এক ভাগচাষী ওসমান। বুকসমান পানিতে নেমে সন্তানের স্নেহে গড়ে তোলা পাটগাছগুলোকে কেটে তুলতে তুলতে তার শরীরে কখনো-কখনো জোক ধরে, রক্ত চুষে পুষ্ট হয়। তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে— আহা তার মেহনতে ফসলে যদি আর কেউ ভাগ না বসাত! কিন্তু করার কিছু নেই, তার অমানুষিক পরিশ্রমের ফসলের ভাগিদার সে একা নয়, কারণ জমি তার নয়। জমির মালিক কোনো কাজ না করেই অর্ধেক নিয়ে যায়, কষ্ট হলেও এতদিন তারা সেটা মেনে আসছিল। কিন্তু 'শিক্ষিত' মালিক এবার নতুন ফন্দি আঁটেন, 'তেভাগা' আইন পাশ হওয়ার সম্ভাবনায় নিরক্ষর চাষীদের কাছ থেকে টিপসই নিয়ে নেন। কী লেখা ছিল ওই কাগজে সরল চাষীরা তা বোঝেওনি, এ নিয়ে প্রশ্নও তোলেনি। ফসল ওঠার পর যখন তারা দেখতে পেলো— মালিকের লোকজন ফসলের তিনভাগের দুইভাগ নিয়ে যাচ্ছে, তখনই কেবল প্রশ্ন জাগে এবং জানতে পারে, মালিক যে তাদেরকে লাঙ্গল-গরু কেনার জন্য টাকা দিয়েছে ওই কাগজে সেটিই লেখা ছিল, যদিও মোটেই সেরকম কিছু করেনি মালিক। তারা প্রতারিত হয়, অনুভব করে— জোকের মতই এরাও তাদের রক্ত চুষে খাচ্ছে। পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে পাট তোলার সময় জোকের রক্ত চুষে খাওয়ার প্রতীকে এই গল্পে আবু ইসহাক এক অসামান্য কুশলতায় শ্রেণীবিভক্ত এই সমাজের শোষণের চিত্রটি এঁকেছেন। গল্পটিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাটচাষের বিভিন্ন পর্যায়ের যে সূক্ষাতিসূক্ষ বর্ণনা আছে, সেটি কেবলমাত্র একজন অভিজ্ঞ কৃষকের পক্ষেই দেয়া সম্ভব। আবু ইসহাক কত গভীরভাবে ওই জীবনকে চিনতেন, এই একটি গল্পেই তার সাক্ষ্য রয়েছে। মনে হয় যেন ওই কৃষকের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ডুব দিয়ে দেখেছেন পাট কাটার দৃশ্য, কিংবা কে জানে হয়তো নিজেও কেটেছেন তাদের সঙ্গে। আবু ইসহাকের দেখার অতলস্পর্শী চোখ আমাদেরকে এমনটি ভাবার জন্য প্রলুব্ধ করে।

রচনাকাল : মার্চ, ২০০৩
প্রথম প্রকাশ : ১৭ এপ্রিল, ২০০৩, দৈনিক আজকের কাগজ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ শামসুল হক : জীবনের চেনা-অচেনা কোণে বহুবর্ণিল আলো

প্রাককথন

দেশবিভাগের পর ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার শুরুতে হাতে গোনা কয়েকজন অগ্রজ সাহিত্যকর্মীর সঙ্গে যে কজন প্রতিভাবান যুবকের আবির্ভাব ঘটেছিল সৈয়দ শামসুল হক তাঁদের অন্যতম। সময়টি ছিল বিপন্নতার। পাকিস্তান নামক অতি-অদ্ভুত একটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হওয়ায় রাষ্ট্রের উদ্যোগে ও আয়োজনে তথাকথিত ইসলামি জাতিয়তাবাদের চাদরে মুড়ে দেয়ার চেষ্টা চলছিল বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, ভাষার বিরুদ্ধে চলছিল নানামুখী ষড়যন্ত্র। এরকম একটা সময়ে যাঁরা লিখতে এলেন তাঁরা অনেকটা নীরবেই রাষ্ট্রের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল উপেক্ষা করে নিজ ভাষাকে টিকিয়ে রাখার যুদ্ধটি করে গেছেন— নিজের ভাষায় সাহিত্য রচনার এবং এর একটি মানসম্মত রূপদান করার যুদ্ধ। সৈয়দ হক সেই যুদ্ধের অন্যতম সৈনিক। পঞ্চাশের সবাই পারেননি, অনেকেই স্তব্ধ হয়ে গেছেন, কিন্তু সৈয়দ সামসুল হক তাঁর অসাধারণ মেধা, প্রজ্ঞা ও প্রতিভায় আজও নিজেকে রেখেছেন বিপুলভাবে সক্রিয়। এটা বললে নিশ্চয়ই অতিশোয়োক্তি হবে না যে, পঞ্চাশের সবচেয়ে প্রতিভাদীপ্ত গল্পকার সৈয়দ শামসুল হক। পূর্ব বাংলার মানুষ তখন নানামাত্রিক নতুন, অভিনব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছে— সৃষ্টি হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, গড়ে উঠছে নগর। সৈয়দ হকই প্রথমবারের মতো সেই নাগরিক মধ্যবিত্তের সংকট-সম্ভাবনা, হতাশা-আকাঙ্ক্ষাকে সফলভাবে তাঁর গল্পের উপজীব্য করলেন। তাঁর ছিল সূক্ষ্ম দৃষ্টি; 'শীতবিকেল', 'ফিরে আসে', 'রক্ত গোলাপ' প্রভৃতি গল্প তাঁর মতো শিল্পীর পক্ষেই লেখা সম্ভব। তিনি অবশ্য কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে থাকেননি। ছুটে বেড়িয়েছেন জীবনের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার সন্ধানে, ক্রমাগত নিজেকে ভেঙেচুরে নিজেকেই অতিক্রম করে গেছেন ঈর্ষণীয়ভাবে। মানব-জীবন, মানব-স্বভাব, সমাজ-জীবন ইত্যাদির প্রতিটি চেনা-অচেনা কোণে উজ্জ্বল আলো ফেলে দেখিয়েছেন সেগুলোর অর্ন্তগত চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য। তাঁর হাতেই নির্মিত হয়েছে 'প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান', 'আরও একজন' প্রভৃতি রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন প্রতীকী গল্প; 'ফিরে আসে', 'গাধা জোৎস্নার পূর্বাপর' প্রভৃতির মতো প্রেমের গল্প। এই রকম আরও অনেক রচনা দিয়ে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন বাংলাদেশের গল্পের ভুবন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদিও গল্প দিয়েই লেখক-জীবন শুরু করেছিলেন সৈয়দ শামসুল হক কিন্তু থেমে থাকেননি সেখানে, বিচরণ করেছেন সাহিত্যের প্রায় সমস্ত শাখায়— কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে। যেখানেই হাত দিয়েছেন, সফল হয়েছেন তিনি। তাঁর সাহিত্যকর্ম— সে গল্প বা উপন্যাসই হোক অথবা কবিতা বা নাটকই হোক— তুমুলভাবে আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে সবসময়। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর যেমন স্বচ্ছন্দ বিচরণ তেমনই প্রতিটি শাখায় তাঁর বিষয়ের বহুমাত্রিকতাও চোখে পড়ার মতো। বিষয়, উপস্থাপন-কৌশল, ভাষার বিভিন্নতা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে তাঁর রচনাকর্ম বহুমাত্রিক জীবনবোধের জন্ম দেয়।

তাঁর অসংখ্য রচনাকর্মের মধ্যে যেগুলো বহুলভাবে আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে— *উপন্যাস*: 'খেলারাম খেলে যা', 'নিষিদ্ধ লোবান', 'দূরত্ব', 'এক যুবকের ছায়াপথ', 'ইহা মানুষ', 'স্তব্ধতার অনুবাদ', 'স্মৃতিমেধ', 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী', 'ত্রাহি', 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ'; *কাব্যগ্রন্থ*: 'বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালা', 'পরানের গহিন ভিতর', 'বুনোবৃষ্টির গান'; *কাব্যনাটক*: 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'নূরলদীনের সারাজীবন', 'গণনায়ক', 'ঈর্ষা', প্রভৃতি।

এই রচনাগুলো যেমন প্রচুর প্রশংসা লাভ করেছে, ভুলভাবে সমালোচিতও হয়েছে অনেক। এসব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। শুধু একটি কথা তাঁর সমন্বন্ধে নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে—আমাদের সাহিত্যজগৎ সমৃদ্ধ করার কৃতিত্ব যাঁরা দাবি করতে পারেন, তাঁদের মধ্যে সৈয়দ শামসুল হক প্রথম সারির একজন।

গল্পপ্রসঙ্গ

১

সৈয়দ হকের বিচরণক্ষেত্র যে সীমাবদ্ধ নয় বরং ক্রমাগত নিজেকে বদলে ফেলেছেন তিনি, অতিক্রম করে গিয়েছেন নিজেকেই সেটি তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্ম পড়া না থাকলেও শুধুমাত্র গল্প পড়েই উপলব্ধি করা সম্ভব। তাঁর গল্পে চিত্রিত হয় সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের সমগ্র জীবনচিত্র— একদিকে মানুষের প্রেম, কাম, আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে তার বেঁচে থাকার সংগ্রাম, বিদ্রোহ, রাজনৈতিক চেতনা, তার ভালোবাসা, মমতা ও মহত্ত্ব। বহু ধরনের গল্প লিখেছেন সৈয়দ্ শামসুল হক, বিষয় আর প্রকরণের বৈচিত্র্যে ভরা এসব গল্প থেকে কয়েকটি গল্প বিবেচনা করে আমরা বিষয়টি বিচার করে দেখতে পারি।

তাঁর সাহিত্যকর্মের একটি প্রধান অংশ জুড়ে আছে মানুষের রাজনৈতিক বিশ্বাস, তার বিপ্লব-বিদ্রোহ ও বেঁচে থাকার যুদ্ধ। প্রচুর লিখেছেন তিনি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। কিন্তু গল্পের স্বল্প-পরিসরে বোধহয় তিনি এসব নিয়ে বিস্তৃত কাজ করতে চাননি। তাঁর গল্পগুলোতে যুদ্ধের বিবরণ তেমন পাওয়া যায় না—স্মৃতিচারণ আছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অংশগ্রহণ নেই, মূলত এই তাঁর এ-ধরনের গল্পগুলোর বৈশিষ্ট্য। তবু প্রতীকী আবহে গল্পগুলোতে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস, চেতনা ও বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়।

'প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান' গল্পে পাঠকের সঙ্গে দেওয়ান ইদ্রিস খাঁ নামক এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তির পরিচয় ঘটে, যদিও এখন আর তাঁর কিছুই অবশিষ্ট নেই, ক্ষয়ে যাওয়ার অনিবার্য নিয়মে তাঁর সবকিছু লুপ্ত হয়ে গেছে, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ করাল গ্রাসে সমস্ত কিছু বিক্রি করতে হয়েছে অথবা বন্ধক দিতে হয়েছে। একমাত্র স্মৃতি হিসেবে তিনি বংশগতভাবে প্রবহমান ঐতিহ্যের চিহ্ন একটি গ্লাস রেখে দিয়েছেন এবং লেখকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে ওই গ্লাসটিকে কেন্দ্র করেই। গল্পটির উপস্থাপনা-কৌশল ভিন্নমাত্রিক ব্যঞ্জনার দাবিদার। লেখক এখানে পরোক্ষ নন, প্রত্যক্ষভাবেই বলছেন— 'এ কাহিনী এর আগে যারা শুনেছে তারা অবিশ্বাস করেছে, এ কাহিনী ভবিষ্যতে যারা শুনবে অবিশ্বাস করবে তারাও।'— বাক্যটি দিয়ে তিনি পাঠককে আরও বেশি আগ্রহী করে তোলেন গল্পটি সম্বন্ধে। লেখক ওই দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে গিয়ে যখন তৃষ্ণায় কাতর হয়ে প্রায় মূর্ছাগত, ওই সময় অলৌকিক পুরুষের মতো— 'রুপার রেকাবিতে রাখা রুপার গেলাশ, গেলাশের ওপর একখণ্ড মসলিনের টুকরো'— নিয়ে দেওয়ান ইদ্রিস খাঁর আগমন ঘটে। এরপর আমরা লেখকের সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত কথোপকথনের চিত্র দেখতে পাই। ইদ্রিস খাঁ জানান যে তিনি আহার জোটাতে একমাত্র গ্লাসটি ছাড়া সর্বস্ব, এমনকি নিজেকেও বিক্রি করে দিয়েছেন। চমকে দেয়ার মতো তথ্য বটে। নিজেকে বিক্রি! যেমন বিক্রি হতো মানুষ, বহুকাল আগে, ক্রীতদাস হিসেবে? ক্রেতা, মহাজন চণ্ডিবাবু, তাকে গাড়ির গাড়োয়ান হিসেবে নিয়োগ দিলেও দুদিন পরই তিনি পালিয়ে আসেন। কারণ 'পেটে দুইটা ভাত পড়ার পর আমার মনে হয়, হায়রে এই ভাতের জন্য পরাধীন? এই ভাতের জন্য নিজে বিক্রি, তা-ও ওই জানোয়ারের কাছে?' কিন্তু তাঁর রেহাই নেই মহাজনের কাছ থেকে, তাঁকে সে ঠিকই খুঁজে বের করে। এই শৃঙ্খল থেকে, পরাধীনতা থেকে মুক্তির উপায় বাতলে দেন 'ভোলা মাস্টার'। মাস্টার তাঁকে 'চুরি' করেন এবং এই বলে সমাধান দেন যে মহাজন এজন্য থানায় এজাহার দিতে পারবে না যে 'আমার মানুষ' চুরি গেছে, কারণ মানুষ কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ইদ্রিস খাঁ সাময়িকভাবে মুক্তি পান। কারণ 'এই মুক্তি দুদিনের। অন্য কোনো কায়দায় সেই হাজার টাকার দাবি চণ্ডিবাবু করবেই করবে। তখন? তখন?' এই পরিস্থিতিতে লেখক 'আশেপাশে ভোলা মাস্টার, যাকে আমি আগে পরে কখনো দেখেনি, তার অনুপস্থিতিতে আমি বড় অসহায় বোধ করি।' গল্পে এই ভোলা মাস্টারের চরিত্রটি বিস্তৃত নয়, স্পষ্টতই বোঝা যায় এটি একটি প্রতীকী চরিত্র মাত্র— যিনি মুক্তির দূত, যিনি মানুষকে পরাধীনতা থেকে, শৃঙ্খল থেকে মুক্তির পথ-নির্দেশ দিতে পারেন। গল্পটিকে একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভীরভাবে বিচার করলে ওই 'রুপার রেকাবিতে রুপার গেলাশ, গেলাশের ওপর একটুকরো মসলিনের টুকরো' যেন আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যের প্রতীক হয়ে ওঠে। আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য আর সম্ভ্রম লুট হয়ে গেছে, আমাদের বেঁচে থাকার যাবতীয় উপকরণ বিক্রি হয়ে গেছে উপনিবেশবাদ আর সাম্রাজ্যবাদের কাছে, এখন এদেশের একজন শিশুও বিপুল ঋণ মাথায় নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যেন জন্ম থেকেই বিক্রি হয়ে আছি আমরা— দেশের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সঙ্গে ইদ্রিস খাঁর পরিস্থিতির একটি মিল যেন আমরা খুঁজে পাই। আর ওই যে, 'ভোলা মাস্টারে'র অনুপস্থিতি যিনি মুক্তির দূত, তা যেন আমাদের নেতৃত্বের গভীর সংকটকেই নির্দেশ করে।

'ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে' গল্পে আমরা মানুষের কাছে নতুন এক মুক্তিযুদ্ধের আগমনী বার্তা পৌঁছে দিতে দেখি। দেখি, মানুষ স্মৃতিচারণ করছে— মুক্তিযুদ্ধের সময় দুজন মুক্তিযোদ্ধা এসে একটি মসজিদ থেকে পাঁচজন রাজাকারকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, আর বহু বছর পর সেই একই মসজিদে দুজন অস্ত্র-সজ্জিত যুবকের আগমন ঘটে। তাদের পরিচয় স্পষ্ট হয় না, তারা কোনো কথাও বলে না। ইমাম সাহেব যখন বলেন, 'কন, বাহে, শুনি হামরা। মুক্তিযুদ্ধ কি ফির শুরু হয়া গেইছে?' প্রশ্নেই শেষ হয়ে যায় গল্প, উত্তর আর পাওয়া যায় না (যেন সবকিছুই অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন), কিন্তু অনুভূত হয়, আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সব মানুষই খুব তীব্রভাবে অনুভব করছে। কিন্তু মানুষের কাছে শত্রু-মিত্র বা সার্বিক পরিস্থিতি কিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠছে না বলে যুদ্ধটি শুরু করা যাচ্ছে না।

'জমিরউদ্দিনের মৃত্যুবিবরণ' গল্পের জমিরুদ্দিন প্রায় মহামানব পর্যায়ের একজন ব্যক্তি। বংশানুক্রমে তাঁদের ছিল বিশাল দাপট, প্রচুর সম্পত্তি, কিন্তু এগুলো কিছুই তিনি গ্রহণ করেন না, সবকিছু ছেড়ে অনেকটা সন্তের জীবন বেছে নেন তিনি, মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং পরিণত হন মুক্তির প্রতীকে। হাটে-বাজারে গিয়ে তিনি কবুতরের খাঁচা কিনতেন তারপর— 'নিজ হাতে একেকটা খাঁচা খুলে জমিরুদ্দিন কবুতরগুলো একে একে আকাশে উড়িয়ে দিতেন। রাত পর্যন্ত কাছারির মাঠে, কাছারির বারান্দায় তাঁর মতো ধনী মানুষ দীনহীনের মতো বসে থাকতেন, শুধু এইজন্যে বসে থাকেন, কেউ যেন কবুতরগুলো আবার না ধরে, আবার না খাঁচায় পোরে, আবার না আহারে সেই কচি পাখিদের মাংসের প্রাণে জলেশ্বরীর রাত ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে।' সেই জমিরুদ্দিনের মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত। সবাই একরকম প্রতীক্ষায় থাকে এবং একটি বিস্ময়কর কথা শুনতে পায়— জমিরুদ্দিন বলছেন, 'এক মহাপাপ আছে, সেই পাপের ক্ষমা না পেলে আল্লাহর সম্মুখে তিনি দাঁড়াবেন কোন ভরসায়, নবিজির শাফায়াত প্রার্থনা করবেন তিনি কোন মুখে, বিবি ফাতেমা সবার জন্যে চোখের পানি ফেলবেন, সেই পানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জমিরুদ্দিনকে দেখে পাথর হয়ে যাবে।' এমন যিনি মহৎপ্রাণ ব্যক্তি, কী তাঁর সেই মহাপাপ? গল্পে তা স্পষ্ট হয় না। কিন্তু গল্পের শেষে আমরা দেখি অনেকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই উল্লেখিত হয়েছে— 'আবার' সামরিক শাসন জারি হয়েছে এবং 'জমিরুদ্দিন বসুনিয়া আর কখনো হাটে যাবেন না কলাগাছের বাকলে তৈরি খাঁচা খুলে কবুতরগুলো উড়িয়ে দিতে।' এই পরিণতি গল্পটিকে শেষ পর্যন্ত আর সাধারণ রাখে না বরং ভিন্নমাত্রিক ব্যঞ্জনায় উজ্জ্বল করে আমাদেরকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে উদ্বুদ্ধ করে। 'আবার সামরিক শাসন' আর পরক্ষণেই জমিরুদ্দিনের কবুতর ওড়ানোর প্রতীক— এ দুয়ের সমন্বয়ে জমিরুদ্দিন আর তখন শুধুমাত্র জলেশ্বরীর জমিরুদ্দিন থাকেন না, হয়ে ওঠেন পুরো বাংলাদেশের মুক্তির দূত, (তিনি কি আমাদের সেই নেতা যাঁর 'মহাপাপ' ঘাতকদের ক্ষমা করা?) যাঁর মৃত্যু সামরিক শাসন ডেকে আনে, যাঁর মহাপাপ দেশের জন্য দীর্ঘস্থায়ী সংশয় ও হুমকি ডেকে আনে, যাঁর অনুপস্থিতি মুক্তির বিষয়টিকে প্রলম্বিত করে তোলে?

সৈয়দ হকের গল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি গল্প 'আরও একজন'। এই গল্পে আমরা দেখি—নিতান্ত 'সাধারণ এক মানুষ, বেনামাজি, গাঁজার অভ্যাস আছে, বেশ্যাবাড়ি যায়' কসিমদ্দি একধরনের প্রতিবাদ গড়ে তুলছে, বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর হিসেবে গড়ে উঠছে ভ্রান্ত ফতোয়া ও ধর্মব্যবসায়ী ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে—

> 'জলেশ্বরীতে হজরত শাহ সৈয়দ কুতুবুদ্দিনের মাজারের বর্তমান খাদেম সৈয়দ আবদুস সুলতান নাকি সম্প্রতি ফতোয়া জারি করেছেন, একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে যাওয়া হিন্দুর পূজা করার সামিল, অতএব যারা সেখানে যাবে তারা ছরাছর দোজখবাসী হবে, সত্তর হাজার সাপ তাদের দংশাবে, আর যখন পিপাসায় কাতর হবে তখন নাছারাদের বিষাক্ত ঘায়ের পুঁজ তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে।' (এই কথা শুনে কসিমদ্দি)... এর প্রতিবাদ করে এবং বলে যে, এই যে হুজুর-পাক, আর আপনারা এখানে, বাবা কুতুবুদ্দিনের মাজারে এসে মানুষেরা কেউ কেউ সেজদা করে, কই তখন তো সেটা পূজা হয় না? কই তখন তো আপনি তাদের শাসন করে বলেন না, যে, মিয়ারা দোজখে তোমাদের সত্তর হাজার সাপে দংশাবে। বরং আপনি তো দেখি তাদের নজর নজরানা টাকাপয়সা বড়ই লম্বা হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেন, বলেন, বাবা ফির আসিস, এই বাবা ছাড়া দুনিয়ার পার করার কাঁহও নাই। ...তখন তো আপনি...আমাদের এই জলেশ্বরীর পাক হুজুরের কথা এমনভাবে কন যেন তাঁর ওপরে জগতে আর কেউ নাই। (এ কথার জবাবে)...খাদেম সৈয়দ আবদুস সুলতান বলেন, তুই কাফের। তার উত্তরে সবাইকে অবাক করে দিয়ে কসিমদ্দি বলে, আমি মানুষ। (অতঃপর কিছুক্ষণ 'তুই কাফের' এবং 'আমি মানুষ' এই দুই সংলাপের বিনিময় চলে এবং ধাপে ধাপে স্বর ওঠে দুজনেরই।) শেষে কসিমদ্দি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, এইবার মুঁই ঢাকা যামো, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একুশে ফেব্রুয়ারি দেখিমো, শহীদ মিনারে গিয়া ফুল দেমো, পত্রিকায় মুঁই দেখিছোঁ ফুলে ফুলে ভরি গেইছে শহীদ মিনার, য্যান বেহেশতের একখান টুকরা হয়া আছে গো। মুঁই সেই শহীদ মিনারে যায়া হামার দ্যাশের যাবত শহীদের নামে সেলাম করিমো, তা হামাক দোজখে সইত্তর হাজার সর্পে ঢংশায় হামার কোনো দুক্ক নাই বাহে।' কসিমদ্দি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দ আবদুস সুলতান বলেন —'কুষ্ঠ হবে, তোমরা দেখে নিও সকলে, ইয়ার যদি কুষ্ঠ না হয়, চন্দ্র সূর্য, আসমান হতে গিরি পইড়বে।' (এরপর ঢাকায় শহীদ মিনারে ফুল দেয়ার পর পুত্রের মুখে ভীতি লক্ষ করে কসিমদ্দি বলে)—'ডরাইস ক্যানে বাপো মোর? দোজখে সাপ যদি ঢংশাইতে ফণা তোলে, শুনি রাখ্, ঐ যে শহীদ মিনারে ফুল দেখলু, ফুলের পাহাড়, একো এক ফুলের একো এক পাঁপড়ি ঢাল হয়া সর্পের ফণা রোধ করিবে।'...

ছোট এই গল্পটিতে আমরা লক্ষ করি, লেখক একদিকে ধর্মের লেবাসধারী ভণ্ড ফতোয়াবাজদের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন, অন্যদিকে একজন সাধারণ আলুপটলের দোকানির— যে হতে পারে এদেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি— মাধ্যমে একটি প্রতিবাদ গড়ে তুলেছেন ভণ্ডদের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে তিনি কসিমদ্দিনের মাধ্যমে এদেশের সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনা, তার জাতীয়তাবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে সূক্ষভাবে চিত্রায়িত করেছেন। এ গল্পের শেষে আরও একটি চমক পাঠকের জন্য রেখে দিয়েছেন লেখক। গল্পের শেষে কসিমদ্দি মারা যায়। সে জাদুঘর দেখতে গিয়েছিল এবং সেখানে সে তারই বংশের একটি গৌরবচিহ্ন আবিষ্কার করে যেটি কিছুদিন আগে তার গ্রাম থেকে লুট হয়েছিল— 'এবং সে প্রাণ দিয়েছে যে কারণে, আমরা কি লক্ষ করব? ঢাকা থেকে আগত, কালো চশমাপ্রিয়, সাফারি-সুট-পরা, শিক্ষিত দস্যুর হাতে একটি বংশের চিহ্ন ডাকাতি হবার জন্য।' — আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না এই 'কালো চশমাপ্রিয়, সাফারি-স্যুট-পরা শিক্ষিত দস্যু' কার প্রতিকৃতি। এ-ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে— ওই বংশের চিহ্ন আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও জাতীয়তার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যা সেই 'শিক্ষিত দস্যুর' আগমনের পর প্রথমবারের মতো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, হুমকিগ্রস্থ হয়, বলতে গেলে একরকম ডাকাতিই হয়ে যায়।

২

সৈয়দ হকের অনেকগুলো গল্পের বিষয়বস্তু নাগরিক মানুষ ও তাদের জীবন। নাগরিক মানুষ যেন আর স্বাভাবিক নেই। যে নিষ্পাপ সরলতা-সহজতা নিয়ে মানুষের জন্ম হয়, নগরের সংস্পর্শে তা ক্ষয়ে যেতে থাকে। যান্ত্রিকতা, জীবনের দুর্মর জটিলতা, অনিবার্য বিচ্ছিন্নতা— এসবই দখল করে নেয় মানুষের যাবতীয় শুভ সম্পর্ক, তার বিশ্বাস ও মানবিক অনুভূতি সর্বোপরি তার সমস্ত আশ্রয়। মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে ওঠে নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন; গতানুগতিকতা আর পৌনঃপুনিকতায় আক্রান্ত এক আনন্দহীন ও যন্ত্রণাদগ্ধ জীবন লাভ করে সে। সৈয়দ হকের এ ধরনের গল্পগুলোতে এসবেরই প্রতীকী চিত্রায়ন দেখতে পাই।

'আনন্দের মৃত্যু' গল্পে আমরা দুটি নাগরিক চরিত্রের দেখা পাই যাদের নির্দিষ্ট কোনো নাম-পরিচয় নেই, যেন তারা যে-কোনো নাগরিক মানুষেরই প্রতিনিধি। চরিত্র দুটো পরস্পর 'বন্ধু' নামক প্রশ্নবোধক সম্পর্কে আবদ্ধ, যদিও তেমন কোনো নিদর্শন তাদের মধ্যে দেখা যায় না, কারণ তারা পৃথিবীর কোনো বিষয়েই একমত হতে পারে না শুধুমাত্র— 'জীবনে আর কোনো স্ফূর্তি নেই'— এই একটি বিষয় ছাড়া। যেন এটাই তাদের জীবনের একমাত্র সত্য, আর সবকিছুই দ্বিধাদ্বন্দ্বে আক্রান্ত, প্রশ্ন ও সংশয়ের মুখোমুখি। তাদের জীবনে কোনো আনন্দ নেই, বৈচিত্র্য নেই, পরিবর্তন নেই। তীব্র গতানুগতিকতা ও পৌনঃপুনিকতায় আক্রান্ত এই জীবনে কিছুটা আনন্দ আনার জন্য তারা প্রতিদিন সন্ধ্যায় বার-এ এসে বসে, খানিকটা নেশায় ঘোরগ্রস্ত হয়, নিজেদের দৈনন্দিন জীবনযাপন কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভুলে থাকে। সেখানে তারা নিতান্ত সাধারণ একটি দৃশ্যে অতি আমোদ খুঁজে পায়। দৃশ্যটি হচ্ছে— একটি লোক মদ খেয়ে উঠে দাঁড়ালে প্রথমে একটি টাল খায়, তারপর সোজা হেঁটে যায়। তারা দৃশ্যটির প্রেমে পড়ে যায়। নিয়মিতভাবে শুধুমাত্র দৃশ্যটি দেখার উন্মুখ প্রত্যাশায় তারা বার-এ আসতে থাকে। গল্পটি আমাদেরকে অ্যাবসার্ড নাট্যকার আর্থার অ্যাডামোভের বহুল আলোচিত একটি নাটক 'পিং পং'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে এরকমই দুটো চরিত্র একদিন পিংপং মেশিনে খেলতে এসে ওটির প্রেমে পড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ওই একটি মেশিনকে কেন্দ্র করেই তাদের পুরো জীবন কেটে গেছে। বাইরের জীবন ও পৃথিবী থেকে তারা বিচ্ছিন্ন থেকেছে, কোনো স্বপ্ন বা কল্পনা তাদের প্রলুব্ধ করেনি। বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতায় আক্রান্ত, স্বপ্ন ও প্রত্যাশাবিহীন বিপন্ন মানবজীবনের এক অসাধারণ প্রতীক চিত্রায়ণ ছিল ওটি। 'আনন্দের মৃত্যু' গল্পেও আমরা দুর্বহ পৌনঃপুনিকতা আর গভীর বিচ্ছিন্নতার প্রতীকচিত্র দেখতে পাই। এই পরিস্থিতি আসলে নাগরিক মানুষের ফাঁপা সম্পর্কের আভাস দেয়, পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাবোধকেই তীব্রভাবে মূর্ত করে তোলে। গল্পের শেষে আমরা দেখি, যে-দৃশ্যটি তাদের ভেতরে গভীর আনন্দের সৃষ্টি করতো, তার মৃত্যু ঘটছে। জীবনে কিছুই আর থাকে না আনন্দিত হওয়ার মতো কিংবা বেঁচে থাকবর আনন্দ হিসেবে, থাকে শুধুই গভীর ক্লান্তি, বেদনা আর যন্ত্রণা।

'মানুষ' গল্পে আমরা— মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসবোধ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে— এই সত্যের প্রতিভাস দেখতে পাই। গল্পের দুটি চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, পূর্বোক্ত গল্পের মতো এদেরও কোনো নাম-পরিচয় নেই, যাদের একজন আরেকজনকে এরকম শত্রুতা করে জেলে ঢুকিয়েছিল। জেল-ফেরত ব্যক্তিটি একদিন চলার পথে ভয়াবহ ঝড়ের মধ্যে পড়ে যায়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক প্রচণ্ড ঘূর্ণি বাতাস... দু-চোখ অন্ধ করে দিয়ে ধুলোর একটা ফাঁপা দেয়াল গড়ে ভেঙে ছিটিয়ে গড়িয়ে চলে যেতে লাগল হু হু করে।... আমি দৌড়ুতে লাগলাম।... রাস্তার সবাই দৌড়ুচ্ছে, কেউ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না;... আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সেখানে যেন তুষের আগুন। পুরু মেঘে যে-আকাশটা ঢাকা, সে-আকাশ লাল হয়ে উঠছে।... সেবার এ-শহরের ওপর দিয়ে সাইক্লোন হয়ে গেল, একটা জাহাজকে উড়িয়ে নিয়ে ডাঙায় তুলে রাখল, বিষাক্ত সাপ আর মানুষ বন্যার মুখে পাশাপাশি আশ্রয় নিল, কিন্তু সাপ কাটলনা মানুষকে। বোধহয় সেবারের চেয়ে কম হবে না আজকের ঝড়।

এমন একটি ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে সে এসে একটি অচেনা বাড়ির বারান্দায় আশ্রয় নেয়, ঘটনাক্রমে সেই একই জায়গায় তার শত্রু লোকটি এসে পড়ে, পরস্পরকে দেখে চমকে ওঠে। কিন্তু এক সময় লোকটির মধ্যে প্রবল প্রতিশোধস্পৃহা থাকলেও এই দুঃসময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে তার শত্রুকে ক্ষমা করে দেয়, কিন্তু শত্রুটি তা বুঝতে পারে না। ঝড়ের মধ্যেই সে যাবতীয় অনিশ্চয়তা মাথায় নিয়ে দৌড় দেয়। গল্পের শেষে জেল-ফেরত লোকটির দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়— 'আমি তো মানুষ, তাই সে আমাকে বিশ্বাস করতে পারল না।' যে ঝড়ের মুখে মানুষ আর বিষাক্ত সাপও পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারছে, সেখানে মানুষ পারছে না, কারণ বিশ্বাসবোধ লুপ্ত হয়ে গেছে, এখন পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা অপরিসীম এবং নিঃসঙ্গতা আর বিশ্বাসহীনতার চাপে পড়ে হাঁসফাস করছে মানবিক জীবন।

'পূর্ণিমায় বেচাকেনা' গল্পটি এ-ধরনের গল্পগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে। গল্পে একটি চরিত্রের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে যার সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকাটাই হুমকির সম্মুখীন, স্বপ্নপ্রাপ্ত অর্শরোগের ওষুধ বিক্রির একটি দোকান খুলে বসেছে সে, কিন্তু কোনো ক্রেতা নেই। তার দুরবস্থা দিনদিন জটিল আকার ধারণ করে, তার পক্ষে আহার জোটানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু এই অবস্থায় আরেকজন লোক একটি যন্ত্র তার কাছে বিক্রি করতে আনলে সে যন্ত্রটির প্রায় প্রেমেই পড়ে যায়। এভাবে এই রহস্যময় লোকটি বারবার বিভিন্ন যন্ত্র নিয়ে আসতে থাকে, যার সবগুলোই তার কাছে অচেনা বা অপ্রয়োজনীয়, আর সে তার যাবতীয় আর্থিক প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে সেসব কিনে রাখতে থাকে। এদিকে তার জীবন-যাপন আরও জটিল হতে থাকে, উনুনে আর হাঁড়ি ওঠে না, ক্ষুধায় আহার জোটে না; অথচ লোকটি যখন যন্ত্র নিয়ে আসে সে ব্যাকুল হয়ে পড়ে, যেভাবেই হোক, যা-কিছুর বিনিময়েই হোক সে সেগুলো কিনে রাখতে চায়। বলা বাহুল্য এই গল্পটিও প্রতীকী তাৎপর্যপূর্ণ। যন্ত্রের জন্য লোকটির ওই উদ্বেলতা কি আমাদেরই চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য নয় যে আমরা পুরোপুরি আধুনিক নাগরিক জীবন-যাপনের লক্ষ্যে নিজেদেরকে প্রায় যন্ত্রে পরিণত করি এবং বুঝতেই পারি না যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের মানবিক জীবন তাতে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে যন্ত্রের কাছে, যেমন গেছে ওই লোকটির? গল্পের শেষে আমরা দেখি, রহস্যময় লোকটি এবার আর কোনো যন্ত্র নয়, একজন নারীকে নিয়ে এসেছে। লোকটির কথায় বোঝা যায়— নারীটি তার 'ঘরের জিনিস'। তাহলে কি এটাই সত্য যে নাগরিক জীবনে যন্ত্রের কাছে, যান্ত্রিকতার কাছে শুধু মানুষের সুস্থ বেঁচে থাকাই নয়, মানুষও স্বয়ং বিক্রি হয়ে যায় ওই যন্ত্রের মতো 'জিনিস' হিসেবে। মানুষ সে যেমনই হোক, 'মানুষ' হিসেবে বেঁচে থাকাটা আর সহজসাধ্য নয় এই নগরে; যে-কোনোভাবেই হোক, মানুষের জীবন হরণ হয়ে যাবে, অমানবিক, যান্ত্রিক হয়ে যাবে— নগরের এই যেন এক অনিবার্য নিয়ম।

আমাদের এখানে মধ্যবিত্তদের নিয়ে প্রচুর মনগড়া কাহিনী লেখা হয়। খুব সম্ভবত বর্তমান বাংলাসাহিত্যের লেখকদের সবচেয়ে প্রিয় চরিত্র মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্তকে দিয়ে যা-ইচ্ছে করানো যায়, কারণ তার নির্দিষ্ট কোনো চরিত্র নেই, সুনির্দিষ্ট কোনো রূপ নেই। একথা অনস্বীকার্য যে মধ্যবিত্তরাই আবহমান মূল্যবোধগুলোকে তীব্রভাবে ধারণ করে, নানারকম বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয় অথবা অংশগ্রহণ করে; কিন্তু এ-ও সত্য যে তারাই সবচেয়ে আগে আপোস করে। এই দ্বৈতচরিত্র-সম্পন্ন মধ্যবিত্তকে খুব বেশি তুলে আনা হয়নি আমাদের সাহিত্যে। সৈয়দ হকও এই শ্রেণীর চরিত্র চিত্রণে দ্বৈতরূপটি আনেননি। আবার তাঁর এ ধরনের গল্পগুলোকে ঠিক গতানুগতিকও বলা যাবে না। তাঁর গল্পে মধ্যবিত্তের আবেগ-অনুভূতি, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি আর জীবনজোড়া হা-হুতাশের চিত্র নেই। তাঁর চরিত্রগুলো দাঁড়িয়ে আছে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, তারা যতটা না তাদের ঘরের বেদনাক্লিষ্ট জীবনযাপনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত, তারচেয়ে বেশি বহির্জগৎ ও জীবনের প্রেক্ষাপটে। দৈনন্দিন আবেগের প্রেক্ষাপটে রচিত 'শীতবিকেল' গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে। এই গল্পটিতে মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন কিশোরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা তার পরিপার্শ্ব বর্ণিত হয়েছে উত্তমপুরুষে। একজন কিশোর তার নিষ্পাপ, নির্মল, সরল হৃদয় নিয়ে তার পরিবারের উত্থান-পতন দেখছে, আনন্দ-বেদনা, গৌরব ও লজ্জা দেখছে। তাদের মূল্যবোধগুলোকে পর্যবেক্ষণ করছে, তাদের অহংকার ও ভয় দেখছে। সবকিছুতেই তার অংশগ্রহণ আন্তরিক এবং গভীর। যেটুকু সে অনুভব করে সেটুকুকে একজন কিশোর বলেই এড়িয়ে যাওয়া বা তুচ্ছ করা তার পক্ষে অসম্ভব। এসব দেখে-দেখে তার ভেতরে সৃষ্টি হয় অজস্র-অসংখ্য অনুভূতির— যে অনুভূতি নিয়ে সে বেড়ে উঠবে, যে আনন্দ-বেদনার স্মৃতি নিয়ে তার সারাটি জীবন কাটবে, যে মূল্যবোধগুলো দিয়ে সে পরিচালিত হবে। আমাদের সাহিত্যে কিশোরের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের এমন অসাধারণ বর্ণনাময় গল্প খুব সুলভ নয়। এই ভিন্ন ধরনের গল্পপাঠে পাঠক অভিভূত হন, অনিবার্যভাবে একবারের জন্য হলেও ফিরে তাকাতে বাধ্য হন তার কৈশোরের স্বপ্নময় দিনগুলোর দিকে, তার ওই বয়সের আবেগ-অনুভূতি-সম্পর্ক আর স্মৃতির দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার 'স্বপ্নের ভেতর বসবাস' গল্পে এক মফস্বলী যুবকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ মেলে যে নানারকম বঞ্চনা ও অবহেলায় হতাশ ও বিবর্ণ। প্রত্যাখ্যাত হতে হতে সে একসময় নিজের অজান্তে বলে ফেলে 'আমি যাচ্ছি'। এ মূলত তার অন্তর্গত উচ্চারণ, এইসব বঞ্চনা ও অবহেলা থেকে, নৈরাশ্য ও বেদনা থেকে সে দূরে কোথাও চলে যেতে চায়, কোথায় সে জানে না, এ যেন তারই প্রতীকী কথন। কিন্তু সেই উচ্চারণটিই সবাই লুফে নেয়। সে তখন মিথ্যে করে বলতে বাধ্য হয় যে সে মধ্যপ্রাচ্য যাচ্ছে। এই তথ্য দেয়ার পর তার প্রতি সবার আচরণ পাল্টে যায়, বন্ধুরা ঈর্ষার চোখে দ্যাখে, পারিবারিক সদস্যদের মমতা ও ভালোবাসা দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে বেড়ে যায়; যেসব তরুণী তাকে দেখে তাচ্ছিল্যভরে চোখ ফিরিয়ে নিত, তারা আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকে, চিরকুট পাঠায়। তার পৃথিবী স্বপ্নিল হয়ে ওঠে। যদিও সে জানে, কোথাও কখনো যাওয়া হবে না তার, তবু তার চোখ আর হৃদয়জুড়ে থাকে স্বপ্ন, স্বপ্নঘোরগ্রস্ত অবস্থায় তার জীবন প্রবাহিত হতে থাকে। এ-ও এক ফ্যান্টাসি বটে। যা সে নয়, যা সে হতেই পারে না, সেই কল্পনায় ও স্বপ্নে তার দিন কাটে। এই কল্পনা, এই স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত তার দীনতা, তার অসহায়ত্ব ও দুর্দশা, তার নৈরাশ্য ও বেদনাকেই তীব্রভাবে মূর্ত করে তোলে, তার বিপন্ন জীবনকে তীব্রভাবে বিদ্রুপাত্মক করে তোলে যা পাঠকহৃদয়ে গভীর মমতা ও ভালোবাসার সৃষ্টি করে এবং গল্পের ভিন্নমাত্রিক ব্যঞ্জনায় পাঠক তৃপ্তি লাভ করে।

৩

সৈয়দ শামসুল হকের অন্যান্য গল্পের মতোই প্রেমের গল্পগুলোও পাঠকের কাছে ভিন্নমাত্রা নিয়ে হাজির হয়। গতানুগতিক পুতুপুতু-মার্কা কোনো প্রেম নেই এসব গল্পে, যে প্রেম আছে তা এতটা অগভীর নয় যে সহজেই তার সবটুকু পড়ে ফেলা যাবে, আবেগ আছে কিন্তু সেই আবেগেরও রাশ টেনে ধরে রাখেন তিনি, তীব্র অনুভূতি আছে কিন্তু তা শুধু ওই প্রেমকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খায় না, সমগ্র জীবনটাই চলে আসে সেখানে; সংলাপগুলোতেও তিনি দার্শনিক উপলব্ধির এবং গভীর জীবনবোধের প্রমাণ রাখেন।

'ফিরে আসে' গল্পের কথাই ধরা যাক। এই গল্পে আমরা পঞ্চাশ দশকের সৈয়দ শামসুল হককে খুঁজে পাই, ফজলে লোহানীকে (গল্পে যে আব্দুল্লাহ) মনে পড়ে। প্রেম এখানে গভীর। কামনা তীব্র কিন্তু তারচেয়ে বেশি তীব্র বোধহয় একজন লেখকের লিখতে না-পারার বেদনা, একজন শিল্পীর ছবি আঁকতে না-পারার কষ্ট। ওই সময়টির কথা যদি আমরা মনে রাখি, বুঝতে পারি, ব্যক্তিগত জীবন-যাপন ততটা জটিল না হলেও একজন লেখক কেন লিখতে পারেন না, একজন শিল্পী কেন ছবি আঁকতে পারেন না—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখন আমি কিছুই লিখতে পারব না। এখন তায়মুর কোনো ছবিই আঁকতে পারবে না, এখন একজন আবদুল্লাহ লিখতে না-পেরে বিদেশে চলে যাবে। কারণ আমাদের কিছুই নেই পেছনে, কিছুই নেই সামনে। আমরা কিছুই বিশ্বাস করি না। আমাদের পায়ের নিচে সিঁড়ি নেই। এ হচ্ছে এমন এক সময়, আমরা কিছুই করতে পারব না, আমরা বয়ে যেতে পারব। আমাদের ভঙ্গি থাকবে, চাল থাকবে, মুখোশ থাকবে কিন্তু হাত থাকবে না স্রষ্টার।'

পঞ্চাশের সেই বিপন্ন ও আত্মপরিচয় খুঁজে-ফেরা সময়ের এর চেয়ে চমৎকার সংজ্ঞা আর কী হতে পারে? আর এই কথাগুলো কি আজকের যে-কোনো শিল্পীর জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য নয়? সৈয়দ হকের প্রেমের গল্পের সার্থকতা এখানেই, মানব-হৃদয়ের অলি-গলি চিহ্নিত করার সঙ্গে সঙ্গে সময়কেও অতি চমৎকারভাবে ধরে রাখেন তিনি, এবং এই অবলোকনের মধ্যে থাকে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যে অর্ধ-শতক পরও তাকে সমসাময়িক মনে হয়।

'রুটি ও গোলাপ' গল্পের চরিত্রগুলো একই। বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে গল্প থেকে কিছু অসাধারণ দার্শনিক পঙক্তি উদ্ধৃত করা যাক। মেয়েটির সংলাপ—

'জীবনের সৌধ গড়ে কী হবে? মৃত্যু চায় তার বিরাট ক্ষুধা আমাকে তোমাকে সবাইকে দিয়ে মেটাতে। একদিন মনে করতাম জীবনের মতো কিছু হয় না। আজ মনে হয়, মৃত্যুই মানুষের ঈশ্বর। তাকে তুষ্ট করবার জন্য জীবনকে বড়, মহৎ, কীর্তিময় করে তুলি। জীবন যত বড়, যত ভালো হবে, মৃত্যু তত বেশি করে বাজবে। মৃত্যুকে বড় করবার জন্য আমরা জীবনকে বড় করি।'

অথবা ছেলেটির ভাবনা—

'মানুষ বেঁচে থাকে কেন? জানি না। জানি না। কোনো কারণ নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই। মানুষ বেঁচে থাকে কেন না নিয়ম তাকে জন্ম দিয়েছে, বিবর্তন তাকে চেতনা দিয়েছে, সভ্যতা তাকে বুদ্ধি দিয়েছে। যদি আমি মানুষ না হয়ে একটা গাছ হতাম তো কী হত? যদি আমি মানুষ না হয়ে হিমালয়ের একটুকরো বরফ হতাম তো কী হত?'

অথবা—

একটা গাছ হেলে পড়েছে, তার নিচে ছায়া, সেই ছায়ায় শুয়ে আমার কারণহীন কান্না কারো জন্য নয়— না আমার জন্য, না আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কারো জন্য। কান্না পেল কারণ এই আকাশটা অনেক বড়, এই মাটিতে অনেক দুঃখ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পৃথিবীটা দুঃখী মায়ের মতো। ঐ দূর ওপার থেকে মানুষ আসছে যাচ্ছে পৃথিবী জেগে উঠেছে, গাছ দাঁড়িয়ে আছে, বাতাস বইছে, শস্য বড় হচ্ছে, নৌকোয় গতির ঘোর লেগেছে— সবকিছু মিলে একটা প্রচণ্ড বেদনা। বেদনা কেননা তা বুঝতে পারি না।'

গল্পের শেষে আমরা দেখি, ছেলেটি জীবনের সংশয় আর মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মিথ্যার সঙ্গে আর আপোস করছে না। সত্য ও সুন্দরের জয় পরিশেষে জীবনকেই বড়ো করে তোলে, জীবনকেই মাহিমান্বিত, সুন্দর ও গৌরবজনক করে তোলে। সৈয়দ হকের প্রেমের গল্প বলে পরিচিত গল্পগুলো এভাবেই দার্শনিকবোধ-সম্পন্ন জীবনধর্মী গল্প হয়ে যায়।

উপসংহারের পরিবর্তে

যে-কথাটি এই রচনার শুরুতেই বলা হয়েছিল এখানে সেটির পুনরাবৃত্তি করতে চাই। সৈয়দ শামসুল হকের যে বিপুল কর্মের জগৎ, লক্ষ করলে দেখা যাবে, তিনি নির্দিষ্ট কোথাও নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। ভাষা, বিষয়, উপস্থাপনা প্রভৃতি নানা দিক থেকে তিনি নিজেকে বদলে ফেলেছেন। ধীরে ধীরে তৈরি করেছেন নিজস্ব একটি ভঙ্গি— কী ভাষায়, কী প্রকরণে— তাঁর লেখাটি যে সৈয়দ হকেরই লেখা সেটি চিহ্নিত করতে পাঠককে কোনোরকম কষ্টই করতে হয় না।

তাঁর গল্পগুলোতে রচনাকাল দেয়া নেই কিন্তু গল্প থেকেই অনেক ক্ষেত্রে সময়কে নির্ণয় করা সম্ভব এবং পাঠক লক্ষ না করে পারেন না যে, তাঁর প্রথম দিককার গল্পগুলোর চেয়ে সাম্প্রতিককালের গল্পগুলোর ভাষা ও আঙ্গিক কী অসাধারণ কুশলতায় বদলে গেছে। 'ফিরে আসে' বা 'রুটি ও গোলাপ' গল্পের যে ভাষা ও উপস্থাপনা, 'গাধা জ্যোৎস্নার পূর্বাপর' গল্পের ভাষা ও উপস্থাপনা তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অন্যদিকে প্রথমদিকের গল্পগুলোতে তিনি আখ্যান-বর্ণনার দিকে যতটা মনোযোগী ছিলেন, পরবর্তীকালে সেটিও পাল্টে ফেলেছেন, বিশেষ করে আঙ্গিকে এমন এক পরিবর্তন এনেছেন যে, মনে হয়, লেখক কেবল গল্পটিই বলছেন না, বরং পাঠকদের সঙ্গেও কথা বলছেন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছেন, আখ্যানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তোলার জন্য পাঠককে সরাসরি সম্বোধন করছেন, যেন পাঠক নিজে কেবল দর্শকের অবস্থানে না থেকে নিজেও অংশগ্রহণ করে। বিশেষ করে রাজনৈতিক ধারার গল্পগুলোতে তাঁর এই কৌশল বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এসব গল্পকে অবশ্য তিনি নিজে শুধুমাত্র 'গল্প' না বলে 'গল্পপ্রবন্ধ' নামে অভিহিত করে থাকেন, কিন্তু এগুলো পাঠ করে একটি 'গল্প' পাঠেরই আনন্দ হয়। গল্পকে তিনি স্রেফ ঘটনা-বর্ণনার দায় থেকে মুক্ত রেখেছেন বটে, কিন্তু 'গল্পহীনতা'র দায়ও নেননি, আবার একটি মেসেজ দিতে গিয়ে সেটিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্লোগানসর্বস্বও করে তোলেননি— শিল্পমানের ব্যাপারে তাঁর এই আপোসহীন অবস্থান তাঁর গল্পকে অধিকতর সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে।

সৈয়দ হক তাঁর গদ্যভাষাকে একটি উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। শব্দের ব্যবহার ও বাক্যের গঠনে তিনি এমন গভীর সচেতনতার পরিচয় দেন যার তুলনা মেলা ভার। আবার কিছু গল্পে, বিশেষ করে যেসব গল্পে উত্তরবঙ্গ উঠে এসেছে, তাঁর ডায়ালেক্টের ব্যবহার ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। গল্পগুলোতে ঐ অঞ্চলের মানুষ ও তাদের জীবনকে চিত্রিত করার জন্য তাদের মুখের ভাষা হুবহু তুলে এনে তিনি যে বিশ্বাসযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর।

সৈয়দ হকের গল্পে প্রতীকের প্রবল প্রচুর ব্যবহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেক গল্পেই তিনি প্রতীক ব্যবহার করেন অতি কুশলতার সঙ্গে। যে-কথাটি তিনি বলতে চান সেটি সরাসরি না বলে প্রতীক ব্যবহার করার ফলে পাঠক কোনো-একটি চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্তে আবদ্ধ না হয়ে বহুমাত্রিক ভাবনায় আন্দোলিত হতে পারেন। মানুষ এবং তার জীবন ও পরিপার্শ্ব, কর্ম ও ভাবনাকে কখনো একক সংজ্ঞা দিয়ে আবদ্ধ যায় না, গল্পে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা তাই পাঠককে দূরে ঠেলে দেয়। সৈয়দ হক সেই সত্যটি জানেন, তাঁর প্রতীক ব্যবহার তাই এতটা কুশলী ও মোহনীয় হয়ে ওঠে। এবং এই সব কিছু এবং আরও অনেক কিছু নিয়েই তিনি হয়ে উঠেছেন আমাদের অন্যতম প্রধান লেখক।

AMARBOI.COM

রচনাকাল : এপ্রিল, ১৯৯৪
প্রথম প্রকাশ : ২২ ডিসেম্বর, ১৯৯৫, দৈনিক জনকণ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসান আজিজুল হক : গল্পে বাঙালির ইতিহাস নির্মাণ

হাসান আজিজুল হক বাংলাদেশের সাহিত্য-রুচির প্রেক্ষাপটে এক বিস্ময়কর চরিত্র। তিনি শুধুই গল্পকার, উপন্যাসের ধারে-কাছে খুব একটা যাননি (এই কিছুদিন আগে কেবল তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস লিখলেন), শুধুমাত্র গল্পচর্চা করেও যে দেশের অন্যতম প্রধান লেখকে পরিণত হওয়া যায় তিনি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সমাজের ক্ষয়ে যাওয়া, নিস্প্রভ, সম্ভাবনাহীন, পরাজিত মানুষ তার গল্প-ভুবনের প্রধান অনুষঙ্গ। শ্রেণী-বৈষম্যের এই সমাজে তাঁর গল্পের প্রাসঙ্গিকতা তাই অনস্বীকার্য। আর শুধু শ্রেণী-সচেতনতার কথাই বা বলি কেন, তিনি তাঁর গল্পে কত ভাবে ভেঙেচুরে যে জীবন ও পৃথিবীকে দেখিয়েছেন, কতগুলো কোণ থেকে যে জীবনের ওপর আলো ফেলেছেন তার কোনো হিসেব-নিকেশ নেই। তাঁর গল্পে সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে কোনো ভাববিলাস নেই, এতটুকু আবেগ নেই কোথাও, স্বপ্ন আছে বটে, নেই স্বপ্ন নিয়ে মোহগ্রস্থতা। এবং তাঁর ভাষা— এ এমন এক সম্পদ যে তাঁর গল্প পাঠের সময় কবিতা পাঠের আনন্দ হয়, গদ্যভাষাকে তিনি এমনই এক উঁচু পর্যায়ে নিয়ে গেছেন।

১৯৩৯-এ জন্ম হাসান আজিজুল হকের, আর লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ষাটের দশকে। কৈশোরেই প্রত্যক্ষ করেছেন দেশভাগের মতো মর্মদন্ত ঘটনা, দুই বঙ্গের মানুষের দেশত্যাগের বেদনা— (তিনি নিজেও স্বদেশ ছেড়ে এই বাংলায় থিতু হয়েছেন), সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দিয়ে একটি জাতির পরিচয় নির্মাণের চেষ্টা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা-দুর্ভিক্ষ, মানুষের করুণ বেঁচে থাকা, আর এসবকিছুর মধ্যে বাঙালির প্রতিরোধ চেতনার স্ফুরণ ও বিকাশ। ষাটের দশকটি বাঙালির জন্য নানাদিক থেকেই সংকটের এবং নির্মাণেরও বটে। এই সংকটমুখর সময়ে, ভাঙন ও নির্মাণের এই প্রক্রিয়ায় হাসান এবং তাঁর সহযাত্রীরা বরাবর যথার্থ সাড়া দিয়েছেন। এসবকিছুর চিহ্ন পাওয়া যাবে তাঁর গল্পে, নানাভাবে, নানা মাত্রায়।

১

বাঙালির জীবনে অনেক কবিতা যেমন স্মৃতির অন্তর্গত হয়ে গেছে, তেমনি গেছে হাসানের কয়েকটি গল্পও। এমন কোনো গল্প-পাঠক নেই যিনি 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' অসংখ্যবার পড়েননি, কারণে-অকারণে গল্পটির কথা তার মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়েনি। পৃথিবীর সকল সফল লেখকই আসলে স্মরণযোগ্য লেখক, উদ্ধৃতিযোগ্য লেখক। কোনো-কোনো লেখককে যে জীবনের নানা পর্যায়ে, নানা প্রয়োজনে আমরা উদ্ধৃত করি, তার কারণ— তাঁদের লেখাগুলো আমাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে, আমাদের জীবনকে কোনো-না-কোনোভাবে প্রভাবিত করেছে। হাসানও তেমন লেখক। ওই গল্পটি ছাড়াও আরও অনেক গল্পের কথাই এক নিঃশ্বাসে বলে যাওয়া যায়, যেগুলো, ধারণা করি— বাংলা কথাসাহিত্যে ইতিমধ্যেই স্থায়ী আসন গেড়ে নিয়েছে। যেমন— 'তৃষ্ণা', 'মন তার শঙ্খিনী', 'আমৃত্যু আজীবন', 'শোনিত সেতু', 'খাঁচা', 'জীবন ঘষে আগুন', 'নামহীন গোত্রহীন', 'সাক্ষাৎকার', 'পাবলিক সার্ভেন্ট', 'মা-মেয়ের সংসার' ইত্যাদি।

হাসানের সবচেয়ে বিখ্যাত গল্প 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' কেন এমন বিপুল গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে সেটি একবার বিচার করে দেখলেই তাঁর শক্তিমত্তার জায়গাটিকে শনাক্ত করা সম্ভব বলে মনে করি। 'এখন নির্দয় শীতকাল, ঠাণ্ডা নামছে হিম, চাঁদ ফুটে আছে নারকেল গাছের মাথায়।' — এই বাক্য দিয়ে গল্প শুরু হয়ে প্রায় এক প্যারা জুড়ে চলে পরিবেশ বর্ণনা। তৃতীয় প্যারায় একটি চরিত্র, ইনামের, দেখা মেলে। একটু পর আরও দুজন মিলে রওনা হয়, হেঁটে চলে, তাদের চারপাশের পরিবেশ-প্রতিবেশের অনুপুঙ্খ বর্ণনাসহ গল্পও এগিয়ে চলে, কিন্তু তাদের গন্তব্য থাকে অস্পষ্ট। শুধু ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে তাদের ক্লিষ্ট, ব্যর্থ, হতাশ জীবন-যাপনের চিত্র। গল্পের শেষে আমরা দেখি, তারা একটি বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে— বোঝা যায় এটিই তাদের গন্তব্য ছিল— এবং তাদের দুজন বাড়ির বুড়োটার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে তার মেয়েকে শয্যাগত করতে গেছে, আর ইনাম বসে বসে বুড়োর গল্প শুনছে। এই তো গল্প। এই সাদামাটা গল্পটি কেন এত দীর্ঘকাল ধরে পাঠককে আপ্লুত করে যাচ্ছে? গল্পের বুড়ো, দেশভাগের ফলে নিজ বাসভূম থেকে ছিটকে পড়া মানুষ— আর, 'যে দেশ ছেড়েছে তার ভেতর বাইরে নেই, সব এক হয়ে গেছে'— এবং এখানে সে পরিবার-পরিজন নিয়ে না খেয়েই মরে যেত যদি ওরা না আসতো। বুড়ো তো মরতে চায় না, চায় বেঁচে থাকতে, কিন্তু এই বেঁচে থাকাটা কী ভয়াবহ গ্লানিকর। স্বদেশ ত্যাগের বেদনা বেশ ভালোভাবেই টের পাওয়া যায়, কিন্তু তারচেয়ে তীব্র এই গ্লানিবোধ, তারও চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার বেঁচে থাকা। জীবনের হলাহল সে প্রতিমূহূর্তেই পান করছে, বিষ দিয়ে সে এই জীবনের ইতি টানতে চায়। পারে না। পারবে বলে মনেও হয় না। যত গ্লানিময়ই হোক না কেন— মৃত্যুর চেয়ে তার কাছে জীবনই বড়, নইলে কী আর জীবন ধারণের জন্য টাকার বিনিময়ে নিজ কন্যাকে অন্যের শয্যাসঙ্গী হতে দেয় কেউ? এই গল্পের শেষের অংশটি এরকম—

> বুড়ো গল্প করছে...আমি যখন এখানে এলাম, হাঁপাতে হাঁপতে, কাঁপতে কাঁপতে সে বলছে, বুঝলে যখন এখানে এলাম— আমি প্রথম একটা করবী গাছ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগাই... তখন হু হু করে কে কেঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এলো, এলোমেলো শাড়ির শব্দ আর ইনামের অনুভবে ফুটে উঠলো নিটোল সোনারঙের দেহ— সুহাস হাসছে হি হি হি— আমি একটা করবী গাছ লাগাই বুঝলে? বলে থামল বুড়ো, কান্না শুনল, হাসি শুনল, ফুলের জন্য নয়, বুড়ো বলল, বিচির জন্যে, বুঝেছ, করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে। আবার হু হু ফোঁপানি এলো— প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই বুঝেছ, আর ইনাম তেতো তেতো— এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন কাঁদতিছ তুমি?

এই অংশটিই গল্পটির মূল শক্তি। দেশভাগের ফলে শেকড়চ্যুত মানুষের তীব্র যন্ত্রণা আর বেঁচে থাকবার তীব্র আকুলতা ধরা পড়েছে এই বর্ণনায় এক অসামান্য ইঙ্গিতময়তায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আমাদের উপহার দিয়েছিল দেশভাগের মতো এমন এক বিমূঢ় অভিজ্ঞতা যে, বাস্তুচ্যুত একজন মানুষ অভিবাসী হয়ে 'এখানে' এসে প্রথমেই লাগিয়েছিল একটি করবী গাছ— ফুলের জন্য নয়, বিষের জন্য! দেশত্যাগের সমান্তরালে বিষপানের এই চিত্র দেখে শিউরে উঠি আমরা, আর গল্পের একদম শেষে এসে যখন বুড়োকে কাঁদতে দেখি, তখন নিজেরাই কেঁদে উঠি। দেশভাগের বিপর্যয়জনিত বাঙালির কান্নাকে এক অসাধারণ কুশলতায় ধরেছেন হাসান এই গল্পে, এবং একটি গল্পে যখন একটি জাতির কান্না মূর্ত হয়ে ওঠে তখন যে সেটি সেই জাতির স্মৃতির অন্তর্গত হয়ে যাবে তাতে আর সন্দেহ কি? হাসান হচ্ছেন সেই অসামান্য গল্পশিল্পী যিনি তাঁর গল্পে এই জাতির কান্নাকে মূর্ত করে তুলতে পেরেছেন।

দেশত্যাগের এইসব গল্প কেন এমন আপ্লুত করে পাঠককে? যে দেশত্যাগে বাধ্য হয়, যে বাস্তুচ্যুত হয়, সে আসলে কী হারায়? একখণ্ড জমি, একটি বাড়ি, কয়েকটি ঘর, গাছপালা, আর কিছু স্থাপনা? না, এগুলোই সব নয়, একইসঙ্গে হারায় তার জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি ও সম্পর্ক, হারায় পূর্বপুরুষের পদচিহ্ন, প্রিয়চিহ্ন সবই। এই মর্মান্তিক যন্ত্রণার কথা ভিন্নমাত্রা নিয়ে এসেছে হাসানের 'উত্তর বসন্তে', 'খাঁচা', 'একটি নির্জল কথা' প্রভৃতি গল্পেও।

'উত্তর বসন্তে' গল্পের পরিবারটি দেশত্যাগ করে যে বাড়িতে এসে উঠেছে সেটি যেন মানুষের বসবাসযোগ্য কোনো বাড়িই নয়, যেন কবরের নিস্তব্ধতা জমে আছে এখানে। যেন এখানে যারা বাস করে তারা আর বেঁচে নেই, সবাই জীবন্মৃত। গল্পকার আমাদেরকে জানাচ্ছেন—

অন্ধকার বাড়িটাকে আঁকড়ে ধরে থাকে আর শেষ ভাদ্রে গোটা আকাশটার বৃষ্টি বায়ুতাড়িত হয়ে এই বাড়িটার ওপরেই মুষলধারে বর্ষণ শুরু করে দেয়...তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় সকাল, বৃষ্টি ধরে আসে...কিন্তু তখনও এ বাড়ির শূন্য অভিশপ্ত ঘরগুলোর কোণে কোণে, দৈত্যের মতো গাছগুলির গোড়ায় রাতের অন্ধকার জমে রয়েছে।

এই বাড়ির কর্তা সেই অন্ধকার ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোন না, এমনকি জানালা পর্যন্ত খোলেন না কখনো, কিশোর ছেলেটি উচ্ছন্নে যেতে থাকে, আর একসময় জানা যায়— বাড়ির বড় মেয়েটি কোনো একদিন আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল। যেন কোথাও কিছু নেই আশাবাদী হওয়ার মতো, যেন এই বাড়িতে আর কোনোদিন সকাল হবে না।

'খাঁচা' গল্পটি এগুলো থেকে একটু আলাদা। দেশত্যাগের পরের ঘটনা নিয়ে নয়, প্রস্তুতি নিয়ে গল্পটি লেখা। অম্বুজাক্ষ— যে একসময় সেতার বাজাতো, কিংবা যার হাতে 'বিশ বছর আগে সেতার একসময় বড়ো খুশি হয়ে বেজে উঠতো'— হোমিওপ্যাথ প্র্যাকটিস করে সংসার চালানোর চেষ্টা করে, সেতার আর ঠিকমতো বাজে না। দেশ ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা— অবশ্য অম্বুজাক্ষের চেয়ে তার বউ সরোজিনীরই আগ্রহটা বেশি— কিন্তু সব মিলিয়ে হয়ে উঠছে না। অম্বুজাক্ষ আর তার পরিবার আর এই বাড়িটিকে গল্পে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, সব জায়গায় ক্ষয়ে যাওয়ার চিহ্ন, সব জায়গায় বিষণ্নতা ছড়ানো। বাড়িটি শ্যাওলা ধরা, অম্বুজাক্ষের বড়ো ছেলেটি মরে যায় সাপের কামড়ে, আর বাপ হঠাৎ করে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এই বর্ণনায় এমন এক ইমেজ মনের মধ্যে তৈরি হয় যে, মনে হয় এই সম্পূর্ণ পরিবারটির সামনে আর কোনো সম্ভাবনার আলো নেই। তবু কোনো পরিবর্তনের উদ্যোগ নেই কারো মধ্যে, ওই যে চলে যাবো চলে যাবো ভাব— 'এমন হয়েছে আজকাল যে চুল নখ বড়ো হলে মনে হয় একবারে সেখানে গিয়ে কাটাবো।'

এই যে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি, আসলে কি অম্বুজাক্ষ চলে যেতে চায়? —

> আমরাও যাব, আমরাও যাব। বাজে। বুকের মধ্যে। এইসব পরিত্যাগ করে, এই সবের মধ্যে মরে গিয়ে। সজল আকাশ, ঠাণ্ডা বাড়ি, পুকুরঘাট, শাদা পথ, লতার মিষ্টি গন্ধ, জমির শেখ, পদ্মপিসী এই সবের মধ্যে মরে গিয়ে আবার বেঁচে ওঠা। ...আচ্ছা, আমাদের এই দেশেরই মতো দেখতে কোথাও গেলে হয় না? যেমন ধরো, নদী আছে, গাছপালা একটু বেশি— কোনো ঠাণ্ডা জায়গায়?

এই কথাগুলো পড়ে মনে কি হয় প্রিয় পাঠক, যে, অম্বুজাক্ষ চলে যেতে চায়? এখান থেকে চলে যাওয়ার চেয়ে মরে যাওয়াও অনেক ভালো, ধ্বংস হয়ে যাওয়া অনেক ভালো, অন্তত তার ভাবনার মধ্যে এই কথাটির সমর্থন আছে—

> এখন আগুন দেবার সময়, অম্বুজাক্ষ ভাবলো, একটিমাত্র দেশলাই কাঠি খরচ করলেই হু হু আগুন জ্বলবে, আগুন এগিয়ে যাবে ছাদে, বরগায়, শূন্য ধানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলায়, সরোজিনীর শুকনো হাড়ে। লাগিয়ে দিলে হয়, অম্বুজাক্ষ আবার ভাবলো, তারপর সরোজিনীকে জড়িয়ে ধরি, বুকে টেনে আনি— তারপর আমি, সরোজিনী, বাবা, সূর্য, বরুণ, কমল, ভ্যাবলা সবাই দাঁড়িয়ে থাকি, সর্বনাশ দেখি— শেষে ধ্বংস হয়ে যাই।

অম্বুজাক্ষ আসলে যেতেই চায় না, গল্পের শেষের দিকে এসে তাই সে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে—

আমরা আর যাচ্ছি না সরোজিনী...যাওয়া গেল না আর কি, সব গোলমাল হয়ে গেল। গিয়েই বা লাভ কি বলো?... কোথাও যাব ভাবতেই ভালো— যাওয়া ভালো না...তাছাড়া সবাই কতো ভালোবাসে...

আর তখন সরোজিনীই ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে। যেন ধ্বংস ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই, দেশভাগ আমাদের সেই ধ্বংসযজ্ঞের পথ খুলে দিয়েছিল।

২

শুধু দেশভাগই নয়, বাঙালির ইতিহাসের নানা পর্বে হাসান সাড়া দিয়েছেন, লিখেছেন চমৎকার সব গল্প। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে লিখেছিলেন 'পরবাসী'। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প যখন তীব্র হয়ে উঠেছে, মুসলমান বশীর যখন 'মোচলমানদের দ্যাশ, মোচলমানদের রাজিত্তি' পাকিস্তানে না যেতে পেরে আফসোস করছে, তখন যে ওয়াজদ্দি তীব্রভাবে বলেছিল— 'তোর বাপ কটো? এ্যাঁ— কটো বাপ? এ্যাঁ কটো? একটো তো? দ্যাশও তেমনি একটো। বুইলি?'— সেই ওয়াজুদ্দির মৃত্যু ঘটে তারই দেশের মানুষের হাতে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ার অপরাধে। আর তখন বশীর দেখে— 'ওয়াজদ্দির তাজা লাল রক্ত, তার বিস্মিত মৃত মুখ, দেখে লাল টকটকে আগুনের চাইতেও লাল তপ্ত রক্ত, বল্লম দিয়ে গাঁথা তার সাত বছরের ছেলে, কয়লার মতো কালো ছাব্বিশ বছরের দগ্ধ এক যুবতী।'... প্রতিশোধ নেয় বশীর। কিন্তু তাতে কি কোনোভাবেই এই খুনোখুনির যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়? হয় যে না, গল্পের শেষে আমরা সেটিই দেখতে পাই।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে হাসান লিখেছিলেন 'শোনিত সেতু'। এটি নির্মাণ কৌশলের দিক থেকে হাসানের অন্যতম সেরা গল্প, অন্যদিকে এটিই তাঁর সবচেয়ে সমালোচিত গল্প। সমালোচনা তাঁর সংযমহীনতা নিয়ে, নইলে অসাধারণ একটি গল্প হয়ে ওঠার সমস্ত উপাদানই এই গল্পে রয়েছে। কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রতীকের চমৎকার মিশ্রণে গল্পটি তৈরি হয়। নিশানাথের মৃত্যু-অপেক্ষা, চাষীদের ধান কেটে নেয়ার জন্য শহুরে বাবুদের আগমন, আর দুটো ষাঁড়ের অদ্ভুত লড়াই— এই তিনটি ঘটনা যেন তিনটি চিত্রকল্প,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠককে যা প্রায় বিমূঢ় করে রাখে প্রথম থেকেই। প্রথমত ঘটনাগুলোকে আপাত সম্পর্কহীন বলে মনে হলেও, গল্প এগিয়ে গেলে পাঠক আবিষ্কার করেন— এগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং সবকিছু মিলেমিশে যেন একটি মাত্র ঘটনায় পরিণত হয়েছে— ঘটনাটি মানুষের বাঁচার লড়াই। কিন্তু গল্পের শেষে ক্ষেতমজুরদের একত্রিত হয়ে শহুরে বাবুর বিরুদ্ধে লড়াই করার সংকল্পের পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই, নিশানাথ মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়ে বেঁচে উঠছে, গ্রামের ষাঁড়টি জয়ী হয়ে ভিন গাঁয়ের ষাঁড়টিকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে, আর 'ঐক্যবদ্ধ' চাষীদের চোখের সামনে পুবের লাল আকাশ। অর্থাৎ তারাও ওই ষাঁড় বা নিশানাথের মতো জয়ী হবে, যেহেতু পুবের আকাশে লাল সূর্য উঠেছে! চাষীদের জয় হাসানের কাম্য হতে পারে— সেটিই স্বাভাবিক— কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওরা তো কখনো জয়ী হয় না, চিরকাল ওরা পরাজিত, আর যা-ই হোক গল্প লিখে ওদেরকে জয়ী করা যায় না। গল্পটির এই পরিণতি নিয়ে কথা প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই লেখককে জানিয়েছিলেন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের আগে দেশে এরকম একটি পরিস্থিতি বিরাজ করতো বলে তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে গল্পটি লিখেছিলেন। কিন্তু এই ধরনের 'অনুপ্রাণিত' গল্প কতটা শিল্পসফল হয়, সেটি বলা মুশকিল। অন্তত এই গল্পটিকে, এর সমস্ত শক্তিমত্তা স্বত্ত্বেও, হাসানের উত্তরকাল তাঁর সংযমহীনতার একটি উদাহরণ হিসেবেই বিবেচনা করছে।

তাঁর গল্পে দেশভাগ যেমন, তেমনি মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ বারবার ফিরে ফিরে এসেছে নানা মাত্রায়, নানা ভঙ্গিতে। উদাহরণ হিসেবে তিনটি গল্পের কথা বলা যেতে পারে— 'নামহীন গোত্রহীন', 'কৃষ্ণপক্ষের দিন', এবং 'ফেরা'।

'নামহীন গোত্রহীন' গল্পের যে নামহীন লোকটি তার নিজের শহরে ফিরেছে, সেই শহর এখন মৃত। কোথাও জীবনের সাড়া নেই, কোথাও যেন কিছু ঘটছে না, হানাদার সৈন্যবাহিনী ছাড়া অন্য কোনো মানুষের উপস্থিতিও চোখে পড়ছে না। যেন ভীষণ কোনো ঝড় বয়ে গেছে এই শহরের ওপর দিয়ে, অথবা অন্য কোনো বিপুল বিপর্যয়। যে দরজায় গিয়ে সে করাঘাত করে বন্ধুকে খোঁজে, সেখানে ভীত-সন্ত্রস্ত একটি মুখ উঁকি দিয়ে বলে— এখানে এই নামে কেউ থাকে না, ছিল না কোনোকালে। এক অদ্ভুত বিষণ্ন বর্ণনায় গল্প এগিয়ে চলে, পাঠক প্রায় ধন্দে পড়ে যায়— কে এই লোক, কেন এসেছে, কেনই বা শহরের এই মৃতদশা, কী ঘটে গেছে এই শহরে। শুধু গল্পের মাঝামাঝিতে এসে পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা এক বাঙালিকে নির্যাতনের দৃশ্যটি না থাকলে, সময়টি যে মুক্তিযুদ্ধকালীন, তা-ও বোঝা যেত না, এমনই আড়াল নেয়া হয়েছে এই গল্পে। লোকটি যে তার নিজের শহরেই ফিরেছে, গল্পের শেষ পর্যন্ত না গেলে তা বোঝাই যায় না। অবশেষে সে নিজের বাড়িতে গিয়ে ঢোকে, মমতাভরে নিজের স্ত্রী আর সন্তানের নাম ধরে ডাকে। এ যে তার নিজেরই বাড়ি, আর 'মমতা' ও 'শোভন' যে তার নিজের স্ত্রী ও সন্তানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম, প্রথমত তা-ও বোঝা যায় না, কিন্তু গল্পের শেষদিকে এসে আমরা এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের মুখোমুখি হই—

> সে তার শিরাবহুল পেশল হাতে কোদাল তুলে নিল। দুবার তিনবার নাক আর মুখ থেকে হ্যাঁক হ্যাঁক করে আওয়াজ বের করে উঠোনে কোপ দিল সে। তারপর হেঁট হয়ে একটি পাঁজরের হাড় তুলে নিল হাতে। ...নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে গন্ধ শুকলো, হাত বুলিয়ে দেখল। তারপর আবার চললো উঠোন কোপানো। একে একে উঠে আসছে হাতের অস্থি, হাঁটুর লম্বা নলি, শুকনো সাদা খটখটে পায়ের পাতা।...খুঁজতে খুঁজতে একটি ছোট্ট হাত পেয়ে গেল, সেটাকে তুলে আপনমনেই লোকটা বলল, শোভন, শাবাশ। তারপর উঠে এলো দীর্ঘ চুলের রাশি, কোমল কণ্ঠাস্থি, ছোট ছোট পাঁজরের হাড়, প্রশস্ত নিতম্বের হাড়— তারপর একটি করোটি। খুলিটা হাতে নিয়ে সে ওটার চোখের শূন্য গহ্বরের দিকে চেয়ে রইল।... মমতা– লোকটি বলল। বলে সেটা পাশে নামিয়ে রেখে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে মাটি খুঁড়তে লেগে গেল। পৃথিবীর ভিতরটা নাড়িভুঁড়িসুদ্ধ সে বাইরে বের করে আনবে।

যদি বলি, এ-ই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, খুব কি ভুল বলা হবে? যুদ্ধে সর্বস্ব হারানো মানুষের এই অসহনীয় দৃশ্যচিত্রই কি অনিবার্য হয়ে ওঠেনি বাঙালির জীবনে? কিন্তু এটিই একমাত্র চিত্র নয়, লেখক সেটি মনে রাখেন, আমরা তাই পেয়ে যাই 'কৃষ্ণপক্ষের দিন'-এর মতো গল্প। এই গল্পে মুক্তিযুদ্ধের বীর গেরিলা যোদ্ধাদের দেখা মেলে। আমাদের যুদ্ধে যে নানা বয়সের, নানা শ্রেণী-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ ছিল, মাত্র পাঁচজনকে দিয়ে তিনি সেটি দেখিয়ে দিয়েছেন। কেউ ক্ষেতমজুর, কেউ স্কুল-ছাত্র, কেউ কলেজ-ছাত্র, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। যুদ্ধ, যুদ্ধের কারণ, যুদ্ধের পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে নানারকম কথাও আছে এই গল্পে। যদিও গল্পের শেষে আমরা পাঁচজনের মধ্যে চারজনকেই পাকিস্তানিদের গুলিতে শহীদ হতে দেখি, তবু ওই একজনের হার না মানা চেষ্টা আমাদেরকে জানিয়ে দেয়, লড়াই করে টিকে থাকা ছাড়া আর কোনো বিকল্প উপায় খোলা ছিল না ওই সময়, আমাদের সামনে।

'ফেরা' গল্পের আলেফও মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধ শেষ, গুলি লেগে তার একটি পা প্রায় পঙ্গু হয়ে গেছে, খোঁড়া পা নিয়ে সে এখন বাড়িতে ফিরছে। ফিরতে ফিরতে নিজেকেই প্রশ্ন করছে— 'আমি যুদ্ধে গিইলাম ক্যানো?'— দেশের জন্যি যুদ্ধে গিইলাম'— এইটুকু ছাড়া আর কোনো উত্তর তার মনে পড়ে না। বাড়িতে ফিরে বউকে, যে বউ যুদ্ধের আগে তাকে ছেড়ে গিয়েছিল ভাত দিতে পারে না বলে, সে জিজ্ঞেস করে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লড়াই শেষ হয়ে গিছে জানিস? দ্যাশের কি হলো ক দিনি?...আমরা রাজা বাদশা হবো নাকি বল তো? রাজা বাদশা হবানে মনে হয়।
বউ প্রতিবাদ করল, তা ক্যানো? রাজা বাদশা হবো ক্যানো? আমাদের দুঃখ কষ্ট আর থাকবে না।
মানে?
ভাত কাপড় পাবানি।
ঠিক কচ্ছিস?

আলেফের মায়ের প্রত্যাশাও অতি সামান্য— 'তোরা যারা নড়াইয়ে ছিলি সরকার তাদের ডাকপে না? আমি আমার এই ভিটের চেহেরা ফেরাবো আলেফ কয়ে দেলাম। আর জমি নিবি এট্টু। এট্টা গাই গরু আর দুটো বলদ নিবি— আর—'

কিন্তু আলেফ নির্বিকার এবং সন্দিহান। ভাতকাপড় পাওয়া যাবে কী না, সেই শঙ্কা কাটেনি তার। বউকে তাই সে জিজ্ঞেস করে, এখানে খেতে না পেলে সে আবার চলে যাবে কী না। আর যখন সরকারের তরফ থেকে অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ আসে সে সেটা ফেরত না দিয়ে বাড়ি-সংলগ্ন ডোবার মধ্যে ফেলে দেয়, ভাবে— 'ডোবাটা ছোটো— রাইফেলটা খুঁজে পেতে তেমন কষ্ট হবে না।'

যাদের স্বপ্ন কেবল ভাত-কাপড় পাওয়া, একটা গাই, দুটো বলদ, একটুকরো জমি পাওয়া— সেই জনগোষ্ঠীর স্বপ্ন তো পূরণ হলো না! তাহলে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য কোথায়? নাকি ডোবায় ফেলে দেওয়া অস্ত্রটি আবার খুঁজে নেবে আলেফের মতো অন্তজ শ্রেণীর মুক্তিযোদ্ধারা?

৩

হাসান আজিজুল হক স্বভাবতই রাজনীতি মনস্ক। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়, আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারে কিংবা প্রবন্ধে-নিবন্ধে তো বটেই, তাঁর বহু গল্পেও তিনি সেই রাজনীতি মনস্কতার পরিচয় রেখেছেন।

'পাতালে হাসপাতালে' গল্পের হাসপাতালটিই যেন এক টুকরো বাংলাদেশ। মফস্বলের ওই হাসপাতালে প্রতিদিন অসংখ্য রোগী আসছে, ধারণ-ক্ষমতার অতিরিক্ত রোগী, যাদের প্রায় সবার অবস্থাই গুরুতর, মরণাপন্নই বলা চলে, কিন্তু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না, চিকিৎসার কোনো সুযোগই নেই। ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, অপারেশন থিয়েটারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই। হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার-নার্স-কর্মচারিরা এসব দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তারা নির্বিকারভাবে কেবল দেখে যায়। যেন বাঁচতে নয়, মরতেই এসেছে সবাই এখানে। কথাটা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানে, জানে রোগীরাও। তবু তারা আসে, মরাটা অত সহজ নয় বলে, হাসপাতালে আসে মৃত্যুটাকে নিশ্চিত করতে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসপাতাল সবার মৃত্যুকেও নিশ্চিত করতে পারে না, অতিষ্ট হয়ে কেউ কেউ হাসপাতাল-চত্বরের গাছের সঙ্গে ঝুলে পড়ে, আর যারা তা পারে না তারা হা-হুতাশ করে মরে। এই যখন অবস্থা, তখন কার কী করার আছে? ডাক্তারের মুখেই বরং অবস্থাটির বিবরণ শোনা যাক—

> এখন হাসপাতাল সার্জারিতে একমাত্র আমিই প্রফেসর আছি। একবার হিসেব করুন, দুটো ওয়ার্ডে কজন রুগী হতে পারে।... মেঝেতে আর বারান্দায় যারা আছে আর যারা গ্রামগঞ্জ থেকে পিলপিল করে আসছে, এখন পথে আছে— তাদের সবাইকে হিসেবের মধ্যে ধরুন। আচ্ছা, এদের মধ্যে কজনকে এক্ষুনি অপারেশন করতে হবে বলুন? প্রত্যেকদিন কটা করে অপারেশন করতে হবে বলুন? গ্যাংগ্রিন-এ পচে গেছে, আলসারে স্টমাক ফুটা হয়ে গেছে, রেলে কাটা পড়ে পচন শুরু হয়েছে, হার্নিয়া বার্স্ট করেছে, এ্যাপিনডিসাইটিসের যন্ত্রণায় হার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে— কোন অপারেশনটা দুদিন পরে করলে চলে?...যার আজ অপারেশন দরকার, তার হবে পনেরো দিন পরে। সে বেঁচে থাকবে কি ইয়ার্কি মারতে? না মন্ত্রের জোরে?

মনে কি হচ্ছে না, ডাক্তার সাহেব ইঙ্গিতে আসলে এই পোড়া দেশটির কথাই বলছেন, যার প্রতিটি অঙ্গ পচে গেছে, এক্ষুণি অপারেশন দরকার, কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হচ্ছে না, আর দেশটি ক্রমাগত আলোর ইশারাবিহীন অতল অন্ধকারে পতিত হচ্ছে! ইঙ্গিতটি পরিষ্কার হয় আরেক রোগীর মন্তব্যে—

> আমি এখানে অনেকদিন রয়েছি। বাঁচবো বলে নয়, মরবার জন্যে। মরণ হচ্ছে না। এত বড়ো হাসপাতাল আমার মরার ব্যবস্থা করতে পারছে না। হাসপাতালের বাইরেও গিয়ে দেখেছি— পোড়াদেশ এই হাসপাতালেরই মতোন— আমার মরার বন্দোবস্ত করতে পারে না।

তো, এসব কথা ডাক্তার সাহেব যার কাছে বলেন, সে নিজেও একজন চিকিৎসাপ্রার্থী, তরুণ বিপ্লবী। তার রোগটা যে কী, তা অবশ্য গল্পে পরিষ্কার হয় না কখনো, তার পরিচয় বা চিন্তাভাবনার সঙ্গেও পরিচয় ঘটে না পাঠকের। কিন্তু, আমরা দেখি এই তরুণ গল্পের এক পর্যায়ে, ডাক্তারের ওই বক্তৃতা শোনার পর, ভাবছে—

> তুমি মধ্যবিত্ত, তুমি পাতি-বুর্জোয়া, বিপ্লব তোমার শত্রু নয়, কিন্তু তোমার দেরি সইবে, বিপ্লব আসতে দেরি হলে তুমি অপেক্ষা করতে পারো– কিন্তু ওর, এই ক্ষেতমজুরের এক মুহূর্ত বিলম্ব সইবে না, বিপ্লব তার এক্ষুণি দরকার, এক্ষুণি। এক্ষুণি বিপ্লব হলে সে বাঁচে, বিপ্লব হতে দুদিন দেরি হলে সে দুদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে মরে যায়। তাকে এই কথাটি বুঝিয়ে দাও, সে সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের পক্ষে লড়ুয়ে হয়ে যাবে।

(যাবে বৈকি! বাস্তবে না হলেও অন্তত বইয়ের পাতায় তো যাবেই, লেখক যেহেতু তাঁই চাইছেন, চরিত্রের সাধ্য কি স্রষ্টার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যায়!) মনে কি হচ্ছে না যে, হাসপাতালের এই বীভৎস দুরবস্থা বর্ণনা করে, তার সঙ্গে দেশের একটি প্রতীকী সম্পর্কসূত্রের দিকে ইঙ্গিত করে লেখক সমস্যার সমাধান হিসেবে 'এক্ষুণি বিপ্লবের' কথা ভাবছেন? হতে পারে এটা আদৌ লেখকের ভাবনা নয়, বরং রাশেদ নামক ওই তরুণ বিপ্লবীর, যে কী না এসব শিখেছে তার দলের কাছ থেকে, কমরেডদের কাছ থেকে, শিখতে গিয়ে বদহজম হয়েছে, সেটাই সে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে উগরে দিচ্ছে! কিন্তু গল্পে যে রাশেদ চরিত্রটির এরকম কোনো বিকাশ দেখানো হয়নি! নাকি এটি সেই সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি লেখকের পক্ষপাত যেখানে বলা হয়, সাহিত্যে যে-কোনোভাবেই হোক না কেন, বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ থাকতে হবে?

আমলাতন্ত্র নিয়ে এক তুলনারহিত গল্প লিখেছিলেন হাসান আজিজুল হক— 'পাবলিক সার্ভেন্ট' শিরোনামে। এই বিষয় নিয়ে এমন অসামান্য আর একটি গল্পও সমগ্র বাংলা সাহিত্য ঘেঁটে খুঁজে পাওয়া যাবে কী না সন্দেহ। আমলাদের চিন্তাভাবনার ধরন, ক্ষমতার কেন্দ্র সম্বন্ধে তাদের মূল্যায়ন, সামরিক শাসকের সঙ্গে তাদের আঁতাত, নতুন রাজনৈতিক দল গড়ার প্রক্রিয়া এবং তার প্রতিক্রিয়া— কী নেই এ গল্পে? বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে, যেখানে সামরিক শাসন এক অনিবার্য ও দীর্ঘস্থায়ী বাস্তবতা হিসেবে রয়ে গেছে, সেখানে এই গল্পের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। এই একটি গল্পেই বোঝা যাবে, কীভাবে আমাদের দেশে সামরিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়, বৈধতা পায়; কীভাবে আমলাতন্ত্র তাকে সহায়তা করে, সমর্থন করে। 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' এই কথা নাকমুখ খিঁচিয়ে যতই বলা হোক না কেন, ক্ষমতা কেন কখনোই জনগণের হয়ে ওঠে না, তার কারণ বোঝা যাবে আমলাদের এই ধরনের চিন্তাভাবনা থেকে—

> তোমাদের বলা হয় পাবলিক সার্ভেন্ট, কিন্তু আদতে তোমরাই জনগণের শাসক। কাজেই ঘোড়ায় চড়তে শেখো এবং চাবুক চালানো আয়ত্ত করো।... কিন্তু দাঁত কেলিয়ে ঘাড় চুলকে বিনয় দেখিয়ে পাবলিক সার্ভেন্ট কথাটা সবসময় চালিয়ে যাবে। তা না হলেই বাঁশ যাবে, চামড়া খিঁচে নেবে জনগণ...। শাসক তুমি যতই হও তুমি কিন্তু সত্যি সত্যিই সেবক, ক্ষমতার সেবক। ক্ষমতা কার? সেটা প্রশ্ন পর্যন্ত করবে না। ক্ষমতার নাক মুখ চোখ নেই।...(কিংবা) মামুন রশীদের আলাপের সূত্রগুলো এইরকম যে কোনো প্রস্তাব, যে কোনো কাজ সমর্থনযোগ্য। দুই, যে কোনো প্রস্তাব, যে কোনো কাজ খণ্ডনযোগ্য। তিন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথের কোনো অন্ত নেই এবং সব পথই পিচ্ছিল, অতএব যে কথাটা সত্যিই বলা হয়েছে, সে কথাটা সত্যিই বলা হয় নি। আর সর্বশেষ হলো বাস্তবের দিকে কখনো চেয়ে দেখা যাবে না, হিসেবটা সব সময়েই আমাদের দিক থেকে।...

কিংবা সামরিক শাসক যখন নতুন দল গঠনের ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন; কারণ, জনগণের কাছে না গিয়ে কতদিন ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা যাবে, এ নিয়ে তাঁর মনে প্রশ্নের উদয় হয়েছে, তখন মামুন রশীদের বক্তব্য—

জনগণের কাছে যেতে হবে কেন, ক্ষমতা যখন জনগণের কাছ থেকে আসেনি?...ক্ষমতা এই মুহূর্তে কোথায় রয়েছে সে বিষয়ে জনগণের কোনো ভুল ধারণা আছে বলে আমার মনে হয় না।...আসল কথা হচ্ছে ক্ষমতাটা যিনি দখলে রেখেছেন তাঁর শাসন জনগণ মেনে নেবে।... সেনাবাহিনী জনগণের অংশ, বিচ্ছিন্ন অংশ।... সেনাবাহিনী একটা সংঘবদ্ধ শক্তি— জনগণের সঙ্গে সেটা কখনো মিশ খায় না।... ক্ষমতা ভাগ হয় না, ক্ষমতা এক, অবিভাজ্য।

এইরকম নানাবিধ উজ্জ্বল বাক্যমালায়, এক অনবদ্য গদ্যে, উইট আর হিউমারের সহযোগে তিনি ফাঁস করে দিয়েছেন আমলাতন্ত্রের গোমর।

আসলে সেনাবাহিনী যেমন একটা সংঘবদ্ধ শক্তি, তেমনি আমলাতন্ত্রও এক সংঘবদ্ধ শক্তি। সেনাবাহিনীর ক্ষমতার উৎস বন্দুকের নল, আর আমলাদের ক্ষমতার উৎস সুদীর্ঘকাল ধরে প্রত্যক্ষভাবে জনগণকে শাসন করার 'অমূল্য' অভিজ্ঞতা। আমলারা যে জনগণের পাল্‌স বোঝেন না, তা নয়, খুব ভালো করেই বোঝেন এবং বুঝেশুনেই সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করেন। আর এই দুই সংঘবদ্ধ শক্তি যখন 'ক্ষমতা' নামক চোখনাকমুখহীন একদেহে লীন হয়, তখন জনগণের আর কিছুই করার থাকে না।

এই ধরনের একটি সরকার যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন অনেক অদ্ভুত কর্মসূচি হাতে নেয়। যেমন একসময় 'খাল খনন কর্মসূচি' রাষ্ট্রীয়ভাবেই গ্রহণ করা হয়েছিল। এই কর্মসূচি নিয়ে হাসানের চমৎকার একটি গল্প আছে 'খনন' শিরোনামে। দুই সাংবাদিক গেছেন সচক্ষে খাল খনন প্রত্যক্ষ করতে। এই কর্মসূচির পক্ষে যত রকম প্রোপাগাণ্ডা রাষ্ট্রীয়ভাবে চালানো হতো— যেমন, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ভিত মজবুত হবে, উৎপাদন বাড়বে, বিরানভূমি শস্যশ্যামল হয়ে উঠবে, দেশের চেহারা পাল্টে যাবে, ইত্যাদি— সবই একজনের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে। কিন্তু অন্যজন কিছু কূট প্রশ্নও তুলেছেন, যে প্রশ্নগুলোর জন্যই এই গল্পটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন, উৎপাদন বাড়বে বটে, কিন্তু সেই ফসল ভূমিহীনদের— এই এখন যারা গায়ে-গতরে খেটে খাল কাটছে, তাদের— ঘরে পৌঁছবে কীভাবে? জমির মালিকরা সরকারী অর্থে নিজেদের জমিতে সেচের ব্যবস্থা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে, তাতে গরিব মানুষের লাভ কি? এই প্রশ্নমুখর সাংবাদিক একদিকে জমির মালিকদের মুখে 'বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে' শুনে, অন্যদিকে রেলস্টেশনে দাঁড়িপাল্লায় করে ভাত মেপে বিক্রি করার দৃশ্য দেখে, অসংখ্য ভিখারীর ভিক্ষার জন্য প্রসারিত হাত দেখে, উদোম শরীরে তরুণী কূলবধূর শরীর বিক্রির চেষ্টা দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বোঝা যায়, স্পর্শকাতর তিনি, রাষ্ট্রকথিত 'বিপ্লবের' আড়ালে এইসব কদর্য দৃশ্যের উপস্থিতি তাকে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এ খনন শুধু খাল খননই নয়, নিজের মনের খননও বটে, নিজের দিকে তাকিয়ে দেখাও বটে। আর এভাবেই নানা গল্পে নানাভাবে হাসান তাঁর সমকালকে ধরে রেখেছেন, যা একসময় হয়ে উঠবে ইতিহাসের অংশ।

৪

হাসানের গল্পে ধরা পড়েছে এই বাংলার দীর্ঘ একটি সময়ের সামাজিক ইতিহাসও। যদিও প্রধানত সমাজের ভঙ্গুর ও ক্ষয়িষ্ণু রূপ এবং মানুষগুলোর দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাপনই তাঁর অধিকাংশ গল্পের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে, তবু, সমাজ ও এর ভেতরে বাস করা মানুষগুলোর সংকট ও সম্ভাবনা, তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও বেদনা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, ক্ষয়ে যাওয়া ও গড়ে তোলা এ-সব কিছুই নিপুণ কুশলতায় এঁকেছেন তিনি। দেখিয়েছেন, সমস্ত সংকট, হতাশা, আর ভাঙন নিয়েও মানুষগুলোর বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা কী তীব্র।

জীবনের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য এই তীব্র অভিলাষ প্রায় ধ্রুপদী মাত্রা অর্জন করে 'তৃষ্ণা' গল্পে। এটি হাসানের সেরা গল্পগুলোর মধ্যে একটি। গল্পের প্রধান চরিত্র বাসেদকে অত লম্বা করে তৈরি করার কারণ হিসেবে হাসান নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে, রাঢ় বঙ্গের মানুষদের প্রকাণ্ড ক্ষিদেটাকে প্রতীকায়িত করতেই তিনি এমনটি করেছেন। কিন্তু এ গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ওই চরিত্রটি নয়, বরং তার বেঁচে থাকার অসাধারণ আকুলতাতেই প্রকাশিত। যদিও তার ক্রমাগত লম্বা হয়ে ওঠা ব্যাপারটা গাঁয়ের মানুষের কাছে একটি ঘটনাই বটে, তবু অচিরেই তা পুরনোও হয়ে যায় স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু তার বাঁচার আকুলতা বোধহয় এত সহজে পুরনো হওয়ার মতো নয়। গাঁয়ের অন্যান্য লোকদের মতোই ক্লিষ্ট-বিপন্ন জীবন-যাপন তার, কিন্তু তার ক্ষিদেটি এত তীব্রভাবে প্রকাশিত যে, দৈর্ঘ্যের জন্য না হলেও তার ওই ক্ষিদেটির জন্যই সবার কাছে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারতো। তার ভাষায়—

> কী যে ভালো লাগে খেতে! পোত্যেকদিন সকালে উঠেই মনে হয়, শালা বেঁচে তো আছি খাবার লেগে। (এবং লেখকের জবানিতে)— একটু ভালো করে লক্ষ করলেই বোঝা যায়—ভারি পছন্দ করে সে বেঁচে থাকতে। শীষ কুড়োতে, ধুলো পায়ে হেঁটে বেড়াতে, কাদা ঘেঁটে মাছ ধরতে, পাখির বাচ্চা জবাই করতে, এটা ওটা চুরি করতে। অত্যন্ত শখ তার বাঁচতে।... (মৃত্যুর মুহূর্তেও সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবছে) দ্যাখো, আমি নোম্বা বাচেদ, অবং বাচেদ, আমি কিছুতেই মরতে চাই না, মরব না, মরব না, ই আল্লা পায়ে পড়ি তোমার, আমি কবরে যাবো না, আমি মরবো না, আমি উই ঝোপটার কাছে যাব, সিকিটো ছুঁড়ে দোবো সখির আঁচলে।

'মন তার শঙ্খিনী' গল্পে দেখি, প্রেমিকের সন্তান গর্ভে ধারণ করে প্রেমিকা বিয়ের পিঁড়িতে বসছে অন্য যুবকের সঙ্গে, চলে যাচ্ছে অন্য গাঁয়ে, কারণ প্রেমিকের খাওয়ানো-পরানোর সাধ্য নেই। ভাতের নিশ্চয়তা চাই— প্রেম দিয়ে কি পেট ভরে?

'মা ও মেয়ের সংসার' গল্পে নিসর্গের এমন এক বর্ণনা আছে যে, অরণ্যচারি আদিম জীবনের ইমেজ মনে আসে। মা ও মেয়ে যেন সেই আদিম সমাজের দুই প্রতিনিধি, যাদের কাছে কোথাও থেকে কোনো আলো এসে পৌঁছেনি। গল্পের শুরুতেই লেখক জানিয়ে দেন— 'মা মেয়ের সংসার। দুজনেই খুব সুন্দরী। কার গরজে তারা অত সুন্দরী কে জানে। আপনমনে থাকে তারা, কোথাও যায় না। কেউ আসেও না তাদের কাছে।' তবে অচিরেই আমরা দেখতে পাই, মানুষ না এলেও আসে শেয়াল— 'ঘরের পেছনেই বেনাঝোপে শিয়াল থাকে। একটা মুরগি পোষার উপায় নেই, ওঁৎ পেতে থাকে চব্বিশ ঘণ্টাই, মুরগি পেলেই হলো, ঝপ করে মুখে তুলে নেবে।' তো, মুরগি না পেয়ে চারটে শেয়াল এসে অবশেষে মেয়ে এবং মাকেই দখল করে নেয়। তারপর 'দুজনের ভাত চারজনে ভাগ করে খেয়ে শেয়াল চারটে একবার হুক্কা-হুয়া আওয়াজ তুলে চলে গেল।' ফলাফল যা হবার তাই। মা মেয়ে দুজনের ভেতরেই বড় হতে থাকে আরেক অস্তিত্ব। কেউ কখনো তাদের কাছে না এলেও এবার সমাজপতিরা আসে–যাদের সন্তানেরা মা-মেয়ের এই দুর্দশার জন্য দায়ী, এসে তাদের সিদ্ধান্ত জানায়—

আল্লার আইন মানতি হবে সগ্‌গলের... কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতি পাথর ছুঁড়ে খতম করতি হবে তোদের।
মায়ের উত্তর— সেই বেবস্থাই কর গে তোমরা।...আল্লা নেই, তাই আল্লার কথা কচ্ছো। থাকলে এতক্ষণে ঠাঠায় পুড়ে কেলায়া থাকতা।
সমাজে থাকতি পারবা না কলাম।
সোমাজে নেই আমরা, খালডার ওপারেই জোঙ্গল।
বলতে বলতেই মা জং-ধরা দাখানা তুলে নিল। এখন আর উঠোনে দিনের আলো নেই। জয়ঢাকের মতো মায়ের বিশাল পেট, বর্তুলাকার কঠিন দুটো স্তন, অপার্থিব মুখশ্রী। দা হাতে উঠোনে নাচতে থাকে মা। মুখের কোণ দিয়ে গেঁজলা উঠে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবা প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে মেয়ের— 'মা আমাদের আল্লা নেই?' প্রশ্নের উত্তরে—

> না, মা দৃঢ়কণ্ঠে বলে, ওদের আছে, মওলানা মৌলবীগো, বড়লোক, ধনীগো আছে; মাতাল, বজ্জাত, জাউরা, পুরুষগো আছে, ওগো সব আছে, তারপরে আবার আল্লাও আছে। (অথবা মা যখন মৃত সন্তান প্রসব করে তখন মেয়েকে)—দানোটারে বাইরে শিয়েলের মুহে দিয়ে আয়। ও বাঁচে থাকলি কাল আমি জাউরা পুরুষজাতটারে দেহাতাম আমরা পারি ফুল ফোটাতি। শু-মুতের মদ্যি যারা গলা পর্যন্ত ডুবোয়ে বসে থাকে, শু-মুতের স্বপ্ন দ্যাখে, তাদের দ্যাহাতাম।

বলাবাহুল্য, এই দৃশ্যের মধ্যে, এইসব কথাবার্তার মধ্যে এক প্রকাণ্ড প্রতিবাদ আছে, আছে আদিম জীবনের শক্তিমত্তার তীব্র প্রকাশ। কিন্তু কখনো কখনো এই তীব্র কথাগুলো প্রায় অবিশ্বাস্যই লাগে এই চরিত্রের মুখে। তার এই প্রতিবাদী রূপের কাছে হার মেনে সমাজপতিরা চলে যায় বটে, কিন্তু আসে এক ঝড়। তীব্র গোর্কি। মা-মেয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেয়। কিন্তু গল্পের শেষে দেখা যায় তারা বেঁচে আছে ঠিকই, মেয়েটি আরেকটি সন্তান প্রসব করেছে, মৃত নয়, জীবিতই। আর

> তখনই আসে প্রথম মৃতদেহটি। অনেকদূর দিয়ে সেটা চলে যায়। তারপর আর একটি, তারপর আর একটি, তারপরে একটির পর একটি, হাজারে হাজারে তারা আসে, ইলিশের ঝাঁকের মতো, মা-মেয়ের থেকে অনেক তফাৎ দিয়ে তারা চলে যায়, অনেকটা নেচে নেচে মঞ্চ থেকে বিদায় নেবার ভঙ্গিতে।...তারপর ঝাঁক থেকে আলাদা হয়ে যায় এক লাশ, একটু আসছি বলে, ডুবতে ডুবতে, ভাসতে ভাসতে, পাক খেতে খেতে সে এগিয়ে আসে মা-মেয়ের কুঁড়ের চালের দিকে। কাছাকাছি এসে লম্বা একটা ডুব-সাঁতার দিয়ে সে কুঁড়েঘরের চালাটির একটি প্রান্ত স্পর্শ করে থামে। মা মেয়ের এক রাতের কথা মনে পড়ে। উদোম, ছোরা ওঁচানো, হিংস্র ডোরাকাটার মতো এক পশু। একটা মুহূর্তই শুধু— লাশ আবার বলেশ্বরের পথ ধরে নিচে নেমে যায়।...বঙ্গোপসাগরের হাঙরেরা অপেক্ষায় থাকে। মা মেয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোয়। দানোর বাচ্চাটি চিল চেঁচিয়ে সারা হয়।

'সভ্য' মাজের অসভ্য অনাচারের প্রতিশোধ অবশেষে প্রকৃতিই নিয়ে নেয় যেন। কীভাবে ব্যাখ্যা করবো গল্পের এই পরিণতিকে? এই শাস্তি কি সত্যিই প্রকৃতিপ্রদত্ত? এত বেশি অনাচার-অবিচার প্রকৃতি সহ্য করে না, তাতে করে প্রকৃতির নিজস্ব ভারসাম্য ও বিন্যাস বিনষ্ট হয়, গল্পের এই পরিণতি কি লেখকের এই ধরনের চেতনা থেকে উদ্ভূত? নাকি এটা তাঁর ব্যক্তিগত কল্যাণচেতনা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের জন্য, বিশেষ করে পীড়িত-দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের জন্য যে কল্যাণকামনা তাঁর গল্পে অনুচ্চারিত হয়েও স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকে, এটা সেরকম কিছু? এই প্রশ্নটি জাগে 'মাটি-পাষাণের বৃত্তান্ত' পড়েও। সাংবাদিক মোনাজাত উদ্দিনের সহায়তায় ভূমিহীন একামতউল্লাহ জানতে পারে যে, সরকার তাকে তিন বিঘা জমি বরাদ্দ দিয়েছে। কিন্তু জমি তার দখলে নেই। দখল তার মালিক জোতদারের, সে যার 'ভাতুয়া'। সে দখল বুঝে চাইলে জোতদার তা দিতে অস্বীকৃতি জানায় আর তাতে করে দ্বন্দ্ব বাড়ে। কিন্তু দ্বন্দ্বে একামতউল্লাহ জিতবে কীভাবে, তার যে কিছুই নেই। অতঃপর আমরা দেখি, গল্প এক অভূতপূর্ব বাঁক নিয়েছে। দেখি, জোতদারের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া কোনো এক অজানা কারণে বাধাগ্রস্থ হয়েছে—

> দিনটা অতি কষ্টে কাটে তার, বৃহদন্ত্রের নিচের দিকটা ধীরে ধীরে কঠিন হতে শুরু করে, চলাচলে অভ্যস্ত আপনবায়ু কোনোদিকে বেরুনোর পথ না পেয়ে একগুঁয়ে আত্মগরিমায় ফুলে উঠতে থাকে। জোতদার নিজের পেটের ওপর আঙুলের টোকা দিলে প্রচণ্ড গুম গুম শব্দ ওঠে।...বৃহদন্ত্রের একেবারে নিচে, মলদ্বারটির একটু উপরে একটি কঠিন গোলক দৃঢ় আকার নিচ্ছে। জোতদার তার দেহের সিংহদরজা হাট খুলে ঢালতে গেল। কিন্তু দৃঢ় কঠিন গোলকটি দরজার মুখে কাপে কাপে বসে গেল, বৃহদন্ত্র শীতে-জমা কোঁচকানো ঠোঁটের মতো শক্ত হয়ে এঁটে রইলো, বিষাক্ত একটি সাপ ক্ষুদ্রান্ত্র বৃহদন্ত্রের পাকে পাকে সরু সরু বাঁকা ফাঁপা দাঁতের ভিতর দিয়ে তীব্র বিষ ঢালতে ঢালতে উপর দিকে উঠল। (আর অবশেষে)— এটা আমাদের সহজেই বিশ্বাস হবে যে প্রচণ্ড চাপের ফলে লক্ষ কোটি বছরে মাটি যেমন পাথর হয়ে যায়... ঠিক তেমনি, দশদিনের মধ্যে, যথেষ্ট পরিমাণ সামগ্রী থাকলে জোতদারের মত মনুষ্যাকৃতির একটি রাক্ষসের দেহে পাষাণের দেয়ালও তৈরি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যা অবিশ্বাস্য তা এই যে দশদিন ধরে এমন নিখুঁত প্রক্রিয়া কি চালু থাকতে পারে যাতে উপরের জায়গা ক্রমাগত খালি হয়ে কঠিন শিলার উপাদান নিচের জায়গায় জমে এবং যতদিন পর্যন্ত শিলীভূত হওয়া শেষ না হয়, ততদিন উপরের জায়গা কখনো বিশ্বাসঘাতকতা বা অসহযোগিতা করে না?... দশদিনের মাথায় নিজের পঞ্চাশ একর জমির ওপর যে পড়েছিল তাকে জোতদার বলে নিঃসন্দেহে চেনা গেলেও পরে দেখা যায় তা আসলেই এক খণ্ড বিশাল ন্যাড়া পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ-ও কি প্রকৃতিপ্রদত্ত প্রতিশোধ? নিপীড়িত-শোষিত মানুষের কিছুই করার ক্ষমতা নেই বলে প্রকৃতি নিজেই তার ভারসাম্য রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নইলে কীভাবে জোতদারের এই করুণ পরিণতি সম্ভবপর হয়?

'বিলি ব্যবস্থা' গল্পেও খাসজমি আর তার মালিকানার প্রসঙ্গ। যেহেতু খাসজমি নিয়ে একটা বিভ্রান্তি আছে— 'খাস জমির মালিক কে বলা সত্যিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুষ্কর।... দলিলও নেই, মালিকানাও নেই— জমি পড়ে আছে আকাশের নিচে, ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, জমিতে ঘাস পাতা জন্মাচ্ছে, তাল খেজুর শিমুল দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে যাচ্ছে, একেই বলে খাস জমি, এর দলিল কারও কাছে নেই।' এরকম এক জমিতে ভূমিহীন নেক বক্শ সরষে ফলালো ঠিকই কিন্তু ঘরে তুলতে পারলো না। তার মালিক-জোতদার এসে তার গোলায় ফসল তুলে ফেলতে বলে। জমিটা যে খাসজমি, সেটা নেক বক্শ বলার চেষ্টা করলে মালিক উত্তর দেয়— 'জমিন আবার খাস কি? সব জমিন আল্লার খাস— কেহ না কেহ দেখাশোনা করে। সরষে সব আজই তুলে ফালা। ঝাড়া পাড়া হয়ে গেলে নেবেন তুমরা আধকাঠা।' তো কাহিনী এখানে নয়, গল্প শেষ হয় অন্য ঘটনায়। মালিকের নুলো ছেলে নেক বকশের কিশোরী বোন নেকিকে গর্ভবতী বানিয়ে ফেলে। মালিকের কাছে এর বিহিত-ব্যবস্থার দাবি জানিয়েও কোনো সাড়া পায় না সে, বরং উল্টো বিচারের রায়ে নেকির শাস্তি হয়— 'গর্তে কোমর ইস্তক গাড়িয়া পাথর তুলিবে, পাথর ছুঁড়িবে, পাথর তুলিবে, পাথর ছুঁড়িবে, যতো রক্ত ঝরিবে বাহে, ততো গুনাহ উড়ি যাইবে। ইমাম সাহেব কহিছে এই হোইল জেনার শাস্তি।' অতঃপর শাস্তি কার্যকর করার আয়োজন সম্পন্ন হয়। নেকিকে গর্তে পুতে— 'জেনাকারীর লাল রক্ত যে মুসলমান চোকে দেখল না সে আবার কিসের মুসলমান!'→ এই জোশে বলিয়ান হয়ে ইমাম সাহেব ইটের টুকরো ছুঁড়ে মারলো। আর তখনই ঘটলো অদ্ভুত এক ঘটনা। মুক-বধির কিশোরী নেকি কী যেন বলতে লাগলো, ইমাম সাহেব কাছে এগিয়ে গিয়ে বুঝতে চাইলো কী বলছে, পারলো না। তখন তার ভাই নেক বক্শ কাছে এগিয়ে গিয়ে কান পাতলো আর একটুক্ষণ পরই—

> দারুণ আতঙ্কে সে চেঁচিয়ে ওঠে, কি কহিছে বাহে? কি কহে সে? কান্দে? কে কান্দে? বোবা চিৎকার শোনা যায়। কে কান্দে কহিস? পয়গম্বর নবীজী কান্দে কহিছে আমার বুন। চোখের আঁসুতে সোনার দাড়ি ভিজাইয়া আমার পয়গম্বর নবীজী কান্দে। জারে জার হইয়া কান্দে।

ইঙ্গিতটি পরিষ্কার। যে ধর্মের নাম করে তোমরা এসব করছো, শুনতে পাচ্ছো না, মানবতার এই নিদারুণ অপমানে সেই ধর্মের প্রবর্তক, প্রিয় নবীজী কাঁদছেন! চেনা গল্প। 'জেনা'র অপরাধে পাথর ছুঁড়ে মারা বা ঝাড়ুপেটা করার এইসব ঘটনা তো আমাদের কাছে পুরনোই হয়ে গেছে। এত দেখছি, এত শুনছি, গা সওয়াই হয়ে যাচ্ছে যেন। কিন্তু এই গল্পের ট্রিটমেন্টটি অসাধারণ, এরকম ফতোয়াবাজিতে স্বয়ং নবীজী পর্যন্ত তাঁর ধর্মের অপমানে কেঁদে ফেলেন— এরকম একটি ইঙ্গিত দেয়ার জন্যই গল্পটি বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এই গল্পে কোনো প্রাকৃতিক প্রতিশোধের ব্যাপার নেই, আছে এক শিল্পিত প্রতিবাদ, আছে এক অসামান্য প্রতীকী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মাণশৈলী— কজন লেখকই বা মানবতার অপমানে নবীজীকে কাঁদাবার সাহস রাখেন?

৫

তাঁর খুব ভিন্ন ধরনের একটি গল্প 'সাক্ষাৎকার'। এটি এমনই এক গল্প যা হাসানের 'সমাজ-সচেতন' 'শ্রেণী-সচেতন' 'রাজনীতি-সচেতন' ইমেজের সঙ্গে যায় না। যে 'লোকটা গত শতাব্দীর কায়দামাফিক সূর্যাস্ত দেখছিল' আর 'তার চোখে ফুটে উঠেছিল তন্ময় কল্পনা' তাকে ধরে নিয়ে যায় কতিপয় অচেনা লোক, তাকে 'রহমান সাহেব' সম্বোধনে শুরু হয় জেরা, যদিও তার নাম রহমান নয়, হুমায়ুন কাদির। তারা ঠিক কী জানতে চায় পুরো গল্পে তা পরিষ্কার হয় না, বোঝা যায় তারা তার কাছ থেকে একটি স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করছে, কিন্তু কিসের স্বীকারোক্তি তা-ও বোঝা যায় না, বরং তাদের মুখে শোনা যায়—

> বুঝতে পারছি আপনি কিছুই স্বীকার করতে চান না। তাতে কিছুই এসে যায় না অবিশ্যি। কারণ আমরা সবই জানি কাজেই আর কিছু জানার নেই। কারণ আমরা কিছুই জানি না অতএব আর কিছুই জানার নেই।

এরকম পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা আর রহস্যময় আচার আচরণ পাঠককে বিমূঢ় করে তোলে। মনে হয়, যেন কোনো অ্যাবসার্ড নাটকের মহড়া চলছে (গল্পটি লেখাও হয়েছে অ্যাবসার্ড নাটকের ফর্মে)। পারম্পর্যহীন কথাবার্তার আরেকটি উদাহরণ তুলে দেওয়া যাক—

> আমরা নিজেরা নিজেরা একতা আইন-শৃঙ্খলা, দাঁড়িয়ে বসে বা মাটিতে শুয়ে যদি তা কোনোদিন দেখিয়ে দিতে পারি একসঙ্গে একসঙ্গে যে যেখানে আছে ঠিকঠাক পরিকল্পনা ঘাসে ভিটামিন জনকল্যাণ বন্যা প্লাবন মহামারী বাঁধ দাও লবণ ঠেকাও যতোরকম চালবাজি রকবাজি ঠকবাজি নিলামবাজি জোতদারি মুনাফাখোরি খুন জখম রাহাজানি ভাবনাচিন্তা জাতীয় প্রেস দুই আর দুইয়ে চার আর সাতে ষোলো যার ফলে ছেষট্টি মোট নিশো তেত্রিশ কোটি দেশী বিদেশী চাল গম আটা সব মিলিয়ে সব।

হুমায়ুন কাদির এসব কথাবার্তা-জিজ্ঞাসাবাদ-আচার-আচরণ কোনোকিছুরই অর্থ উদ্ধার করতে পারে না, পারি না আমরাও। অবশেষে অজানা অপরাধে হুমায়ুন কাদিরের মৃত্যুদণ্ড হয়, এবং দণ্ড কার্যকর করার আগে তাকে দু-মিনিট ভাববার সুযোগ দিলে সে ভাবে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেককাল আগে একবার সবুজ ঘাসের মধ্যে শুইয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিলাম। উহার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত দেখা গিয়াছিল, উহা হালকা নীল ছিল। পরে উহা চুম্বনের দাগের মতো মিলাইয়া যায়। ইহার পর মানুষের জগতে ফিরিয়া আসি— তাহাতে নোনা টক গন্ধ আছে এবং আক্রোশ ও ঘৃণা রহিয়াছে এবং ভালোবাসা ও মমতা রহিয়াছে। মানুষের জীবনে কোথায় অন্ধকার তাহার সন্ধান করিতে গিয়া আমি ঘন নীল একটি ট্যাবলেটের সন্ধান পাই— মানুষ যে সামাজিক, সে নিজের ইতিহাস জানিতে চাহিয়াছে, তাহাতে সর্বদাই অন্ধকার নর্তনকুর্দন করিতেছে। তবু আমি মানুষেরই কাছে প্রার্থনা জানাইব— কারণ মানুষেই মানুষের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া থাকে— যদিও ওই দাগ দেখা যায় না। অসংখ্যবার সঙ্গম করিয়াও যেমন আমি নারীতে ঐ দাগ কখনো দেখি নাই। কোথাও কিছু পাই না বলিয়াই বাধ্য হইয়া আমি শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছেই প্রার্থনা ও আবেদন জানাইব। ইতিমধ্যে সব কিছু চমৎকার ঘটিয়াছে। অবশ্য অনেক কিছুই বাকিও রহিয়া গেল কারণ কিছুই শেষ হইবার নহে।

এই গল্পটি, আগেই বলেছি, হাসানের ইমেজের সঙ্গে যায় না (যদিও গতানুগতিক ছকবাঁধা সমালোচকরা এই গল্পটিকে 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প' নামে একটি তকমা এঁটে একে ছক-বদ্ধ করতে চান!)। বিষয়বস্তু বা নির্মাণ কৌশলেও গল্পটি তাঁর অন্যান্য সব গল্প থেকে আলাদা। আমরা যে অ্যাবসার্ডিটির ভেতরে বাস করি, বিনা কারণে, অজানা অপরাধে আমাদের মৃত্যুদণ্ড হয়ে যায়, আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হয় কিন্তু আমরা বুঝেই উঠতে পারি না যে, আমাদের কাছে আসলে কী জানতে চাওয়া হচ্ছে— তার একটি প্রতীকী উপস্থাপন রয়েছে এই গল্পে। মৃত্যুমুহূর্তেও কোথাও কিছু পাইনি বলে আমরা মানুষের কাছেই প্রার্থনা ও আবেদন জানাই, কারণ *মানুষেই মানুষের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া থাকে*। এই গল্পে ব্যক্তিমানুষের সংকট, তার সমাজ-রাষ্ট্র ও ইতিহাস, মানবজীবন, জীবনের অর্থ কিংবা অর্থহীনতা কিংবা জীবন অর্থহীন জেনেও অর্থ আরোপের চেষ্টা ইত্যাদি নানা বিষয় এক গভীর ইঙ্গিতময়তায় ধরা আছে। এরকম অসামান্য সংযম আর ইঙ্গিতময়তার দেখা এমনকি হাসানের অন্য কোনো গল্পেও মেলেনি।

৬

আগেই বলেছি— সমাজের ক্ষয়ে যাওয়া, নিষ্প্রভ, সম্ভাবনাহীন, পরাজিত মানুষ তার গল্প-ভুবনের প্রধান অনুষঙ্গ। আমার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে (ভোরের কাগজ সাময়িকী, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৮) তিনি বলেছিলেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সাধারণত আশা-আশ্বাসের গল্প লিখতে পারি না বরং আমার গল্পের জগৎটি এমন যেন সেখানে ফুল ফোটে না, পাখি গায় না, শিশুরা হাসে না, মানুষ সংসারজীবন যাপন করে না...আমি সব মানুষের জন্য মুক্ত জীবন চাই, সেই কারণেই বর্তমানের প্রচণ্ড ধ্বংসের ছবি আঁকি।

তাঁর এই চাওয়া তাঁর গল্প পড়েও টের পাওয়া যায়— আর কিছু না হোক কেবল বেঁচে থাকা, কেবলই বেঁচে থাকার সাধ-স্বপ্ন-সংগ্রাম তাঁর গল্পে বারবার ঘুরেফিরে আসে। পাঠক, তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ে দেখুন ১৯৭৯ সালে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'অন্য ঘরে অন্য স্বর'-এর ওপর লেখা তাঁর আলোচনার এই অংশটি—

এই বইয়ের গদ্য শুকনো খটখটে, প্রায় সবটাই ডাঙা; ডাঙার উপর কচি নরম সবুজ গাছপালা জন্মেছে এমনও মনে হয় না। কোথাও একটু দয়া নেই, জল দাঁড়ায় না— বাস্তব ঠিক যেমনটি, তেমনি আঁকা... ইলিয়াসের খোলা চোখের দৃষ্টি সমকালের মূলটুকু দেখে নেয়... আর ঠিক সেটুকুই তিনি লিখতে বসে যান। এইজন্যেই তাঁর লেখায় হাবাগঙ্গারামদের প্রেম নেই। দাম্পত্য, প্রেম, প্রীতি, পিতৃভক্তি, বাৎসল্য ইত্যাদির উপর তিনি যেন বাজ ফেলেছেন। জীবন এইরকম নাকি? এত কুৎসিত? দুপুরের ন্যাড়া মাঠে পোড়া মাটির মতো? আমি তা বিশ্বাস করতে চাই না। চোখের একেবারে ভিতরের দিকে একটু কোমলতা থাকা ভালো।

মনে কি হয় না— ইলিয়াস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি আসলে নিজেকেই ব্যাখ্যা করেছেন? যে জীবনে *ফুল ফোটে না, পাখি গায় না, শিশুরা হাসে না, মানুষ সংসারজীবন যাপন করে না* সেই জীবনও কি কুৎসিত নয়? হাসানের গল্প পড়ে তাঁর মতো করে আমরাও প্রশ্ন তুলতে পারি— *জীবন এইরকম নাকি? এত কুৎসিত?* এবং তাঁর মতো করেই বলতে পারি— *চোখের একেবারে ভিতরের দিকে একটু কোমলতা থাকা ভালো।*

৭.

হাসান আজিজুল হকের গল্প এত বহুমাত্রিক, এত অসংখ্য দিক নিয়ে কথা বলা যায় তাঁর গল্প নিয়ে যে, একটি মাত্র লেখায় তা প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁর গল্পে ধরা পড়েছে বাঙালির প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর ইতিহাস। শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, ব্যক্তির ইতিহাস— তার ভাঙা-গড়া, তার দুঃখ-কষ্ট-হতাশা, তার সংগ্রাম, তার আকাঙ্ক্ষা, তার জীবন-যাপন; সামাজিক ইতিহাস— তার পতন, বিকার ও বিকাশ, তার পরিবর্তন, তার সম্ভাবনা ও সম্ভব-না এই সবকিছু। তাঁর গল্পেই তিনি বলে দিয়েছেন— ইঙ্গিতে ও ইশারায়, শিল্পিত কুশলতায়— কোন ধরনের সমাজ তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাম্য। যে প্রচণ্ড ধ্বংসের ছবি আঁকেন তিনি, সেটি কেবল বাস্তবতার শিল্পিত রূপ দেবার জন্যই নয়, বরং এইসব বর্ণনা দিয়ে তিনি পাঠক-মনে জাগিয়ে তোলেন ক্ষোভ ও বেদনা, বুঝিয়ে দেন— এরকম সমাজ আমাদের কাম্য হতে পারে না, মানুষের জন্য আমরা চাই একটি শোষণমুক্ত-দারিদ্রমুক্ত-দুর্দশামুক্ত-উজ্জ্বল-প্রাণবন্ত-মানবিক সমাজ। তাঁর গল্প তাই শেষ পর্যন্ত কেবল গল্প হয়েই থাকে না, হয়ে ওঠে বাঙালির ইতিহাসের এবং বাঙালির আকাঙ্ক্ষার প্রামাণ্য দলিল।

রচনাকাল : জানুয়ারি, ২০০৮
প্রথম প্রকাশ : ১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮, দৈনিক সমকাল

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাহাত খান : 'খুব বেশি আশা করতে নেই'

প্রাককথন

ষাটের দশক বাংলাদেশের সাহিত্যে উপহার দিয়েছিল এক ঝাঁক উজ্জ্বল সাহিত্য কর্মী— কী কথাসাহিত্যে, রাহাত খান তাঁদেরই একজন। তিনি অবশ্য ষাটের দ্রোহ ও বিক্ষোভ থেকে খানিকটা দূরেই ছিলেন, যেন এক নিঃসঙ্গ চিত্রকর নির্জনে আঁকতে বসেছিলেন তাঁর সমকাল ও পরিপার্শ্বের নিখুঁত চিত্র। পাঠক তাঁর কাছ থেকে পেলেন 'আমাদের বিষবৃক্ষ', 'ইমান আলীর মৃত্যু', 'চুড়ি', 'ভালোমন্দের টাকা', 'অন্তহীন যাত্রা' প্রভৃতির মতো কালজয়ী গল্প, 'অমল ধবল চাকরি'র মতো ক্যামেরা দৃষ্টিসম্পন্ন উপন্যাস, 'হে অনন্তের পাখি'র মতো একদল মানুষের আনন্দ-বেদনার অসামান্য চিত্রায়ণ। তারপর হঠাৎ করেই তাঁর দীর্ঘ নীরবতা। বহুদিন পাঠক তাঁর চুম্বক-আকর্ষণী লেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। সুখের বিষয়, তিনি আবার ফিরে এসেছেন তাঁর মুগ্ধ পাঠকের কাছে।

গল্পপ্রসঙ্গ

১

রাহাত খান তাঁর গল্পে পরিপার্শ্ব ও সমকালকে তুলে আনেন তার সব আলো-অন্ধকার, সংকট-সম্ভাবনা, সারল্য-শঠতা, ভন্ডামি-সততা সহ আর এসবের মধ্যে বাস করা মানুষগুলো উঠে আসে তাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা-কষ্ট-ক্লান্তি-ভালোবাসা-মমতা-নিস্পৃহতা-বিচ্ছিন্নতাসহ। তারুণ্যের হতাশা, পরাজয়, প্রেম ও আকাঙ্ক্ষা; মুক্তিযুদ্ধের প্রাপ্তি ও হারানোর চিত্র নিপুণ কুশলতায়, পরম মমতা দিয়ে নির্মাণ করে পাঠকদের আপ্লুত করেন তিনি। সহজ-সরল ভাষায় তিনি পাঠককে জানিয়ে দেন— জীবনটা এরকম, পৃথিবীটা এরকমই— যাবতীয় ইতি-নেতিবাচকতা পাশাপাশি মিলে গেছে এখানে। আর এর মধ্যে মানুষের একটাই স্বপ্ন— সে বেঁচে থাকতে চায়, বেঁচে থাকার স্বপ্ন থেকেই সে তৈরি করে অন্যান্য স্বপ্ন, বেঁচে থাকার জন্যই তার যাবতীয় আয়োজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

মানুষের এতসব আয়োজনের পেছনে যে মধুর স্বপ্নগুলো লুকিয়ে থাকে, এই বিপন্ন সময় আর কঠিন বাস্তবতা তার সঙ্গে এক চিরন্তন দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। রাহাত খানের গল্পের বিচিত্র শ্রেণী-পেশার মানুষগুলোকে এই রকম বহুবিধ দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে দেখা যায়। যেমন 'চুড়ি' গল্পে আমরা বস্তির সর্দার কালু মিয়ার ভাষ্যে পিওন বৈদর আলী আর তার বউ জৈগুনের সঙ্গে পরিচিত হই— 'কেবল সুখের ইস্তিরিই না, আপদ-বিপদের বউও। বাতাসী, মজিদী, আগুনির মা এদের কারোর সাথে মিল নাই।' কালু মিয়ার ঘরের পাশেই ওদের প্রেমময় সুখের সংসার এবং মিলন মুহূর্তে—

> টুংটাং করে আর এক রকমের মিঠা আওয়াজ।... হাতের ক'টা চুড়ির বাজনা জৈগুনের দিলভরা রোশনীর জানান দেয়। বুকভরা পিরিতির মধুর গীত বাজায়।... মহব্বত ছাড়া আন্ধার বিছানায় আর যাই হোক মেয়ে মানুষের হাতের চুড়ি বাজে না। কক্ষণো না।

কালু মিয়া পোড়-খাওয়া অভিজ্ঞ মানুষ। সে মানুষের মুখ দেখে তার স্বভাব-চরিত্র বলে দিতে পারে। প্রায় পুরো গল্পজুড়ে কালু মিয়ার নিজস্ব ভাষায়, গভীর ভালোবাসা আর মমত্ববোধ দিয়ে অংকিত হয় জৈগুন। কিন্তু ওই 'মিঠা আওয়াজের' পেছনে হা করে দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষুধা-দারিদ্র্য এবং বৈদর আলীর স্বল্প বেতনের পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্য টানাটানি ও সংকট অবশেষে বৈদরকে বাধ্য করে বউয়ের টান করা শরীরকে ব্যবহার করতে। গল্পের শেষ দিকে দেখি, ওদের ঘরের বারান্দায় মাংস-লোভী মানুষের আগমন এবং শেষ পর্যন্ত জনৈক কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে জৈগুনের ঘরের ভেতর প্রবেশ—

> 'বুঝলাম ঘরের ভিতরে যে মানুষটা কাঁপা হাতে সিগারেট ফুঁকছে আর ফিসফিস হাসছে, এই মাস্টার কন্ট্রাক্টরই জৈগুনের মানুষ, সে-ই আজ ঘরের বাতি নিভাবে।... *কিন্তু*... চৌকির ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ শুনলাম, ভারি একটা দমের হাঁসফাঁস শুনলাম। তারপর সব থামল। কিন্তু, আরে আরে, জৈগুনের তো হাতভরা রেশমি চুড়ি, চুড়ির আওয়াজ শুনলাম না তো।'

জৈগুনের চুড়ির ওই 'মিঠা আওয়াজ' হারিয়ে গেছে। কারণ, এই মিলনে আর যাই থাক 'মহব্বত' নেই। এ শুধু দারিদ্র্য ও ক্ষুধার কাছে আত্মসমর্পণ। জীবনের এই ভয়াবহ চিত্রই হয়তো বাস্তবতা, হয়তো এই সমর্পণ অনিবার্যও বটে, কিন্তু রাহাত খান তাঁর গল্পে পাঠকদের বুঝিয়ে দেন— ওই 'মিঠা আওয়াজ'টা তিনি প্রবলভাবেই শুনতে চান, সেটিই কাম্য তাঁর। রেশমি চুড়ির ওই মনোরম শব্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈদর-জৈগুনের প্রেমপূর্ণ আনন্দময় জীবনযাপনের প্রতীক হয়ে পাঠককে জানিয়ে যায়— ক্ষুধার সুবিশাল হা-এর মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে ওই প্রেম, অনিবার্যভাবে, অবিরল।

লেখকের 'মিঠা আওয়াজ' শোনার বাসনা-প্রত্যাশা এই গল্পে নিপুণভাবে চিত্রিত হয় বটে, কিন্তু তিনি তো শিল্পী, মানবজীবনে সৃষ্ট ও রচিত নানাবিধ দৃশ্যের মেধাবী চিত্রকর— তিনি তাই ওই প্রত্যাশাকে পাঠকের ওপর চাপিয়ে দেন না। তিনি জানেন— জীবনের বহুমাত্রিক জটিলতা ও সংকট, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সব ইতিবাচকতাকে প্রশ্নের মুখোমুখি করে তোলে। স্নেহ-মমতার বন্ধন, ভালোবাসার শক্তি সবই যেন ক্ষয়ে যায়, বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাটিই তখন একমাত্র বিষয় হয়ে মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে। আর এসব জানেন বলেই আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়ে যাই 'ইমান আলীর মৃত্যু'র মতো কালজয়ী গল্প। এই গল্পের প্রথমেই আমরা মৃত্যুদশায় পতিত ইমান আলীর সন্তানদের আহাজারি, পুত্রবধূদের বিলাপ দেখতে পাই, যেন তার আসন্ন মৃত্যু তাদেরকে কতটাই না বিকারগ্রস্ত করে তুলেছে! এ অবস্থা থেকে প্রায় অলৌকিকভাবে জীবন ফিরে পেলে পাঠকের মনে বিস্ময় জন্মে, জাগে প্রশ্ন— তবে কি ইমান আলীর মৃত্যু এর চেয়েও কোনো ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করবে? ইমান আলীকে অতঃপর আমরা দেখি যৌথ পরিবারের স্নেহ-মমতার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন হিসেবে, এক স্নেহময় জনকের বিশাল হৃদয়ের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু তারপরই গল্পে চলে আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আসে বন্যা। আসে অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রিলিফের অপর্যাপ্ত চাল আর তাদের ক্লিষ্ট বেঁচে থাকার খুঁটিনাটি চিত্র। বন্যার জল নেমে গেলে খাদ্যের অভাব আরও বাড়ে, মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে খাদ্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে—ইমান আলীর ছেলেরাও সেই দলে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সেটা বাপকে ছাড়াই। কিন্তু—

> 'রাতেই ওরা তৈরি হয়ে যায়। কিছু হাঁড়িপাতিল-বাসন, কিছু গাঁটরি-বোঁচকা আর ফকির চানের পোলাপানগুলো, এই হলো বোঝা। চলে যাওয়ার আগে চুপচাপ শেষ দেখার জন্য তারা যায় ইমান আলীর ঘরে, গিয়ে দ্যাখে লম্বা পিরহানটা গায়ে দিয়ে টুপি মাথায় লোকটি তৈরি হয়ে বসে আছে। ওদের আওয়াজ পেয়েই ভাঙা গলায় কেঁদে ফেলে ইমান আলী। বলে, পুত, আমারে থুইয়া তোমরা কই যাও? আমি কার কাছে থাকতাম?'

অতঃপর ইমান আলীও ওদের সঙ্গী হয় (খাদ্যের সন্ধানে এই অনিশ্চিত যাত্রা আমাদের কি আদিম মানুষের কথা মনে করিয়ে দেয়?)। এবং—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ইমান আলী মুচকি মুচকি হাসে। চালাকি না করলে বাঁচনের জোগাড় আছে? আর-একটু হলেই তো তিন পোলা তাকে ফেলে চলে এসেছিল!...তিন পোলার চালাকি-ষড়যন্ত্র সে যে ভণ্ডুল করে দিয়েছে এজন্য তার আমোদ লাগছিল খুব।'

কিন্তু এই দীর্ঘ যাত্রা, দু-দিন দু-রাত উপবাসের পর ক্লান্ত শরীর এক সময় ভেঙে পড়ে—

হাঁটু ভেঙে সে বলল, 'ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ।' মেন্দি 'কি অইছে মেছাব' জিজ্ঞেস করলে ইমান আলী বলে, আল্লা রহম কর, রহম কর। এই সময় বুক একেবারে ভেঙেচুরে বিষম কাশি উঠল বুড়োর, বুকে হাত দিয়ে কাশতে লাগল।...ইমান আলী গাছতলায় চোখ বুজে শুয়ে আছে, হাঁপরের মতো ওঠানামা করছে বুক, বোধহয় মরেই গেছে। এই অবস্থায় তিন ভাইয়ের মধ্যে চোখ ঠারাঠারির একটা পরামর্শ হয়ে গেল। ফিসফিস করে রহিম চান বলে, 'আর উপায় নাই কুনো উপায় নাই।'

অতঃপর বাপকে ফেলেই রওনা দেয় তারা। গল্পের শেষ অংশে মৃতপ্রায় পিতাকে ফেলে পুত্রদের এই পলায়ন দৃশ্য পাঠককে ভয়াবহভাবে চমকে দেয়। গল্পের শুরুতে যখন অভাব ও ক্ষুধার প্রকোপ এতটা তীব্র ছিল না, ইমান আলীর আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনায় যারা আহাজারি-হাহাকার-কান্না আর বিলাপে পরিবেশ ভারি করে তুলেছিল, তারাই এই দুর্ভিক্ষপীড়িত সংকটকালে মৃতপ্রায় পিতাকে রাস্তার পাশে ফেলে রেখে লঙ্গরখানার উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছে! এমনকি ছোট ছেলে আবু চান যখন টের পায় তার 'পিরানের খুঁট'টা মুমূর্ষু ইমান আলী চেপে ধরেছে তখন—

মাথাটা ঘুরে উঠল আবু চানের। দুইদিন দুই রাত উপোসের পর এভাবে রাস্তার ধারে গাছতলায় আটকা পড়ে গিয়ে এবং কিশোরগঞ্জের লঙ্গরখানা এখনো পনেরো মাইল দূরে সেই চিন্তায় ও ভয়ে দিশা হারিয়ে পাগলের মতো উঠে দাঁড়ায় সে, 'ভায়ু গো, ভায়ু গো, মল্লাম, মল্লাম, এই চিৎকারে আকাশ ফাটিয়ে সে ছুটল।

ক্ষুধা মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তার একটি অসামান্য বর্ণনা পড়ে আমরা শিউরে উঠি। ইমান আলীর মৃত্যু ঘটছে— একটি গ্রামের সম্মানিত ব্যক্তি, একজন স্নেহময় পিতা, মায়াময় পারিবারিক বন্ধনের প্রতীক সে— অথচ তার মৃত্যু নিয়ে ভাবাবেগে ভোগার কোনো অবকাশই পাঠকের আর থাকে না। রাহাত খান তর্জনী তুলে পাঠককে সাবধান করে দেন— এখানে কোনো ভাবাবেগের স্থান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই; বরং আবু চানের ওই দৌড়ে পালানোর দৃশ্যটি ভয়াবহ বাস্তবতার প্রতীক হয়ে ধ্রুপদী দৃশ্যের মতো পাঠকের সামনে চিরকালের জন্য ঝুলে থাকে।

আবু চানের ওই পালিয়ে যাওয়া কিংবা ইমান আলীর ওই 'পিরানের খুঁট' আঁকড়ে ধরার দৃশ্যগুলো তাদের বেঁচে থাকার তীব্র আকুতিকেই মূর্ত করে তোলে। 'বাঁচতে চাই'— এর চেয়ে বড় কোনো সত্য নেই তাদের কাছে। সম্পর্কবোধ নয়, স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা নয়— বেঁচে থাকাটাই সর্বস্ব।

এই আকুতি, বেঁচে থাকার এই অভিলাষ আমরা দেখতে পাই 'উদ্বেল পিপাসা' গল্পেও। জীবনবোধ নির্মাণে গল্পটি তুলনারহিত। একজন অসুস্থ লোক, ঘরে বন্দি, ওষুধ-ডাক্তার ও খাদ্যের জন্য স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল। স্ত্রী কর্মহীন, অতএব পাশের কামরাটি এক বন্ধুকে সাবলেট দেয়া ছাড়া উপায় থাকে না। একদিন ঘটনাক্রমে লোকটি স্ত্রীকে তার বন্ধুর বাহুলগ্ন অবস্থায় দেখতে পায়। ঈর্ষায়, ক্রোধে সে জ্বলে ওঠে। প্রতিশোধ স্পৃহায় পাগল হয়ে ওঠে— 'হাসান আমি ভালো হবার পর তোমাকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো শালা। সে দাঁত কিড়মিড় করল। খালেদাকেও ছাড়বে না।' একদিকে ক্ষুধা, পেটে তীব্র দহন, আরোগ্যাতীত অসুস্থতা, অন্যদিকে ঈর্ষা, ক্রোধ ও কষ্টে নীল হয়ে গেল সে। বউকে গালাগালি করলো, অভিশাপ জানালো সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতি। কিন্তু সে বাঁচতে চায়, সেজন্য খালেদার ওপর নির্ভরতা ছাড়া তার কোনো উপায় নেই। সে খেতে চায়, ওষুধ চায়, মমতা চায় ওই 'চরিত্রহীন' স্ত্রীর কাছেই, এমনকি বাঁচার জন্য হাসানকে 'সুহৃদ' বলেও মনে হলো তার। স্ত্রীর মমতাময়ী রূপটি ভেবে কষ্ট ভুলতে চাইলো। একই সঙ্গে ঘৃণা ও ভালোবাসা, প্রেম ও আক্রোশ, ঈর্ষা ও নির্ভরতা, ক্রোধ ও বাঁচার আকুতিতে সে এক অদ্ভুত চরিত্রে পরিণত হলো। ছোট একটি গল্পে একটি চরিত্রের এমন বহুমাত্রিক প্রকাশ দেখে আর সবকিছুর মধ্যে ওই চরিত্রের বেঁচে থাকার তুমুল আকাঙ্ক্ষাকে আবিষ্কার করে বিস্ময়ে পাঠক অভিভূত হয়ে যায়। পৃথিবী— সে যেমনই হোক, জীবন— সে যতই পীড়াদায়ক হোক, একটি জীবনের জন্য একবার মাত্র পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ ঘটে— চরিত্রটি যেন সেই সত্য আরেকবার জানিয়ে যায় পাঠকের কানে কানে।

এভাবেই বিভিন্ন রকমের বেঁচে থাকা মানুষের। বেঁচে থাকার জন্য, একটু ভালো থাকার জন্য জীবনের বর্ণ-গন্ধময় আয়োজনকে আরেকটু উজ্জ্বল করে তোলার জন্য জৈগুনকে নিজের শরীর বিলিয়ে দিতে হয় 'পরপুরুষের' কাছে। আবু চানকে জনকের স্নেহময়তার বন্ধন ভুলে দৌড়ে পালাতে হয় কিংবা প্রবল ঈর্ষায় কাতর হয়েও সুযোগসন্ধানী বন্ধুকে 'সুহৃদ' বলে ভাবতে হয়। এত এত বিভিন্ন মাত্রিক আয়োজন বিভিন্ন মানুষের। জীবনকে যে যেভাবে দেখে সেভাবেই নির্মাণ করে বেঁচে থাকবার কৌশল। 'ভাল মন্দের টাকা' গল্পের রহিমদাদ হয়তো জীবনকে নিয়েছিল এক নিষ্ঠুর কৌতুক হিসেবে। কোনো বিষয়েই যেন কোনো মোহ নেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার, এক অদ্ভুত নিরাসক্তি তাকে ঘিরে থাকে। এই নির্মোহতা ও নিরাসক্তি নিয়ে সে এক বিচিত্র কৌতুকে মেতে ওঠে। 'পর্নোগ্রাফি' আর 'থ্রিলার' লিখে জীবনধারণ করে সে কিন্তু এতেও যেন তার বিশেষ কোনো অংশগ্রহণ নেই। বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই লেখা আর বিচিত্র সব মানুষের সংস্পর্শে আসা। 'হীরু মিয়া', 'আমিনা' কিংবা 'হাজী সাহেবের' মতো লোকজনের সঙ্গে তার মেলামেশা স্রেফ ব্যবসায়িক প্রয়োজনে— তাদের আচার-আচরণ তার ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে না। হীরু মিয়া অবলীলায় তার লেখা পর্নোগ্রাফি 'কিছু হয় নাই' বলে মুখের ওপর ফেরত দিয়ে গেলেও তার তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না, সে বরং আমিনার সঙ্গে গল্প জমাতে চেষ্টা করে। হেনাবুর সংসার ভাঙার সংবাদ শুনে সে অবসন্নতা কাটিয়ে 'ঠিক আগের মতো জেগে উঠল'। বন্ধু সাখাওয়াত প্রায় ভিখারি সদৃশ জীবনযাপন করে— রহিমদাদের এতেও কোনো বিকার নেই। রায়হানার পাশে শুয়েও নিজেকে অনুত্তেজিতই দেখতে পায় সে। যেন এক জীবন্মৃত মানুষ সে— অনুভূতিশূন্য, প্রতিক্রিয়াহীন। বন্ধু জামিল মৃত্যুপথযাত্রী, অথচ এ নিয়ে তার কোনো দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। আছে দুশ্চিন্তা — জামিল মরে গেলে কে তাকে থ্রিলারের রসদ জোগাবে! জামিলের আসন্ন মৃত্যু নিয়েও সে এক বিস্ময়কর কৌতুকে মেতে ওঠে। যেন বন্ধুর মৃত্যুও একটি ঠাট্টার বিষয়। রহিমদাদের এই আচরণ আমাদের চমকে দিয়ে যায়। এমন নিস্পৃহ, নিরাসক্ত আচরণের ব্যাখ্যা কী? সে কি কোনো কারণে হারিয়ে ফেলেছে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা, নাকি জীবনকে অতিমাত্রায় ক্যাজুয়ালি নিয়েছে সে? অর্থহীন আর বৈশিষ্ট্যহীন এই জীবনের জন্য এত আয়োজন কি হাস্যকর মনে হয় তার কাছে? জামিলের সঙ্গে কথোপকথনে তার নিস্পৃহ কৌতুকপ্রবণ আচরণটি ফুটে ওঠে—

> জামিল মরে যাওয়ার আগে তার সম্পত্তির কাকে কি দিয়ে যাবে সেই কথা হচ্ছিল। রহিমদাদ বলল, দোস্ত, তুই লেখাপড়া করে এই তিনতলাটা আমাকে দিয়ে যা না।
> পাগল নাকি। জামিল বলল। তুই আমার কে যে বাড়িটা দিয়ে যাব?
> রহিমদাদ বলে, কেন আমি তো তোর ফ্রেন্ড। দিয়ে যা না বাড়িটা।
> জামিল বলে, না। আমি তোকে লেখার টেবিল আর বইগুলো দিয়ে যাব।
> আর জামাকাপড়? তোর পার্কার পেনটা? চেনওয়ালা সোয়েটারটা?
> জামিল হাসতে হাসতে বলেঃ আর কিছু না। লেখার টেবিল আর বইগুলো, ব্যস।
> রহিমদাদ দুঃখিত হয়ে বলেঃ ঠিক আছে তাই দিস। কিন্তু তুই মরে গেলে আমার সিরিজটা মার খেয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চমকে উঠতে হয়, এ কি কোনো মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুর সঙ্গে কথোপকথন? এত নিস্পৃহতা, এমন নিষ্ঠুর কৌতুক কী করে সম্ভব একজন অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে? পাঠককে আবারও চমকাতে হয় জামিলের মৃত্যুসংবাদ শোনার পর রহিমদাদ ও রায়হানার আচরণ দেখে। মৃত্যুসংবাদ শুনে—

রহিমদাদ ঃ মারা গেছে। দুপুরবেলা? ইস!
রায়হানরা ঃ দুপুর একটা পঁচিশে মারা গেল। খুব শান্তভাবে মরল। একটাও কথা বলেনি। কারো দিকে তাকায়নি।
রহিমদাদ ঃ যাক, জামিল তাহলে মারা গেল। উঃ কদ্দিন থেকে মারা যাওয়ার কথা। জামিল নিজেই টায়ার্ড হয়ে পড়েছিল।

এখানেই মৃত্যুর আলোচনা শেষ, অতঃপর দুজনেই প্রবেশ করে জীবনের আলোচনায়। যেন জামিলের মৃত্যু বিশেষ কোনো ঘটনা নয় তাদের কাছে, যদিও রায়হানা জামিলের একদা প্রেমিকা, রহিমদাদ বন্ধু। আবারও দেখতে পাই জামিলকে সমাধিস্থ করে এসে—

বাসায় নামিয়ে দিয়ে রায়হানা বললো, তুমি কবিতা লিখেছিলে?
রহিমদাদ বলেঃ নাহ।
রায়হানা বলেঃ তুমি পারবেও না।
রহিমদাদ বলেঃ তাই। আমি থ্রিলারও লিখতে পারছি না আর।...
রায়হানার গাড়িটা চলে গেলে রহিমদাদ কিছুক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল। পরে নিজেকে নিজে বলল ঃ হয়তো আমি একটা কবিতা লিখতে চাই। এছাড়া উপায় নেই আমার। আমাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া উপায় নেই আমার।

গল্পের একেবারে শেষ পঙ্‌ক্তি নতুন করে ভাবিয়ে তোলে পাঠককে— যেন এতক্ষণে রহিমদাদের মধ্যে খানিকটা মানবিক বোধের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে আর থ্রিলার লিখতে পারছে না। একটি কবিতা লিখতে চায় সে, কারণ, 'এছাড়া উপায় নেই' তার। কেন? কে তাকে নষ্ট করেছে? রায়হানা? যে আশ্চর্য নিরাসক্তি নিয়ে সে বরাবর জীবনকে দেখে এসেছে, থ্রিলার লিখেছে, পর্নোগ্রাফি লিখেছে, একটি কবিতা লেখার প্রেরণা— যা রায়হানা কর্তৃক প্রদত্ত— কি সেই নিরাসক্তিকে ধসিয়ে দিলো?

রহিমদাদ বাংলা গল্পের দীর্ঘ ঐতিহ্যে এক বিস্ময়কর চরিত্র। জীবনকে এত ক্যাজুয়ালি, এত ঠাট্টা-মশকরা, কৌতুক-বিদ্রূপের বস্তু হিসেবে দেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। রহিমদাদ তাই দেখেছিল। এভাবেই হয়তো জীবনকে দেখতে চেয়েছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অন্তহীন যাত্রা'র কমরউদ্দিন। প্রায় লম্পট এক নাগরিক চরিত্র সে, একজন 'খারাপ মহিলা'র বাসা আরামবাগ থেকে নিজের বাড়ি ভূতের গলিতে ফিরছে সে— মধ্যরাতে, মাতাল হয়ে। জীবনযাপনে সম্ভবত ব্যর্থ একজন মানুষ সে, নিস্পৃহ এবং অনুতাপহীন। সাহায্যপ্রার্থী বন্ধুর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতে পারে, 'বাবার মতো' দেখতে ভিখারিকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিতে পারে, যে-কোনো দুর্ঘটনা যেন তাকে উল্লসিত করে তোলে। অনুতাপহীন সে, কিন্তু সম্ভবত এজন্য তার দুঃখও আছে। 'আমার কোনো অনুতাপ নেই'— এ কথা বলার একটি অর্থ কি এই নয় যে, এজন্য আমার ভেতরে প্রশ্ন আছে, ক্ষরণ আছে? গভীর রাতের এই দীর্ঘ পরিক্রমণের এক পর্যায়ে সে ওই 'খারাপ মহিলা'র প্রাক্তন স্বামীর হাতে বেদম মার খায়। কষ্টের চেয়ে তার বিস্ময় বাড়ে অধিক মাত্রায়— লোকটি কী আশ্চর্য প্রেমিক! প্রেমিকদের পক্ষেই সম্ভব ঈর্ষা করা এবং 'প্রাক্তন' হওয়া সত্ত্বেও লোকটির ঈর্ষা কী প্রবল! নিজেকে ওই প্রেমিকের সঙ্গে মিলিয়ে দ্যাখে— কোনোদিন প্রেমিক হতে পারেনি, চিরকাল সে নিছক একজন পুরুষ। সে বস্তুত কিছুই পারেনি। মোটামুটিভাবে একজন ব্যর্থ লোক হিসেবে তাকে চিহ্নিত করা যায়। এখন সে অনুতাপহীন, নিস্পৃহ। স্ত্রীর মৃত্যুপথযাত্রাও তাকে টলাতে পারে না। একদিন 'বুভুক্ষু শিশু'দের ম্লান মুখ যার চোখ সজল করে তুলতো, ওদের জন্য যে কোনো 'রক্তাক্ত বিপ্লবে' অংশ নিতে চাইতো, তার এই পরিণতি অবশেষে তাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

গল্পের শেষাংশে আমরা দেখি কমরউদ্দিন হেঁটে চলেছে একটা অচেনা শবযাত্রীদের দলের সঙ্গে— গন্তব্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, অন্তহীন এক যাত্রার পথিক হয়ে। তবে কি মৃত্যুই তার অনিবার্য পরিণতি এই মুহূর্তে? যে অস্বাভাবিক নিস্পৃহতা তাকে ঘিরে আছে— মৃত্যু ছাড়া তা থেকে মুক্তি নেই?

নাগরিক মানুষের এসব নিস্পৃহতা ও নিরাসক্তি— যেন তারা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে যাবতীয় মানবিক অনুভূতি— রাহাত খানের কলমে চমৎকার কুশলতায় চিত্রিত হয়ে পাঠককে মুগ্ধ করে।

৩

রাহাত খানের গল্পের এক প্রধান অংশ জুড়ে আছে মুক্তিযুদ্ধ। 'মধ্যিখানে চর', 'দীর্ঘ অশ্রুপাত', 'এই বাংলায়', 'মুক্তিযোদ্ধার মা' প্রভৃতি গল্পে মুক্তিযুদ্ধ চিত্রিত হয়েছে এক ভিন্ন মাত্রায়। যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ-পরবর্তীকালের এই দেশ ও সময়ই তার কলমে অধিক মর্যাদা পেয়েছে।

'মধ্যিখানে চর' গল্পের সবুজ যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের ক্ষয়ে যাওয়া, বিভ্রান্ত, স্বপ্নশূন্য তারুণ্যের প্রতিনিধি। যে সাহস ও ত্যাগ নিয়ে, যে হিরন্ময় স্বপ্ন বুকে নিয়ে প্রাণ হাতে করে তারা যুদ্ধ করেছিল, সদ্য স্বাধীন দেশ তার সবকিছুকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্বীকার করেছে, কিছুই পায়নি তারা। সমাজ পাল্টায়নি, দেশ ক্রমশ অন্ধকারের অতল গহ্বরগামী, তারা বিভ্রান্ত ও স্বপ্নশূন্য না হয়ে কী-ই বা করবে? অতএব আতিক কিংবা মিজান বা হাজারী অথবা সবুজ এখন অবসাদগ্রস্ত, ক্লান্ত, বিপন্ন। এখন তারা 'ডাকাতি কইরা' বেড়ায়। যে হাত একদা পাঞ্জাবি সৈন্যদের বুকে বেয়নেট চার্জ করেছে, এখন সেই হাত ডাকাতির জন্য ছুরি বসায়, 'বুড়ো পাইকারের পেটে লাথি' বসায়। তাঁদের চারপাশে এখন 'মৃত্যু, রক্তপাত, গভীর পতন ও চিৎকার।' তাদের আর ফেরার উপায় নেই স্বাভাবিক জীবনে। তারা তাই ক্ষুব্ধ, জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও অবসাদগ্রস্ত।

অথচ এমন তো হবার কথা ছিল না। স্বপ্ন যখন তৈরি হয় তখন তার বিস্তার তো আকাশ-ছোঁয়াই হয়। তার পুরোটা হয়তো পূরণ হয় না কখনো, সেটা সম্ভবও নয়। তা-ই বলে কিছুই থাকবে না স্বপ্ন দেখার মতো? ঘাতকরা শেষ পর্যন্ত বসবে সমাজের উঁচু উঁচু পদে। এতটা কি মেনে নেয়া যায়? 'এই বাংলায়' গল্পের মৃত আত্মারা তাই যখন এই মর্তলোকে এসে বিজয় উৎসবের মঞ্চে ঘাতকদের বসে থাকতে দেখে, অপমানিত হয়ে ফিরে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় থাকে না। এই গল্পটির নির্মাণ কৌশল চমকপ্রদ এবং হয়তো এই নির্মাণশৈলীর জন্যই এটি পাঠকদের কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশে সমাজ ও রাষ্ট্রে ঘাতক-দালালদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসার করুণ-মর্মান্তিক-অভাবনীয় বাস্তবতাই এই গল্পে ধরা পড়েছে চমৎকার কুশলতায়। গল্পের শুরুতেই দেখি— একটি মেয়ে, যুদ্ধের সময় যে পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছে নির্মমভাবে নিগৃহীত হয়েছিল, ধর্ষিত হবার পরও পৈশাচিক নির্যাতন করে (ছুরি দিয়ে স্তনবৃন্ত কেটে নিয়ে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে) তাকে হত্যা করা হয়েছিল, সেই মেয়েটি তার ছায়া-শরীর নিয়ে নেমে এসেছে এই বাংলায়, তার জন্মভূমিতে। প্রতি বছরই সে ফিরে আসে এই দিনে তার ছায়াশরীর নিয়ে— হয়তো পার্থিব জগতের মায়া আর ফেলে যাওয়া জীবন আর স্বজনদেরকে আবার চোখভরে দেখার তৃষ্ণাই তাকে ফিরিয়ে আনে। অনন্তলোকে গিয়েও সে অনুভব করে— পার্থিব জীবনের কোনো কিছুই ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়নি তার পক্ষে, এমনকি প্রেমিকের কাছে প্রতিশ্রুত একটি অসমাপ্ত চুম্বন-আকাঙ্ক্ষার স্মৃতি অথবা মা-বাবা তাকে আদর করে যেসব নামে ডাকতেন সেগুলোও। শুধু যে সে-ই আসে, তা নয়। আসে তারই মতো আরও অনেক অনন্তলোকের বাসিন্দা, যাদেরকে যুদ্ধের সময় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের কথোপকথনে আমাদের জানা হয়ে যায় সেইসব অলিখিত ইতিহাস। কিন্তু, বিজয় উৎসবের দিনে এক শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে এসে মেয়েটি দেখতে পায়— অনুষ্ঠান মঞ্চের সভাপতির আসনে বসে আছে ওই শহীদের হত্যাকারী আর এক সহযোদ্ধা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মলিন-শতছিন্ন পোশাক পরে, ভিখারির বেশে। মঞ্চ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুংকার ভেসে আসছে— 'লাহোর-প্রস্তাবেরই ফল এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা। যারা তা মানে না, তারা জাতীয় বেঈমান।'

কোথায় মুক্তিযুদ্ধ, কোথায় মুক্তিযোদ্ধা, কোথায় শহীদ, কোথায় স্বাধীনতা? হায়! অতঃপর, তীব্র বেদনা বুকে চেপে শহীদের আত্মারা ফিরে যায় অনন্তলোকে! আর আমরা অনুভব করে উঠি— এ আসলে গল্পের চেয়ে বেশি কিছু। টের পাই— গল্প নয়, বরং রচিত হয়েছে আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার এক অনুপম দলিল।

মৃত আত্মারা না হয় সইতে না পেরে আকাশ বিহারে চলে যেতে পারে; কিন্তু যারা বেঁচে আছে তারা কী করবে? 'মুক্তিযোদ্ধার মা' গল্পের শহীদ আবু চানের মাকে তো জীবনধারণ করতে হচ্ছে ভিক্ষা করে। ছেলের পরিচয় দিতে সে গর্বই বোধ করে; কিন্তু তাতে খিদে তো আর মেটে না। ফলে ভিক্ষা করতে গিয়ে ওই পরিচয়টি তাকে প্রায় ঠাট্টা-মশকরা করার মতো একটি চরিত্রে পরিণত করে ফেলে। গল্পের শেষে পাড়ার যুবকদের কাছে তার মার খাওয়ার দৃশ্যটি হয়তো বর্তমান সময়ের একটি সার্বিক চিত্রকেই নির্দেশ করে যায়। আমাদের এই দুর্বিনীত সময়ে মুক্তিযুদ্ধ-মুক্তিযোদ্ধা কিংবা তাদের স্বপ্ন, তাদের প্রত্যাশা কিংবা অর্জন ক্রমাগতই কি মার খেয়ে যাচ্ছে না ঘাতকদের কাছে?

তবে কি মুক্তিযুদ্ধ কিছুই দেয়নি আমাদের? যে *দীর্ঘ অশ্রুপাত* শুরু হয়েছিল একাত্তরে, আজও কি তার শেষ হলো না? মুক্তিযুদ্ধ কি তবে ছিল কেবল পতাকা বদলের যুদ্ধ, কেবল এক দল শোষকের হাত থেকে অন্যদলের হাতে ক্ষমতা অর্পণের যুদ্ধ? রাহাত খানের গল্পে এসব প্রশ্ন অনুক্ত থেকেও যেন তীব্র হয়ে ওঠে পাঠকের সামনে।

উপসংহারের পরিবর্তে

রাহাত খানের প্রায় সব গল্পই ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে লেখা। ভাষায় কোনো রকম জটিলতা নেই, নিমেষে পড়ে ফেলা যায়— সংযত আবেগ, সংহত বর্ণনা। যেন জীবন এমনই— এরকম ক্যাজুয়াল, নিস্তরঙ্গ। 'চুড়ি'র মতো ইঙ্গিতবাহী গল্প, 'ভাল মন্দের টাকা' কিংবা 'ইমান আলীর মৃত্যু'র মতো অসামান্য গল্পও তাঁর কলমে নিরাসক্ত বর্ণনায় মূর্ত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে 'মধ্যরাতে' গল্পটির কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। পুরো গল্পটিই রচিত হয়েছে সংলাপের মাধ্যমে। দুজন মধ্যবয়স্ক মানুষ— বিপরীত লিঙ্গের— রং-নাম্বারে পেয়ে গেছে পরস্পরকে, মধ্যরাতে। তাদের কথোপকথনেই রচিত হচ্ছে নিজেদের জীবনচিত্র। নিঃসঙ্গ, অচেনা দুজন মানুষ যেন এই মধ্যরাতে পরস্পরের কাছে অকপট ও আপন হয়ে উঠেছে। কিন্তু গল্পের শেষদিকে যখন লোকটি 'মাঝে-মধ্যে এরকম আলোচনা'র ইচ্ছে প্রকাশ করে তখনই লাইন কেটে যায় এবং পরিশেষে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখকের কথা ঃ মানুষের সব গল্পই এরকম। জীবন ভরে বহু রং নাম্বার। কখনোই খুব বেশি আশা করতে নেই।

পুরো গল্পটি সংলাপমুখর রেখে একদম শেষ পঙক্তিতে লেখকের উপস্থিতি পাঠককে কৌতূহলী করে তোলে এবং 'মানুষের সব গল্প এরকম' মন্তব্যে রাহাত খান জীবন সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি খানিকটা জানিয়ে দেন। মানুষের গল্প এমনই— অচেনা দুজন মানুষের মধ্যরাতের অনিশ্চিত, রহস্যময়, গন্তব্যহীন কথোপকথনের মতো। তারপর 'জীবন ভরে বহু রং নাম্বার'। মানুষ তাহলে প্রধানত রং নাম্বারেই ডায়াল করে যায়! রাহাত খান এ কোন জীবনের কথা বললেন? মাত্র একটি পঙক্তিতেই কি বুঝিয়ে দিলেন মানুষের নিঃসঙ্গতা ও নিঃস্বতার বিষয়? কারো সঙ্গেই কারোর কার্যকর যোগাযোগ ঘটে না— মূলত মানুষ তো একা, 'তার চিবুকের কাছে ভীষণ অচেনা ও একা'— পুরোপুরি যোগাযোগ হওয়ার আগেই কেটে যায়, যেহেতু তা রং নাম্বার! গল্পের শেষ পঙ্‌ক্তি 'কখনোই খুব বেশি আশা করতে নেই'— যেন জীবন সম্বন্ধে এক সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়। এত কিছু এই জীবন নিয়ে— এত প্রেম, ভালোবাসা, ঈর্ষা, ক্ষোভ, ক্রোধ, দ্রোহ, যুদ্ধ— অথচ কত অনিশ্চিত আর ক্ষণস্থায়ী! এই জীবনের কাছে, এই পৃথিবীর কাছে তাই 'খুব বেশি আশা' করা অনুচিত— আশা করতে নেই!

রচনাকাল : ডিসেম্বর, ১৯৯৭
প্রথম প্রকাশ : ১৭ জুলাই, ১৯৯৮, দৈনিক ইত্তেফাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদুল হক : আশ্চর্য অবলোকন

প্রাককথন

ষাটের দশক বাংলাদেশের সাহিত্যে উপহার দিয়েছিল এক ঝাঁক উজ্জ্বল সাহিত্য কর্মী— এক সঙ্গে এত অধিক সংখ্যক শক্তিশালী লেখকের আগমন আর কোনো সময় ঘটেনি। একই সময়ের লেখক হলেও তাদের একে অপরের সঙ্গে মিল সামান্যই, বস্তুত এজন্যই ষাটের দশক নির্মাণ করতে পেরেছে বহুমাত্রিক সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রভূমি। এ সময়ের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ গল্পকারের কথা-ই ধরা যাক। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আর আবদুল মান্নান সৈয়দ একই সময়ের গল্পকার— ব্যক্তিজীবনে তাঁদের বন্ধুত্বও ছিল— কিন্তু গল্পভাবনা, গল্পের বিষয়, ভাষা ও প্রকরণে তাদের রয়েছে কয়েক যোজন দূরত্ব। কিংবা রাহাত খান বা জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের ভেতরেও দূরত্ব একই-রকম। সেলিনা হোসেন, হাসান আজিজুল হক, শওকত আলীও প্রায় একই সময়ের গল্পকার হলেও এবং তাঁদের গল্পের বিষয়বস্তু মোটামুটি একই— প্রধানত ম্লিবিত্তের পোড় খাওয়া মানুষের জীবন-যাপন— হলেও নির্মাণ কৌশলে তাঁরা আলাদা। মাহমুদুল হক আবার এঁদের সবার থেকে আলাদা। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়— মাহমুদুল হক এই সময়ের লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে ব্যতিক্রমী, উজ্জ্বল ও অনন্য কথাশিল্পী। তাঁর সাফল্য উপন্যাসের পথ ধরে এলেও এবং তাঁর গল্পের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও— ওই স্বল্পসংখ্যক গল্পেই তিনি রেখেছেন তাঁর শক্তিশালী লেখনির স্বাক্ষর। তিনি যে এক অনন্য প্রতিভাধর গল্পশিল্পী, সেটি তাঁর কয়েকটিমাত্র গল্প পাঠেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

গল্পপ্রসঙ্গ

১

মাহমুদুল হক তাঁর গল্পে খুব বেশি কথা বলেন না কখনো, বরং তাঁকে বলা যায় সংযমী, আবেগের রাশ টেনে ধরা লেখক। অন্যান্য লেখকরা যে দৃশ্যপটের বিস্তৃত বর্ণনার লোভ সামলাতে পারেন না, সে-রকম দৃশ্যের বর্ণনায়ও তিনি থাকেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরাসক্ত; এবং পছন্দ করেন ইঙ্গিত দিতে— কখনো কখনো একেকটি ইঙ্গিতই তাঁর গল্প হয়ে ওঠে, কখনো একটিমাত্র বাক্য গল্পের পরিণতি নির্ধারণ করে, কখনো-বা একটি মাত্র দৃশ্যকল্প গল্পের প্রেক্ষাপট পাল্টে দেয়।

তিনি সংযমী, কম কথা বলতে পছন্দ করেন— কিন্তু যেটুকু বলেন সেটুকুতে তিনি স্পষ্ট, লক্ষ্যাভিসারী— যা বলার তা বলে ফেলেন কোনো রাখঢাক ছাড়াই; ফলে যা বোঝাতে চান, সফলভাবেই তা বোঝাতে পারেন তাঁর পাঠকদের।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে তাঁর 'বুড়ো ওবাদের জমা খরচ' গল্পটির কথা। গল্পে বর্ণিত সময়টি মুক্তিযুদ্ধের, কিন্তু কোথাও এর ভয়াবহতার কথা বর্ণনা করেননি লেখক— যথারীতি কেবল ইঙ্গিতেই সেরেছেন মানুষের আশ্রয়হীনতা, অসহায়ত্ব ও নিরাপত্তাহীনতার বিষয়গুলো—

> 'প্রাণের ভয়ে পোঁটলাপুঁটলি সম্বল করে কেউবা একেবারে নাঙ্গা হাতে বনবাঁদার ভেঙ্গে খেতখামার ডিঙ্গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে হন্যে হয়ে ছুটে চলেছে। শহরে শহরে খুনখারাবি, হুলস্থুল; মিলিটারির ভয়ে কিছুটা দিকভ্রান্তের মতো গ্রামে গ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মানুষ।'

কিংবা যুদ্ধের চাপে কেমন আগুনঝরা চেহারা পেয়েছে গ্রামগুলো তার ইঙ্গিত—

> 'প্রতিটি গ্রামই এক একটি নাড়াক্ষেত, দাউ দাউ করে জলছে আগুন; বিপুল ক্ষুধায় গনগনে রৌদ্র নিঃশব্দে গিলে ফেলছে লেলিহান শিখা, দিনগুলোর আদল কতকটা এইরকম।'

তো, এই অবস্থার মধ্যেও চলে জীবনের আয়োজন; অন্য সবকিছুর সঙ্গে সুবিধাবাদিরা নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়। তেমনই এক জনের কাজ করে দেয় বুড়ো ওবাদ— চোরাই মালের বস্তা এদিক-ওদিক করে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে পৌঁছে দেয় মালিকের কাছে। এরই মধ্যে একদিন ঘটে যায় প্রলয়ংকরী ঘটনা। বংশানুক্রমে চুরি যাদের পেশা, তেমনি এক গ্রামে আশপাশের সাত গ্রামের মানুষ হামলা করে চালায় হত্যার উৎসব; গুনে গুনে 'আড়াইশ' পর্যন্ত জবাই করা হয় বুড়ো ওবাদের চোখের সামনেই এবং এতবড় একটি ঘটনায়ও সে থাকে নিস্পৃহ, নির্বিকার, নিরাসক্ত। হত্যার এই মহোৎসবে খানিকটা যেন অংশগ্রহণও আছে তার। কী কারণ? তার কী স্বার্থ? কারণটি লেখক বলেন এইভাবে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জবাই শেষে ধর আর মুন্ডু ফেলে দেওয়া হচ্ছিলো খালে। বোঝা তাকেও টানতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা আর ভালো লাগে না। সে হতাশ হয়েছিলো। বুড়ো ওবাদের ধারণা ছিলো তাকে ফুটোকপালে জেনে অত্যুৎসাহীদের কেউ না কেউ তার হাতে নগদ কিছু গুঁজে দেবে, 'চিমড়া হাড্ডিতে মন্দ দেহাইলা না বুড়া' – স্রেফ এই সুখ্যাতিটুকুই তার জন্য বরাদ্দ ছিলো, সে তা আন্দাজ করে নি।'

চমকে উঠতে হয়। এই নাকি মানব-স্বভাব? কেবল নগদ কিছু পাওয়ার আশায় কেউ এমন হত্যাযজ্ঞেও অংশগ্রহণ করতে পারে? লেখক কি এইরকম নেতিবাচক হিসেবে দেখতে চান মানুষকে?

গল্পের বাকি অংশে আমরা দেখি বুড়ো ওবাদ বিপদ-বিপত্তির আশংকা মাথায় নিয়েও নৌকা বেয়ে চলেছে 'বাইল্যারপাড়' লক্ষ্য করে— নানান কথা ভাবতে ভাবতে। কেন? তার সংশয়-ভীতি-উদ্বেগ দেখে মনে হয়— সে বুঝি কোনো অন্যায় কাজ করছে, হয়তো চোরাই মাল নিয়ে যাচ্ছে তার গন্তব্যের দিকে, এবং ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় থেকেই হয়তো ওই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। অন্ততঃ গল্পের ধারাবাহিকতায় তার ভেতরে এমন কোনো মানবিক আচরণ চোখে পড়েনি, যা দেখে আমরা অন্য কিছু আশা করতে পারি। গল্পের পরিণতির জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয় এর শেষ বাক্য পর্যন্ত। আমরা দেখি— সে আসলে এত আশংকা নিয়েও এখানে এসেছে হত্যাযজ্ঞে নিহত তিনটি শিশুর লাশ দাফন করার জন্য। গল্পের শেষে তাদেরকে কবরস্থ করতে করতে—

সে এক অপার্থিব আচ্ছন্ন গলায় বললে, 'সোনারা, তোমাগো বাপ-মায়ে মাটি পায় নাই, তোমরা পাইলা। দুনিয়াতে তুমাগোর কুনো গুনা নাই। তোমাগোর মনে কুনো দাগ লাগে নাই, আল্লায় তোমাগোর কথা শুনবো, আল্লায় য্যান আমারে বেস্ত দেয়, সোনারা তোমরা কয়ো।'

এই শেষ বাক্যে এসেই আমরা বুঝতে পারি বুড়ো ওবাদ প্রকৃতপক্ষে এক ইতিবাচক মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন মানুষ; যুদ্ধের জন্য ওই গুণাবলি চাপা পড়ে গেছে নিস্পৃহতা ও নিরাসক্তির আড়ালে। তার নির্লিপ্ততার পেছনে আছে মমতা ও ভালোবাসা ভরা একটি হৃদয়— অচেনা শিশুদের লাশ তাই শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সে কবরস্থ করার কথা ভাবতে পারে; আছে সুন্দর জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা— মৃত শিশুদের কাছে তাই সে বেহেশতের জন্য সুপারিশের অনুরোধ জানাতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদুল হক এভাবেই আবিষ্কার করেন মানব চরিত্র আর ইঙ্গিত করেন সকল শুভবোধ ও কল্যাণবোধের প্রতি।

২

মাহমুদুল হক মানুষকে দেখতে চান তার বহুমাত্রিক সম্ভাবনাসহ। ফলে বুড়ো ওবাদের নিরাসক্ত কার্যকলাপের আড়ালে লুকোনো মানবিক হৃদয়টি আবিষ্কৃত হয় যেমন, তেমনি 'অচল সিকি' গল্পে আপাত সহানুভূতির পেছনে আবিষ্কার করেন এক তরুণীর নিষ্ঠুর ও লম্পট রূপটিও।

এই গল্পে এক নবদম্পতি বেড়াতে এসেছে নির্জন বনভূমিতে। গল্পের শুরুতেই দারোয়ানকে পাঁচ টাকা বখশিস দিয়ে আর এই বিরানভূমিতে একাকি বসবাসের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে মেয়েটি তার মমতাময়ী হৃদয়ের পরিচয় পাঠকের কাছে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে। তাদের টুকটাক কথাবার্তা আর খুনসুটিতে গল্প এগিয়ে যায়। বোঝা যায় না, এই খুনসুটিমার্কা কথাবার্তা, ইয়ার্কি আর দুষ্টুমি দিয়ে লেখক গল্পটিকে কোথায় নিয়ে যেতে চান। আমরা দেখি, তারা লোকালয়ের উদ্দেশে হাঁটছে, হাঁটতে হাঁটতেই এক বৃদ্ধ চা বিক্রেতার দেখা পেয়েছে, ত্রি-ভুবনে যাকে দেখার মতো কেউ নেই। মেয়েটি তার প্রতিও সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। তারা চা-টা খেয়ে আবার এগোয়; আর আমরা ক্রমান্বয়ে গল্পের শেষে এসে এক বিমূঢ় পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে পড়ি ; দেখি মেয়েটি বলছে— 'খুব তো ভয় দেখিয়েছিলে যে ঐ আনি সিকিটা চালাতে পারবো না, বুড়ো কিন্তু টেরই পায়নি। ... সেই অচল সিকিটার সৎকার করে এলাম।'

আমাদের কাছে হঠাৎ করেই যেন এই মায়াময়, সহানুভূতিপূর্ণ মানুষগুলোর ভিন্নতর একটি রূপ পরিস্ফুট হয় আর আমরা আবার চমকে উঠি।

মানুষ তাহলে এমনই! অর্থাৎ বাইরে থেকে তাকে যেমন দেখা যায় সে আসলে হুবহু তেমনই নয়; তাকে একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার অবকাশ আছে, তাকে বোঝার জন্য একটি আলাদা অবলোকনের প্রয়োজন আছে। অন্তত মাহমুদুল হকের গল্প আমাদের তাই বলে।

৩

এরকম একটি অবলোকনের চোখ আছে বলেই মাহমুদুল হক দেখতে পান, আপাত নিরীহ জীবন-যাপনের মধ্যেও অনবরত জমে উঠছে গ্লানি, কিছুতেই তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না, কিছুতেই ধুয়ে-মুছে ফেলা যাচ্ছে না অনিবার্যভাবে জমে ওঠা ওই গ্লানির পাহাড়।

জীবনযাপন মানেই তো নানারকম গ্লানিময় অভিজ্ঞতা, কখনো সচেতনভাবে, কখনো অলক্ষ্যেই জমা হয় হিসেবের খাতায়, কিছুতেই তাকে এড়িয়ে যাওয়া যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। 'প্রতিদিন একটি রুমাল' গল্পে সবুজ তেমনই এক চরিত্র, অবিরাম গ্লানি সঞ্চয়ই যার একমাত্র নিয়তি। গ্রামের এক কলেজে পড়ায় সে; ম্লান, ম্রিয়মাণ, সম্ভাবনাহীন, অনুজ্জ্বল এক জীবন তার। অথচ তার ফেলে আসা শৈশব-কৈশোর-তারুণ্য এমন ছিল না; তার বন্ধু আলতাফের ভাষায়— 'স্কুল লাইফে তুই ছিলি আমাদের মধ্যে আদর্শ চৌকস ছেলে। চমৎকার ক্রিকেট খেলতিস, ডিবেটে কচুকাটা করতিস বড় বড় চাঁইদের, ছবি আঁকতিস, কবিতা লিখতিস। স্ট্রাইক হয়ে যেতো দুদ্দাড় তুই ডাক দিলে, আর এখন?'

আর এখন ? এখন সে এক গ্রামের কলেজের 'মাস্টার' আর—

> 'ছেলেমেয়ে আগলে ঢাকায় পড়ে থাকে রেখা (তার স্ত্রী)। সব দায়ভাগই তার। সবুজ শুধু মাসের মধ্যে দু'চারবার ঘুরে যায়, মাস পয়লা পয়সা দিয়ে যায়। ইছাপুরায় পড়ে থাকতে তার নিজেরও খুব একটা ভালো লাগে তা নয়; কিন্তু নিরুপায়। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। টেনেটুনে চালাচ্ছিলো সে এতোদিন কোনো মতে, এখন আর একেবারেই ভালো লাগছে না। সংসার চলার অন্য উপায় থাকলে নির্ঘাৎ ছেড়ে দিতো কলেজের চাকরি, আর পেরে উঠছে না সে।'

তো, গল্প এখানে নয়। গল্পটা হচ্ছে, আলতাফ— যে উচ্ছল, প্রাণবন্ত, জীবনের আনন্দকে উপভোগ করতে চায় তাড়িয়ে তাড়িয়ে— সবুজকে জোর করে নিয়ে বাইরে বেরোয় বেড়াতে। বেরিয়ে সে নানারকম কাণ্ড করে। জোরসে গাড়ি হাঁকায়, রাস্তায় অন্য সব গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দেয়, হৈ-হল্লায় মেতে থাকে— এসব তার চরিত্রের সঙ্গে মানিয়েও যায়, কারণ (সে বলে)— 'আমি সারাদিন, সারা জীবনভর ভীষণ উত্তেজনার ভেতর থাকতে চাই, উত্তেজনাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়।' কিন্তু সবুজের চরিত্রের সঙ্গে এসব একেবারেই বেমানান। সে এসব দুদ্দাড় কর্মকাণ্ডে রীতিমতো পীড়িত বোধ করে। তারা একবার শহরের বাইরে বনভূমির কাছে গিয়ে বসে— সেখানেও আলতাফ জীবনের পক্ষে, আনন্দের পক্ষে সোচ্চার, আর সবুজ যথারীতি ভেঙে পড়া মানুষ— 'আমি আর পারছি না। একবার ঢাকা, একবার ইছাপুরা, এ আর ভালো লাগছে না। ওখানে যা পাচ্ছি এ বাজারে তা এমন হাস্যকর। জীবন চলে না।'

ফেরার পথে আলতাফ এক রিকশারোহী বিষণ্ন তরুণীকে তাড়া করে, পাত্তা না পেয়ে তার রিকশাটাকেই ভেঙে চুরমার করে দেয়; এবং সবুজকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে ঘটনাটার ব্যাখ্যা দেয় এভাবে—

> 'দোষগুণ যাই বলিস না কেন আমার ধরনটাই এখন এই। আমার যা প্রয়োজন আমি তা জোর করে আদায় করে নেই, কারো মুখ চেয়ে বসে থাকি না হা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিত্যেশ করে। যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে গায়ের জোর খাটাই, প্রয়োজন হলে উড়িয়ে দেই, নিজের অস্তিত্বের জন্য এইসব করতে হয় আমাকে। বুঝতে পারছি খুব খারাপ লাগছে তোর, আমি দুঃখিত। মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা কর, ভুলে যা সবকিছু, দেখবি সবকিছু আবার কেমন ফর্সা হয়ে গেছে। দুনিয়াটাই এভাবে চলছে বন্ধু, ভুলে যাবার ক্ষমতা পর্বতপ্রমাণ হওয়া চাই!'

কিন্তু সবুজ কি ভুলতে পারে সবকিছু? তার স্বভাব তো আলতাফের সম্পূর্ণ বিপরীত, আলতাফ যা সহজেই পারে সবুজের পক্ষে তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। নইলে তো আর ঢাকায় কোনো একটা কর্মসংস্থানের জন্য তাকে আলতাফের মুখের দিকে চেয়ে হা-পিত্যেশ বসে থাকতে হতো না, নিজের জীবনকে এমন দুর্দশাপূর্ণ করে তুলতে হতো না! গল্প শেষ হয়ে যায় এখানেই। কোনো-কোনো পাঠক হয়তো ভাববেন— এ গল্পের মানে কী? কেবল জনৈক আলতাফের তারুণ্যের উচ্ছ্বাসমাখা কর্মকাণ্ডের বিবরণ ছাড়া এ গল্পের মধ্যে আছেটা কী? কিন্তু যারা একটু মনোযোগী পাঠক, তারা এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই তুলবেন যে, সবুজ আলতাফের কথামতো আদৌ সবকিছু ভুলে যেতে পেরেছিল কী না! গল্পের কোথাও এ সম্বন্ধে কিছু বলা নেই। কিন্তু আলতাফের—

'ভীষণ ঘেমে গেছিস, মুখ মুছে নে— (বলার প্রেক্ষিতে) সবুজ পকেট হাতড়ালো। রুমাল খুঁজে পেল না। বাঁশবনের তলায় রুমাল পেতে বসেছিলো, মনে পড়লো ফেলে এসেছে। প্রায়ই ফেলে আসে, রেখা বলে এতো রুমাল হারাও কি করে!'

অংশটি পড়ে গল্প সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে হয়। আমরা তো প্রতিদিনই আমাদের শরীরে জমে থাকা ঘাম-ধুলো-ময়লা মুছে ফেলি রুমাল দিয়ে— সেই রুমাল যদি হারিয়ে যায় তাহলে কী উপায় হবে? সমস্ত ঘাম-ধুলোবালি-ময়লা-আবর্জনা জমা কি হবে না শরীরে? এই গল্পের রুমালটি তো নিছক একটি রুমালই নয় বরং এ যেন এক উজ্জ্বল প্রতীক— যা দিয়ে জীবনযাপনের গ্লানিগুলো মুছে ফেলা যায়। কিন্তু প্রতিদিন একটি করে রুমাল হারিয়ে গেলে মোছা আর হয়ে ওঠে না, কেবল জমা হতে থাকে গ্লানিগুলো— জমা হতে হতে গ্লানির পাহাড় জমে ওঠে, জীবনটাই হয়ে ওটে বিপুল গ্লানিময়।

রুমালের আদলে ব্যবহৃত এই প্রতীকটির কারণেই গল্পটি হয়ে ওঠে অনন্যসাধারণ। শুধু মাহমুদুল হকের গল্পগুলোর মধ্যেই নয়— সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই এমন গল্পের উদাহরণ বিরল। এত অল্প কথায়, এত সংযম, এত উজ্জ্বল ইঙ্গিতময়তায় মানবজীবনের এক রূঢ় সত্যের এই অসামান্য রূপায়ন খুব বেশি ঘটেনি আমাদের সাহিত্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪.

মাহমুদুল হকের চরিত্রগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই— সবুজের মতো— জীবন-যাপনে ম্লান-ম্রিয়মাণ-ব্যর্থ ও নিঃস্ব। তাদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, হাবভাব স্পষ্টতই বলে দেয়— তাদের জীবনে কোনো একটা অঘটন গেছে কিংবা প্রতিনিয়ত অঘটন ঘটেই চলেছে। এই চরিত্রগুলো বিষণ্ন ও নিঃসঙ্গ, জীবনের প্রাত্যহিকতায় বেমানান ও বেখাপ্পা— অনুজ্জ্বল ও সম্ভাবনাহীন তাদের জীবনযাপন। ফলে দেখা যায়, দৈনন্দিন ব্যর্থতা ও দুঃখবোধ ঢাকতে তারা আশ্রয় নেয় তাদের ফেলে আসা সোনার শৈশবে। কখনো কখনো হয়তো শৈশবটিও স্বর্নালী নয়, তবু তারা ফিরতে চায় সেখানেই— কারণ ওখানে আশ্রয় আছে, অবোধ আনন্দ আছে, দুঃখবোধের বিপরীতে সুখের বিশাল আকাশ আছে। 'জোনাকী' গল্পের আবুল হোসেনকে আমরা যেমন দেখি এভাবে—

> 'শৈশবে বিমাতার সংসারে নির্মমভাবে প্রহৃত হয়েছেন আবুল হোসেন, মনে পড়ে সেইসব। মনে পড়ে গ্রাম, এক একটি দীর্ঘদিন, গ্রামের জলবায়ু, মেঠোপথ, বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত, মাটির গন্ধ, হু হু বাতাস, প্রহৃত হলেও সেখানে এসব ছিলো যতো বলো, শৈশব মানে বিমাতার অত্যাচার, শৈশব মানে দুঃখ, সে তবু চায়, কিছুতেই তাকে বোঝানো যায় না, বলে আরও দাও, আরও দুঃখ দাও, আমাকে শৈশব দাও, আমাকে কোলে নাও, আমাকে মারো'...

আবুল হোসেন শৈশব চায়, কারণ 'প্রহৃত হলেও সেখানে এসব ছিলো'— তার মানে, এখন এসব নেই। আসলে এখন কিছুই নেই তার জীবনে। ব্যর্থ, ম্লান, ম্রিয়মাণ তার জীবনযাপন। সন্তানগুলো পর্যন্ত বেয়াড়া, হাতছাড়া হয়ে গেছে (এমনকি তাদের মা-ও তাদের সঙ্গেই হাত মিলিয়েছে— নিজের দুঃখ-কষ্টগুলো শেয়ার করার মতো একজন সঙ্গীও নেই তার), তার অপছন্দের কাজগুলো তারা অবলীলায় করে যায় তাকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করেই; পিতা হয়েও তাদেরকে যেন কিছু বলবার অধিকার নেই তার। অবশেষে একদিন ধৈর্যের বাধ ভেঙে গেলে, আর এসবকিছুর বিরুদ্ধে অনেকটা হঠাৎ করেই রুখে দাঁড়ালে নিজ সন্তানের কাছেই প্রহৃত হতে হয় তাকে। এবং তারপর—

> 'অবসন্নতা ক্রমশ কাবু করে ফেলে তাকে। অবসন্নতা, মনোবেদনা, স্থবিরতা— এদের আর এখন কোনো সংকোচ বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। বয়েসের কাছে নিদারুণ ভাবে তিরস্কৃত আবুল হোসেন, বয়েস তাকে ধিক্কার দেয়। গলা পর্যন্ত ঠেলে ওঠে গ্লানির গরল, অদ্ভুত এক গ্লানি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই কি তবে মানুষের নিয়তি? একজন মানুষকে সারাজীবন কেবল মারই খেয়ে যেতে হবে? শৈশবে বিমাতার হাতে মার খাওয়াটা তবু মেনে নেয়া যায়, তাই বলে এই প্রৌঢ়ত্বে এসে নিজ সন্তানের হাতে! জীবন কি তবে এমনই? এই-রকম নিঃস্ব, ব্যর্থ, মার খাওয়া? কোথাও কি একটু স্নেহস্পর্শও থাকবে না? হ্যাঁ, থাকবে। মাহমুদুল হক একচক্ষু দৈত্য নন যে, তিনি শুধু মানুষের উপরিতলটিই দেখবেন। তাঁর আছে অবলোকনের ভিন্নতর একটি দৃষ্টিকোণ, মানুষের ভেতরটাও যা দেখে নিতে পারে। ফলে গল্পের শেষে আমরা দেখি, আবুল হোসেনের আপাতভাবে বিগড়ে যাওয়া মেয়ে এবার বাবাকে খেতে ডাকছে এবং—

> 'কান্নায় কেমন যেন ভেজা বুলুর স্বর, সে একটা হাত রাখলো তাঁর গায়ে। আবুল হোসেন চোখ মেলে দেখলেন। এই প্রথম তাঁর মনে হলো বুলুর হাত কি কোমল, চোখ কি স্নিগ্ধ।'

মার খাওয়া জীবনেরও কোথাও-না-কোথাও স্নিগ্ধতা থাকে— মাহমুদুল হক সেটুকুই আবিষ্কার করতে চান। এখানেই তিনি ব্যতিক্রম, অনন্য। তিনি যেমন আপাত মমতার ভেতর থেকে লাম্পট্যের অংশটুকু ছেঁকে বের করে দেখাতে পারেন, তেমনি আপাত নিষ্ঠুরতার ভেতর থেকে আবিষ্কার করতে পারেন স্নিগ্ধতা। কোনোকিছুই চূড়ান্ত নয়, একক নয়— ইতি ও নেতি মিলেমিশে থাকে জীবনের বাঁকে বাঁকে— মাহমুদুল হক অতি সূক্ষভাবে কথাটি আমাদেরকে বুঝিয়ে দেন।

৫.

'হৈরব' নামে এক অসামান্য চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন মাহমুদুল হক 'হৈরব ও ভৈরব' গল্পে। বংশানুক্রমে ঢাকী সে; ঢাকঢোল তার জীবন ও জীবিকা। কিন্তু জীবনটা প্রায় অচল হয়ে পড়েছে, জীবিকাও হুমকির মুখে। একদিকে বয়সের ভার, অন্যদিকে সীমাহীন দারিদ্র। যেন এক ব্যর্থ, ম্রিয়মাণ, নুইয়ে পড়া, জীবনের কাছে পরাজিত মানুষ সে। এবং স্মৃতিভারাক্রান্ত। একসময় তাদের জীবনে ঔজ্জ্বল্য ছিল— অন্তত সে তাই-ই মনে করে; তখন 'বাবু'রা ছিলেন, নানান পালাপার্বনে তাদের বাড়িতে হৈরবদের মতো আরও অনেক ঢাকীদের ডাক পড়তো—

> 'কয়কীর্তনের ঢাকীদের কি দাপটটাই না ছিলো একসময়, পালাপার্বনের আগে সারাদেশ থেকে বায়না করতে আসতো মানুষজন। বনেদি বাবুদের বাড়ি না হলে তারা বায়না ফিরিয়ে দিয়েছে কতোবার, সেই তারাই এখন ঋষিদাশদের সঙ্গে বাঁশ আর বেতের ঝুড়ি বুনে কোনোমতে নিজেদের পেট চালায়, চুরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাকাতি করে বেড়ায়। সময়ে কি না হয়; মাটিতে পড়া ডুমুর , তার আবার গোমর কিসের।'

এখন আর সেই দিন নেই, বাবুরা দেশগাঁ ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছে ওই পারে, সবকিছু ছেয়ে গেছে অভাব, দারিদ্র আর বেলেল্লাপনায়— এখন নবমীর রাতে পূজা কমিটির ছেলে-ছোকরারা 'খানকি' নাচাতে চায়। হৈরব তাই পা বিছিয়ে কাঁদে, একা একা। স্মৃতির জাবর কাটে, কষ্ট সইতে না পেরে কখনো-কখনো নিজের মৃত্যু কামনা করে। এই যখন জীবন— অভাব-দারিদ্রই যখন সারকথা, অন্যের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর ভরসা করে বেঁচে থাকা, চারদিকে কেবল ভাঙনের সুর, অতীতের সুখ-স্মৃতিচারণ ছাড়া আর কিছু নেই, তখন গনি মিয়ার কাছ থেকে ধার করা টাকা হৈরব শোধ করে কীভাবে? গনি মিয়া এসে টাকার জন্য চোটপাট করে, ভিটেবাড়ি বিক্রি করতে বলে, তার বিধবা বোনের 'দয়া'র দিকে কুনজর ফেলে— যেন সবকিছু গিলে ফেলতে এসেছে।

এ তার কঠোর বাস্তব জীবন বটে, কিন্তু সে যেন বাস করে বাস্তবাতিরিক্ত কোনো উচ্চতর জগতে। জনজীবনের মধ্যে যে প্রবহমান দার্শনিকতা, মাহমুদুল হক যেন এই দার্শনিক ঢাকির মধ্যে দিয়ে তা ধরতে চেয়েছেন। যেমন, দারিদ্রক্লিষ্ট সংসারে বিধাব পিসি আর মায়ের কলহ দেখতে দেখতে ত্যক্ত-বিরক্ত ভৈরব (হৈরবের ছেলে) যখন চেঁচায়, তখন ভৈরবের উক্তি— 'তরা যে কি হইলি, বুঝি না তগো। ঘর হইলো গিয়া তর বাগান, বাগানে পাখিরা তো চিক্কুর পারবই'।

শুধু জীবনযাপনেই নয়, 'বাজনা' নিয়েও তার আছে এক গভীর দার্শনিক ভাবনা—

> 'ঢাক বইলা কথা, ঢাকী বইলা কথা; যে নিকি নিজেরে বাজাইয়া থুইছে হ্যার কাছে যা দিবা হ্যা তাই বাজায়া দ্যাখাইবো।... তরা বুঝছ না, হাত কি বাজাইব, বাজায় গিয়া মন; পেরথম নিজেরে বাজান শিখ, শ্যাষম্যাষ যা ধরছ হেই বাইজা উঠব'। যহন মনিষ্যি আছিলো না, তহন বাজনা আছিলো; পর্বত বাইজা উঠছে, জল বাইজা উঠছে, মাটি বাইজা উঠছে, ধরিত্রি বাইজা উঠছে, বাইজা উঠছে আকাশ। তারপর স্যান বাইজা উঠলো মনুষ্যজন্ম, বাইজা উঠলো মনুষ্যধর্ম, মানবজীবন...।'

যেন এক দারিদ্রপীড়িত ঢাকি নয়, এক দার্শনিকের কথা শুনছি আমরা। শুধু কি তাই? ভাষাহীন-মূক প্রাকৃতিক অনুষঙ্গেরও ভাষা বোঝে হৈরব। যখন নিজের কাছে কাঁদতে বসে, এমন সব ভাবনায় সে আমাদের চমকিত করে, যে, মনে হয়— কিছুই আর ভাষাহীন নয়, সবই যেন কথা বলে ওঠে তার কাছে। তার কান্নাটিও তাই হয়ে ওঠে ভীষণ তাৎপর্যময়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈশ্বর, ঈশ্বর আমারে তুইলা নাও – 'হৈরব নিজের কাছে কাঁদবে বলে পা বিছিয়ে বসে। কতো কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে সিরাজদিখাঁর সেই পাতক্ষীরের কথা, জিভে স্বাদ লেগে আছে এখনো। মনে পড়ে রামপালের কলামুলোর কথা, গাদি ঘাটের কুমড়ো, আড়িয়লবিলের কই মাছ, কতো কিছু। আতরপাড়ার সেই দই, আহারে সব গেল কোথায়। ...গোটাগ্রাম জুড়ে ছিল কদমের বন, বর্ষার নদী ধীরে মন্থর গতিতে ফেঁপে ফেঁপে উঠে শেষে কদমের বনে গিয়ে ইচ্ছে করে পথ হারিয়ে 'এ আমার কি হলো গো' ভান ধরে ছেলেমানুষিতে মেতে উঠতো। এখন গ্রাম কি গ্রাম উজার; দেশলাইয়ের কারখানা গিলে ফেলেছে সবকিছু। কদমের সে বনও নেই, নদীর সেই ছেলেমানুষিও নেই; এখন ইচ্ছে হলো তো এক ধারসে সব ভাসিয়ে দিলো, সবকিছু ধ্বংস করে দিলো, 'আমি তোমাদের কে, আমার যা ইচ্ছে তাই করবো' ভাবখানা এমন।'

মনে কি হয় না, 'বর্ষার নদী'র ভাষাও বুঝতে পারতেন তিনি? নইলে 'এ আমার কি হলো গো' বা 'আমি তোমাদের কে, আমার যা ইচ্ছে তাই করবো' এই ধরনের বাক্য ব্যবহার করলেন কীভাবে? কিন্তু এসব ভেবেই কি বসে থাকলে চলে? গনি মিয়া তার পাওনা টাকার তাগাদা দিতে আসে নিয়মিতই। 'দয়া'র জন্য সুবিধা করতে পারে না অবশ্য। অবশেষে 'দয়া'র রংঢংয়ের কাছে হেরে গিয়ে 'বাজনা' শুনতে চায়। হৈরবের ছেলে ভৈরব এবার বাপের মতো করেই ঢাকে আওয়াজ তোলে—

'যহন মনিষ্যি আছিলো না, তহন বাজনা আছিলো, পর্বত বাইজা উঠছে, জল বাইজা উঠছে, মাটি বাইজা উঠছে, ধরিত্রি বাইজা উঠছে, বাইজা উঠছে আকাশ, বাইজা উঠছে মনুষ্যজন্ম, বাইজা উঠছে মনুষ্যধর্ম, বাইজা উঠছে মানবজীবন, ...বাবু হুনতাছেন? ঢাকে কেমনে কথা কইতাছে হুইনা দ্যাহেন। দশখুশি বাবু, চৌদ্দমাত্রা, মানবজীবন কথা কইতাছে বাবু! দশখুশি বাবু, চৌদ্দমাত্রা, মনুষ্যধর্ম বোল তুলতাছে, আখিজলে আখিজলে, টলমল টলমল, ধরাতর ধরাতল, রসাতল, হাঁ'

ঢাকের বাজনা নিছক বাজনা তো নয় ঢাকীদের কাছে, তাদের হাতে মানবজীবন বেজে ওঠে, বেজে ওঠে মনুষ্যধর্ম। পাহাড় বাজে, ধরিত্রি বাজে, জল-মাটি-আকাশ বাজে। ভৈরবের এমনতর বাজনাতে গনি মিয়া ভয় পেয়ে যায়, কারণ ভৈরব যেন এখন আর ঢাক বাজাচ্ছে না, বাজাচ্ছে অন্য কিছু— 'ফিরান দিয়া বহেন,..দশখুশি বাজাই দ্যাহেন ক্যামনে, মাইনষের চামড়ার ছানিতে দ্যাহেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমুন বাজে...'— যেন স্বয়ং মানুষকেই বাজিয়ে চলেছে সে তার সমস্ত আক্রোশ মিটিয়ে। কিন্তু একসময়—

> 'গনি মিয়ার পিঠ নয়, পরিশ্রান্ত ভৈরব একসময় অবাক বিস্ময়ে দেখে এতোক্ষণ সে তার নিজের ঢাকের গায়েই সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত হেনেছে; চামড়ার দেয়াল আর ছানি ফেঁসে গেছে, চুরচুর হয়ে ছিটকে পড়েছে টনটনে আমকাঠ, বেঘোরে নিজের ঢাকটাকেই চুরমার করেছে এতোক্ষণ।'

গল্পের মুখ ঘুরে যায় আবার। নিপীড়িত হৈরব বা ভৈরবদের হাতে ওই গনি মিয়াদের পিঠের চামড়ার দুরবস্থা দেখে যখন একটু খুশি হওয়ার কথা ভাববেন পাঠক, তখনই লেখক দেখিয়ে দেন— গনি মিয়ার পিঠ নয়, ভৈরব নিজের ঢাকটারই বারোটা বাজিয়েছে এতক্ষণ। ইচ্ছে করলেই তো নিপীড়কদের পিঠের চামড়া তুলে নেওয়া সম্ভব নয়, ওটা শ্লোগানে সম্ভব, কিংবা সম্ভব তথাকথিত বিপ্লবী লেখকদের ইচ্ছেপূরণের গল্পে। মাহমুদুল হক শ্লোগানে বিশ্বাসী নন, বিপ্লবীও নন, তিনি কেবল মানুষের প্রকৃত রূপটি আবিষ্কার করতে চান।

সমাজ-বাস্তবতার রূপ যারা খুঁজতে চান শিল্প-সাহিত্যে, তাদের জন্য সব ধরনের উপকরণ রেখে দিয়েও এই গল্পকে তিনি নিয়ে গেছেন শিল্পসফলতার তুঙ্গে। সকল বাস্তবতা বুঝেও আমাদের মন পড়ে থাকে হৈরবের অসামান্য দার্শনিকতার কাছে, মাহমুদুল হকের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বর্ণনা আমাদেরকে ঘোরগ্রস্ত করে রাখে দিনের পর দিন—

> এক একবার বিস্তীর্ণ দুপুর ঝনঝন করে বেজে ওঠে। ঝলসানো গাছপালা মুখ নিচু করে আচ্ছন্নপ্রায় দাঁড়িয়ে থাকে। এরই মাঝে এক একটি গন্ধ নেশার মতো জড়িয়ে ধরে হৈরবকে, সে বুঝতে পারে বৌনার ডালে ডালে এখন মঞ্জরি, কী আনন্দ, কী আনন্দ, ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি নামে। এক একটা গন্ধ এমন এক একটা স্মৃতি, যাতে নখের কোনো আঁচড় নেই, দাঁতের কোনো দাগ নেই, ছিমছাম, নির্ভার, অবিরল। কাঠালের মুচির গন্ধে হৈরবের বুক গুমরে ওঠে। টুনটুনি পাখি চিরকালই তার চোখে একটা আশ্চর্য প্রাণী, যেমন কাচকি মাছ; এই তো একফোঁটা অথচ এরাও কী স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকে, তাল মিলিয়ে বংশ বৃদ্ধি করে চলে। একটা টুনটুনি, যার ঠোঁটে তুলো, চোখে রাজ্যের বিস্ময়, আকন্দগাছের শাখায় দোল খেয়ে ফরফর করে একদিকে উড়ে যায়; হৈরবের মনে শিশিরের ছোঁয়ায় পদ্মকোরক শিরশির করে ওঠে, ঐ যে তিনি, তিনি নিরভিমান, তিনি নম্র, তিনি ব্যাকুল, তিনি বলেন— আমি একফোঁটা, আমি তুচ্ছ, অতিতুচ্ছ।... ঈশ্বর, ঈশ্বর আমারে তুইলা নাও— হৈরব নিজের কাছে কাঁদবে বলে পা বিছিয়ে বসে। কতো কথা মনে পড়ে... সবকিছু দেখে, সব কথা ভেবে হৈরব এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছায়, অনেক কিছু তার দেখা হয়ে গেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক, অনেক, আর দরকার নেই তার দেখার— চক্ষু তো এই দুইখান, আর কতো দেখাইবা, ঈশ্বর, আমারে তুইল্লা নাও।... জীবনের কি খাঁই, কতো কিছু তার চাই, আজ আর তার কোথাও বাঁশপাতার কোনো গন্ধ লেগে নেই, উইটিপির গন্ধ নেই, এ্যাওলাশ্যাওলার গন্ধেও কতো আত্মীয়স্বজন, কতো পালাপার্বণ, কতো জন্মমৃত্যুর স্মৃতি ভুরভুর করেছে একসময়। জীবনের এখন গণ্ডা গণ্ডা মাথা, গণ্ডা গণ্ডা চোখ, হাত, নখ, দাঁত; রাবণ কোন ছার; জীবনের এখন সবকিছু চাই, কেবল ভালোবাসা ছাড়া, যতো কিছু আছে সব...। ঈশ্বর আমারে তুইলা নাও– গলায় আকন্দের মালা পরে 'হে বিরিক্ষ এ অধমের পেন্নাম লইবেননি, হে হনুমানসকল, আপনেরা খুশি থাকিলেই বিশ্ব সংসার লীলাময় হয়, 'আহা সরলতার কিবা দিব্যকান্তি, মরি মরি' আপন মনে এইসব বলে আর কেউ একা একা কেঁদে ফিরবে না দেবদারু বনে, আর কেউ চৌতালে, একতালায়, টেওটে, ত্রিতালে, ঝাঁপতালে, ঠুমরি ঠেকায় ঢাকে বর্ষাভর ডাহুকের ডাক বাজাবে না, ঈশ্বর হৈরবরে তুমি তুইলা নাও..

এই আমাদের মাহমুদুল হক। অনবদ্য এক ভাষায় তিনি তুলে ধরেন নিসর্গের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা 'তুচ্ছ' অনুষঙ্গের মধ্যে অপার বিস্ময় আর এ দেশের দরিদ্র-ক্ষুধার্ত-নিরন্ন মানুষের মধ্যে প্রবহমান দার্শনিকতা।

৬

'একজন জামশেদ' গল্পের জামশেদও অদ্ভুত এক চরিত্র। চাকরি খুঁজতে থাকা, বড় ভাইয়ের কথার বানে জর্জরিত হওয়া যুবক জামশেদ। গল্পটি যেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সেই একঘেয়ে-পুরনো পাঁচালি— কিন্তু মাহমুদুল হকের কলমে ওই পুরানো গল্পও নতুন হয়ে ওঠে। কারণ একটিই— তাঁর আছে একটি ভিন্নতর দেখার চোখ। কিছুই বাদ পড়ে না তার দেখার তালিকা থেকে— এমনকি উঠোনে ফুটে থাকা সজনে ফুলও গল্পে গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা করে নেয়। ছোটবেলায় মা সজনে ফুল ভেজে দিতেন— 'আহা কী তার স্বাদ, কী তার সুগন্ধ। এইসব টুকিটাকি হাজাগোবজা আনাজপাতি রাঁধায় মা'র কোন তুলনা ছিলো না, মনে পড়ে।'

আর এখন—

'এখন তো গরু ছাগলে মুতে ভাসাচ্ছে, রোদ ওঠার আগে আর কেউ তোমাদের কোঁচর ভরে তুলে নিয়ে যাবে না, ইদানিং আমোরা সভ্য হইয়াছি, আমাদের সামনে পেছনে লেজ গজিয়েছে, মুখের স্বাদ বৃটিশ থেকে পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবি থেকে বাঙালি হয়েছে, এবং ইদানিং আমোরা সভ্য হইয়াছি, কোকোকোলা খাইতে শিখিয়াছি এবং খাইতেছি, এবং খাইব, হাম্বারগার, চাউমেন, আন্ডাওলা হাফ বিরিয়ানি, হগলই খাইমু, কেননা আমোরা সভ্য হইয়াছি'...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার এই ভাবনার ভেতরেই আছে বর্তমান জীবনযাপনের প্রতি তীব্র-তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ। কারণ কয়েকদিন আগে ভাবীকে সজনে ফুল ভেজে দেয়ার কথা বললে— 'ও ম্যাগো। ভাবী আকাশ থেকে পড়ে বলেছিল, তোমার তো বিদকুটে বিদকুটে শখ, সজনে ফুল আবার মানুষে খায়।'

অথচ এই ভাবী দিন আনি দিন খাই পরিবার থেকে আসা মেয়ে, এখন পেটে 'তিনথাক চর্বি' জমিয়ে, বুলিতে দু-চারটে ইংরেজি শব্দ মিলিয়ে ভদ্দরলোক সেজেছে। এখন জামশেদের দুঃসহ বেকার দিনযাপন, ঘরের মধ্যে লাম্পট্য, ভাবীর পেটে তিনথাক চর্বি আর কথাবার্তায় ন্যাকামি, আর বড়ভাই কর্তৃক স্ত্রীর অনুপস্থিতে কাজের মহিলাটিকে (রোকেয়ার মা) চেপে ধরা কিংবা 'যা ভালো বোঝো তাই করো' জাতীয় হুমকি— এসবই তাকে সহ্য করে যেতে হয়। উপায় কী? সে বেকার, কিচ্ছু করার নেই কেবল তীব্র ক্ষোভ আর বিদ্রুপে নিজেকে জ্বালিয়ে দেয়া ছাড়া, আত্মহত্যা বা ভাইয়ের নাক-মুখ ফাটিয়ে দেয়া বা ভাবীর মামাত বোনকে রেপ করার পরিকল্পনা করা ছাড়া কিংবা সংগোপনে মায়ের জন্য কান্না ছাড়া।

> মা বলতেন— 'তোরা দু'জন, তোরা আমার চোখ'— জামশেদের খুব খারাপ লাগে এখন। ইচ্ছে করে হাউমাউ করে কাঁদতে। সে মনে মনে বলে 'মা তুমি আমার একটা চোখ কানা করে দাও, আমার আর ভালো লাগে না।'

এসব ছাড়া তার আছেই বা কি? তার জীবনটাই যে নেতিবাচকতায় ভরপুর। নইলে প্রেমিকার কাছে যাওয়ার জন্য আতিপাতি করে খুঁজেও কোথায় দুটো টাকা পাওয়া যাবে না কেন? অতএব তাকে অবশেষে রোকেয়ার মা'র ওপরই চড়াও হতে হয়— বড় ভাই সঙ্গমের বিনিময়ে তাকে যত টাকা দিয়েছে তার অর্ধেক বখরা নিতে হয়। এইবার তার মন ভালো— 'সবকিছু ভালো আছে, চড়ুইদের মন ভালো আছে....সবকিছু স্পটলেট, ফ্ললেস, চমৎকার চমৎকার এবং চমৎকার'। এমনকি রোকেয়ার মা'র জন্যও এখন তার মন সহানুভূতিতে দ্রবীভূত— 'আহা, চুল ধরা উচিত হয়নি ওভাবে, আচ্ছা পায়ে ধরে মাফ চেয়ে নিলে হয় না!' সারাটি গল্প জুড়ে যে তীব্র বিদ্রুপে পৃথিবীর সবকিছুর ওপর কালিমা লেপন করে ছেড়েছে, সে-ই এখন কী রকম দ্রভীভূত, নরম মনের মানুষ। কারণ এখন সে তার প্রিয়তম মানুষের কাছে যেতে পারছে। এত অল্পে যে তুষ্ট, এত সামান্যে যে এমন ভালোমানুষ হয়ে ওঠে তার কপালে কেন কিছুই জোটে না? তাকে কেন বেকার হয়ে অন্যের ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকতে হয়? জীবন এমনই নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদুল হকের গল্পে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ বারবার ঘুরে-ফিরে এসেছে। কিন্তু তা যতটা না মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কাহিনীসমৃদ্ধ হয়ে, তার চেয়ে বেশি এসেছে যুদ্ধের মধ্যে অবরুদ্ধ স্বদেশভূমিতে আটকে পড়া মানুষের দুঃসহ দুর্দশা ও ভয়াবহ অভিজ্ঞতার আলোকে। এ বিষয়ে কোথাও-ই তিনি বেশি কথা বলেননি, কিন্তু যেখানেই তিনি প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন— মনে হয়েছে যেন একটি দম বন্ধ করা অসহায়-অনিশ্চিত পরিবেশের মধ্যে মানুষগুলো হাসফাঁস করছে। 'বুড়ো ওবাদের জমা খরচ' গল্পে এমনকি মুক্তিযুদ্ধ কথাটি পর্যন্ত উচ্চরিত হয়নি কিন্তু মানুষ কী বিপুল দুর্দশার মধ্যে পতিত তা বোঝা যায় দু-একটি বাক্যেই। কিংবা 'প্রতিদিন একটি রুমাল' গল্পের সবুজ— যে ছিল তার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে চৌকস ছেলে, বদলে গেছে—

> আমি মৃত্যুকে ভয় পাই আলতাফ, সত্যি বলছি, ভয় পাই! পঁচিশে মার্চের আর্মি ক্র্যাক ডাউন না হলে কখনো হয়তো জানতেও পারতাম না জীবনকে এতো ভালোবাসি, এতো ভয় করি মরণকে! (আর, আলতাফ)— আরে গর্দভ মরণের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েই তো সত্যিকারের আনন্দ। চিলমারি অপারেশনে থাকলে বুঝতিস, মৃত্যু কতো তুচ্ছ ব্যাপার, মৃত্যুকে নিয়ে কিভাবেই না ছেলেখেলা করেছিলাম আমরা প্রাইভেট আর্মির দস্যুরা। মরণকে আবার ভয় কিরে?

একই যুদ্ধ দুজনকে দু-ভাবে জীবনের পক্ষে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। একজন যুদ্ধের ভয়াবহতায় ভয় পেয়ে গুটিয়ে গেছে নিজের মধ্যে, অন্যজন যুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে হয়ে উঠেছে সাহসী, একরোখা, মৃত্যুকে পরোয়া না করা মানুষ। যুদ্ধ হয়তো এভাবেই বদলে দেয় একেকজন মানুষকে। আবার অবরুদ্ধ জনগোষ্ঠীর মনোজগৎ সবচেয়ে চমৎকারভাবে চিত্রিত হতে দেখি 'গরু ছাগলের গল্প' এবং 'বেওয়ারিশ লাশ' গল্পে। প্রথোমোক্ত গল্পে দেখি— মানুষ কী ভয়াবহ নিরাপত্তাহীনতায় আর অসহায়ত্বের ভেতর দিনযাপন করছে! যে-কোনো মুহূর্তে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা, আশ্রয়হীন হওয়ার সম্ভাবনা, নিজভূমি ছেড়ে অচেনা-অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়ার বাধ্যবাধকতা মানুষকে যেন গরু-ছাগলের মতো করে তুলেছে। মানবিক জীবনের সম্ভাবনা যেন চিরতরে অন্তর্হিত হয়ে গেছে তাদের জীবন থেকে। 'বেওয়রিশ লাশ' গল্পে দেখি, একটি বেওয়ারিশ লাশ একটি পরিবারকে কী ভয়াবহ সংকটে ফেলে দিয়েছে, কী বিপুল নিরাপত্তাহীনতা তাদেরকে গ্রাস করেছে! অতঃপর লাশটি রাজাকাররা এসে সরিয়ে নিয়ে গেলে দেখি, প্রৌঢ় দম্পত্তিও মেতে উঠেছে প্রেমের সৌরভে। কিন্তু মাহমুদুল হকের এই শ্রেণীভুক্ত গল্পগুলোর মধ্যে 'বুলু ও চড়ুই' গল্পটি ভিন্নমাত্রিক ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর। ছোট্ট একটি গল্প। পুরো গল্প জুড়ে 'আনু' নামের এক সদ্য-তরুণের কৈশোরিক হৈ-হল্লা— সে তার বোন বুলুকে নানাভাবে ডেকে চলেছে, 'বুলু-অ্যাই বুলু-বুলটি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুলিয়া-বুলুপা-বুলুমনি-বুলবুলি-আপামনি'— ইত্যাদি ইত্যাদি; আর এই ডাকের পরিপ্রেক্ষিতে বুলুর নানান ধরণের ভাবনা। আনুটা সারাজীবনই এমন। হৈ-চৈ-হল্লা-চিল্লা করতে পছন্দ করে, একমুহূর্ত সুস্থির থাকতে পারে না। তার নানান কাণ্ডকারখানা এই পরিবারটিকে বহুভাবে ভুগিয়েছে, এমনকি তারই জন্য তার বাবাকে সরকারি চাকরিটি হারাতে হয়েছে। তো, এই আনু যুদ্ধে গিয়েছিল। ব্যাপারটি চেপে রাখা সম্ভব হয়নি। ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পড়লে পাকিস্তান আর্মিরা তার বাবা আর বুলুকে ধরে নিয়ে যায়।

যুদ্ধ শেষ।

সবাই ফিরে এসেছে।

কিন্তু সর্বনাশ যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। যুদ্ধ এক ভয়াবহ সর্বনাশের চিহ্ন রেখে গেছে তাদের পরিবারে যার শিকার বুলু।

বুলু এখন একা একা ঘরে শুয়ে রাজ্যের কথা ভাবে; সময়কে চলে যেতে দেখে। পুরো গল্পেই আমরা বুলুকে এভাবে একটি ঘরে শুয়ে আনুর ওই ডাকাডাকির প্রেক্ষিতে এসব ভাবতে দেখি। কিন্তু এত ডাকাডাকি করে আনু তাকে কী বলতে চায়? গল্পের শেষে আমরা দেখি, আনু বুলুর ঘরে ঢুকে তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে—

> 'এই দেখো' — মেঝের ওপর পড়ে থাকা খড়কুটো আর চড়ুইপাখির একটি শাবকের দিকে সে আঙুল তুলে দেখায়। — 'বাসা থেকে বাচ্চাটি পড়ে গিয়েছিলো, কি জানি কি করে। যতোবার তুলে দিই ততোবারই ওরা ঠুকরে ঠুকরে ওকে নিচে ফেলে দিচ্ছে,অবাক কাণ্ড না?'
>
> বুলু বললে, 'ওরা তো তোদের মতো মানুষ নয়।'
>
> 'তার মানে? তোর কথার মাথামুণ্ডু বুঝি না' –
>
> 'মানুষ বড় ভালো,' বুলু বললে, তার চোখ তখন ভেজা ভেজা। বললে, 'মানুষ বড় সুন্দর।'

এই তো গল্প। কিন্তু কী অসামান্য মহিমায় ভাস্বর! যে বুলু নির্যাতিত, যে বুলুর স্বপ্নের মৃত্যু ঘটেছে বীভৎসভাবে— ওই মানুষের মতো দেখতে পশুদের দ্বারাই; বুলু সেই মানুষকেই বলছে ভালো, সুন্দর! কারণ সে যে বেঁচে আছে মানুষেরই স্নেহছায়ায়, মমতায় ও যত্নে।

যা কিছুই ঘটুক— *মানুষ খুব ভালো, মানুষ খুব সুন্দর* — এই হচ্ছে পাঠকের কাছে মাহমুদুল হকের মেসেজ। সমস্ত গল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর পাঠকদের কাছে প্রধাণত এই কথাটিই বলতে চান— সবকিছুর পরও মানুষ ইতিবাচক প্রাণী। মানবতার পক্ষে, মানুষের পক্ষে, মানবজীবনের পক্ষে মাহমুদুল হকের এই দৃঢ় অবস্থানই তাঁর গল্পের প্রাণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক.

আলোচনা পড়ে কোনো পাঠক যদি মাহমুদুল হকের গল্প সম্বন্ধে ধারণা পেতে চান, তাহলে তিনি যে জিনিসটি থেকে বঞ্চিত হবেন, তা হলো— তাঁর অসামান্য ভাষামাধুর্য এবং নির্মাণকৌশলের অসাধারণ রূপ। তাঁর সম্বন্ধে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন— *বাংলা গদ্যে প্রভুত্ব করার ক্ষমতা এঁর আছে।* সুনীল অতিশয়োক্তি করেননি— অন্তত মাহমুদুলের পাঠকরা তাই মনে করেন। তাঁর গল্প-উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করার বিপদ হলো এই যে— অসংখ্য উদ্ধৃতি দেয়ার লোভ সংবরণ করতে হয়। তাঁর বর্ণনা এত চমৎকার যে, কোনো আলোচক যদি উদ্ধৃতি দিতে শুরু করেন, তাহলে পুরো রচনাটিই উদ্ধৃতিস্বর্বস্ব হয়ে যেতে পারে।

খ.

শুধু ভাষামাধুর্যই নয়— তাঁর রয়েছে চরিত্রচিত্রণের অসামান্য দক্ষতা। হৈরব, ভৈরব, বুড়ো ওবাদ, হলধর নিকারী, বুলু, সপুরা, পরাগল, নুনি, তপা— এসব অভূতপূর্ব চরিত্র বাংলা গল্পে খুব সুলভ নয়। পাঠকরা লক্ষ না করে পারেন না যে, এদের নামগুলোও ঠিক প্রচলিত নয়— যেন নাম নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই তিনি বুঝিয়ে দিতে চান যে, এরা ঠিক সাধারণ চরিত্র নয় কিংবা ব্যতিক্রমী মর্যাদা পাওয়ার যোগ্যতা এদের আছে।

গ.

তাঁর চরিত্রগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবনযাপনে ম্লান-ম্রিয়মাণ-ব্যর্থ। এই ব্যর্থতাবোধ থেকে দূরে থাকার জন্য তারা আশ্রয় নেয় নিজেদের ফেলে আসা শৈশবে-কৈশোরে। মাহমুদুল হকের এটি একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য যে, তিনি তাঁর প্রায় সকল চরিত্রকে তাদের আপাত-সোনালী অতীতে ভ্রমণ করিয়ে আনেন। দৈনন্দিন বাস্তবতার কঠিন কষাঘাত থেকে মুখ ফিরিয়ে অতীতে আশ্রয় নেয়ার ফলে তাঁর চরিত্রগুলোকে কখনো কখনো পলায়নপর বলে মনে হয়। তিনি জীবনের বাস্তবতাগুলো বোঝেন বলেই জানেন যে, দৈনন্দিন জীবনের দুরূহ বাস্তবতা থেকে সহসা মানুষের মুক্তি মেলে না, অতএব পলায়ন এবং পলায়নই একমাত্র মুক্তির উপায়।

ঘ.

আর তাই এসব গল্প পড়তে গিয়ে আমরা অনুভব করে উঠি— সবকিছু মিলিয়ে তিনি আমাদের কথাই লিখেছেন। যে জীবন তিনি তাঁর গল্প উপন্যাসে আঁকেন সেগুলো তো আমাদেরই যাপিত জীবন। তাঁর অসামান্য ভাষামাধুর্য, চরিত্রচিত্রণ আর নির্মাণকৌশল দিয়ে তিনি আমাদেরকে তাঁর রচনাসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেন, আমাদের সঙ্গে তৈরি করেন এক গভীর নৈকট্য— আর হয়ে ওঠেন আমাদের কালের অন্যতম কুশলী কণ্ঠস্বর।

রচনাকাল : মার্চ, ২০০১
প্রথম প্রকাশ : ২৯ জুন, ২০০১, দৈনিক যুগান্তর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : নির্দয় সময়ে বেঁচে থাকার দায়

প্রাককথন

বাংলা সাহিত্যে আজ এবং আগামী দিনের জন্য এক অনিবার্য ও অনস্বীকার্য প্রসঙ্গ তিনি। শুধু বাংলা সাহিত্যই বা বলি কেন, এ কথা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পৃথিবীর যে-কোনো কথাসাহিত্যের সঙ্গেই তাঁর রচনা মর্যাদার সঙ্গে উল্লেখিত হবার যোগ্যতা রাখে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। আমাদের এক গৌরবদীপ্ত অহংকারের নাম।

মাত্র পাঁচটি গল্পগ্রন্থ, দুটো উপন্যাস এবং একটি প্রবন্ধগ্রন্থেই নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এক গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর প্রভাব-বিস্তারী লেখক হিসেবে। শুধুমাত্র একজন সাধারণ লেখক নন, এই বিপন্ন দেশ ও কালে তিনি যেন এক নিরাসক্ত সন্ত। এত নির্মোহ গদ্য এখন আর চোখে পড়ে না মোটেই। তিনি সেই শিল্পী যাঁর সৃষ্টি প্রেরণা জাগায়, গৌরব দেয় এবং জানিয়ে যায় এই তথ্য যে, আমরা পিছিয়ে নেই বিশ্বসাহিত্য থেকে।

তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হলেও সাহিত্য জগতে তাঁর আগমন ঘটেছিল ষাটের দশকে। এ এক আশ্চর্য সময় বাংলাদেশের জন্য। পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছিল সর্বত্র। শিল্প-সাহিত্যে, রাজনীতিতে, আত্মপরিচয়ের সংকট বিমোচনে, সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণে উজ্জ্বল কয়েকজন সাহিত্যশিল্পীর অন্যতম ছিলেন তিনি। খুব অল্প সময়ে নির্মাণ করেছিলেন এক অসামান্য বর্ণনাভঙ্গি, এক হৃদয়গ্রাহী ভাষা ও বহুমাত্রিক বিষয়-বৈচিত্র্য।

বিরলপ্রজ ছিলেন তিনি, প্রায় তিরিশ বছরে তাঁর গ্রন্থিত গল্পসংখ্যা মাত্র তেইশটি। এত অল্প লিখে সাহিত্য জগতে নিজের নামটি যিনি স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখার যোগ্যতা রাখেন, তাঁর দিকে মনোযোগ না দিয়ে উপায় থাকে না। এ রচনাটি তাঁর গল্প সম্বন্ধে একটি অসম্পূর্ণ মূল্যায়ন। তাঁর মৃত্যুর আগেই এর সংক্ষিপ্ত একটি রূপ প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান আলোচনায় তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত গল্পগ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থের অধিকাংশ গল্প মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

ইলিয়াসের গল্প : জীবনের সবটুকু দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

কী বিষয়-ভাবনা, কী চরিত্র-চিত্রণ, কী বর্ণনাভঙ্গি সবকিছুতেই ইলিয়াস নির্মাণ করেছিলেন এক আশ্চর্য জগৎ। জীবনকে তিনি দেখেছেন খুব গভীরভাবে— একেবারে ডুবুরীর চোখ নিয়ে— সমস্ত খুটিনাটিসহ, এমনকি মানুষ চিত্রিত হয়েছে তার থুথু-কাশি-মল-মূত্রসহ। চরিত্র-চিত্রণে তথাকথিত আভিজাত্য মানেননি কোনোদিন এবং সবকিছু বর্ণনা করেন এমন এক ভঙ্গিতে যেন তা চোখের সামনেই ঘটছে; এবং ব্যবহার করেন এমন এক ভাষা যা দৈনন্দিন জীবন থেকে এতটুকু পৃথক নয়। সাহসী তিনি, কুশলী তো বটেই, জীবনকে ভয়ংকর নগ্নভাবে তুলে ধরতে তাঁর কুণ্ঠা নেই কোনো। মনস্ক পাঠকের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা তাই প্রশ্নাতীত। মানুষ এবং তার জীবনযাত্রা এবং তার পরিপার্শ্ব তাঁর কলমে চিত্রিত হয় সকল সম্ভাবনাসহ— তার প্রেম-কাম-ভালোবাসা-স্নেহ-মমতা-ক্রোধ-দুঃখ-হতাশা-প্রতিশোধস্পৃহা ও প্রত্যাশাসহ। যা কিছু নির্মিত হয় তাঁর হাতে— হয় প্রায় নিপুণ পরিপূর্ণতায়। এই দেশে, এই নষ্ট সমাজে, এই বিপন্ন কালে মানুষের বেঁচে থাকা— যা প্রায় কীটপতঙ্গের জীবনের সঙ্গে তুলনীয়, তাঁর কলমে বিস্ময়কর সূক্ষ্মতায় ও নৈপুণ্যে উঠে আসতে দেখে অভিভূত হতে হয়।

২

'যুগলবন্দি' গল্পে তাই 'রিটায়ার্ড পোস্টমাস্টার'-এর পুত্র আসগরের নামের সঙ্গে তার 'সাহেবের' কুকুর 'আরগসের' নামের ভয়াবহ মিল দেখে আমরা আঁতকে উঠলেও অবাক হই না। এটাই যেন স্বাভাবিক, অন্তত আসগরের জন্য, কারণ সে দুই কামরার টিনের ঘরে বেড়ে ওঠা স্বল্প-আয়, কৃপণ, মিথ্যেবাদি পিতার পুত্র, কিন্তু উচ্চাভিলাষী— সে বড়ো হতে চায়। অন্তত— অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য তার তীব্রভাবেই কাম্য এবং তা যে-কোনো উপায়েই হোক না কেন। সেক্ষেত্রে, 'সাহেব' সরোয়ার কবিরের প্রায় কুকুরে পরিণত হওয়া ছাড়া তার আর উপায় কী— যেহেতু তিনি একটি বা দুটো ফোন করে দিলেই তার ভাগ্য খুলে যায়। আসগর তাই সাহেবকে— যিনি আলোচনার একটি প্রধান অংশ ব্যয় করেন কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রসঙ্গে— খুশি করার জন্য তার কুকুর 'আরগস'কে নিয়ে খেলে, তার যত্ন নিতে নিজেকে প্রায় উজাড় করে দেয়, মিসেস কবিরের কমলালেবু খাওয়ার ইচ্ছে পূরণের জন্য মধ্যরাতে বেরিয়ে পড়ে— সাহেবকে সন্তুষ্ট রাখতে কোনো কাজই তার জন্য আর অসাধ্য নয় যেন। তবু ভাগ্য ফেরে না তার। আরগসের খাদ্যতালিকায় নতুন খাবার যোগ করার প্রসঙ্গ আলোচিত হলেও তার নিজের খাবার সাহেবদের মুডের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকে। অতএব আসগরের জীবনকে একটি কুকুরের জীবনের চেয়ে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না পাঠকের কাছে। সারা গল্প জুড়ে তার ওই কুকুর-প্রতিম জীবন-যাপনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুপুঙ্খ বর্ণনা চলে এক কৌতুকপূর্ণ ভাষায় আর গল্পের শেষে পাঠকের জন্য অপেক্ষা করে এক তীব্র আঘাত।

আসগর আরগসকে নিয়ে যায় কোষ্ঠ পরিষ্কার করার জন্য এবং অনুভব করে তার নিজেরটাও পরিষ্কার নেই। সে তখন 'সাহেব'দের মতো তিনটে সিগারেটের কোর্স সম্পন্ন করার প্রস্তুতি নেয়। —

> 'এখন বুঝতে পারছে, আরগসের বাউয়েলস আসলে ক্লিয়ার হচ্ছে না। সরোয়ার কবির ঠিকই বলে যে পাকস্থলি পরিষ্কার না হলে জীব শান্তি পায় না। আসলে ক্লিয়ার করার বন্দোবস্ত করাটা খুব দরকার। সায়েবসুবোর বাড়িতে থাকে, ওদের নিয়ম মানলেই কাজ হবে। ...পকেট থেকে সকালবেলা সরোয়ার কবিরের টেবিল থেকে হাতানো সিগারেটের প্যাকেট বার করে ১টা ধরালো। সিগ্রেট শেষ করার পরও আসগরের হাতের মুঠিতে শিকলের কম্পন বাঝা যায়। ...২য় সিগ্রেটটি ধরিয়ে গোটা তিনেক লম্বা টান দেয়ার পর আসগরের হাতের শিকল শান্ত ও শিথিল হয়ে আসে। আসগর সিগ্রেটে বেশ কয়েকটা সুখটান দেয় আর অনুভব করে যে, আরগস খুব আরাম ও তৃপ্তির সঙ্গে বাউয়েলস ক্লিয়ার করছে। শিকলের ধাতব বিনুনি বেয়ে সেই তৃপ্তি আসগরের শরীরে চমৎকার মৌতাত ছড়িয়ে দিচ্ছে।... ৩ নম্বর সিগ্রেটটি ধরাতেই আসগরের হাতে শিকল শিরশির করে ওঠে এবং সে রিনিঝিনি আওয়াজ শুনতে পায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার, আশাতিরিক্ত ক্ষিপ্রতায় আরগস তার সামনে এসে মৃদু মৃদু ল্যাজ নাড়ে। কোন সন্দেহ নাই যে তার পাকস্থলিতে এখন শেষ শীতের নির্মল হাওয়া বইছে।' (যুগলবন্দি / দোজখের ওম)।

গল্পের এই অংশে এসে পরাজয়ে বিবর্ণ নগ্ন জীবনের ভয়াবহ রূপটি আমাদের অসহায় ও বিমূঢ় করে তোলে। আসগরের তিনটে সিগারেটের কোর্স সম্পন্ন করার সঙ্গে কুকুরটির বাউয়েলস পরিষ্কার করার বিষয়টি যেন আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনে প্রচণ্ড চাবুক হেনে আমাদেরকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। আসগর সিগ্রেট টানে আর তারই প্রতিক্রিয়ায় যেন কুকুরের বাউয়েলস পরিষ্কার হতে থাকে– তাহলে কি 'আরগস' ও 'আসগর' আসলে একই চরিত্র? কিংবা কতটুকু পার্থক্য আছে এই দুটি প্রাণীর মধ্যে? কয়েকটি বর্ণ এদিক-ওদিক করে তাদের দুজনের নামের যে পার্থক্য তৈরি করা হয়েছে, জীবন-যাপনেও কি তারা এর চেয়ে খুব বেশি পৃথক? জীবনকে এই তীব্র প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত করে, নগ্নভাবে মানুষের এই লজ্জাজনক পরাজয়ের চিত্র উন্মোচিত করে ইলিয়াস তাঁর পাঠককে দীর্ঘকালের জন্য ভাবিত করে রাখেন।

আবার 'উৎসব' গল্পের আনোয়ার আলি এইমাত্র বিত্তবান বন্ধুর বিয়ের নিমন্ত্রণ খেয়ে, ধানমণ্ডির চোখ ধাঁধানো জৌলুস দেখে এসে বিপদে পড়েছে। কারণ সেখানে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সম্মানজনক দূরত্ব নিয়ে পকেটে হাত দাঁড়িয়ে আছেন মণিমুক্তাখচিত বড়ো বড়ো সব প্রাসাদ। বোঝা যায় ঐসব নিষিদ্ধ গ্রহ নক্ষত্রে কোয়ার্টার ডজন হাফ ডজন রূপসী অন্য কোনো ভাষায় বাক্যালাপ করে।' (আর এখানে, তার এই হতদরিদ্র বাসস্থানে)— 'এই দুপুর রাতে আটটা-নটা কুত্তা দৌড়ে বেড়াচ্ছে একবার গলির এ মাথায়, একবার ও মাথায়। ...। সবগুলো শালা নেড়ি, গায়ে লোম নেই এক ফোঁটা, শরীর ভরা ঘা নিয়ে কেবল কুঁই কুঁই গোঙায়। নিজের ঘরে ঢুকলে মনে হয় এই ঘর এই গলিরই একটা বাইলেন। সেই ভিজে ভিজে ভ্যাপসা ভোঁতা গন্ধ, ৪০ পাওয়ারের টকটক আলো...' (উৎসব /অন্য ঘরে অন্য স্বর)।

এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশ আনোয়ারকে হতবিহ্বল করে দেয়। তার সমস্ত অনুভূতিতে, চিন্তায় ও কল্পনায় ওই দুই পরিবেশের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। বিয়ে-বাড়িতে আনোয়ার সান্নিধ্য পেয়েছে সফল বন্ধু ও তাদের স্মার্ট ও রূপবতী স্ত্রীদের, আলো ঝলমলে রূপসীদের যারা— 'অল্পের মধ্যে সুন্দর সাজতে পারে। খুব মনোহারী কণ্ঠে কী সুন্দর বাচনভঙ্গি এদের।' এবং বাড়িতে—

'সালেহা বেগমের পুরু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা হলুদাভ ও একটা সাদা দাঁত নির্লজ্জ উঁকি দেয়। সালেহা বেগম তার স্ত্রী, তার স্ত্রীর ঠোঁটের কোণে লালার আভাস, সমগ্র মুখমন্ডলে গ্রাম্যতা, কেবল গ্রাম্যতা তোতলায়। ...মেয়েটা এমন জবুথবু হয়ে থাকে কেন? শাড়ির ভেতর বুক নেই, পাছা নেই, দিনরাত হেঁটে বেড়াচ্ছে একটা বেঢপ কোলবালিশ। ...কল তলায় দুটো ইটের উপর ধ্যাবড়া দুটো পা রেখে সে এখন গ্যালন খানেক পেচ্ছাব করবে। মেয়ে মানুষের এরকম বারবার পেচ্ছাব পায়খানা করা, দলাদলা থুতু ফেলা– এসব আনোয়ার আলির মনঃপুত নয়। তো কী আর করা যাবে? এসব মেয়েমানুষ শোধরায় না কোনোদিন।' (উৎসব / অন্য ঘরে অন্য স্বর)।

এবং অবশেষে ওই আলো ঝলমলে জীবনের ক্ষণিক অভিজ্ঞতা তার প্রাত্যহিক প্রাক-নিদ্রা রতিক্রিয়ায়ও সমস্যা বাঁধায়। তার ভাবনা-'ভালো ভালো মেয়ে দ্যাখা গেছে বহু। সুখ তো আজ ওদের নিয়ে, সালেহা উপলক্ষ মাত্র।' আর তাই হাতের কাছে স্ত্রীর নগ্ন শরীর নিয়েও তার কানে ভেসে আসে কিছুক্ষণ আগে শোনা কোন এক কিন্নর কণ্ঠ, চোখে ভেসে ওঠে ওইসব দূরবর্তী শরীর। সুতরাং—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আনোয়ারের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়ে সেখানে ঠাণ্ডা সর পড়ছে। শীতল শরীরে একটু ধ্বনি শোনা যায় : কি হলো, আজ একটুও ইচ্ছা করছে না কেন? কোনো কোনো দিন দুপুরবেলা অফিসে বসে সে পর্ণোগ্রাফি পড়ে, সেদিন রাত্রিবেলা কিন্তু এই মেয়েটার শরীরেই বেশ টাটকা স্বাদ পাওয়া যায়। আজ ক্ষোভ হয় : যতোই সেক্সি হোক না, কায়দাটা এরা ঠিক রপ্ত করতে পারে না— এই সালেহা টাইপের মেয়েরা। ... হাতের একেবারের ভেতরে সালেহার স্তন, এতো কাছে, তবু তাকে স্পর্শ করা যায় না কেন? দুটো ফাঁপা বেলুনের মত স্তন জোড়া ধরে আছে যে হাত সেই হাতে কি রাবারের পুরু গ্লাভস? ...সালেহার মুখ থেকে, বুক থেকে, হাত থেকে রক্তের নোনা ধোঁয়া বেরিয়ে ঘর মেঘলা করে দিলো। তার স্তনজোড়া ফুটছে টগবগ করে। কিন্তু আনোয়ার আলির শকপ্রুভ গ্লাভস খুলবে কে?' (উৎসব / অন্যঘরে অন্য স্বর)।

অতএব তার ওই রতিক্রিয়া প্রায় বিরক্তিতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু এক সময় তাদের পাড়ায় ওই গভীর রাতে একটু হৈচৈ মতন তৈরি হলে সে বাইরে বেরিয়ে দ্যাখে— রাস্তার দুটো নেড়ি কুকুর রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছে এবং রাস্তার ধারের মানুষগুলো, যারা তার চেয়েও অধিকতর নগ্ন ও ব্যর্থ, তাই নিয়ে উৎসবে মেতে উঠেছে। সে অনেকক্ষণ ধরে সেই দৃশ্যটি দ্যাখে, প্রাণিত বোধ করে এবং স্ত্রীর পাশে শুয়ে—

'আমার শেলী বলে আনোয়ার আলি স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলো। ... আনোয়ার আলির হাত থেকে রবারের পুরু গ্লাভস খুলে গেছে। চামড়ার আবরণটাও উঠে যাচ্ছে নাকি? সুখ ও উত্তেজনায়, আনোয়ার আলির উত্তপ্ত কণ্ঠ থেকে, মুখ থেকে আঠালো ধ্বনি চুঁয়ে পড়ে।' (উৎসব/অন্যঘরে অন্য স্বর)।

গল্পটি পাঠককে একেবারে নগ্ন করে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আনোয়ার আলি তার নিম্নবিত্ত বা বড়জোর নিম্ন-মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন জীবন-ধারার বাইরে উজ্জ্বল ও সফল এক জীবনের ক্ষণিক অভিজ্ঞতায় তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে। স্ত্রীকে মনে হয় 'একটা বেঢপ কোলবালিশ।' তার সবকিছুই প্রায় অশ্লীল মনে হয় এবং স্ত্রীর শরীর ছুঁয়েও নিজেকে জাগাতে না পেরে মনে হয় যেন রবারের গ্লাভস পড়ে আছে। ওই উজ্জ্বল-অচেনা অভিজ্ঞতা তাকে দূরে নিয়ে যায় তার দৈনন্দিন স্বাভাবিকতা থেকে। অথচ কুকুরের রতিক্রিয়া দেখে তখন সেই পুরনো বউকেই 'আমার শেলী' বলে জড়িয়ে ধরে এবং কণ্ঠ থেকে 'সুখ ও উত্তেজনার ধ্বনি' চুঁয়ে পড়ে। তবে কি ওই উজ্জ্বল জীবন নয়, কুকুরের জীবনের সঙ্গেই তার সংলগ্নতার বোধ অনেক গভীর? এই বোধ কি তার নিজ জীবনের প্রতি চূড়ান্ত ক্ষোভ ও বিদ্বেষ, নিজস্ব ব্যর্থতা ও অক্ষমতা এবং সম্ভাবনাহীনতা থেকে উৎসারিত নয়? কুকুরের রতিক্রিয়া তাকে অনুপ্রাণিত করে, তাকে প্রাত্যহিকতার সঙ্গে সংলগ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে দেয় যেন তার জীবন ওই রাস্তার নেড়ি কুকুরের মতোই, অন্তত তার চেয়ে উজ্জ্বল কিছু নয়; যেহেতু উজ্জ্বল জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা তাকে বরং দুরে সরিয়ে দেয় স্বাভাবিক জীবন-যাপন থেকে। গল্পের এই পরিণতি পাঠককে বিমূঢ় করে দেয়, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ব্যর্থ ও নগ্ন চিত্রের সামনে দাঁড় করিয়ে বাস্তবতার তীব্র চাবুকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে।

৩

জীবন যদি হয় এরকম প্রায় পশুর জীবনের মতো— কোনো সম্ভাবনা, কোনো উজ্জ্বলতা, কোনো সাফল্য যদি না থাকে, যদি ক্রমাগত বিবর্ণ হতে থাকে যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা এবং একটি সুখময়-সুন্দর জীবনের স্বপ্ন যদি ক্রমাগত সুদূর পরাহত হতে থাকে; তাহলে পরিশেষে আর কী-ই বা থাকে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া অথবা একেবারে মরেই যাওয়া ছাড়া কিংবা মরে যাওয়ার আগে অন্তত শেষবারের মতো একবারের জন্য হলেও তীব্রভাবে প্রতিশোধস্পৃহায় জ্বলে ওঠা ছাড়া?

আমরা তাই 'কীটনাশকের কীর্তি' গল্পে রমিজ আলীকে মরিয়া হয়ে উঠতে দেখি। রমিজ ঢাকায় কোনো এক সাহেবের বাড়ির ভৃত্য। গ্রাম থেকে বাপের চিঠিতে তার বোনের অত্মহত্যার সংবাদ আসে— 'তুমার ভইন আছিমুন্নেসা গত সমবার দিবাগত রাত্রে পোকের অউসুদ খাইয়া মরিয়া গিয়াছে'। — সে নির্লিপ্তভাবে এই সংবাদ শোনে, কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখায় না— যেন খুব স্বাভাবিক একটি ঘটনা ঘটেছে। তারচেয়ে বরং আর্থিক বিষয়টিই তার ভেতরে অধিক চিন্তার জন্ম দেয়—

> 'দারোগা পুলিশে একুনে ৩টাকা কম ২৫০ টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। আরও জানিবা যে মিরধা বাড়ির আছমত আলি পাওনা ২৪৫ টাকার জন্য দুইশত পচ্চালিশ টাকার জন্য বার ২ তাগাদা দিতাছে, তাগাদার জন্য হাটে যাওয়া একরূপ অসম্ভাব হইয়া পরিয়াছে।' (কীটনাশকের কীর্তি / দোজখের ওম)।

রমিজ অতঃপর তার সাহেবের কাছে টাকা চেয়ে নিয়ে বাড়িতে যাওয়ার কথা ভাবে। কিন্তু টাকা চাওয়ার দীর্ঘ প্রস্তুতি শেষ হতে না হতে 'ধিনিক ধিনিক নাচতে নাচতে' সাহেবের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া কন্যার আগমন এবং 'কাঁদো কাঁদো গলায়' নাচে মেডেল পাওয়ার সংবাদ এবং মহা উল্লাসে প্রায় এ্যাকসিডেন্টের বিবরণ প্রদান। বোনের মৃত্যুসংবাদ বা টাকার কথা আর বলা হয় না রমিজের। তার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে, নানা ফাঁকফোকর খোঁজে কথাটা বলার এবং একটা যুতসই বাক্য তৈরি করার জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি নেয় কিন্তু বলা হয়ে ওঠে না। কারণ হঠাৎ করেই যেন গুরুত্ব পেয়ে যায় অ্যালসেশিয়ানের খাদ্য-প্রসঙ্গ, যেন তার জীবন ওই বাড়ির কুকুরের চেয়েও নিম্নমানের, তার প্রয়োজন অ্যালসেশিয়ানের খাদ্য-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসঙ্গের চেয়েও তুচ্ছ, তার গুরুত্ব কোনোভাবেই একটি কীট-পতঙ্গের চেয়ে বেশি নয়। শেষ পর্যন্ত তার প্রয়োজনের কথাটা আর বলা হয় না, বাড়িতেও যাওয়া হয় না। কিন্তু বোনের মৃত্যু সংবাদ-প্রাপ্তির প্রথম নিস্পৃহতা এক সময় হারিয়ে গিয়ে এক গভীর বেদনাবোধ এসে তাকে এলোমেলো করে দেয়। একটি কীটনাশকের প্যাকেটে 'চিৎপটাং' হয়ে পড়ে থাকা মৃত 'ইদুঁর, আরশোলা, মাকড়শা, ছারপোকা, মশা এবং মাছি'র রঙিন ছবির মধ্যে বোনের মৃত মুখ ভেসে ওঠে আর ধীরে ধীরে তার ভেতরে জেগে ওঠে অবদমিত প্রতিশোধস্পৃহা। তার প্রিয় 'বুবু', আশৈশব বন্ধু বোনটির প্রতি গভীর মমত্ববোধ আর তার অপমৃত্যুতে জেগে ওঠা অসহায়বোধ থেকে উৎসারিত ওই প্রতিশোধস্পৃহা তাকে হিংস্র করে তোলে। কিন্তু প্রতিশোধটা সে নেবে কার ওপর? ভগ্নিপতি হাফিজউদ্দিনের ওপর? নাকি 'মৃধাবাড়ির ম্যাট্রিক পাসে'র ওপর যে তার বোনের জীবনটিকেই তছনছ করে ফেলেছে এবং যার ষড়যন্ত্রের ফলে বোন তার স্বামীর ঘর করতে না পেরে 'পোকের অউসুদ' খেয়ে মরে গেল? শত্রুকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারে না বলে তার প্রতিশোধস্পৃহাও কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ পায় না। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি, তার এই ক্রোধ তাদের প্রতিই যারা তার এবং তাদের মতো মানুষগুলোর জীবনকে প্রায় পশুর জীবনে পরিণত করে, যাদের কারণে তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলো চিরদিন অপূর্ণ রয়ে যায়, বোনকে আত্মহত্যা করে মরতে হয় এবং সেই খবর পেয়েও কিছুই করার থাকে না, জীবন ক্রমাগত বিপন্ন-বিবর্ণ হয়ে পড়ে, বেঁচে থাকার ন্যূনতম স্বপ্নগুলোও সুদূরপরাহত হয়ে যায়। গল্পের ক্রমপরিণতিতে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রমিজের ভেতরে প্রতিশোধস্পৃহা ধীরে ধীরে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, কিন্তু কীভাবে কার ওপরে প্রতিশোধটা নেবে সেটি বুঝতে না পেরে অবশেষে কীটনাশকের প্যাকেট হাতে সাহেবের মেয়ের ঘরে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়েও তার আর্থিক সংকটের ব্যাপারটিই প্রথমত প্রধান হয়ে ওঠে। আমরা দেখি, সে গিয়েই হাত ঘড়ি আর সোনার মেডেল সরায় এবং তারপর সাহেবের মেয়েকে কীটনাশক খাওয়ানোর প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু মেয়ের চিৎকারে বাড়ির লোকজনের ঘুম ভেঙে গেলে সে প্রায় গণপিটুনিতে রক্তাক্ত হয়। তার আর প্রতিশোধ নেয়া হয় না। ওই মৃত পোকা-মাকড়ের সারি থেকে 'বুবু'র মুখটিকে মুক্তি দিয়ে সেখানে সাহেবের মেয়েকে স্থাপন করতে চেয়েছিল রমিজ। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটিকে বোনের প্রতি তার ভালোবাসার গভীর প্রকাশ বলে মনে হয় বটে, কিন্তু তীব্র প্রতিশোধও কি নয়? কারণ শুধু ওই মেয়েটিকেই নয়— 'আরেক দিন কায়দা করে বিবিসায়েবের মুখে পোকার ওষুধ ঢুকিয়ে দেবে, আরেক দিন সাহেবের মুখে, আরেক দিন আরেক দিন।' — এই প্রতিশোধস্পৃহা যেন সবার বিরুদ্ধে যারা রমিজের জীবনকে এমন বিপন্ন, মূল্যহীন ও নিষ্প্রভ করে তোলে। কিন্তু তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যর্থতা আমাদের এ-ও জানিয়ে দেয়, ওরা যেন কেবল রক্তাক্ত হওয়ার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছে।

এই গল্পে ইলিয়াস একই সঙ্গে মানুষের নির্মম বেঁচে থাকা, তার অন্তর্গত মমত্ববোধ ও ভালোবাসা এবং প্রতিশোধস্পৃহা ও ঘৃণার চমৎকার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। বোনের প্রতি রমিজের ভালোবাসা, বোনকে নিয়ে তার শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিচারণ এবং অবশেষে ব্যর্থতায় রক্তাক্ত হয়ে— 'রমিজ ডুকরে কাঁদে। বুবু। বুবুরে! বুবু! রমিজ কাঁদতেই থাকে, কেবলি কাঁদে।'— তার কান্না আমাদের চোখ ভিজিয়ে দেয়। খুব রুক্ষ বাস্তবতাকে আঁকেন ইলিয়াস, কিন্তু তার ভেতরে প্রোথিত হয়ে থাকে গভীর মমত্ববোধ। এ তাঁর এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য।

৪

জীবন যখন এরকম বিপন্ন ও ক্লিষ্ট, সম্ভাবনা ও প্রত্যাশার মৃত্যু ঘটে যায় প্রতি মুহূর্তে, প্রতিশোধ নেয়ার তীব্র ইচ্ছা মুখ থুবড়ে পড়ে নিজেরই অক্ষমতার কারণে, স্বপ্ন যখন ক্রমাগত চলে যেতে থাকে নাগালের বাইরে তখন হয়তো আমরা এমন কাউকে খুঁজি যিনি আমাদের স্বপ্নকে রূপান্তরিত করতে পারেন সম্ভাবনায় কিংবা পরিণত করতে পারেন বাস্তবে।

'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পের মিলি এজন্যই আব্বাস পাগলাকে খুঁজে নিয়েছিল। গল্পে মিলির ভাই রানা এবং তার বন্ধুরা মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালের বখে যাওয়া তরুণদের প্রতিনিধি— আদর্শচ্যুত, লক্ষ্যহীন, জীবনের পাক-কাদায় জড়িয়ে পড়া নিরুপায় যুবক— অবৈধ পথে সম্পদ আহরণ করা যাদের প্রধান কাজ। এরা সবাই তাই মিলির কাছে একই সমতলের—

> সোহেল না মিজান না ফয়সাল নাম তিনটে এই তিনজনেরই, কিন্তু মিলির কাছে এদের সবাইকে একই রকম মনে হয়, এদের আরেকজন বন্ধু আছে, সে আজ আসেনি, এমন হতে পারে যে এই তিনটে নামের মধ্যে তার নামটিও রয়ে গেছে, সেদিক থেকে বিবেচনা করলেও সুনির্দিষ্ট নামে এদের একজনকে সনাক্ত না করাই ভালো।' (মিলির হাতে স্টেনগান/ দুধভাতে উৎপাত)।

এমন কিছুই এরা ধারণ করে না যা মিলির কাছে বিশেষ গুরুত্ব পাবে, ফলে তারা তার কাছে 'সোহেল না সিডনি না ফয়সল' এরকম যে-কোনো একজন হয়ে দাঁড়ায়— যেন কোনো আলাদা পরিচয়ই তাদের নেই— কেউই তার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না। ওরা মিলির দৃষ্টি আকর্ষণের অবিরাম চেষ্টা চালায় এবং যথারীতি ব্যর্থ হয়। —

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মিলির সঙ্গে মুখোমুখি হতে ফর্সারোগা মাখোমাখো মার্কা চোখে-মুখে লাল রঙ ক্যাট-ক্যাট করে ওঠে, এই জিনিস মিলি আগেও লক্ষ করেছে। কালো-লম্বা এক্সট্রা স্মার্ট হয়, 'রানা কাল বিকালে ঢাকা ক্লাবের প্রোগ্রামটা মিস কইরো না। ফাইভ থার্টি শার্প।' তার মুখটা মিলি ভালো করে দেখে নেয়। অতো ছটফট করার দরকার কী বাপু? প্রেম-ট্রেম করতে চাইলে সরাসরি বললেই পারো। এরা তো সব একই টাইপের, মিলি কী বাছাবাছি করতে বসবে, নাকি তাই করা তার পোষায়?' (মিলির হাতে স্টেনগান/ দুধভাতে উৎপাত)।

কিন্তু আব্বাস পাগলা— এক সময় স্কুল শিক্ষক ছিল, যুদ্ধ থেকে ফেরার পর পাগল হয়ে গেছে— মিলির কাছে অন্যরকম বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়। আব্বাস স্বপ্ন দ্যাখে, আর সেই স্বপ্ন এতটাই গভীর ও ব্যাপক যেন তারা এই সংকীর্ণ পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে চাঁদ ও গ্রহ-নক্ষত্রের জগতে ডানা মেলেছে। সে নিজে স্বপ্ন দ্যাখে, দেখাতেও জানে। তার দেখার চোখ যেন সীমাহীন আকাশকেও অতিক্রম করে যায়। সে দ্যাখে যে শত্রুপক্ষ পুরো পৃথিবীটাই দখল করে নিয়েছে, এবার আকাশটা দখলের পায়তারা করছে —

'খানকির বাচ্চারা, তোমরা দুনিয়ার পুরাটাই কব্জা করছো, অহন আসমান চোদাইবার তালে অছো না?' (শত্রুক্ষ চাঁদে গেছে শুনে তার প্রতিক্রিয়া) — 'এই চুতমারানিরা গেছে, খানকির বাচ্চাগুলি অহন নাম দিবো। নাম দিবো, দাগ দিবো, খতিয়ান করবো, কবলা করবো, দলিল করবো, মিউটেশন করবো, হালার বাপদাদাগো সম্পত্তি পাইছে তো বুঝলি না? — দুনিয়ার পানি বাতাস মাটি আগুন পাথর তো জাউরাগুলি পচাইয়া দিছে, অহন পচাইবো চান্দেরে।' (মিলির হাতে স্টেনগান/ দুধভাতে উৎপাত)।

'দুনিয়ার পানি বাতাস মাটি আগুন পাথর' কে পচিয়েছে, 'দুনিয়ার পুরোটাই' কে কব্জা করেছে? আব্বাস পাগল, কিন্তু এই শত্রুপক্ষের পরিচয় সে জানে— ওরা দখলদার সাম্রাজ্যবাদি, সৌন্দর্য হত্যায় যারা আনন্দ পায়, মানুষকে যারা ব্যবহার করে দাসের মতো। কিন্তু ওদের যুদ্ধ-কৌশল আব্বাসের নখদর্পনে। যদিও ওরা চাঁদে গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে তবু আব্বাস একটা স্টেনগান পেলে আর হেডকোয়ার্টার থেকে চূড়ান্ত মেসেজ পেলে ওদের সমস্ত আয়োজন তছনছ করে দিতে পারে। হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে তার সর্বক্ষণিক যোগাযোগ আছে, এখন তার দাবি একটা স্টেনগানের এবং সেটা রানার কাছে। এই যার ভাবনা, আকাশ পর্যন্ত ধাওয়া করে মানব জাতিকে এইসব শত্রু আর তাদের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করার কথা যে ভাবতে পারে— স্বাভাবিকভাবেই সে মিলির মতো স্বপ্নঘোরগ্রস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। আব্বাসের প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি আচরণ তাঁকে মুগ্ধ করে, বিস্মিত করে, স্বপ্নকাতর করে তোলে—

> 'বাইরে আব্বাস পাগলার হাততালি এখন স্পষ্ট এবং উচ্চশব্দ। তালির মাঝে বিরতি খুব দ্রুত কমে আসছে। তাক্ তাক্/তাক্ তাক্ তাক্ তাক্ /তাক্ তাক্— এই তালের নিয়মিত ও দ্রুত পেটায় বাইরের নীরবতা সংহত। ... জানালা দিয়ে হাততালির ধ্বনি ছলকে ছলকে এসে ঘরময় থৈ থৈ ভাসছে। মিলির চোখেমুখে ছলাৎ ছলাৎ ঝাপটা মারে তাক্ তাক্/ তাক্ তাক্ তাক্ হাততালি। তাক্ তাক্/ তাক্ তাক্ তাক্ চোখের পানি ঘন হতে হতে কালো মেঘের আকার ও রঙ পায়, অন্ধকার এখন নিশ্ছিদ্র। তাক্ তাক্/ তাক্ তাক্ তাক্— অন্ধকারের ভেতর ডিমের মধ্যে বড়ো হওয়ার স্পন্দন অনুভব করা যায়, তখন সেই হাততালির সঙ্গে পা ফেলে মিলি। একটা উঁচু ক্রেনের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে।' (মিলির হাতে স্টেনগান/ দুধভাতে উৎপাত)।

এই স্বপ্নঘোরগ্রস্ত চমৎকার মেয়েটিকে আব্বাসের স্বপ্ন-ভাবনা-কল্পনা আলোড়িত করে যায়, তার গণ্ডিবদ্ধ দৈনন্দিন অনটনময় জীবনে যা কিছু ব্যতিক্রম তা যেন শুধুমাত্র আব্বাস পাগলার কাছেই সঞ্চিত হয়ে আছে। এ এক ধরনের মুক্তিও তো বটে। এই গতানুগতিক, পৌনঃপুনিক, নিত্যনৈমত্তিক ও সম্ভাবনাহীন বিবর্ণ জীবন-যাপন থেকে কল্পনার অসীম আকাশে অবাধ বিচরণ এক ধরনের মুক্তি দেয় তাকে। কিন্তু তার এই স্বপ্ন আর মুক্তিও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কারণ, আব্বাস, রানার ভাষায়— 'একটা থরোব্রেড বাস্টার্ড' আর 'পাবলিক নুইসেন্স' বলে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। আর তারপর মিলি গোপনে দেখা করতে গেলে, তার মুখে তখন শুধুই ক্ষুধা আর খাবারের কথা শোনা যায়। স্বপ্নের কথাগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন। কিন্তু মিলি ততদিনে আব্বাস বর্ণিত আকাশ-জগৎ দেখতে শিখে গেছে।

অবশেষে হাসপাতাল থেকে আব্বাস সুস্থ হয়ে ফিরে এলে মিলির স্বপ্নের মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি ঘটে। মিলি আব্বাসের বহু প্রত্যাশিত স্টেনগাটটি এনে দিলে সে 'আমি ভালো হইয়া গেছি' বলে প্রত্যাখ্যান করে। তখনও—

> 'মিলির হাতের ভঙ্গি অপরিবর্তিত। সে কেবল আব্বাস পাগলার চোখ দেখছে। ঐ চোখজোড়ায়-দ্যাখা সমস্ত ঘটনা নিজে দেখতে পারলেই আব্বাস পাগলার সঙ্গে সেও শত্রুপক্ষ ঠেকাবার কাজে নেমে পড়তে পারে। কিন্তু আব্বাস পাগলার চোখের বহুবর্ণ জমি ঘুমের ঘষায় ঘষায় পানসে সাদা হয়ে গেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— (এবং এখন সে রানার ইন্ডেটিং ফার্মে 'প্রভাইভেড' হওয়ার পথ খুঁজছে ; আর তাই) —

'ঘরে এসে মিলি আধ মিনিটও দাঁড়ায়নি। ভেতরের বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে সোজা ছাদে উঠে সে দ্যাখে যে ধোয়ামোছা মসৃণ ঘাড় নিচু করে গুটি গুটি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে আব্বাস মাস্টার। গোলগাল মুণ্ডুটা তার অতিরিক্ত নোয়ানো। এটা তার ধড়ের সঙ্গে কোনোমতে সাঁটা। তার পেছনে আর একটি মানুষ, এর মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল, ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মাথাটিও সংশ্লিষ্ট ধড়ের সঙ্গে ঢিলেঢালাভাবে ফিট-করা। কয়েক পা এগিয়ে গেলে এই দুটোর কোনটা যে আব্বাস মাস্টারের তা ঠাহর করা যায় না।' — (এ যেন সেই সোহেল না সিডনি না ফয়সলের মতো, আব্বাসও এখন আর আলাদা কেউ নয়, বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যই নেই আর— বস্তুত সে 'ভালো হইয়া' যেন আরও ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে। এখন সে আরও হাজার লোকের মতোই স্বপ্নহীন এক অদ্ভুত জীবমাত্র।) — 'এদের পর আর একজন পানের পিক ফেলে উল্টোদিকে হাঁটে। পরের লোকটি হাঁটে পানের পিক না ফেলে। এরপর দুজন লোক হাঁটছে পাশাপাশি, ডানদিকেরটা চশমার ভেতর দিয়ে মিলিকে দেখতে দেখতে হাঁটে। চশমাবিহীন বাঁদিকেরটা হাঁটে মিলিকে না দেখতে দেখতে। এইসব পার্থক্যে কিছু এসে যায় না, কারণ গলির মাথায় পৌঁছবার আগেই সবগুলো মুখ একই রকম ঝাপসা হয়ে আসে। ওখানে বড়ো রাস্তায় বড্ডো ভিড়। ট্র্যাফিক পুলিশের বাঁশির অবিরাম শব্দে রিক্সা, স্কুটার, হোন্ডা, কার, বাস, ট্রাক, ঠেলাগাড়ি এবং পথচারীরা একই তালে এবং একই গতিতে নড়াচড়া করে, একটি থেকে আরেকটিকে আলাদা করে সনাক্ত করা যাচ্ছে না। একি রঙবাজি শুরু হলো, দুপুর বেলার রোদে মানুষ ও যানবাহন ও রাস্তা ও ট্রাফিক পুলিশের দাঁড়াবার উঁচু জায়গা ও ফুটপাত ও রেস্টুরেন্ট ও দোকানপাট ও তারের জটা মাথায় ইলেকট্রিক পোল— সবাই মিলে মিশে দলা পাকিয়ে যাচ্ছে? আকাশের দিকে মুখ তুললে মিলি টের পায় যে চারদিকের বাতাস চাপা হয়ে আসছে। চাঁদ তাহলে এতক্ষণে শত্রুর কব্জায় চলে গেছে! দখলকারী সেনাবাহিনীর এক নাগাড় বোমাবাজিতে চাঁদের হাল্কা মাটির ধুলা এবং বারুদের কণা নিচে ঝরে পড়ছে। রোদ ও বাতাস তাই ধোঁয়াটে ও ভারি, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বৈ কি! হাতের স্টেনগানের ইস্পাতে আঙুল বুলাতে বুলাতে পায়ের পাতায় চাপ দিয়ে মিলি আরও ওপরে দ্যাখার চেষ্টা করে। রাস্তার মানুষজন তো বটেই, ইলেকট্রিক তারের জটাধারী পোল এবং আশপাশের ছাদের টেলিভিশনের এ্যান্টেনাগুলো পর্যন্ত তার চোখের লেবেলের নিচে। তবে কি-না চাঁদের রেঞ্জ এখনও মেলা দূর। ওকে তাই দাঁড়াতে হয় পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে। এতে হচ্ছে না। এবার একটা উড়াল দেওয়ার জন্য মিলি পা ঝাপটায়।'(মিলির হাতে স্টেনগান/ দুধভাতে উৎপাত)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্ন ও মুক্তিপ্রয়াসের পরিসমাপ্তি ঘটে এভাবেই। স্বপ্নবাহক ব্যতিক্রম মানুষেরা হয়ে যায় জনরাণ্যে মিশে যাওয়া আর দশজন মানুষের মতোই সাধারণ ও গতানুগতিক।

মিলি— এই কল্পনাপ্রবণ স্বাপ্নিক মেয়েটির জন্য আমাদের কষ্ট হয়। যে আব্বাস পাগলাকে কেন্দ্র করে মিলি স্বপ্ন দেখেছিল সে-ও মিলেমিশে গেছে আর সবার সঙ্গে, অন্য যে-কারো সঙ্গে তার পার্থক্য ওই পানের পিক ফেলা আর না ফেলার মতোই, চশমা পরা আর না পরার মতোই; গলির মোড়ে যেতে-না-যেতে যারা এক হয়ে যায়, এমনকি 'যানবাহন ও রাস্তা ও ট্রাফিক পুলিশের দাঁড়াবার উঁচু জায়গা ও ফুটপাত ও রেস্টুরেন্ট ও দোকানপাঠ ও তারের জটা-মাথায় ইলেকট্রিক পোল'-এর সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য নেই। এ-সবকিছুই মিলির 'চোখের লেবেলের নিচে'— একই সমতলের। এরা কেউই মিলির স্বপ্নকে ধারণ করার যোগ্যতা রাখে না। স্বপ্নগুলো তাই ওড়ার জন্য শুধু ডানা-ই ঝাপ্টায়, উড়তে পারে না। পারে না কারণ, কেউ আর কোথাও নেই স্বপ্নগুলো বহন করে নিয়ে যাওয়ার মতো, মুক্তির আনন্দ এনে দেয়ার মতো।

এই দেশে এই বিপন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পের প্রাসঙ্গিকতা তাই অনস্বীকার্য। মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্ন পূরণ না হওয়ার বেদনা ও তার কারণ এমন অসামান্য প্রতীকী কুলশলতায় খুব একটা নির্মিত হতে দেখা যায় না। বাংলা ছোটগল্পের শতবর্ষের ঐতিহ্যে এই গল্পটি তাই এক অসামান্য সংযোজন হয়ে থাকে।

৫

কেউ নেই আর স্বপ্নকে বহন করার মতো, স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার মতো, নেই নিজস্ব কোনো গৌরব, যোগ্যতা বা সাহস। আর নেই বলেই 'দখল' গল্পের ইকবাল তার মৃত পিতার সম্পত্তির দখল চাইতে গিয়ে পরিশেষে পিতার গৌরবের দখল প্রত্যাশী হয়ে পড়ে। তেইশ বছর আগে মরে যাওয়া পিতার সম্পত্তির অংশ দাবি করতে এসে ইকবাল দেখতে পায়— সে এক প্রাচীন গণবিরোধী পরিবারের উত্তরাধিকারী, যদিও তার বাবা পঞ্চাশের রাজশাহী কারাগারের ঐতিহাসিক 'জেল হত্যা'র শহীদ। তিনি ছিলেন মানুষ ও মানবতার পক্ষে। একটি ধর্মীয় আবহের শোষণকামী মানসিকতাসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি দরিদ্র-ক্লিষ্ট মানুষদের সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন, তাদেরকে মুক্তির আলো দেখাতে চেয়েছিলেন, অতঃপর এক সময় রাজশাহী কারাগারে নিহত হয়েছিলেন। এই অঞ্চলের দরিদ্র-বঞ্চিত জনসাধারণ তার স্মৃতি আর আদর্শ বহন করে চলেছে। ইকবাল এখানে এসে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। একদিকে পিতামহের কাছ থেকে নিজের মৃত বাবার জন্মমুহূর্তের গল্প থেকে শুরু করে তাঁর সমগ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনেতিহাস, অন্যদিকে দরিদ্র জনসাধারণের কাছ থেকে তাঁর কর্ম ও আদর্শের ইতিহাস; একদিকে তার পিতাকে নিয়ে মানুষের প্রত্যাশা ও ভালোবাসা অন্যদিকে তার পরিবারের গণবিরোধী ভূমিকা, সরকারী বাহিনীর সঙ্গে আঁতাত করে জনগণকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র— এই দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতি তাকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। তার যেন কিছুই করার থাকে না, সব বিষয়েই সে হতবিহ্বল, সিদ্ধান্তহীন। এই নিস্পৃহতা ও অক্ষমতা আমাদের তরুণ প্রজন্মের আবহমান নিস্পৃহতার কথা মনে করিয়ে দেয়, যারা দেড়-দুই যুগ পরপর একবার জ্বলে উঠেই ডুব দেয় এক গভীর নিস্পৃহতার সমুদ্রে। ইকবাল শুধু অন্তর্গতভাবে জ্বলে মরে—

> 'মোয়াজ্জেম হোসেন বড়োছেলের পাশে সমাধিস্থ হওয়ার জন্য আগে থেকেই আয়োজন করে রেখেছেন। ...ইকবালের পাতলা ঠোঁটের একটু ভাঙা ধারালো ঢেউ তার দাদুর প্রবল বাসনাকে আঘাত করে; ভালোই! মানুষের হৃত-অধিকার উদ্ধার করতে গিয়ে ছেলে জেলখানায় মরে পুলিশের গুলিতে, পরে তুমি শালা বুড়ো শয়তান তোমার আরেক ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করে রক্ষিবাহিনী নিয়ে আসো গ্রাম উজার করার জন্য। আবার দ্যাখো, কবরের তিনদিকে ছোট্ট দেয়াল, ছেলের কবরের পাশটায় ফাঁকা। মানে শালা কবরের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি হয়ে বাপে-বেটায় হাড়-তরঙ্গ বাজাবে, না? অতো সোজা? তোমার ছেলে তোমার সঙ্গে মিলবে? তোমাকে আমার চিনতে বাকি আছে? (দখল/দুধভাতে উৎপাত)।

পিতার সমাধির পাশে পিতামহের ওই কাঙ্ক্ষিত কাল্পনিক কবর তাকে এভাবেই ক্ষুব্ধ করে তোলে। প্রথমত সে ব্যক্তিগত ক্রোধেই সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু এক সময় তার পিতার আদর্শের অনুসারী জনতা এই বাড়ি আক্রমণ করলে তার কাছে পিতার বিপ্লবী ভাবমূর্তিটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে—

> 'ইকবাল লাফ দিয়ে এসে পড়ে শূন্য কবরের ওপর। — এতো সোজা! মোয়াজ্জেম হোসেন কে? ওর বিপ্লবী বাপের পাশে থাকবে ওই শয়তান বুড়োটা? এই মানুষমারা, ঠক ও শোষক শয়তান জোতদার! এতো সোজা! ... এই কবরে মোয়াজ্জেম হোসেনের থাকার কী অধিকার? ইকবাল নিজেই কবরে বেশ জুৎ করে বসলো। বাপের যা কিছু আছে সব তো তারই প্রাপ্য। শূন্য কবরে লাশের মতো শুয়ে সে একটু একটু করে পা নাচায়। এবার মরলে এখানেই তার চিরকালের আসন হয়ে থাকবে। চিরকাল? হ্যাঁ চিরকাল! কাঁঠালপোঁতার প্রবাহ এই তো এসে পড়লো। আসুক না! তার ভয় কী? তার জন্য নিশ্চিত অমরতা। বাপের ফলকের পাশে আরেকটি ফলক স্থাপিত হতে কতোদিন আর লাগবে? বিপুল মানুষের সমবেত পদযাত্রার প্রচণ্ড ধ্বনি শুনতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনতে ইকবালের চোখ চকচক করে, জিভ দিয়ে সে ঠোঁট চাটে।' (দখল/দুধভাতে উৎপাত)।

গল্পের ইকবাল এক স্থবির যুবক। সে পরিচিত হয় তার পিতার বিপ্লবী সত্তার সঙ্গে, ত্যাগের সঙ্গে, গৌরবের সঙ্গে, ভেতরে ভেতরে দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত হয়, দগ্ধ হয় অথচ মানুষের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে না, এমনকি তাদের প্রত্যাশিত সামান্য একটি সিগন্যাল দিতেও সে ব্যর্থ হয়। শহীদ হওয়ার তীব্র বাসনায় তার চোখ চকচক করে অথচ এর জন্য যে ত্যাগ ও সাহস প্রয়োজন তার কিছুই তার মধ্যে নেই। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর সাহিত্যে কখনো কিছু আরোপ করেননি, চাপিয়ে দেয়া 'বিপ্লবে' তাঁর আস্থা ছিল না, ইকবালকে দিয়ে তিনি তাই হঠাৎ বিপ্লব ঘটিয়ে দেননি। তার মতো যুবকের পক্ষে বিপ্লবী কোনো কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা অসম্ভব— ইলিয়াস তা জানতেন, আমাদের অনেক লেখকই তা জানেন না, বানোয়াট বিপ্লবের জন্য এইসব মেধাহীন লেখকের 'চোখ চকচক' করে কিন্তু রচনাটি হয়ে যায় বিবর্ণ। ইলিয়াসের রচনা সেদিক থেকেও ব্যতিক্রম। এই ধরনের চরিত্রের পক্ষে যা সম্ভব ইলিয়াস তার চেয়ে বেশি কিছু দেখান না। ইকবাল ভাবে— 'বাপের যা কিছু আছে, সব তো তারই প্রাপ্য!'— এ-ও কি এক ধরণের আত্মপ্রতারণা নয়? হ্যাঁ, তা-ই; ইকবালের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি প্রত্যাশাও করা যায় না। নিজের কোনো উদ্যোগ নেই, উদ্যম নেই, উজ্জ্বলতা নেই, স্থবিরতা চিরসঙ্গী অথচ গৌরব-প্রত্যাশী এই যুবক কি আমাদেরই প্রতিবিম্ব নয়? আমাদের সামনে আছে হাজার বছরের সংগ্রামের ইতিহাস, মানুষের আকঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা, আমরা কতটুকুই বা তার সঙ্গে নিজেদেরকে মেলাতে পারছি? নাকি কেবলি ব্যস্ত রয়েছি ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তায়?

৬

এজন্যই কি জীবনের মান উন্নত হয় না এই জনপদে? মানুষ বেঁচে থাকে ক্লিষ্টতায় ও বিপন্নতায়? আর ইলিয়াসের গল্পে এইসব জীবন্মৃত নানা শ্রেণী-পেশার পরাজিত মানুষ উঠে আসে অতি নিপুণ কুশলতায়— তাদের খুটিনাটিসহ সমগ্রভাবে। 'উৎসব' গল্পের আনোয়ার, 'প্রতিশোধ'-এর ওসমান, 'অসুখ-বিসুখ'-এর আতমন্নেসা, 'দুধভাতে উৎপাত'-এর জয়নাব কিংবা অহিদুল্লা, 'দখল'-এর ইকবাল, 'কীটনাশকের কীর্তি'র রমিজ, 'যুগলবন্দি'র আসগর, 'দোজখের ওম'-এর জালালউদ্দিন, 'খোঁয়ারি'র অমৃতলাল, 'প্রেমের গপ্পো'-এর জাহাঙ্গীর, 'কান্না'র আফাজ আলি— এরা সবাই কোনো-না-কোনোভাবে তাদের জীবনের কাছে পরাজিত, ক্ষয়ে যাওয়া মানুষ। কিছুই নেই তাদের সামনে যা নিয়ে গৌরব করা যায়। স্বপ্ন-প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তবতার মিলন তাদের জীবনে ঘটে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'উৎসব'-এর আনোয়ার মধ্যবিত্ত সংকীর্ণতায় আবদ্ধ মানুষ, উচ্চবিত্ত উজ্বল জীবনের ক্ষণস্থায়ী অভিজ্ঞতা ও উত্তেজনা তার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। নিজের ঘরবাড়ি, স্ত্রী সবই তার কাছে অশ্লীল হয়ে ধরা পড়ে। প্রায় অকারণে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সে। এ ক্ষোভ আসলে তার নিজেরই প্রতি। তার অক্ষমতা ও বিপন্নতা এবং জীবনের কাছে তার পরাজয় তাকে রক্তাক্ত করে তোলে। কিংবা 'প্রতিশোধ'-এর ওসমান তার বোনের প্রাক্তন স্বামী এবং হত্যাকারীর— যে তার প্রেমিকাকেও ছিনিয়ে নিয়েছে, তার ছোট ভাইকে করে রেখেছে বশংবদ প্রভুভক্ত কুকুরের মতো— বিরুদ্ধে প্রতিশোধ স্পৃহায় জ্বলে ওঠে, নানাভাবে প্রতিশোধ নেয়ার পরিকল্পনা করে কিন্তু কখনোই সেগুলো কার্যকর করা হয় না কিংবা করতে পারে না, কারণ সে উপলব্ধি করে— ব্যক্তিগত অক্ষমতা ও পরাজয় ও ব্যর্থতার দুর্বহ যন্ত্রণায় তার নিজের ভেতরেই জেগে উঠেছে আত্মহত্যার দুর্মর বাসনা, কারণ সে জানে— এই প্রতিশোধ নেয়ার যোগ্যতাটুকুও তার নেই। আবার 'প্রেমের গপ্পো'র জাহাঙ্গীর নবপরিনীতা স্ত্রীর কাছে বানিয়ে বানিয়ে তার প্রাক-বিবাহ বীরত্ব ও প্রেমের গল্প ফাঁদে, বউ তা উচ্ছ্বাস ও বিস্ময় নিয়ে শোনেও, কিন্তু আদৌ বিশ্বাস করে কী না বোঝা যায় না। কারণ শুনতে শুনতে সে কখনো-কখনো ঘুমিয়েও পড়ে! নিজের গৌরব প্রকাশে জাহাঙ্গীর খুবই পটু, যদিও তা বানোয়াট। এক সময় সে তার সংগীতপ্রিয় স্ত্রীকে আবিষ্কার করে সহপাঠী এক যুবকের সঙ্গে ক্রন্দনরত অবস্থায়, তাদের ওস্তাদের অসুস্থতাজনিত কারণে। জাহাঙ্গীরের ঈর্ষা নয়, কষ্ট হয়, কারণ ওদের উজ্জ্বল কিছু স্মৃতি আছে, কান্নার মতো একই বিষয়বস্তু আছে, নস্টালজিক হওয়ার মতো অভিন্ন ঘটনা আছে— তার এগুলোর কিছুই নেই— না অতীতের, না বর্তমানের। তার অতীত সাদা-কালো, সেখানে কোন রঙিন আলো নেই, তার বর্তমান বসের ধমক-খাওয়া বাস্তবতা, তার ভবিষ্যৎ গোধুলি-লগ্নের মতো ধূসর। স্ত্রী ও তার সহপাঠীর যৌথ-ব্যক্তিগত স্মৃতিকাতরতায় তার যেমন স্থান নেই, তেমনি নেই অন্য কারো সঙ্গে তার একান্ত যৌথ স্মৃতি। এমনকি কলেজে পড়ার সময় মেয়েদের 'সাউন্ড' দেয়ার দলেও সে ছিল নিতান্তই গৌণ সদস্য মাত্র। এক ম্রিয়মাণ, ক্লান্ত, একাকী মানুষ সে, কেবলই গড়িয়ে চলে জীবনের পথে— ঠিক তার মোটর সাইকেলের মতো।

'দুধভাতে উৎপাত'-এর জয়নাব— অসুস্থ-কাতরতায় যার ইচ্ছে জাগে ছেলেমেয়েদেরকে দুধভাত খাওয়ানোর, কিন্তু সেই স্বপ্ন তার কাছে সুদূরপরাহত হয়েই রয়ে যায়— যেখানে ভাতই জোটে না, দুধভাত সেখানে বিলাসিতারই নামান্তর। তাছাড়া তাদের কালো গাইটা ঋণের দায়ে পাচার হয়ে গেছে— দুধ তারা পায় কোথায়? পুরো গল্প জুড়ে দুধভাতের জন্য আহাজারি চলে— জয়নাবের মৃত্যু পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। তাদের আর দুধভাত জোটে না— জোটে প্রতিবেশী আত্মীয়ার জ্বাল দেয়া চালের গুঁড়ো, যা দেখতে খানিকটা দুধভাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতোই লাগে। ওই জিনিসের ওপরই হুমড়ি খেয়ে পড়া জয়নাবের ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েদের কীর্তিকলাপ দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে যেতে হয়। গল্প এমন ভয়াবহ বাস্তবতাকে এত সূক্ষ্মভাবে ধারণ করে কীভাবে? জয়নাবের ছেলেমেয়েদের দুধভাত খাওয়ানোর ইচ্ছেটাকে অপূর্ণ রেখেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়, আর তার বড়ো ছেলে অহিদুল্লাহ, সমস্ত ঘটনার প্রায়-নীরব দর্শক, নিজের ব্যর্থতায় ও ক্ষুধায় ও বিরক্তিতে ক্ষতবিক্ষত হয়।

'দখল'-এর ইকবাল তার অযোগ্যতা ও অক্ষমতা নিয়ে পিতার গৌরবময় অতীত সঙ্গে নিয়েও মানুষের স্বপ্নের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না, 'কীটনাশকের কীর্তি'র রমিজের প্রতিশোধ নেয়ার প্রচেষ্টা রক্তাক্ত বিফলতায় পর্যবসিত হয়, 'যুগলবন্দি'র আসগর অবশেষে কুকুরপ্রতিম জীবে পরিণত হয়; আর এইসব ক্লিষ্ট, বিপন্ন, পরাজিত, রক্তাক্ত মানুষ অতি নিপুণ কুশলতায় আর গভীর মমতায় চিত্রিত হয় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মেধাবী কলমে।

৭

ইলিয়াসের আরেকটি ভিন্নরকম গল্প 'পিতৃবিয়োগ'। বাবার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে ইয়াকুব এসেছে গ্রামে। জীবিতকালে পুত্রের সঙ্গে তার আচরণ ছিল সদা-গম্ভীর, একটি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন সবসময়। আবেগের প্রকাশকে তিনি ন্যাকামো মনে করতেন। ফলে এই এখন, তাঁর মৃত্যুর পর, ইয়াকুবের— 'চোখ দিয়ে অঝোরে পানি ঝরতে শুরু করলে ইচ্ছা হয় আব্বা বলে খুব জোরে একবার হামলে উঠি। কিন্তু জীবিত আশরাফ আলির গম্ভীর ও শীতল মুখের কথা ভেবে, তার আকাঙ্ক্ষিত পিতৃ-সম্বোধন দাঁত ও নোনা জিভের চাপে বেরিয়ে আসে ফোঁপানির মধ্যে।' কিন্তু স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে তার বাবা সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য ভেসে আসছে সেগুলো যেন কোনোভাবেই তাঁর জন্য প্রযোজ্য বলে মেনে নেয়া যাচ্ছে না। নানা ধরনের লোকজন মৃত মানুষটি সম্বন্ধে অবিরাম মন্তব্য করে যায়— 'তিনি ছিলেন মাটির মানুষ'— 'যে মানুষ সদাসর্বদা হাসিয়ে রাখতো, হাস্যরসে সর্বজনরে মাতিয়ে রাখতো, সেই কিনা সবারে কাঁদায়ে চলি গেলো।' — 'কী রসিক মানুষ একবার গল্পগুজব শুরু করলো তো রাত দশটাই কি আর বারোটাই কি?' কিন্তু এসব মন্তব্য ইয়াকুবকে ধাঁধায় ফেলে দেয়— 'এসব উক্তি কার সম্বন্ধে করা হচ্ছে? সামনে শোয়ানো কাফন-ঢাকা মৃতদেহে ভালো করে দ্যাখ্যা দরকার। ... না কোথায়? এসব লোক কি বলছে? বাবার সেই মুখ, সেই আটকানো ঠোঁট। সেই ঠান্ডা কপাল।'

ইয়াকুবের বাবাকে নিয়ে বিরামহীন স্মৃতিচারণ তবু চলতেই থাকে। তার চেনা বাবা আর এইসব লোকের বর্ণনাকৃত অচেনা মানুষটিকে নিয়ে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব চূড়ায় হয়ে ওঠে যখন সে এসব ফেলে নিজ কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামা তাকে 'কুলখানি সেরেই যা' বললে তার ভেতর থেকে এক অদ্ভুত প্রশ্ন বেরিয়ে আসে— 'কার?' কিংবা 'তোর বাবাকে এখানকার লোক খুব ভালোবাসতো।' শুনে তার প্রশ্ন— 'কাকে?' অর্থাৎ এখানকার লোক যাকে ভালোবাসতো তাকে সে চেনে না। এ এক আশ্চর্য পরিস্থিতি। —

> 'লোকজন কাকে ভালোবাসতো? বাবার মুখটা সম্পূর্ণ নিয়ে আসার জন্য ইয়াকুব আরেকটা এ্যাটেম্পট নিলো। গম্ভীর একজন লোক একবার হাতের নাগালে আসে তো আরেকজনের গ্লাস থেকে ঢালা মদের ছলকে সমস্ত গাম্ভীর্য মুছে যায়। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হাসিখুশি মুখ করে একটি বালিকার জন্য মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মাখে। দেখতে দেখতে ভাতের থালা তার সামনে থেকে সরে যায়, লোকটা চিঠি লিখতে বসে, তার টাইট মুখের নিচে ও তার শক্ত আঙুলের ঠিক তলায় বেরিয়ে আসে পিঁপড়ের সারি, তার ভ্রূর গেরো কঠিন হতে থাকে। এই পরিচিত লোকটিকে তার চোখের মণিতে এঁটে রাখবার জন্য ইয়াকুব মনোযোগী হতে না হতে নীলমনিগঞ্জে রেল এ্যাকসিডেন্টের খবরে কাঁদতে থাকা লোকটির চোখের জলে সব ধুয়ে যায়। না, কেউ থাকে না, দু'জনের একজনও নেই।' (পিতৃবিয়োগ/খোঁয়ারি)।

অতএব তার ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। পিতার সঙ্গে পুত্রের যে অনতিক্রম্য দূরত্ব, যে অচেনা দেয়াল মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে খুবই সহজলভ্য— এ গল্পটি তার এক অসাধারণ উপস্থাপন।

৮

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ইলিয়াসের যে একটা ভিন্নমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল— তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প পড়ে তা তীব্রভাবেই অনুভব করা যায়। পাঁচটি গল্পগ্রন্থ মিলে তাঁর এ ধরনের গল্পসংখ্যা মাত্র তিনটি হলেও এই তিনটিতেই মুক্তিযুদ্ধ পেয়ে গেছে এক ভিন্ন মাত্রা।

এই গল্পগুলোতে ইলিয়াস মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা শোনাননি, পাকিস্তানিদের হত্যা-ধর্ষণ-লুটপাট-নিপীড়নের অনুপুঙ্খ বিবরণ দেননি, মুক্তিযোদ্ধারা থেকেছে গল্পের নেপথ্যে, গল্পের প্রধান চরিত্রগুলো বরং যুদ্ধকালীন সময়ে দেশের ভেতরে রয়ে যাওয়া সেই কোটি কোটি হতভাগ্য জনতার প্রতিনিধি। প্রতিমুহূর্তের উৎকণ্ঠা, জীবনের অনিশ্চয়তা আর নির্যাতিত হওয়ার ভয় সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা যাদের বুকের খুব গভীরে স্বপ্ন আর গৌরব সৃষ্টি করে।

'অপঘাত' গল্পের বুলু যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছে। তার মায়ের এ নিয়ে বিলাপের শেষ নেই— 'হামার বুলু কোটে কার গুলি খায়া মুখ থুবড়্যা পড়্যা মলো গো, ব্যাটার মুখকোনো হামি একবার দেখবারও পারলাম না গো! হামার বুলুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরে গজব পড়ে কিসক গো? বুলু অপঘাতে পরে কিসক গো?' এ নিয়ে বুলুর বাবা মোবারক আলির বিরক্তিও সীমাহীন। এমন করে কাঁদলে যদি 'মিলিটারি' এসে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করে, সে কী বলবে? গল্প এগিয়ে চলে, ইলিয়াস তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ডিটেইল বর্ণনায় সময়টিকে বর্ণনা করতে থাকেন এবং গল্পের শেষদিকে এসে আমরা দেখি— পরিস্থিতি পাল্টে যাচ্ছে, মোবারক আলি তার পুত্রের কার্যকলাপ গৌরব মেখে বলা শুরু করেছে এবং গল্পের একেবারে শেষে বুলুর মা তাকে নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলে— 'তার জন্য স্ত্রীর এই দুশ্চিন্তা দেখে মোবারক আলি বিরক্ত হয়। যার ছেলে মারা গেছে মাস দুয়েকও হয়নি, সেই মা অন্য কারণে উতলা হয়ে কিভাবে? সন্ধ্যার পর ছেলের জন্য হামলে কেঁদে মা যদি সারা গ্রাম মাথায় না তুললো তো বুলু এরকম মরা মরতে গেছে কোন দুঃখে?' শেষ পর্যন্ত তাহলে গৌরবটাই বড় হয়ে ওঠে! 'ছেলের জন্য হামলে কেঁদে সারা গ্রাম মাথায়' তোলার অর্থ তো শুধু কান্না নয়— এ তো সবাইকে ছেলের গৌরবকীর্তি জানিয়ে দেয়া। জানিয়ে দাও তোমার সন্তান যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছে, জানাও তোমার সন্তানের প্রাণ অনর্থক ব্যয়িত হয়নি।

এই গৌরববোধ আমরা দেখতে পাই 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদার মধ্যেও। তার শ্যালক মিন্টু মুক্তিযুদ্ধে গেছে— 'বৌয়ের এই ভাইটার জন্য তাকে এক্সট্রা তটস্থ হয়ে থাকতে হয়।' গল্পের প্রথমদিকে সে যথারীতি ভীতু, অংশগ্রহণহীন। এমনকি মিন্টুকে নিয়ে তার বউয়ের 'এরকম বাড়াবাড়ি একদম পছন্দ নয়।' মিন্টুর রেইনকোট পরেও তার ভয় কাটে না। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, তার পরিবর্তন আসছে অতি সন্তর্পণে। গল্পের শেষে পাকিস্তান আর্মির হাতে ধরা পড়ে সে এবং তার সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যোগাযোগ আছে এই অভিযোগে ভীষণ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। অবাক হয়ে লক্ষ করি, তার ভেতর থেকে ভয়-ভীতি উধাও হয়ে গেছে। 'মিসক্রিয়েন্ট'দের সঙ্গে তার আঁতাতের অভিযোগে সে দারুণ গৌরাবান্বিত।

> 'বৃষ্টির মতো চাবুকের বাড়ি পড়ে তার রোইনকোটের মতো চামড়ায় আর সে অবিরাম বলে চলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তার জানা আছে। শুধু তার শালার নয়, তার ঠিকানা জানার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নাই, সে ছদ্মবেশীর কুলিদের আস্তানাও চেনে। তারাও তাকে চেনে এবং তার ওপর তাদের আস্থাও কম নয়। তাদের সঙ্গে তার আঁতাতের অভিযোগ ও তাদের সঙ্গে তার আঁতাত রাখার উত্তেজনায় নুরুল হুদার ঝুলন্ত শরীর এতটাই কাঁপে যে চাবুকের বাড়ির দিকে তার আর মনোযোগ দেওয়া হয়ে ওঠে না।' (রেইনকোট/ জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মিসক্রিয়েন্টদের' সঙ্গে আঁতাতের অভিযোগই যাকে এতটা উদ্দীপ্ত ও উত্তেজিত করে তোলে তার খুব গভীরে কি ওই 'মিসক্রিয়েন্ট' হওয়ার স্বপ্ন ছিল না? হতে পারেনি— হয়তো সাহসের অভাবে, বা মায়াময় বন্ধনগুলো অস্বীকার না করতে পেরে, অথবা যে ধরনের মানুষ সব ঘটনায়ই অংশগ্রহণহীন থাকে সে সেই ধরনের বলে। তবু তার মধ্যে রয়েছে এক গভীর মমত্ববোধ— ওই 'মিসক্রিয়েন্ট'দের জন্যই, রয়েছে তাদের জন্য এক অসাধারণ গৌরববোধ, রয়েছে তাদের নিয়ে এক গভীর স্বপ্ন।

'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' গল্পের লালমিয়াও যুদ্ধের সময় ছিল পক্ষপাতহীন। তার মালিক রাজাকার নাজির আলির 'মিসক্রিয়েন্টরা কিছুই করতে পারবে না' এই ভাষ্যও যেমন সে বিশ্বাস করতো, তেমনই তার বন্ধু মুক্তিযোদ্ধা ইমামুদ্দিনের তেজি স্বপ্নের কথাবার্তাগুলোও বিশ্বাস করতো অথবা দুটোর কোনোটিই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি কোনোদিন, কেবল দ্বন্দ্বে ভুগেছে। পুরো যুদ্ধের সময়কালে সে ছিল এক অদ্ভূত চরিত্র, অংশগ্রহণ ছিল না, চারদিকের ঘটনাগুলো তাকে কেবল আলোড়িত করে গেছে। রাজনীতি সে বোঝে না, যুদ্ধের কারণ তার জানা নেই, এর ফলাফল সম্বন্ধেও সুনির্দিষ্ট কোনো ধারণা করতে অপারগ সে। যথারীতি যুদ্ধ শেষ হয়, ইমামুদ্দিন শহীদ হয়, নাজির আলী পালিয়ে যায় ও আত্মগোপন করে অজানা জায়গায়। এই পরিস্থিতিও পাল্টে যায় একসময়, নাজির আলি যথারীতি ফিরে আসে সগর্বে-সদর্পে। নিজের স্থানটি পুনরুদ্ধার করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না তার। এরকমই একটি সময়েই লালমিয়া স্বপ্ন দ্যাখে 'পাওয়ের পাতা দুইখান পিছন দিকে' এমন একজন মানুষকে। সেই স্বপ্নের বর্ণনা সে দিচ্ছে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ইমামুদ্দিনের ছেলে বুলেটকে— যুদ্ধের সময় যার জন্ম। বুলেট বড়ই সন্দেহপ্রবণ, লাল মিয়ার স্বপ্ন বৃত্তান্ত সে আগাগোড়া শুনলেও প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত রাখে। হয়তো স্বপ্নে তার বাবার দেখা মিলেছে কী না সে তারই সন্ধান করে, কিন্তু অচিরেই সে বুঝতে পারে ঐ 'উল্টা ফিট করা পাওয়ালা' লোকটি নাজির আলিই। সে নিজেই এবার স্বপ্ন দ্যাখে এবং চেনা-অচেনা 'উল্টা পাওয়ালা' লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে—

> 'আচ্ছা হুজুররা, বহুত দিন তো হইয়া গেল, আপনেরা আপনাগো পাওগুলি মেরামত করেন না ক্যালায়?... এই কথায় তারা খুব রেগে বুলেটের দিকে এগিয়ে এল। কিন্তু পায়ের পাতা তাদের পেছন দিকে থাকায় তারা যতই হাঁটে বুলেটের কাছ থেকে ততই সরে যায়। তারা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হওয়ার আগেই ঘুমের মধ্যেই বুলেট গড়িয়ে পড়ে অন্য স্বপ্নে। এখানে সে নিজেকে দেখতে পায় হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশনের উঁচু ছাদের ওপর। নিমেষের মধ্যে সে নিজেকে আর আলাদা করে দ্যাখে না, বরং নিজেই দ্যাখে নিচে অনেক মানুষ।... লালচে ফর্সা মুখ থেকে দুধের নহরের মতো দাড়ি এবং দুধের ধারায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু ঘিয়ে রঙের আলখাল্লা ঝুলিয়ে তার চেনা লোকটি দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা জাফরি-কাটা দেয়ালের পাশে। এই লোকটার নেতৃত্বে ওল্টানো পা-ওয়ালার একটি পার্টি বুলেটে দিকে তেড়ে এসেছিল, সেটা স্বপ্নে না জাগরণে, সেটা কোন জায়গায়, সেটা কবে এর কিছুই মনে করতে না পারলেও তার একটুও উদ্বেগ, এমনকি উত্তেজনাও হয় না। লোকটির পায়ের পাতাজোড়া মেরামত করতে হলে ওগুলো আগে ফেলে দেওয়া দরকার— এই বিবেচনায় বুলেট ওদিকে কী ছুঁড়বে তাই নিয়ে বেশ ভাবনায় পড়ে। সে তার প্যান্টের এ পকেট হাতড়ায়, ও-পকেট হাতড়ায়, কিছুই নেই দেখে ভাবনা আরও বাড়ে। এই রকম ভাবতে ভাবতে তার বড্ডো পেচ্ছাব চাপে। ... একরকম বাধ্য হয়েই বুলেট ছাদ থেকে হলুদ প্রস্রাবের ধারা বইয়ে দেয় নিচের দিকে। এর মধ্যেই সে তাগ করেছে গাল থেকে দুধের নহর বইয়ে দেওয়া ঘিয়ে রঙের আলখাল্লাওয়ালার ওল্টানো পায়ের পাতা। ...তার তীব্র বেগ হয়তো সন্তোষজনক ছিল, কিন্তু ওল্টানো পায়ের পাতা তার প্রস্রাবের ঝাঁঝ আঁচ করতে পেরে জাফরি-কাটা দেওয়াল টপকে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়েছে তাদের অদৃশ্য আখড়ার ভেতরে'। (জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল/জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল)।

এই ওল্টানো পায়ের পাতাওয়ালা লোকগুলোকে চিনে নিতে পাঠকের কষ্ট হয় না যেহেতু চেনা লোকটিকে বুলেট নিজেই চিহ্নিত করতে পেরেছে নাজির আলি হিসেবে। এদের পায়ের পাতা ওল্টানো— এরা তাই যতই সামনে হাঁটতে চায়, পারে না, পেছন দিকেই ধাবিত হয়। অনেক দিন হয়ে গেছে তারা তাদের 'পাওগুলি' 'মেরামত' করেনি— আজও তারা পশ্চাৎপদ, হিংস্র, বন্য। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে হানাদার পাকিস্তানিদের সহযোগী এদেশীয় হিংস্র রাজাকারদের এ এক চমৎকার প্রতীকী উপস্থাপন। কিন্তু এদেরকে 'মেরামতের' উপায় কি? বুলেট, এক শহীদের সন্তান, তার প্রস্রাবকেই এ কাজের জন্য উপযুক্ত মনে করেছে। এবং লক্ষ না করে উপায় থাকে না যে সে উঠে বসেছে হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশনের উঁচু ছাদের ওপর এবং নিচের জড়ো হয়েছে ওই লোকগুলো। তার চেনা লোকটি আবার দাঁড়িয়ে আছে একটি জাফরি-কাটা দেয়ালের কাছে। ওই নির্দিষ্ট স্থানটিতে কারা জড়ো হয়, আমরা জানি, বুলেট তাদেরকে টার্গেট করে প্রস্রাব করে কিন্তু তারা 'প্রস্রাবের ঝাঁঝ আঁচ করতে পেরে জাফরি কাটা দেয়াল টপকে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়েছে তাদের অদৃশ্য আখড়ার ভেতর'। তাদের ওই আখড়া থাকায় তারা পালাবার জায়গা পায় এবং বুলেটদের টার্গেট মিস হয়ে যায়। কিন্তু এ নিয়ে বুলেটের দুঃখও কম নয়। ফের স্বপ্নটি দেখার ইচ্ছায় সে দাদির শিখিয়ে দেয়া পদ্ধতি অনুসরণ করে বালিশ উল্টিয়ে শোয়। ডানদিকে ফিরে এবং বালিশ উল্টিয়ে শুলেই স্বপ্নটি ফের দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে। সে এই দুটো বিষয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি পূরণ করলেও আরেকটি করতে পারে না। ফলে আমরা বুঝতে পারি— তার ফের স্বপ্ন দেখাটা অনিশ্চিত হয়ে গেছে, 'টার্গেট ফুলফিল' করাটাও।

এ তো আমাদের এ সময়েরই চিত্র। আমরা ওদেরকে 'মেরামতের' জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারছি না— পরিস্থিতি যেন এরকমই। তবু আমাদের স্বপ্ন তো থেমে থাকে না। 'মেরামত' করার অভিপ্রায়ে আমরা ফের প্রস্তুতি নেয়ার স্বপ্ন দেখি, বুলেট যেমন নিয়েছিল।

৮

প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অন্য ঘরে অন্য স্বর'-এর প্রথম গল্প 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় আমরা অন্য এক ইলিয়াসকে আবিষ্কার করি, আমাদের চেনা ইলিয়াসের সঙ্গে যাঁর দূরত্ব অনেক। আত্মজৈবনিক ধরনের গল্পটিকে তাঁর কোমল হৃদয়টি ধরা পড়েছে। এই গল্পের কথা না বললে ইলিয়াস সম্বন্ধে কথা বলা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এটি তাঁর প্রথম জীবনের রচনা। একটি অসাধারণ পংক্তি দিয়ে গল্পটি শুরু হয়— *এই মনোরম মনোটোনাস শহরে অনেকদিন পর আজ সুন্দর বৃষ্টি হলো*। এটি কি কোনো গল্পের লাইন, নাকি কবিতার? *মনোরম* আর *মনোটোনাস* এই দুই আপাত বিরোধপূর্ণ শব্দের সহাবস্থান এই প্রশ্নের জন্ম দেয় বৈকি। কবিরা এমন লিখতে পারেন, লেখেনও, কবিতার অ্যালিগরি বলে একটা ব্যাপার আছে, কিন্তু কোনো গদ্যকার কি সচেতনভাবে এমনটি লিখবেন? লিখলে— একটি শহর কীভাবে একইসঙ্গে মনোরম এবং মনোটোনাস হয়— গল্পকারকে এরকম প্রশ্নে জর্জরিত হতে হবে। গল্পকাররা নানাদিক থেকেই দুর্ভাগ্যবান— পাঠকরা তাদের এতটুকু ত্রুটিও (!) ক্ষমা করে না। গদ্যের জন্য কাব্যিক ভাষাকে রীতিমতো নিন্দার চোখে দেখা হয় এদেশে, যেন গদ্যকে আবশ্যিকভাবে কাঠখোট্টা হতে হবে! কিন্তু ওই একই গল্পের আরও কয়েকটি পঙক্তি পড়ে নিতে পারি আমরা—

> এই মনোরম মনোটোনাস শহরে অনেকদিন পর আজ সুন্দর বৃষ্টি হলো। রাত এগারোটা পার হয় হয়...আমার জানলায় রোদন-রূপসী বৃষ্টির মাতাল মিউজিক, পাতাবাহারের ভিজে গন্ধভরা সারি, বিষাদবর্ণ দেওয়াল; অনেকদিন পর আজ আমার ভারি ভালো লাগছে।...ছমছম করা এই রাত্রি, আমারি জন্যে তৈরি এরকম লোনলী-লগ্ন আমি কতোদিন পাইনি, কতোকাল, কোনোদিন নয়। বৃষ্টি-বুনোট এইসব রাতে আমার ঘুম আসে না, বৃষ্টিকে ভারি অন্যরকম মনে হয়, বৃষ্টি একজন অচিন দীর্ঘশ্বাস। এইসব রাতে কিছু পড়তে পারি না আমি, সামনে বই খোলা থাকে, অক্ষরগুলো উদাস বয়ে যায়, যেনো অনন্তকাল কুমারী থাকবার জন্যে একজন রিক্ত রক্তাক্ত জন্মদান করলো এদের। চায়ের পেয়ালায় তিনটে ভাঙা পাতা ঘড়ির কাঁটা হয়ে সময়কে মন্থর কাঁপায়। ষাট পাওয়ারের বাল্বে জ্বলছে ভিজে আলো, আর চিনচিন করে ওঠে হঠাৎ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> কতোদিন আগে ভরা বাদলে আশিকের সঙ্গে আজিমপুর থেকে ফিরলাম সাতটা রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনে, 'তুই ফেলে এসেছিস কারে', সেই সোনার শৈশবে ভুল করে দ্যাখা একটি স্বপ্ন, স্বপ্নের মতো টলটল করে। আমার ঘুম আসে না, আলোর মধ্যে একলা জেগে রই।... (নিরুদ্দেশ যাত্রা / অন্য ঘরে অন্য স্বর)।

মনে কি হয় না, একটি কবিতা পড়ছি? মনে কি হয় না, যেন কোথাও থেকে বিষণ্নতা ঝরছে? মনে কি হয় না, যেন এইমাত্র একটা কথাহীন অব্যাখ্যাত সুর শুনে উঠলাম? এই পঙক্তিগুলো পড়ে মনে কি হয় না যে, এই ইলিয়াসকে আমরা চিনি না? গল্পটি নিয়ে আরও এগিয়ে গেলে আমাদের সঙ্গে রঞ্জুর পরিচয় হয়— এক বিষণ্ন একাকী যুবক, খানিকটা অস্বাভাবিক, হয়তো ব্যাখ্যহীন কোনো অসুস্থতায় আক্রান্ত। ইলিয়াস যেন অচেনা এক আবেগে লিখে গেছেন গল্পটি। 'রঞ্জু'— গল্পের এই হৃদয়গ্রাহী চরিত্রটি আবেগপ্রবণ, স্মৃতিকাতর, একা ও অস্বাভাবিক— আমাদের মমতা কেড়ে নেয়। মধ্যরাতে তার মনে হয়, 'আম্মার ঘরে কী যেনো ফেলে এসেছি।' কিন্তু কী ফেলে এসেছে, তা আর মনে করতে পারে না। ঘুম আসে না বলে বাইরে বেরোয় সে, ওই মধ্যরাতেই, নতুন একটি চরিত্র আবার তাকে স্মৃতিরও অতীত দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিতে চায়। পুরো গল্প জুড়ে এই 'জন্ম-ক্লান্ত' রঞ্জুর স্মৃতি-কাতরতা টের পাওয়া যায়, সে হেঁটে চলে অচেনা গন্তব্যের দিকে। এবং গল্পের শেষে তার মৃত্যু-দৃশ্য যেন তার গন্তব্যটিকে স্পষ্ট করে তোলে। আমরা এগিয়ে চলি, তার মতো আমরাও বিষণ্ন হতে থাকি, একা হতে থাকি, আর পড়া শেষ হয়ে গেলে মনে হয়— একবার পড়ে এই গল্পটি বোঝা হয়ে উঠলো না। আবার পড়ার জন্য হাত বাড়াই, আবারও বিষণ্ন হই, কখনো হয়তো চোখের কোণ ভিজেও ওঠে, কিন্তু এবারও মনে হয়— আবার পড়তে হবে এই গল্প। কোনো-কোনো কবিতা মানুষ ফিরে ফিরে পড়ে, বহুবার পড়ে, হয়তো সাধ মেটে না বলেই পড়ে কিংবা সেটি তার সূক্ষ অনুভূতিকে আরও তীক্ষ্ণ করে তোলে বলে পড়ে। কিন্তু গল্প? কোনো গল্প কি একই পাঠকের কাছে বহুবার পঠিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে? সাধারণত করে না। যেটি করে সেটি উজ্জ্বলভাবে ব্যতিক্রম— 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' সেই ধরনের গল্প। কী হলো রঞ্জুর, কী হলো— এই ভাবনায় আক্রান্ত হয়ে আমরা ইলিয়াস ঘাঁটি এবং বহুদিন পর তাকে পেয়ে যাই চিলেকোঠায়। সেই একইরকম— বিষণ্ন ও একাকী। অসুস্থ ও চলমান জীবনে অংশগ্রহণহীন। অবশেষে তাকে হাড্ডিখিজিরের দেখানো পথে হারিয়ে যেতে দেখলে আমরা আবারও তার পরিণতি জানার জন্য ইলিয়াস হাতড়াই এবং দেখি তাঁর শেষ উপন্যাস 'খোয়াবনামা'য় এই রঞ্জুই তমিজের বাপ হয়ে উপস্থিত হয়েছে। দেখি, ইলিয়াস বারবার রঞ্জুর কাছে ফিরে এসেছেন। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রঞ্জু, 'চিলেকোঠার সেপাই'-এর ওসমান আর 'খোয়াবনামা'র তমিজের বাপ— এই তিনজন আসলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই চরিত্র, তিনজনই খানিকটা অস্বাভাবিক, অসুস্থই বলা চলে, তিনজনই ঘোরগ্রস্ত, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সম্পর্কহীন নিষ্ক্রিয় মানুষ। তিনজনের পরিণতিও এক— অস্বাভাবিক মৃত্যু। আমাদের চারপাশেই এমন কিছু মানুষ আছে যারা বাস্তবতার মধ্যে বাস করে না, করে ফ্যান্টাসি বা কল্পনার জগতে, সমাজে থেকেও এই লোকগুলো জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, ইলিয়াস তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেননি, এমনকি বিদ্রুপও করেননি তাদের নিয়ে, যেমন করেছেন মধ্যবিত্তদের, বরং তাদের প্রতি তাঁর এক গভীর সহানুভূতি টের পাওয়া যায়। যে রঞ্জুকে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর প্রথম জীবনে, তাকেই ফিরিয়ে এনেছিলেন ওসমান এবং তমিজের বাপের মধ্যে। আমার অনেক বার এ-কথা মনে হয়েছে যে, ওসমান ও আনোয়ার একই চরিত্রের এপিঠ-ওপিঠ, কিংবা তমিজ ও তমিজের বাপও একই চরিত্রের এপিঠ-ওপিঠ— একজন নিঃসঙ্গ, অসহায়, নৈরাশ্যপীড়িত, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ; আরেকজন সক্রিয়, আশাবাদী, সমকালের আয়োজন ও প্রয়োজনের সঙ্গে একাত্ম। একজন মানুষের মধ্যে যে একইসঙ্গে পরস্পরবিরোধী মানুষ বাস করে— এইসব স্প্লিট পার্সোনালিটি নির্মাণ করে ইলিয়াস হয়তো সেটিই বলতে চেয়েছেন।

উপসংহারের পরিবর্তে

এই দুর্বিনীত কাল, এই ক্ষয়ে যাওয়া মূল্যবোধ, এই ধসে পড়া সমাজে স্বপ্ন দেখাও যেন ধৃষ্টতা। তবু আমাদের আর কী-ই বা আছে স্বপ্ন ছাড়া? সময়ের চেয়েও দুর্বিনীত হয়ে খুঁজে নিতে পারি অমল স্বপ্ন, এ ছাড়া বেঁচে থাকার আর কোনো উপাদানই যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বেঁচে থাকার জন্যই আমাদেরকে খুঁজে নিতে হয় স্বপ্ন, তৈরী করতে হয় নানারকম কৌশল। ইলিয়াসের গল্পে আমরা তাই জীবনের প্রতি এক আগ্রাসী প্রেমকেই বড়ো হয়ে উঠতে দেখি। তাঁর গল্পে মানুষ উপস্থাপিত হয়েছে তার সমস্ত বেদনা ও হাহাকার ও পরাজয় ও অনিশ্চয়তা নিয়ে, তবু তাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই বেঁচে থাকার এক অমোঘ প্রেরণা।

'অসুখ-বিসুখ' গল্পের আতমন্নেসার হা-হুতাশ, ক্ষোভ ও বেদনা কিংবা অতীত জীবনের টুকরো দু-একটা সুখের স্মৃতিচারণ আমাদের জানিয়ে যায়, মানুষ যে-কোনো মূল্যে— হোক সে পরাজিত, অনুজ্জ্বল, ব্যর্থ, নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ— বেঁচে থাকতে চায়। আনোয়ার তাই কুকুরের সঙ্গম লীলা দেখে উদ্দীপ্ত হয়—জীবনবোধে তাড়িত হয়ে স্ত্রীকে 'আমার শেলী' বলে জড়িয়ে ধরে; ওসমান শেষ পর্যন্ত প্রতিশোধ নিতে না পারলেও আত্মহত্যার সম্ভাবনা থেকে পলিয়ে আসে, আতমন্নেসা তার মেয়ের জন্য আনা অচেনা ওষুধ খেয়ে ফেলে, আসগর একটি উজ্জ্বল জীবন-যাপনের কল্পনায় নিজেকে একটি প্রায় প্রভুভক্ত কুকুরে পরিণত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতেও দ্বিধা করে না। এসবই ঘটে তাদের বেঁচে থাকার তীব্র স্পৃহা ও প্রেরণা থেকে।

আর তাই 'দোজখের ওম' গল্পের বৃদ্ধ কামালউদ্দিন ক্লান্তি-জরা-ব্যাধি ইত্যাদি নিয়ে সারা গল্পজুড়ে মরে যাওয়ার তীব্র আকুতি প্রকাশ করলেও গল্পের শেষে— 'বাচুম না ক্যালায়? ঠোঁট, জিভ ও গলার সচল ও অচল ও নিমচালু করাগুলো জোড়াতালি দিয়ে কামালউদ্দিন একটি লালা-বলকানো হুংকার ছাড়ে, 'তর চাচারে কইস, দাদায় অহন তরি বাইচা আছে'। — এই হুংকার তার বেঁচে থাকার অহংকারকেই তীব্রভাবে মূর্ত করে তোলে। শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকাটাই গৌরবের ও অহংকারের। জীবনের অর্থ স্বয়ং জীবনই, এর ভিন্নতর কোনো অর্থ নেই। হাজারও বিপন্নতা ও সীমাবদ্ধতা, কষ্ট ও হাহাকার, জরা-ব্যাধি, পরাজয় ও অক্ষমতা সত্ত্বেও ইলিয়াসের চরিত্রগুলো তাই জীবনের পক্ষে তাদের তীব্র আকুতি প্রকাশ করে। এই আকুতিই মানুষকে টেনে নিয়ে যায় নানারকম আয়োজনের মধ্যে, আনন্দের মধ্যে, সুখ-স্বপ্ন ও প্রত্যাশার মধ্যে।

ইলিয়াসের গল্পের মানুষ বরাবরই চিত্রিত হয়েছে তাদের সমাজকাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে। এই দমবন্দ করা অমানবিক-নির্দয়-হৃদয়হীন সমাজ-কাঠামোর মধ্যে হাসফাঁস করা মানুষের নির্মম ও সম্ভাবনাহীন, স্বপ্ন ও কল্পনাহীন জীবন-যাপনের নিপুণ চিত্র পাঠককে জানিয়ে দেয়— এই সমাজ-ব্যবস্থা, এই রাষ্ট্রকাঠামো কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু কোনটি কাম্য বা গ্রহণযোগ্য ইলিয়াস তাঁর পাঠককে সে বিষয়ে কোনো উপদেশ দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে শিল্পের সীমানা মেনে তিনি পাঠককেই দায়িত্ব দেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের। এই স্বপ্ন-সম্ভাবনাহীন, ক্ষয়ে যাওয়া, ক্লান্ত, বিপন্ন, পরাজিত, ক্লিষ্ট মানুষকে একটি মানবিক ও উজ্জ্বল জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারে একটি বৈষম্যহীন মানবিক সমাজ, ইলিয়াস না বললেও তাঁর গল্প পাঠ করে এ কথাটি বুঝে নিতে পাঠকের কোনো অসুবিধাই হয় না।

রচনাকাল : অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯৫
প্রথম প্রকাশ : ২৭ জুন, ১৯৯৬, দৈনিক সংবাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মান্নান সৈয়দ : অন্তর্লোকে সাফল্যবিহার

প্রাককথন

সব্যসাচী লেখক আবদুল মান্নান সৈয়দ। সাহিত্যের প্রায় সমস্ত শাখায়— কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, সমালোচনা সাহিত্য— তাঁর অবাধ-প্রবল-প্রচুর বিচরণ আগ্রহী পাঠকের মুগ্ধ ও বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষত গল্প ও সমালোচনা সাহিত্যে তাঁর সাফল্য তুঙ্গ স্পর্শ করেছে।

ষাটের দশকের কথাশিল্পীদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'সমাজ-বাস্তবতার' নির্মাণ। তবে আবদুল মান্নান সৈয়দ এর ধারে-কাছেও যাননি। তাঁর গল্প ধ্রুপদী মাত্রা পেয়েছে মানুষের অন্তর্লোক চিত্রায়ণের কুশলী সফলতায়। মানবমনের বহুবিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূক্ষ্ম চিত্রণে তার তুলনা মেলা ভার। মানুষকে তিনি তুলে এনেছেন তার অন্তর্লোকের পরিপ্রেক্ষিতে, তার সমস্ত আকুলতা-আকুতি, আবেগ-আবেশ, বিস্ময়-বিভিন্নতা, ভয়-ভাবনা আর এসবের অদ্ভুত-অসাধারণ ব্যাখ্যাসহ। পাঠক তাঁর লেখায় খুঁজে পান তার নিজের বহুবিচিত্র মনোভঙ্গির অচেনা ব্যাখ্যা; তার সামনে খুলে যায় এক নতুন পৃথিবী। সে পৃথিবী তার অন্তর্গত কামনা-বাসনার, চিন্তা-চেতনার, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার।

গল্পপ্রসঙ্গ

আবদুল মান্নান সৈয়দের গল্পগুলোর দিকে তাকালে গল্পের ভাষা, আঙ্গিক ও বিষয়-ভাবনার বহুমুখীনতায় মুগ্ধ হতে হয়। দু-একটি উদাহরণ দেয়া যাক।

'মাতৃহননের নান্দিপাঠ' গল্পের আতিকুল্লাহ—

> দর্শনের একজন দারুণ ছাত্র, বুদ্ধিজীবীদের মতোই যার মুখ লম্বাটে, চোখ স্বপ্নিল, যে চোখ অযুত গ্রন্থের চোরাবালি অতিক্রম করে জ্ঞান নামক বিদেহী সমুদ্রে ভাসছে সারাক্ষণ, কৃশ দীর্ঘ শরীর। (মায়ের স্নেহের আধিক্যে-অত্যাচারে অতিষ্ট সে, কারণ)— যেখানেই আমি যাই দু'টি নির্নিমেষ চোখ পিছনে ছুটছে, পিছলে পড়ছে না একবারো, সরে যাচ্ছে না, এমনকি পলক ফেলছে না কখনো, যেন মানুষের চোখ নয়। মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> অবশ্য, তবু মানবীয় নয়। দানবীয় এক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে সে...আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে মৃত্যুর অভিমুখে, কবর পর্যন্ত আমাকে পৌঁছিয়ে না দিয়ে শান্তি নেই তার।... অবিচ্ছিন্ন এই যন্ত্রণা আমার গা বেয়ে উঠলো চূড়ান্ত পর্যায়ে, যখন দেখলাম আমার আর রিনার ভেজানো দরজায় আঁকা আছে দু'টি ভয়াবহ রকমের শান্ত চোখ।...তাই মা-র ভালোবাসা আমার পক্ষে অমনই ভীষণ, অমনই নিঃস্বপ্ন যন্ত্র।

এরকম ভয়ানক যন্ত্রণায় কাতর হয়েও সে নিজেকে বোঝায়— সে যেহেতু মায়ের একমাত্র সন্তান এবং মাত্র আটাশ বছর বয়সে বিধবা হলেও তিনি আবার বিয়ে করেননি কারণ এতে সন্তানের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে— তার এই আচরণ অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু বুঝেও সে কিছুতেই মায়ের ওই 'নির্মম' মমতামিশ্রিত উৎকণ্ঠা মেনে নিতে পারে না, কারণ এতে তার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও মানসিক শান্তি চূড়ান্তভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অতএব—

> আমার একসময় মনে হলো, এমন হয় না যে ঐ শীতল মুখটার ভিতর থেকে লকলকে ছুরির মতো বেরিয়ে পড়ে জিভ, মার্বেলের মতো চোখের মনি দু'টি ঠিকরে বেরিয়ে আসে।

কতটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লে একজন যুবক তার মায়ের সম্বন্ধে এরকম ভাবতে পারে তা নিশ্চয়ই অনুমান করা যায়! আর তাই, অবশেষে, সে মাতৃহত্যার সিদ্ধান্ত নিলে আমাদের বিস্মিত হওয়ার উপায় থাকে না। কিন্তু যেহেতু সে যুক্তিবাদি, তাই এই হত্যাকার্য সম্পাদন করার জন্য সত্যিকার অর্থেই একটি গভীর যুক্তি বা কারণ খুঁজে পেতে চায়, আর তাতে পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। সে মায়ের ঘরে একটি লোককে বসে থাকতে দেখলে আর এতে মা বিব্রত ও আরক্তিম হয়ে উঠলে তার মনে পড়ে— এর আগেও সে এ ঘরে আধপোড়া সিগারেটের টুকরো দেখেছিল। তার মানে, লোকটি নিয়মিতই এখানে আসে! ঘটনাটি তার মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অথচ বিষয়টি নিয়ে নিজের মুখোমুখি দাঁড়ালে মায়ের এই আচরণকে সে যুক্তিহীন কিংবা অস্বাভাবিক বলে ভাবতে পারে না, বরং মায়ের দীর্ঘকালীন অবদমিত কামনা কোনো-না-কোনো সময় যে জেগে ওঠা স্বাভাবিক— এই সত্য অনুধাবন করে সে আরও বেশি মুষড়ে পড়ে। সে বুঝতে পারে— মায়ের এই আচরণ তার ভেতরে জন্ম দিয়েছে ঘৃণা, বেদনা ও আক্রোশ যা তার নিজের কাছেই যুক্তিহীন ও কারণহীন বিদ্বেষপ্রসূত বলে মনে হয়! অতএব এই কারণটি মাতৃহত্যার মতো জটিল একটি বিষয়কে তরান্বিত করতে পারে না। তার মানসিক দ্বন্দ্ব চূড়ান্তে পৌঁছায়, অনুভব করে ওঠে, মায়ের ভালোবাসায় সে পীড়িত বোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেও তার মনোযোগে অন্য কারো অংশীদারিত্বও অসহ্য বোধ হচ্ছে। সে নিজেকেই বলে—

> আসলে তুমি এমন প্রকৃতির লোক, যে মাকে কষ্ট দিয়ে চিরকাল আনন্দ পাবার চেষ্টা করে। কে তাহলে শয়তান? হয়তো তোমার মনোভাব আরও গর্হিত; মা-র মুখ্য মূলধন আবেগ, নানা আকারে তোমার কাছেই পৌঁছে যেতে থাক সারাজীবন— এই তোমার ইচ্ছা অথচ বদলে তুমি দিয়ে যাবে শুধু উপেক্ষা।

গল্পের শেষের দিকে আতিকুল্লাহ মাতৃহননের যৌক্তিক কারণটি খুঁজে পায়, যা তার দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ অন্তর্লোকের অতি-বিচিত্র চিন্তাভাবনার একটি ধ্রুপদী চিত্র হিসেবে পাঠককে নাড়া দিয়ে যায়। আমরা দেখতে পাই দ্বন্দ্বমুখর এই যুবকটি— যে সবকিছুর একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে চায়, যে প্রতিটি বিষয়েই নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকেই প্রশ্নবানে ক্ষতবিক্ষত করে, রক্তাক্ত করে তোলে নিজের হৃদয়কেই, নিজেকেই বলছে—

> নিজেকে তুমি কিছুতেই আর-দশজনের সঙ্গে মেলাতে পারো না, কি ক'রে লোকে এত সামান্য কারণে হাসতে পারে, ছোটো বিষয় নিয়ে মেতে ওঠে হিংসার প্রতিযোগিতায় তুমি তা ভেবে পাওনা – এ নিয়ে মনে হেসেছোও যেমন তেমনি দুঃখ আছে তোমার: কেন তুমি আর দশজনের মতো হ'লে না, বেলেল্লা হল্লায় মেতে থাকতে পারলে না আজীবন।

মাকে হত্যা করার কারণটি আমরা এই জটিল যুবকের বুকচেরা দীর্ঘশ্বাস থেকে জানতে পারি এভাবে—

> অন্তরে-অন্তরে যেহেতু নিশ্চয়ই আমি জানি, আমি একজন অস্বাভাবিক প্রকৃতির মানুষ—নির্জনতা সর্বনাশ করেছে আমাকে—আর কেউ গুঢ়তর ব্যাপারটা যেন না জানে, তাই স্বাভাবিক, বাস্তব, সাধারণ হবার জন্য ভিতরে ভিতরে আমার কি করুণ দ্বন্দ্ববহুল প্রয়াস আমিই তা জানি।

আর-দশজনের মতো হতে না পারার এক অদ্ভুত বেদনায় কাতর একজন অস্বাভাবিক যুবকের এই দ্বন্দ্বমুখর মানসলোকের সফল ও অসাধারণ চিত্রায়ণ লেখকের মানব-মনোজগৎ বিশ্লেষণের তুঙ্গস্পর্শী ক্ষমতারই প্রমাণ দেয়।

মান্নান সৈয়দের গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এগুলোর বিষয়-বৈচিত্র্য। যদিও মানুষ, তার মনোজগৎ এবং তার কার্যকলাপে পৃথিবী ও প্রতিবেশের প্রভাব, সর্বোপরী তার অন্তর্লোক ও বহির্জগত এ দুয়ের সম্মিলনে নির্মিত যে সম্পূর্ণ জীবন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রায়ণই তাঁর মূল লক্ষ্য, কিন্তু বিষয়-বৈচিত্র্যে তাঁর বহুগামিতা লক্ষ করার মতো। আর এভাবেই তাঁর গল্পে উঠে আসে স্বপ্নভঙ্গে ক্লান্ত-বিপন্ন মানুষ— নানা প্রতীকের মাধ্যমে। 'মাতৃহননের নান্দিপাঠ' গল্পের আতিকুল্লাহকে আমরা তার শীর্ণ শরীর ও দ্বন্দ্বমুখর অন্তর্লোকসহ নির্মিত হতে দেখেছি। 'রাস্তা' গল্পের যুবককে আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রসহ নির্মিত হতে দেখি, যার জীবনের একমাত্র চাওয়া 'সুন্দর শরীর' ও 'সুন্দর চেহারা'। তার সমস্ত কর্মকাণ্ড ও চিন্তাভাবনা আবর্তিত হয় এই একটিমাত্র চাওয়াকে কেন্দ্র করে। তার ধারণা— 'মানুষের হীনতা, ক্ষুদ্রতা, জটিলতা বেড়ে যায় যদি তার শরীর সুস্থ ও বলবান না থাকে।' গভীর কোনো ভাবনা তাকে আবিষ্ট করে না কারণ— 'পণ্ডিতি ভাবনার আমার সময় নেই' এবং 'আমি আমার ধারণা নিয়ে আছি, কেউ আমাকে বুঝুক না বুঝুক আমি তোয়াক্কা করি না।' শরীর ঠিক রাখার জন্য প্রতিদিন ভোরে সে দৌড়াতে বের হয়, নিজেকে ব্যস্ত রাখে খেলাধুলা ও ব্যায়ামে— তার জীবন এই একটি বিষয়েই গণ্ডিবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। গল্পটি অনেক দূর পর্যন্ত এরকমভাবে এগিয়ে যায়, কিন্তু শেষের দিকে এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে বিস্ময়কর এক চমক। আমরা দেখতে পাই, নিত্যদিনের মতো ভোরে সে দৌড়াতে বেরিয়েছে, কিন্তু হঠাৎ গির্জার ঘণ্টা ধ্বনি শুনে সে বুঝতে পারে— সময়টা ভোর নয়, মধ্যরাত। একটা তীব্র ভয় তাকে গ্রাস করে নেয় মুহূর্তে। এই নির্জন রহস্যময়ী রাতের শহর তার সমস্ত সাহস ও মনোবল কেড়ে নেয়। সে নিজের ঘরে ফেরার জন্য ছুটতে শুরু করে—

> ছুটতে-ছুটতে ছোট, বড়, সোজা, বাঁকা, অন্ধকার, আলোকিত কত রাস্তা পার হয়ে গেলাম। ছুটতে ছুটতে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই আমি, যথাসম্ভব জোরে জোরে হাঁটছিলাম—দৌড়ানোর ক্ষান্ত দিয়ে। পথে একটি জীবিত প্রাণীরও সাক্ষাৎ পেলাম না আমি, যা অন্য কোন কোন রাতে পেতাম.. না কোন চোর, পুলিশ, মাতাল, বেশ্যা বা শিল্পী। আমি জানি না, অন্ধকার রাতে আমি একই রাস্তায় গোলকধাঁধার মত ঘুরে বেড়াচ্ছি না নতুন নতুন রাস্তায় চলে আসছি। কিন্তু নতুন, পুরনো, হারানো, ছড়ানো যে রাস্তাই আমি যাই না কেন, সেই আশ্চর্য অন্ধকারে আমি কিছুতেই আমাদের বাড়ি খুজে পাই না আর। আমার সম্মুখে একের পর এক রাস্তা খুলে যায়, কেবলি একটি রাস্তা আরেকটি রাস্তায় নিয়ে যায় আমাকে।

গল্পের এই পরিণতি আমাদের একটি সত্য জানিয়ে দিয়ে যায়— গণ্ডিবদ্ধ যে মানুষ, গণ্ডির বাইরে তার আর কোনো পৃথিবী থাকে না। দৈনন্দিন নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম ঘটলেই পৃথিবী তার কাছে হয়ে যায় গোলোকধাঁধার মতো, পরিচিত পরিবেশে ফেরার পথ কিছুতেই আর খুঁজে পায় না সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মাছ' গল্পের অধ্যাপক সাহেব সবসময় একটি এ্যাকুরিয়াম সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করেন— যেন গণ্ডিবদ্ধ মানব জীবনের প্রতীকী ইঙ্গিত ওই এ্যাকুরিয়াম। সামাজিকভাবে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন মানুষ তিনি, সহকর্মী-বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন কারো সঙ্গেই কোনোরকম সম্পর্ক নেই তার। দৃষ্টিকটুভাবে তার এই এ্যাকুরিয়াম বহন সবার চোখে কৌতূহলকর-কৌতুককর দৃশ্য হিসেবে বিবেচিত হয়— কিন্তু তার কোনো ভাবান্তর লক্ষ করা যায় না। একদা সামাজিক-স্বাভাবিক এই অধ্যাপক নানারকম পোড় খেতে খেতে হয়ে উঠেছেন তীব্রভাবে একাকী আর তার পৃথিবী হয়ে উঠেছে এ্যাকুরিয়াম-কেন্দ্রিক। তার দিনরাত কাটে এখন ওটা ঘিরেই—

> এই একটা পৃথিবী...রাত্রিবেলা যখন সারা ঘর অন্ধকার করে এ্যাকুরিয়ামটা আলোকিত করে রাখি তখন সমস্ত দুনিয়াও অন্ধকার হয়ে যায়। কেবল জেগে থাকে ওই এ্যাকুরিয়াম...আমি ইজি চেয়ারে বসে ঐ আলো জ্বলা এ্যাকুরিয়ামের দিকে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকি...তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি একটি মোটেলের একা ঘরে শুয়ে থাকি। জিনিসটা সামান্য নয়। সামান্য হলেও অসামান্য। একটা সবুজ মাছের মধ্যে বিশ্বচরাচর...এমনিভাবে দিন কেটে যায়। আমার আর কাজ কি? এ্যাকুরিয়ামের পানি বদলে দেই মাঝে মাঝে। নিউ মার্কেট থেকে মাছের খাবার এনে দেই ওদের। রাত্রিবেলা আলো জ্বেলে মাছের খেলা দেখতে দেখতে ভোর হয়ে যায়। দিনের বেলা যেখানে যাই ঐ এ্যাকুরিয়াম আমার সঙ্গী।

নাগরিক জীবনের গভীর বিচ্ছিন্নতা, অনিবার্য বিপন্নতা, সীমাবদ্ধতা, পৌনঃপুনিকতা, গণ্ডিবদ্ধ জীবনযাপন, আর হাজারও কোলাহলের ভেতরে দিগন্তব্যাপি নিঃসঙ্গতার এমন চোখ-ভিজে-ওঠা চমৎকার প্রতীকী চিত্রায়ণ আর কী হতে পারে? গল্পের শেষের দিকে অধ্যাপক একজন অদ্ভুত লোকের সঙ্গে পরিচিত হন, লোকে যাকে সাঁইজি বলে ডাকে। সাঁইজি অধ্যাপককে— 'আপনি তো বাবা বাউল'— বলে চমকে দেন, আর শোনান বাউলদের সেই ঘরছাড়া পৃথিবীর অদ্ভুত তত্ত্ব। লোকটির কথা তাঁকে খুব গভীরে স্পর্শ করে যায়, যেন হঠাৎ করেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর আত্মপরিচয়। গল্পের শেষে—

> তারপর একদিন কোথাও কিছু না— হঠাৎ একটা লোকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এ্যাকুরিয়ামটা ভেঙে যায়। কাঁচগুলো খান খান...একহাজার লোক আসছে-যাচ্ছে, তাদের সামনে ফুটপাতে প'ড়ে পাঁচটি মাছ সাঁতরাতে থাকে এদিক-ওদিক। আমি হতবাক। শূন্য চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। হতবাক, স্তব্ধ আমাকে পেছনে ফেলে মাছগুলো এগিয়ে যায় অনেক অনেক দূরে।

এই পরিস্থিতি যেন অধ্যাপকের তুমুল মুক্তিকেই নির্দেশ করে এবং আমরা দেখি, তাঁর এই মুক্তি এসেছে তখনই যখন তিনি নিজেকে চিনতে পেরেছেন, যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের ভেতরে এক বাউলের সন্ধান পেয়েছেন। তবে কি আমরা— এই নাগরিক মানুষেরা— সবাই ভেতরে ভেতরে একেকজন বাউল? কেবল সচেতনভাবে তা অনুভব করি না? আর তাই বন্দি হয়ে থাকি গণ্ডির ভেতরে, পৌনঃপুনিক এক যান্ত্রিকতার ভেতরে।

মান্নান সৈয়দের গল্পগুলোতে আমরা যেমন দ্বন্দ্বমুখর অন্তর্লোকের পরিচয় পাই তেমনি মানুষকে চিত্রিত হতে দেখি তার বিপরীত ও বহুমুখী সম্ভাবনাসহ। মানুষ তার বিপরীত সম্ভাবনাময় চরিত্রটিকে মানবিক কারণেই লুকিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু যেভাবে সে পরিচিত তার পরিপার্শ্বের কাছে, সে কি সত্যিই পুরোপুরি ওরকম? নাকি খুব ভালো বলে পরিচিত একজন মানুষের মধ্যেও বাস করে নিষ্ঠুর ও অসৎ আরেকজন? 'গল্প ১৯৬৪' গল্পের কবির— সেই দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ সময়ে যে ছিল তরুণ এবং দাঙ্গা-প্রতিরোধ সংগঠনের সক্রিয় ও বলিষ্ঠ কর্মী, এতকাল যার কোমল রূপটিই ছিল প্রকাশিত, একসময় তার ভেতরের পশু-রূপটি বেরিয়ে আসে। তার শৈশব-কৈশোরের বন্ধু অমল, যার সঙ্গে কেটেছে তার অজস্র সকাল-দুপুর-বিকাল, বহু আনন্দ-বেদনা-সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে কেটেছে দুরন্ত সময়, দাঙ্গা শুরু হলে অন্যান্যের সঙ্গে সেই অমলদের পরিবারকে রক্ষা করার জন্য কবির বিশেষ মনোযোগ প্রদান করে। সেই সময়ের একটি চিত্র গল্পে পাওয়া যায়— সাম্প্রদায়িকতার ভয়াল উন্মাদনায়-নিষ্ঠুরতায় নিরুপায়-অসহায় হয়ে পড়া মানুষের আহাজারি কানে বাজে। অনেকের মতো অমলরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়— যাওয়ার সময় নিরাপত্তার খাতিরেই অমল তার বোন শোভাকে কবিরের হেফাজতে রেখে যায় কিছুদিনের জন্য। কবির কয়েকদিন তার দায়িত্ব পালন করেছিল সঠিকভাবেই কিন্তু একসময় তার ভেতরের পশু জেগে ওঠে, শোভার অসহায়ত্ব ও আশ্রয়হীনতার সুযোগ সে গ্রহণ করে—

> সব সমস্ত চলছিল ঠিক ভাবে। কিন্তু এক রাতে আমার মধ্যে জানোয়ার জেগে উঠেছিল; আমি কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারিনি। শোভাও হয়ত ভয়ে বাধা দেয়নি, চিৎকার করেনি।

এই যে সুযোগ গ্রহণ তা কি তার বিপরীত মানসিকতারই চরম প্রকাশ নয়? যে দায়িত্ব নিয়েছে মানুষকে নির্ভরতা দেয়ার, যে তার কর্মকাণ্ডেই প্রমাণ করেছে এবং বিশ্বাস অর্জন করেছে নির্ভরযোগ্যতার, সে কেন এমন পশু হয়ে ওঠে? কেন তার ভেতরে জেগে ওঠে আদিম লালসা আর কিছুতেই সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না? তবে কি মানুষের মধ্যে বাস করে অচেনা এক পশু? গল্পটি এখানেই শেষ নয়; আমরা দেখি, এটি তার স্মৃতিচারণ এবং সমস্ত কিছুর শেষে তার ভেতরে জেগে ওঠে এক দিগন্তব্যাপি অনুতাপ—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আ, আমার নিয়তি। তার পরদিনই সন্ধ্যার অন্ধকারে ফিরে এসেছিল অমল। আ, যদি একদিন আগে আসতো। আমি বেঁচে যেতুম। শোভা বেঁচে যেতো, আমি বেঁচে যেতাম।

এই অনুতাপ-অনুশোচনা কি প্রমাণ করে না তার অন্তর্গত সৌন্দর্যের? মানুষের সত্য রূপ তাহলে কোনটি?

'এক অমানুষের গল্প'-এর রশিদ—যে মেয়ে সরবরাহ করে অথবা মেয়েদের নগ্ন ও অশ্লিল ছবি তুলে ব্যবসা করে, আমরা দেখি— একটি মেয়েকে সে নানা পদ্ধতিতে, অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে, উদারতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে অবশেষে নগ্ন ছবি তোলার জন্য স্টুডিওতে নিয়ে এসেছে। শুধু ছবি তোলাই নয়, সেখানে প্রথমে স্টুডিওর কর্ণধার তার লালসা চরিতার্থ করে মেয়েটিকে দিয়ে। অতঃপর—

ক্লিক...ক্লিক। একের পর এক। অনেক ভঙ্গিতে। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক, উদ্ভট ও বেয়াড়া আসনে। সব রকম ক্রেতার দিকে নজর রাখতে হয় তার। সে যখন ব্যবসাতে নেমেছে।

অথচ মেয়েটি যখন আহ্বান জানায় রশিদকে, সে প্রত্যাখ্যান করে। কেন? ওই সময় ওরকম এক তীব্র যৌবনতীর প্রকাশ্য আহ্বান কেন সে উপেক্ষা করে যায়? একি তার নীতিবোধ? সে তাকে ভোগ করতে চায় না, শারীরিক মিলন তার কাছে নিছক খেলা নয়— এই ধরনের একটি আদর্শিক চিন্তা কি তার ভেতরে খেলা করে? জীবনের তীব্র প্রয়োজনে সে হয়তো ব্যবসায় নেমেছে, জানে সে— আদিম ও অন্যায় এ ব্যবসা, তবু তার ভেতরে কি একজন সৎ ও সুন্দর মানুষও বাস করে না? গল্পের শেষে দেখতে পাই তারা পরস্পরকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করছে, এই সম্বোধনের ভেতর এক গোপন-মোহন ভালোবাসার কণ্ঠ কি খুব নির্জনে ভেসে আসে না? মানুষের এই দ্বৈতসত্তা তার জন্য খুবই মৌলিক ও একান্ত। কারণ সে প্রকৃতিগতভাবেই একই সঙ্গে মানুষ ও পশু— সে তার করোটি ও ধমনিতে বয়ে এনেছে তার সহস্র পূর্বপুরুষের বার্তা— যা ছিল 'নীতিহীন ও বর্বর' আবার সভ্যতা তাকে শিখিয়েছে হিংস্র নখর লুকিয়ে রাখতে। অথচ মানুষ সব সময় প্রধান করে তুলতে চেয়েছে তার আলোকিত রূপটি, হয়তো চেয়েছে একটি মাত্র চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যের মানুষ হতে। এই চাওয়াও তার জন্য মৌলিক। একক চরিত্রের মানুষ হওয়ার এই মৌলিক চাওয়া কি পূরণ হয় মানুষের?

'সমীচীন মানব' গল্পের সিকান্দর, সেক্রেটারিয়াটের এক সাধারণ কর্মচারী, চিন্তাভাবনায় বেশ খানিকটা ব্যতিক্রম হয়েও পরিপার্শ্বের জন্য গতানুগতিক হয়ে পড়ে। আমরা দেখি— অফিস থেকে বেরিয়ে সে একজন সুরভিত-সুন্দর মেয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদয় জয় করার চেষ্টা করছে। অতঃপর তার সর্বাত্মক চেষ্টা শেষ হলে, মেয়েটি আরও খানিকটা তার নিকটবর্তী হলে সে এবার আরেকটি পৃথিবীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। একজন পতিতাকে অনুসরণ করে তার ঘর পর্যন্ত যায়, আর সমস্ত সভ্যতার আবরণ থেকে মুক্ত করে নিজেকে প্রায় অশ্লীল করে তোলে। আর এই পর্ব শেষ হলে সে অবশেষে ফিরে আসে তার ঘরে— স্ত্রীর কাছে। এবার সে প্রেমিক নয়, নয় সে অসভ্য-অশ্লীল। স্ত্রীর সঙ্গে প্রয়োজনীয় সাংসারিক আলাপ, কিঞ্চিৎ খুনসুটি অতি চমৎকারভাবে সম্পাদন করে। তবু—

> সিকান্দার ভাবছিল, আমি সাইফাকে প্রেমের বাক্যে তুষ্ট করেছি; বেশ্যা মেয়েটিকে অশ্লীল কথা বলেছি; এবং রাফেজার সঙ্গে দরকারি সাংসারিক আলাপ করেছি। বিভিন্নজনের কাছে আমার আচরণের ও ব্যবহারের এই বিভিন্নতা সম্ভব হয়েছে এজন্য যে আমি চতুর, আমি বুদ্ধিমান, আমি সমীচীন। আমি নিজের আশ্চর্য ব্যবহার ও বুদ্ধিতে হো হো করে হেসে উঠতে পারতাম, কিন্তু কেন জানি না নিজেকে বড় বেশি বিমর্ষ ও ফতুর বলে মনে হচ্ছে। সকলের সঙ্গে অমন চাতুর্যভরা সার্থক ব্যবহারের পরও কেন আমি বিমর্ষ? আমার একদিনকার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত জীবনযাত্রার তো কোনো ত্রুটি নেই, তাহলে কেন নিজেকে শূন্য মনে হচ্ছে? আমি মঞ্চে কোনদিন অভিনয় করিনি, তবু আমি অভিনেতা— আমি তিনটি চরিত্রে অভিনয় করে ঘুমাতে এসে, এখন জেগে আছি একটি মাত্র মৌল আমাকে নিয়ে। আমি যুদ্ধ জয়ের পরও ঘুমের আবেগে ছটফট করছি, কেননা কারুকার্য করা বিধাতার কাছে আমি একদিন একটিমাত্র চরিত্র চেয়েছিলাম, সে প্রেমিক হোক, কি বেশ্যাগামী হোক, কি সাংসারিক হোক। আমি একটিমাত্র চরিত্র চেয়েছিলাম।

বলাবাহুল্য সিকান্দর তা পায়নি।

'চাবি' গল্পে জীবন ও জগৎ এবং শিল্পদর্শন সম্বন্ধে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন মান্নান সৈয়দ। তাঁর গল্পের অধিকাংশ চরিত্রের মতো এই গল্পের প্রধান চরিত্রও— চিত্রকলার তরুণ অধ্যাপক— বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত, নিঃসঙ্গ ও বিষণ্ন। কিন্তু একটি অদ্ভুত ঘটনা তাঁকে প্রতিবেশীদের কাছে যেতে বাধ্য করে এবং নানারকম অভিজ্ঞতা উপহার দেয়। একদিন তিনি বাইরে থেকে ফিরে নিজের দরজায় দাঁড়িয়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখেন, চাবি নেই। কোথায় রেখেছেন কোনোভাবেই তা মনে করতে না পেরে একে একে প্রতিবেশীদের দরজায় হানা দেন। পাশের ফ্ল্যাটে তিনি পান সৌজন্যবোধজনিত আতিথেয়তা, কিন্তু চাবি সেখানে নেই। এরপর নিচতলার প্রথম ফ্ল্যাটে পান শীতল উপেক্ষা, তারপরের ফ্ল্যাটে তারচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা— চাবির কথা বলতেই গৃহকর্ত্রীর রুদ্ররূপ—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেন কি, আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েকে আপনি চোর ভাবেন, কখনো নয়, ককখনো নয়, ককখনো ওরা নিতে পারে না। দেখুন অন্য কোথাও। কী-যে ভাবেন আপনারা!

তারপরের ফ্ল্যাটে উঁকি দিতেই—

একজন বেরিয়ে এসে প্রায় আমাকে ধমকাতে লাগলো: তার গলায় রাগ; কিন্তু ছোটো চোখের বিরাট মুখের মণ্ডলে ক্রোধের চিহ্ন নেই, 'বলছেন আমাদের উপরের তেরো নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন আপনি? অসম্ভব, আপনাকে কোনোদিন এ অঞ্চলেই দেখিনি। আপনি মশাই চালাকি পেয়েছেন— আসুন বাজি রাখুন দশটাকা। বললাম : আপনি এ বাড়ির কোনো ঘরেই থাকেন না। এ বাড়ির লোকদের চেহারা অন্যরকম হয়, জানেন? চাবি খুঁজছেন, হ্যাঁ, চাবির কি হাত হয়েছে?..যান যান এ অঞ্চল ছেড়েই চলে যান, বেশি গোলমাল করলে পুলিশে দেবো।' আমি ফিরতে ফিরতে শুনলাম পিছন থেকে একটি স্ত্রী কণ্ঠ 'কী জানি বাপু, কী মৎলবে ঘুরছে, যা দিনকাল পড়েছে, কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।'

এর পরের অভিজ্ঞতা আবার বিপরীত ধরনের— মন ভালো করে দেয়ার মতো।

তারপরের ঘরটিতে এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে কলালাপ করছিল, নক্ষত্রের মতো চলাফেরা করছিল, আমাকে দেখেই সন্ধেবেলার পাখিদের মতো চ্যাঁচামেচি করতে করতে বেরিয়ে এলো, বললো সবাই মিলে, 'না তো, আপনার চাবি আমরা দেখিনি তো, চাবিঅলার কাছে যান না, আরেকটা বানিয়ে নিন। আর সামনের রাস্তায় চাবি বাজাতে বাজাতে যদি কোনো চাবিঅলা যায়, তো নির্ঘাৎ আপনার কাছে তাকে ডেকে দেবো। কিংবা চাবিঅলার কাছে যেতে হবে কেন, আপনি যদি বলেন তাহলে আমরা এক্ষুণি গিয়ে আপনার ঘরের দরজা ভেঙে দিচ্ছি। কী যে আপনি বলেন, এটা কোনো সমস্যা নাকি?

তারপরের অভিজ্ঞতা আবার অন্যরকম— একজন বুড়ো মতন লোক বলে উঠলেন— 'চালাকি পেয়েছো ছোকরা? চাবির নাম করে ঘরে এসে বসবে, খাবে, গল্প করবে, তারপর আমার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবে, ওসব চালাকি বুঝি আমি।'

আর এভাবেই এক চমকপ্রদ বর্ণনায় লেখক নাগরিক জীবনের মধ্যে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা, সম্পর্কহীনতা, অন্যের প্রতি মনোযোগহীনতা, নিস্পৃহতা, জটিল মনোবৃত্তি, নিষ্ঠুরতা, সন্দেহ, অবিশ্বাস তুলির এক আঁচড়ে এঁকে ফেলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবই উঠে আসে ওই চাবি খোঁজার উছিলায়। কিন্তু যে ঘরে ঢোকার জন্য এত চেষ্টা ও আয়োজন, কী এমন আছে ওই ঘরে, কী এমন গুরুত্ব তার?

> কী আছে ঐ ঘরে? আছে আমার সর্বস্ব, আমার সারা জীবনের সাধনা; কতো সমাপ্ত অসমাপ্ত ছবি, কতো ভাবনা আর স্মৃতি, কতো গুঞ্জরণ। ছেলেবেলা থেকে আমার সাধ ছিল, আমার নিজের একটি ঘর হবে, সেখানে আমি আমার ভাবনা নিয়ে স্বপ্ন নিয়ে, অসম্ভব নিয়ে কাটাতে পারবো। আর বড়ো হয়ে যখন দেখলাম; আমরা কেউই ঠিক পরস্পরের নই, যখন আরও-একলা গহন-একলা হয়ে উঠলাম, তখন তো ওই ঘরই হয়ে উঠলো প্রিয়তম। তাইতো ঐ ঘরকে ফিরে পেতে চাই।

বলাবাহুল্য ওই স্বপ্নঘরের চাবিটি এই বর্ণনার পর আর আক্ষরিক চাবি হয়ে থাকে না, পরিণত হয় মোহন প্রতীকে, আর ওই ঘরের প্রবেশের চেষ্টাটিও আর আক্ষরিক অর্থে ঘরে ঢোকার ব্যাপার হয়ে থাকে না বরং তার চিরকালীর স্বপ্নের কাছে, প্রত্যাশার কাছে, আশ্রয়-ভালোবাসা ও নির্ভরতার কাছে, প্রবল নিঃসঙ্গতায় একটুখানি স্বস্তি পাওয়ার মতো বিষয়ের কাছে পৌঁছাবার চেষ্টায় পরিণত হয়। অধ্যাপক সাহেব কারো কাছেই চাবিটি খুঁজে পান না, বরং মুখোমুখি হন নানাবিধ বিরূপ অভিজ্ঞতার— তবে কি কেউ-ই সন্ধান দিতে পারে না সেই মোহন চাবির যা দিয়ে আমরা আমাদের স্বপ্নলোকে প্রবেশ করতে পারবো? তবে কি এই খুঁজে বেড়ানোর বাঁকে বাঁকে দাঁড়িয়ে থাকবে কেবলই সন্দেহ, অবিশ্বাস, জটিলতা, কূটিলতা? গল্পের শেষে আমরা দেখি অধ্যাপক অবশেষে এসে পৌঁছেছেন পতিতাদের ঘরে, বলাবাহুল্য চাবি এখানেও নেই, তবে এই মেয়েরা গল্পটিকে একটি নতুন মাত্রা এনে দেয়। তারা তার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করছিল, কিন্তু তার আগ্রহ ছিল না বলে তিনি যখন ফেরার পথ ধরলেন, তখন—

> মেয়েরা বললো, যাচ্ছেন তাহলে? আমি উত্তর দেবার আগেই আরেকটি মেয়ে বললো, উনি তো চাবি খুঁজতে এসেছিলেন, যান, আপনার যখন চাবি নেই, তখন এখানে থেকে কি করবেন? চাবি পেলে আসবেন, এখানে কয়েকটি দরজা-বন্ধ-করা ঘর আছে। আমরাও যে চাবি খুঁজছি গো...ওরা হাসছিল, আমি ওদের জন্য মনে মনে কাঁদছিলাম। ওরা খিলখিল করে হাসছিল, চাবি খুঁজছিগো মহারাজ। আমি মনে মনে হু হু করে কাঁদছিলাম, চাবি খুঁজছি গো মহারাজ।

সারা গল্প জুড়ে কোনো চরিত্রই অধ্যাপকের চাবি খোঁজার মর্মার্থ ধরতে পারেনি, পেরেছে এই মেয়েগুলো, এবং বিষয়টিকে তারা আরও তীব্রভাবে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছে, কারণ তাদেরও আছে 'কয়েকটি দরোজা-বন্ধ-করা ঘর'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং তারাও খুঁজছে সেই মোহন চাবি। যেন আমাদের, এই সুবেশী নাগরিকদের চেয়ে তাদের বোধ অনেক তীব্র কারণ তারা অন্তত জানে, স্বপ্নলোকের সন্ধান তারা পায়নি, আর আমরা— তীব্র গতানুগতিকতায় আচ্ছন্ন, এই নাগরিক মানুষরা— তাও জানি না। *চাবি খুঁজছি গো মহারাজ* — এই তীব্র আকুলতা ও হাহাকার তাই মানুষের সমস্ত না পাওয়াকে মূর্ত করে তোলে। গল্পের সেই অধ্যাপক শেষ পর্যন্ত চাবি খুঁজে পাননি— 'আমি নিজের ঘরের বাইরে নির্বাসিত ও প্রবাসী থেকে এখনো দিনরাত সেই পুরনো ঘরের চাবি সন্ধান করে যাবো— এই আমার নিয়তি।' — এবং আর কোনোদিনই তাঁর ফেরা হয়নি কাঙ্খিত স্বপ্নলোক।

জীবন হয়তো এমনই। স্বপ্নের পৃথিবী থেকে, প্রত্যাশা ও স্বপ্নপূরণ থেকে আমাদের অবস্থান বহুদূরে রয়ে যায় আজীবন। তবু কী এক ঘোরে আমাদের দিন কেটে যায়। আমরা বেঁচে থাকি; কারণ আমরা বেঁচে থাকতে চাই। জীবনের চারপাশে এতসব নেতিবাচকতা, এতসব যুদ্ধ-দ্বেষ-হিংসা ও হানাহানি, এতসব সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা, এতসব মৃত্যু ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, তবু সবকিছু ছাপিয়ে ওঠে আমাদের বেঁচে থাকার আয়োজন। হয়তো এজন্যই 'অস্তিত্ব অন্যত্র' গল্পের মন্টু তার অতিপ্রিয় পিতামহের মৃত্যুকে পাশে রেখে মেতে উঠেছে জীবন ভাবনায়। মন্টু তার গল্প লেখা নিয়ে, তার সাহিত্যভাবনা নিয়ে একটি নিজস্ব পৃথিবীর মধ্যে ডুবে আছে। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তার চিরসঙ্গী, স্বভাবে অস্বাভাবিক, এমনকি প্রেমের জন্যও সে নিজস্ব স্বভাবের বাইরে যেতে পারে না। গল্পের প্রথম দিকেই আমরা মন্টুকে দেখতে পাই তার পিতামহের মৃত্যুজনিত কারণে তাঁর স্মৃতিবাহিত ভাবনা ও বর্তমানের প্রাসঙ্গিক শোকসহ। কিন্তু পরবর্তী অনুচ্ছেদই আমাদের চমকে দেয়, কারণ এবারের ভাবনার বিষয় তার পিতামহ নয়, বরং তার সাহিত্যভাবনা, এমনকি প্রেম বিষয়ক ভাবনাও তাকে এলোমেলো করে দেয়। এভাবে গল্পের একটি অনুচ্ছেদ চিত্রিত হয় লোকটির মৃত্যুজনিত প্রতিক্রিয়া, স্মৃতিচারণ, শোক ও বিলাপের চিত্র, পরবর্তী অনুচ্ছেদে মন্টুর স্মৃতিচারণ— তার দাদাকে নিয়ে যা খুব ঘনিষ্ঠভাবে জীবন-সংশ্লিষ্ট, তার সাহিত্য-ভাবনা ও প্রেমচিন্তা। গল্প এগিয়ে যায়, আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করি, ধীরে ধীরে ওই ভাবনাগুলো আর অনুচ্ছেদ মানছে না, বরং মৃত্যু ও জীবন ও প্রেম ও সাফল্য ও ব্যর্থতা ও পরশ্রীকাতরতা ও ভালোলাগা ও জীবন-তৃষ্ণা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। যেন এসবের কোনোকিছুই আর বিচ্ছিন্ন নয়, জীবন ও মৃত্যু এখানে একাকার হয়ে গেছে—

> রাতে এক ফোঁটা চোখ বোজেনি মন্টু, সারাদিন ধকল গেছে, বিকেলে মন্টুর প্রথম গল্পগ্রন্থের ওপর আলোচনা সভা। দাদাকে নামিয়ে দেওয়া হলো কবরে, আব্বা বলছেন, 'সবার দিতে হয় নিজের হাতে একটু মাটি ছিটিয়ে দে—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> ঝুরঝুর করে মুঠো গলে মাটি ঝরে পড়ে মৃত প্রেমের ওপর, একজন আলোচক বলছেন, 'এই বই-এ যে-ধরনের গল্প আছে তা প্রচলিত গল্প ধারণাকে বদলে দ্যায়। এগুলোও গল্প, কিন্তু এক নতুন নিয়মে... 'জোরে মাটি ছুঁড়ে দিতে পারে না মন্টু,...দরোজা খুলে যায়, বিবির মা 'দাঁড়াও ডেকে দিচ্ছি' বলে ভেতরে চলে যান, চোখ বুজে আসতে চায় আমার, জোর করে চোখের পাতা টেনে ধরে রাখি, ক্লান্ত কিন্তু ভেতরটা আমার ক্লান্তিহীন জেগে আছে, প্রতিটি সেকেন্ডে আমার স্নায়ুর ভিতর অতিক্রম করে যায়, পায়ের শব্দ, শাড়ির খসখস, পর্দা সরে যায় 'বিবি আমি এসেছি।'

তীব্র জীবন বোধ সমৃদ্ধ এই অসাধারণ গল্পটি আমাদের জানিয়ে দেয়— মৃত্যু তা সে যত প্রিয়জনেরই হোক না কে, পরিশেষে আমাদের জীবন-তৃষ্ণাকেই তীব্রতর করে তোলে। আমরা তো জানি, আমাদেরই চারপাশে প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত শোক সত্ত্বেও চলে জীবনের আয়োজন, মৃতের স্বজন তার লাশ ঘরে রেখে একটু আড়াল খোঁজে, সুযোগ খোঁজে হেসে ওঠার, ভিন্ন বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার আসে, পিতার লাশ পাশে রেখে সন্তান সেই খাদ্য গ্রহণ করে, একটি প্রিয় মুখ চোখে পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্মৃত হতে হয় শোক ও বিলাপ, জেগে ওঠে ভালোবাসা ও প্রেম— এ সবই এক প্রবল জীবন-তৃষ্ণার কারণে ঘটে যায়।

আর এজন্যই সবকিছুর পরও মানব-জীবনে জীবন-তৃষ্ণা একটি ধ্রুবতারার মতো জ্বলতে থাকে। সব কিছুর চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে জীবন এবং বেঁচে থাকা। 'অধঃপতন' গল্পে আমরা এই সত্যের চিত্রায়ণ দেখতে পাই। গল্পের তরুণ 'ছোকরা' অধ্যাপক যখন তার চিকিৎসকের কাছে জানতে পারে এই সংবাদ যে তার মৃত্যু নিকটবর্তী, আমরা দেখি— কী এক তীব্র অভিমানে সে বদলে ফেলছে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। যে ছিল লাজুক, গভীর আত্মমগ্ন ভাবুক ও সার্বক্ষণিক চিন্তাবিদের মতো চুপচাপ; সে তার আসন্ন মৃত্যুর সংবাদটি শুনে প্রথমত সারাদিন ঘুমায়। উল্টোপাল্টা অর্থহীন ও বিচ্ছিন্ন স্বপ্ন দ্যাখে— যেন স্থবির হয়ে পড়েছে। অতঃপর জীবনকে যেন নতুনভাবে নির্মাণ করতে চায় সে— বাইরে বেরুবার সময় চাকরানিকে দেখে চোখ টেপে— এই প্রথম; বাইরে বেরিয়ে পথ দিয়ে চলার সময় চোখ তুলে বিভিন্ন বাড়ির মেয়েদের দ্যাখার চেষ্টা করে, যদিও তার এই সুনাম আছে যে সে কখনো চোখ তুলে তাকায় না; শীষ বাজাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে— ব্যর্থ, কারণ এটাও প্রথম চেষ্টা; সিনেমা হলে গিয়ে রগরগে সিনেমা দ্যাখে, 'উল্লোল নায়িকা-কর্তৃক প্রবল নিতম্ব-আন্দোলন' দেখে অন্যান্যের মতো সেও চিৎকার-শিৎকার ইত্যাদিতে মেতে উঠতে চায়। অতঃপর এবার আরেকটু এগিয়ে যায় জীবনের পথে— নিশিকন্যার সঙ্গে গিয়ে তার শরীরের স্বাদ গ্রহণ করে, বলাবাহুল্য, এটাও প্রথম আর অবশেষে মদ খেয়ে নিজেকে ভাসিয়ে দেয় অচেনা-অদেখা নেশার সাগরে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> বমির মধ্যে শুয়ে উচ্চারণ করে করে নিজেকে শুনিয়ে সে বলতে লাগলো, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে অদ্ভুত পার্থিব জীবনের আর এক মুহূর্ত নষ্ট না করে এইভাবে আগামী বৎসরখানেক অর্থাৎ যতদিন আমি বাঁচি ততদিনের মধ্যে এতকাল-সঞ্চিত সম্ভ্রান্তির ভ্রান্তিময় সম্পদ সকল হারিয়ে ফেলার চেষ্টা করবো।

কেন এই চেষ্টা? কার ওপর, কেন এই অভিমান? এই গভীর অভিমান কি তার প্রবল জীবনতৃষ্ণা থেকে উৎসারিত নয়? এতকাল সে একটি আদর্শিক জীবন যাপন করেছে, মূল্যবোধ দিয়ে গড়তে চেয়েছে জীবনের সৌধ, মৃত্যু তাকে সময় দেয়নি। অথচ সে জানে সব কিছুর চেয়ে বড়, মহৎ ও সুন্দর এই জীবন ও বেঁচে থাকা—

> অন্য মনে বসে ছিল সে—এইসব আলো-প্রেম-নীলিমা ছেড়ে চলে যাবে কোনো নামহীন, তৃপ্তিহীন পরোক্ষে, চৈতন্যে তার নিবিড় ঘণ্টা বাজছে, হাওয়ায় ছেড়ে-দেওয়া সন্তানকে রক্তের শিকড়গুচ্ছ ধরে অবিরাম ডাক দিচ্ছে কারা : কি অতীন্দ্রিয় দুঃখ-মূর্তি ফলে উঠছে, চরাচরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তারই শতদল বেদনা, একমাত্র তার কেননা এইসব আলো-প্রেম-নীলিমার ভিতরে সুখে-দুঃখে জড়িত কত মানুষ— হায়, ওরা জানে না সমস্ত সুখের চেয়ে জীবন বড়ো, সমস্ত দুঃখের চেয়ে জীবন বড়ো— ওদের উপরে কত আসন্ন বৎসরের ধারা, কত সুখ-দুঃখ, ওদের দুঃখকেও হিংসা লাগে, কেননা সব দুঃখই শেষ-পর্যন্ত গভীরতম সুখের শিহরণ, ওরা গাধা, ওরা মুর্খ, ওরা না-বুঝে অনর্থক দুঃখের কষ্টে অভিভূত, তবু একজন মৃত রাজার চেয়ে একটা জ্যান্ত গাধার জীবন কত বড়ো, তাদের উপরে আসন্ন বৎসরের ধারা, শুধু সে ফুরিয়ে গেলো, এতো তাড়াতাড়ি, যেন এক মুহূর্তের মতো চলে গেলো এক জীবন।

এই ভাবনা, এই তৃষ্ণা, এই চোখ-ভিজে-ওঠা জীবনবোধ, বেঁচে থাকার এই গভীর-তীব্র আকুতিই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে আর আয়োজন ও উৎসবে ও আনন্দে ও গৌরবে ভরিয়ে রাখে মানবজীবন।

উপসংহারের পরিবর্তে

জীবনের এই বোধ, অন্তর্লোক নির্মাণ আর শিল্পের দায় আবদুল মান্নান সৈয়দকে পরিণত করেছে একজন সফল কথাশিল্পীতে। তাঁর গল্পগুলো সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো তাই খুবই দুরুহ। তবু ব্যক্তিগত কিছু উপলব্ধি লিপিবদ্ধ করা যায়।

তাঁর গল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং আকর্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে তাঁর কাব্যিক সুষমামণ্ডিত গদ্যভাষা। প্রায় অচেনা ও অপ্রচলিত শব্দসমুহের এবং উপমা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পের বহুবিচিত্র ব্যবহার তাঁর গদ্যভাষাকে আরও মধুর ও মোহনীয় করে তোলে, গল্পের পরিবেশ ও চরিত্রের আকর্ষণ বহুমাত্রায় বাড়িয়ে দেয়। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। *সুন্দর অবদমন* গল্পের 'নায়িকা' কুলসুম সম্বন্ধে কয়েকটি বাক্য—

> কুলসুমের এই প্রশ্ন যেন একটা স্নিগ্ধ চাবুকের মতো এসে পড়লো আমার উপরে অথবা খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো কুলসুম। আমি মাথার ওপর দেখলাম নিসর্গ প্রকৃতি ভেদ ক'রে ইলেকট্রিক তার চলে গেছে।... (অথবা) কুলসুম বৈকালিক বাতাসে শুকনো পাতা খ'শে পড়ার মতন আস্তে করে যেন স্বগতোক্তির মতন বললো... (কিংবা) পাশাপাশি কুলসুম আর আমি হেঁটে চলেছি। আমার বুকের মধ্যে অর্জুন গাছের পাগল ছায়ারা চলাফেরা করে বেড়ায়।... (কিংবা) ওর আর আকাশের নীরবতার মধ্যে পুঞ্জিত হয়ে আছে রাধা-চূড়ার হলুদ মঞ্জুরী, কৃষ্ণচূড়ার লালে লাল প্রকাশ। ওর না-বলা কথারা সুরমা ব্রিজকে ঘিরে এক হাজার পায়রা হয়ে ঘুমিয়ে আছে।... (অথবা) কুলসুম নাম্নী আমার অনন্ত-আনন্দ, অনন্ত-বেদনা.. কিংবা একমুষ্ঠি রাতুল পায়ের পাতা—ইত্যাদি।

আবদুল মান্নান সৈয়দের গল্পের প্রতীকময়তাও লক্ষ করার মতো। প্রতীকময়তার জন্য তাঁর গল্পগুলোর একমাত্রিক ব্যাখ্যা করা বিপদজনক— 'চাবি', 'রাস্তা', 'অস্তিত্ব অন্যত্র', 'মাছ' প্রভৃতি গল্প বহুমাত্রিক ব্যখ্যার দাবি রাখে।

একটি উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই লেখায় খুব বেশি কথা বলা হয়নি, সেটা হলো— গল্পের প্রকরণ বা নির্মাণ-শৈলী। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো উল্লেখযোগ্য নির্মাণ-শৈলী তার গল্পগুলোতে ছড়িয়ে আছে, আর এই একটি বিষয়ে তিনি এখনো তরুণ লেখকদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আছেন। 'অস্তিত্ব অন্যত্র' গল্পে তিনি স্বপ্ন-বাস্তবতা ও কল্পনাকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছেন। 'যাত্রা' গল্পে আমরা দেখি ১, ২, ৩, এভাবে ১০০ পর্যন্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করে তিনি নির্মাণ করছেন একটি ফেরি-স্টিমার আরোহীদের কার্যকলাপ যা পরিশেষে মানব জীবনের একটি সম্পূর্ণ চিত্র হয়ে উঠেছে। 'হোসেন মিয়ার সঙ্গে' গল্পে তিনি 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে পুনর্নির্মাণ করেছেন, আবার 'জীবনানন্দ দাশের একটি অপ্রকাশিত গল্প' পড়ে বুঝে ওঠাই কঠিন হয়ে পড়ে যে, এটি কোনো সত্যি ঘটনা নয়, গল্প মাত্র। একই কথা বলা যায় 'নারীর হৃদয় প্রেম গৃহ অর্থ কীর্তি সচ্ছলতা' গল্পটি সম্বন্ধেও। 'আবদুল হাফিজ জীবন ও সাহিত্য' গল্পে আবদুল হাফিজের বেদনা-যন্ত্রণা ও গ্লানির প্রকাশ ঘটাবার জন্য তিনি যে কৌশল ব্যবহার করেছেন তা সত্যিই অভিনব। 'রাজা', 'আম্র কাননে' প্রভৃতি গল্পের ভাষাভঙ্গিই পাঠককে বলে দেয়— এগুলো একালের 'গল্প' নয়, অথচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচীনকালের এইসব কাহিনীতে যে সত্য প্রতিভাত তা সমকালের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য।

আর এই সবকিছু নিয়েই আবদুল মান্নান সৈয়দ হয়ে ওঠেন এক গুরুত্বপূর্ণ গল্পকার, যাঁর গল্প ছাড়া আমাদের গল্পসাহিত্যের আলোচনা পূর্ণতা পায় না।

রচনাকাল : ডিসেম্বর, ১৯৯৫

প্রথম প্রকাশ : ১৩ মার্চ, ১৯৯৭, বাংলাবাজার পত্রিকা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদ : গল্পের জাদুকর

স্কুলে পড়ার সময় ছোটগল্পের সংজ্ঞা পড়তে হতো রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে, হুমায়ূন আহমেদের গল্প পড়তে গেলে সেটি খুব মনে পড়ে—

ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্ত সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারটি অশ্রু জল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়েও হইল না শেষ।

যথার্থই ছোট ছোট দুঃখ-কথার রূপকার ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। ভঙ্গিটিও ছিল সহজ-সরল। কোনো ভান নেই, ভনিতা নেই, বর্ণনায় কোনো জটিলতা নেই, 'ঘটনার ঘনঘটা' নেই, আয়তনেও নিতান্তই ছোট— তবু পড়ার পর ছোট্ট একটা দুঃখ বুকের কোথাও যেন আটকে থাকে, অথবা চোখের কোণে। জীবন, জগৎ ও মানুষ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বরাবরই ইতিবাচক। তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্প বা উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত মানুষের খুব গভীর-কোমল-মায়াময় একটা রূপ ফুটে ওঠে, আর আমরা দেখি— জীবন যতই গ্লানিকর আর বেদনাময় হোক না কেন, মানুষের জন্য কোথাও-না-কোথাও এক টুকরো মমতা জমা করে রাখা হয়েছে।

২

দু-একটি উদাহরণ দিলে এসব কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

'নিশিকাব্য' গল্পে শহরে চাকরি করা ছেলে হঠাৎ সুযোগ পেয়ে এক রাতের জন্য বাড়িতে এলে যেন এক উৎসব শুরু হয়। নতুন করে রান্না চড়ে চুলায়, পুকুরে ঝাঁপাঝাপি করে গোসল করে দুই ভাই, তার শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে মা-বাবার স্নেহময় উৎকণ্ঠা, আর স্ত্রীর মৃদু লজ্জামাখা আহ্লাদ। এত সহজ ভাষায়, এত মৃদুকণ্ঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইসব ছোট ছোট সুখ ও আনন্দের গল্প শোনান তিনি যে মনে হয়— জীবনের কোথাও কোনো কালো দাগ লেগে নেই। মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরে ভোরের ট্রেন ধরতে বেলা ওঠার আগেই বাড়ি ছাড়তে হয় তাকে, কিন্তু পেছনে রেখে যায় এক অপার ভালোবাসার গল্প। ছোট্ট একটি গল্প। এমনকি তেমন কোনো ঘটনাই ঘটে না, তবু বুকের গভীরে যেন একটা ছাপ রেখে যায়। মনে হয়, জীবন কত সুন্দর, কত প্রেমময়।

'ফেরা' গল্পে গভীর রাতে রুই মাছ হাতে বাড়ি ফেরার পর ঘুমিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের জাগিয়ে ফের রান্নার আয়োজন, টুকিটাকি কথাবার্তা, দুষ্টুমি-খুনসুটি, আনন্দ-আনন্দ-আনন্দ, কারণ আহ্লাদি মেয়েটা যে আজকে খাবার পছন্দ হয়নি বলে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। এটাও খুব ছোট একটা গল্প, বিষয়ও সামান্য। একটা রুইমাছ, একটা ছোট্ট সাধ পূরণ— কত সাধারণ এই আখ্যান। অথচ এই সামান্যের ভেতরে যে অসামান্যতা লুকিয়ে আছে, যে গভীর গভীরতর আনন্দ লুকিয়ে আছে, হুমায়ূন তার মায়াবী আবিষ্কারক। এই শ্রেণীটি এত সংকট, এত যন্ত্রণা, এত জটিলতা নিয়েও কীভাবে বেঁচে থাকে, সেটি তিনি আবিষ্কার করেছেন নিপুণ কুশলতায়। তাঁর মতো করে আর কেউ কখনো এই জীবনকে দেখেননি বোধ হয়।

'সৌরভ' গল্পে মেয়ের 'ইভনিং ইন প্যারিস' নামক সেন্টের আবদার মেটাতে অক্ষম বাবা মেয়ের জমানো টাকা নিয়েই বেরিয়ে পড়েন, সঙ্গী হয় গ্লানি আর লজ্জা। তার মেয়ে তার অক্ষমতা বোঝে না, মাসের শেষে বায়না ধরে, টাকার অভাবে বাবা সেই বায়না মেটাতে পারে না বলে নিজের জমানো টাকা এনে হাতে গুজে দিয়ে অপমান করে, তার স্ত্রী ইনিয়ে-বিনিয়ে ভাইদের কাছে টাকা চেয়ে চিঠি লেখে। এটা কোনো জীবন হলো? – 'তাঁর মনে হলো তিনি কুকুরের জীবনযাপন করছেন। সাধ-আহ্লাদহীন বিরক্তিকর জীবন।' এরকম এক জীবনে দুর্ঘটনা যে নিত্যসঙ্গী হবে সেটি আর অস্বাভাবিক কি? ফলে বাসায় ফেরার পথে দোকানে গিয়ে সেন্ট কিনতে গিয়ে দেখেন, মেয়ের দেয়া টাকাগুলো তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু সেন্ট ছাড়া তিনি ফিরবেন কোন মুখে? নিরুপায় হয়ে কলিগের কাছ থেকে টাকা ধার করে মধ্যরাতে দোকান খুলিয়ে যখন বাড়ি ফেরেন, তখন বৃষ্টিভেজা পিচ্ছিল পথে পড়ে গিয়ে সেন্টের শিশিটিও হারিয়ে ফেলেন। গল্প এটুকুই। মনে হয়, এই সামান্য শখ পূরণ করতে অপারগ মানুষটির জীবনে এরকম বিদঘুটে দুর্ঘটনা তো না ঘটলেও পারতো। গ্লানির যেন আর শেষ নেই! কিন্তু হুমায়ূন ওখানেই থামেন না। গল্পের শেষ কয়েক পঙক্তি পড়লেই বোঝা যাবে, তিনি মানুষের কোন রূপটি দেখতে ও দেখাতে চান!

> 'জমে থাকা পানিতে ছপছপ শব্দ তুলে মা ও মেয়ে দুজনেই দ্রুত আসছিল। তিনি ব্যস্ত হয়ে রিকশা থেকে নামতে গিয়ে উল্টে পড়লেন। যে জায়গাটায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, সেখানটায় অদ্ভুত মিষ্টি সুবাস। তিনি ধরা গলায় বললেন, লিলি তোর শিশিটা ভেঙে গেছে রে।
লিলি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমার শিশি লাগবে না। তোমার কী হয়েছে বাবা?
গভীর জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন আজহার খাঁ। লিলি আর লিলির মা ভয়কাতর চোখে জেগে বসে আছেন। বাইরে বৃষ্টিস্নাত গভীর রাত। ঘরের ভেতরে হারিকেনের রহস্যময় আলো। জানালা গলে ভিজে হিমেল হাওয়া আসছে। সেই হাওয়া সেন্টের ভাঙা শিশি থেকে কিছু অপরূপ সৌরভ উড়িয়ে আনল।'

গল্পের শুরুতে যে কুকুরসদৃশ গ্লানিময় জীবনের দেখা পেয়েছিলেন পাঠকরা, শেষে এসে কি সেটি আমূল বদলে গেল না? মনে কি হয় না, ওই মমতাটুকু এক মনমাতানো সৌরভ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে জীবনের চারপাশে? এরকম অনুভূতির দেখা মিলবে 'জলছবি' 'জীবনযাপন' 'এইসব দিনরাত্রি' 'সুখ অসুখ' 'অপরাহ্ণ' প্রভৃতি গল্পেও।

হুমায়ুন আহমেদ প্রায়ই বলেন, তিনি মানুষের আলোকিত দিক নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন। হয়তো সেজন্যই তাঁর গল্পের মানুষগুলোর নানারকম নেতিবাচক কার্যকলাপের ভেতর থেকেও তাদের ইতিবাচক দিকগুলোকে উদ্ভাসিত করে তোলেন। আমরা, পাঠকরাও তো আমাদের ইতিবাচক দিকগুলোকে ফিরে ফিরে দেখতে ভালোবাসি এবং নেতিগুলো এড়িয়ে যেতে চাই। হুমায়ুনের লেখার ভেতরে আমরা আমাদের এই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে পাই এবং সাদরে গ্রহণ করি। তাঁর এই বিপুল পাঠকপ্রিয়তার এটিও একটি কারণ।

৩

শুধু আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন নয়, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পাঠকরা প্রথমবারের মতো তাদের সমস্ত আনন্দ ও বেদনার, সুখ ও দুঃখের সন্ধান পেয়েছিলেন হুমায়ুনের রচনায়। তাঁর প্রথম দুটো উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' এবং 'শঙ্খনীল কারাগার' আমাদেরকে যে ছবি উপহার দিয়েছিল সেটি এর আগে আর কখনো বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়নি। মধ্যবিত্ত জীবনের এমন ছোটখাটো অনুষঙ্গও যে উপন্যাসের বিষয় হতে পারে, সেটি এই উপন্যাস দুটোর আগে কে-ই বা ভাবতে পেরেছিল? আর এই জীবনকে এর খুঁটিনাটিসহ এমন গভীরভাবে চেনার প্রমাণই বা আর কে দিতে পেরেছিলেন, হুমায়ূনের আগে? আমাদের সাহিত্য জগতে মধ্যবিত্তরা তো অবহেলিত চরিত্রই ছিল, যেন তারা কোনো মানুষই নয়, তাদের কোনো সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা নেই। আর বুদ্ধিজীবীদের কাছে তো তারা রীতিমতো ভিলেন। হুমায়ূন এসে দেখালেন— মধ্যবিত্তরা যন্ত্র নয়, ভিলেনও নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলার কথাশিল্পীদের প্রিয় চরিত্রদের— দরিদ্র মানুষদের— চেয়ে তাদের দুর্দশা এবং সংকটও কম নয়। প্রথা ভেঙে একটি শ্রেণীর দিকে মানবিক চোখে তাকিয়েছিলেন তিনি, মমতা ও সহানুভূতি দিয়ে এঁকেছিলেন তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ কথা, হয়ে উঠেছেন মধ্যবিত্ত জীবনের যথার্থ রূপকার। একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে, তিনি তাঁর গল্পগুলোতে জীবনের খুব গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেন না, বরং উপরিতলের বর্ণনার মধ্যেই গল্পকে সীমাবদ্ধ রেখে মানুষের মমতাময় একটা রূপ আঁকার চেষ্টা করেন। এ কথা মনে করার কোনো অবকাশ নেই যে, এই জীবনকে তিনি গভীরভাবে দেখেননি বা চেনেন না বা বোঝেন না। বরং স্বল্পপরিসরের গল্পগুলোতে তিনি যেভাবে জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখের কথা বলেন, অক্ষমতার বেদনা আর সামান্য প্রাপ্তিতে বিপুল আনন্দের ছবি আঁকেন, তাতে বোঝা যায়— খুব সূক্ষভাবেই এই জীবনকে চিনেছেন তিনি। কিন্তু এ-ও সত্যি যে, তিনি কখনো এইসব সংকট ও বিপর্যয়ের কারণ সন্ধান করেন না। খুবই হালকা চালে গল্প বলেন তিনি। মধ্যবিত্তই আমাদের দেশে সবচেয়ে বিচিত্র শ্রেণী। একাধারে তারা আপোসহীন ও সুবিধাবাদী, ত্যাগী ও স্বার্থপর। হুমায়ূনের কলমে তাদের এই দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ-পরস্পরবিরোধী রূপগুলো কখনো ধরা পড়ে না।

যাহোক, 'নিতান্তই সহজ সরল' এই গল্পগুলো পড়লে বোঝা যায়, বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের স্পর্শকাতর বিন্দুগুলো হুমায়ূনের মতো এত ভালো করে আর কেউ চেনেননি। এইখানটায় আমি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিল খুঁজে পাই। সম্ভবত শরৎচন্দ্রই প্রথম লেখক যিনি বাঙালির আবেগ-আকাঙ্ক্ষার জায়গাগুলো সূক্ষভাবে চিহ্নিত করে সেগুলোকে নিপুণ দক্ষতায় ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। একজন মানুষের যেমন কিছু স্পর্শকাতর বিন্দু থাকে, সেসব বিন্দুতে আঘাত পেলে এমনকি স্পর্শ পেলেও সে আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে— রেগে যায়, স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে, উচ্ছ্বসিত হয়, বা চোখ ভিজে ওঠে; তেমনি একটি জাতিরও তেমন কিছু স্পর্শকাতর-আবেগবিন্দু থাকে। সেই আবেগবিন্দুগুলোকে চিনে নেয়া অত্যন্ত দুরূহ কাজ। শরৎচন্দ্র হচ্ছেন বিশ্বসাহিত্যের সেই বিরলতম লেখক যিনি একটি জাতির তেমনই একটি আবেগবিন্দুকে খুব ভালোভাবে শনাক্ত করেছিলেন আর নিজের করণ-কৌশলকে সেই বিন্দুর অনুগামী করে তুলেছিলেন। তিনি জেনে ফেলেছিলেন, ঠিক কোন বিন্দুতে টোকা পড়লে বাঙালির চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। শরৎচন্দ্র যেমন বাঙালি জাতির আবেগপ্রধান স্পর্শকাতর বিন্দুগুলোকে চিনতেন, হুমায়ূন আহমেদ অতখানি না হলেও বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের হাসি-কান্নার বিন্দুগুলো চেনেন, অনায়াসসাধ্য দক্ষতায় তিনি তাঁর পাঠক-দর্শকদের হাসিয়ে-কাঁদিয়ে চলেছেন। হুমায়ূনের বিপুল গ্রহণযোগ্যতার আরেকটি কারণ এটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

মাঝে মাঝে আমার এরকম প্রশ্ন মনে জাগে— এই যে পাঠকরা গল্প-উপন্যাস-কবিতা পড়ে, শ্রোতারা গান শোনে, দর্শকরা নাটক-সিনেমা দ্যাখে, এর ভেতরে কোনগুলো তারা মনে রাখে আর কোনগুলো ভুলে যায়? নিজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, যে লেখাগুলো বা গানগুলো বা যে নাটকটি বা যে সিনেমাটি মনের গভীরে কোথাও ছাপ ফেলে, সেটিই মনে থাকে, বাকিগুলো ভুলে যেতে হয়। আর এই ছাপ ফেলার জন্য বেদনাবোধ এক দারুণ কার্যকর অস্ত্র। আনন্দের গল্পগুলো আমাদের মনে থাকে না, কিন্তু যে গল্প গভীর বেদনার জন্ম দেয় সেগুলো ভুলতে পারি না। হুমায়ূন আহমেদের প্রেমের গল্পগুলো এই দ্বিতীয় দলের। প্রেমের গল্প না বলে এগুলোকে না-পাওয়ার গল্প বললেও ভুল বলা হবে না। 'রূপা', 'একটি নীল বোতাম' বা 'কল্যাণীয়াসু' অসাধারণ গল্পপাঠের অভিজ্ঞতা দেয়। 'ভালোবাসার গল্প', 'নন্দিনী', 'একজন ক্রীতদাস', 'গোপন কথা', 'শঙ্খমালা' 'অসময়' 'পাখির পালক' প্রভৃতি গল্পগুলো পড়লেই বোঝা যাবে, হুমায়ূন শেষ পর্যন্ত পাঠকের মনে বেদনা সঞ্চার করতেই চেয়েছেন। অমীমাংসিত সম্পর্কের বেদনা, কাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক গড়ে না ওঠার বেদনা, তুচ্ছ কারণে বা কোনো কারণ ছাড়াই সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার বেদনা, না-পাওয়া, না-হওয়ার বেদনা, এবং কোনোভাবেই এসবের কার্যকারণ খুঁজতে না যাওয়া— হুমায়ূনের প্রেমগুলো যেন এরকমই। আমরাও এইসব জাদুকরী গল্পে জর্জরিত হই, মন খারাপ করে একা একা ঘুরে বেড়াই।

৫

হুমায়ূন আহমেদের গল্পগুলো মধ্যে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে মুক্তিযুদ্ধ। 'জলিল সাহেবের পিটিশন', 'উনিশ শ 'একাত্তর, 'অসুখ' 'শ্যামল ছায়া' প্রভৃতি এ ধরনের গল্প। এর কেনোটিতেই অবশ্য যুদ্ধের ব্যাপারটি সরাসরি আসেনি, তবু মুক্তিযুদ্ধে অর্জন ও আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, ত্যাগ-তিতিক্ষার এক সূক্ষ্ম অথচ হৃদয়গ্রাহী বিবরণ আছে।

'শ্যামল ছায়া' গল্পে আমরা 'অশিক্ষিত' পিতামাতার এক 'শিক্ষিত' সন্তানের দেখা পাই, যে নিজেকে দেশ সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ বলে মনে করে। যুদ্ধ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের এই চরিত্রের মাধ্যমে আমরা একজন মহান আত্মত্যাগী মুক্তিযোদ্ধার ত্যাগের কনসেপশনের সঙ্গে পরিচিত হই। যুদ্ধ এখানে সরাসরি আসেনি, এসেছে খুবই ইঙ্গিতপূর্ণভাবে, কিন্তু যুদ্ধ শেষে সে ক্র্যাচে ভর দিয়ে ফিরে এসে যখন বলে 'একটি স্বাধীনতার কাছে এই ক্ষতি খুব সামান্য' তখন লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার মতো এই চরিত্রের সুমহান আত্মত্যাগ মহিমান্বিত ও আলোকিত হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত যে আত্মত্যাগ তবু কি প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে বাংলাদেশের? স্বাধীনতার পর বিস্ময়করভাবে ঘাতকদের ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, এবং সুযোগ বুঝে অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে ঘাতকরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে, এমনকি রাষ্ট্রক্ষমতায়ও। কিন্তু কীভাবে এটা মেনে নেবে এদেশের মানুষ, বিশেষ করে যারা লক্ষ শহীদের নিকটজন? 'জলিল সাহেবের পিটিশন' গল্পে আমরা দুজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পিতাকে দেখতে পাই যিনি ঘাতকদের বিচারের দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করেছেন। বিস্মৃতি-প্রবণ সুবিধাবাদী মানুষের কাছ থেকে তিনি নানা রকম বাধা পাচ্ছেন বটে, কিন্তু তিনি দমবার পাত্র নন—

> 'আমি ছেড়ে দেব? ছাড়ব না। আমার দুই ছেলে ফাইট দিয়েছে। আমিও দেবো। মৃত্যু পর্যন্ত ফাইট দেবো। দরকার হলে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের সিগনেচার জোগাড় করব। ত্রিশ লক্ষ লোক মারা গেল আর কেউ কোনো শব্দ করল না? আমরা মানুষ না অন্য কিছু বলেন দেখি?'

চরিত্রটির মাধ্যমে হুমায়ূন যেন এক ধরনের প্রতিবাদ সংগঠিত করতে চেয়েছেন, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এই প্রতিরোধ আজ গড়ে উঠছে, কিন্তু এটা হওয়ার কথা ছিল অনেক আগেই। হুমায়ূন আহমেদ যেন সেই আহ্বানই জানিয়েছিলেন। গল্পে জলিল সাহেব কাজটি সম্পন্ন করার আগেই মৃত্যুবরণ করেন কিন্তু মৃত্যুর আগে নাতনির কাছে স্বাক্ষর-খাতাটি দিয়ে গিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন— একদিন নিশ্চয়ই ওটা নিতে কেউ আসবে, নতুন করে আবার কাজটি শুরু হবে। নাতনির চরিত্রটি নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি। হুমায়ুন জানিয়ে দেন–দায়িত্ব বর্তেছে নতুন প্রজন্মের ওপরেই, সে দায়িত্ব যেন তারা পালন করে। হুমায়ূনের এই গল্পটি খুবই শক্তিশালী ও বক্তব্য-সমৃদ্ধ। এ ধরনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'অসুখ'। গল্পটিতে একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার মায়ের চরিত্র আছে, যিনি সন্তানের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের কথা শুনে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছেন। আছে আরেকটি চরিত্র রঞ্জু, যে সেই শহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। রঞ্জু ওই বাড়িতে যেতে চায় না, তবু ওখানকার সবাই তাকে খুঁজে বেড়ায়। তাকে গিয়ে মায়ের সামনে বসতে হয়। মিথ্যে করে বলতে হয়— পাকিস্তানিরা তাঁর সন্তানকে জবাই করে হত্যা করেনি, ওর তলপেটে গুলি লেগেছিল। মিথ্যা বলার জন্য তার অনুশোচনা হয় না। তবু সে ওখানে যেতে চায় না। কারনটি কি? —

> মিথ্যা কথা বলতে আমার কখনও খারাপ লাগে না। একজন মাকে প্রবোধ দেবার জন্য আমি এক লক্ষ মিথ্যা অনায়াসে বলতে পারি। কিন্তু তবুও কখনো এ বাড়িতে আসতে চাই না। অপ্রকৃতিস্থ এই মহিলাটির সামনে এসে বসলেই আমি নিজেও কিছু পরিমাণে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ি। সীমাহীন ক্রোধ আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে কোন একটি ভয়ংকর অপরাধ করি। যে অপরাধের কথা এর আগে কেউ কখনো শোনেনি। কিন্তু আমি তা করতে চাই না।... আমি অন্য দশজনের মতো স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চাই। একটি ছোট্ট ঘর, একজন মমতাময়ী নারী। একজন মানুষ খুব বেশি কিছু তো কখনো চায় না।'

গল্পটিতে রঞ্জু চরিত্রের কোনো ধারাবাহিক বিকাশ ঘটেনি। কিন্তু এই অংশটুকুতেই তার চরিত্রের একটা স্পষ্ট রূপ ধরা পড়ে আমাদের কাছে। হ্যাঁ, একজন মানুষ খুব বেশি কিছু চায় না। কিন্তু রঞ্জুরা চেয়েছিল বহু মানুষের মুক্তি, তাদের ছিল সুমহান আত্মত্যাগের প্রেরণা। কিন্তু স্বাধীন দেশে তাদের ব্যক্তিগত সামান্য চাহিদাও পূরণ হয়নি, সমষ্টিগত তো নয়ই। রঞ্জুরা তাই জ্বলছে আজও ভেতরে ভেতরে, যদিও তার প্রকাশ নেই। রঞ্জুর যে সীমাহীন ক্রোধ' তা কি এই সমাজ ব্যবস্থা, এই দুর্নীতিগ্রস্থ নেতৃত্ব, শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক সীমাহীন লুটপাট ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতি নয়? তারা বিদ্রোহে জ্বলে, কিন্তু কেন তার প্রকাশ নেই? কেন জীবন হাতে করে যারা যুদ্ধে গিয়েছিল তারা এখন 'স্বাভাবিক জীবন' আর 'ছোট্ট একটি ঘরের' স্বপ্নে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে? এসব প্রশ্ন হুমায়ূন খুব তীব্রভাবে ছুঁড়ে দেন পাঠকের উদ্দেশ্য।

৬

কত রকম গল্প যে লিখেছেন হুমায়ূন, তার ইয়ত্তা নেই। 'অদ্ভুত গল্প', 'ভৌতিক গল্প', 'অতিপ্রাকৃত গল্প' ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে তিনি যে গল্পগুলো লিখেছেন, বাংলাদেশের গল্পসাহিত্যে তা পুরোপুরি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাংলা সাহিত্য থেকে তো এই ধরনের গল্পগুলো হারিয়েই গিয়েছিল, তিনি সেগুলোকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন। 'ছায়াসঙ্গী' 'ভয়' 'পিপড়া' 'সে' 'কুকুর' 'আয়না' প্রভৃতি গল্পের উদাহরণ বাংলা গল্পের দীর্ঘ ইতিহাসে খুব সুলভ নয়। 'খাদক' 'চোখ' 'অচিন বৃক্ষ' 'অয়োময়' 'আয়না' 'ভয়' 'ব্যাধি' 'কুকুর' 'পিশাচ' 'গন্ধ' 'গুনীন' 'অঁহক' প্রভৃতি গল্পগুলোকে কোনো গোত্রবদ্ধ করাই কঠিন, কোনো শিরোনামেই এসব গল্পের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে না। একজন ভার্সেটাইল লেখক হয়ে ওঠার সমস্ত গুণই তার আয়ত্তে। যখন সায়েন্স ফিকশন লিখেছেন তিনি, সেগুলোকে নিয়ে গেছেন এক ভিন্নতর উচ্চতায়। সেগুলো শুধু বিজ্ঞান বা ফিকশন থাকেনি, তাঁর হাতে পড়ে হয়ে উঠেছে মানবিক অনুভূতির দলিল। তাঁর রচিত সায়েন্স ফিকশন এই একটি জায়গায় পৃথিবীর অন্য সব সায়েন্স ফিকশন থেকে আলাদা। 'তোমাদের জন্য ভালোবাসা' 'শূন্য' 'নি' প্রভৃতি উপন্যাস সেই প্রমাণ দেবে। আবার মানবমনের গূঢ়-অপার রহস্য নিয়ে তিনি যে মিসির আলী সিরিজ রচনা করেছিলেন, প্রথম দিকে তা-ও ছিল এক গভীর মানবতাবোধে উজ্জীবিত। এমনকি তাঁর হিমু চরিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে তিনি প্রথমদিকে খুঁজতে চেয়েছিলেন প্রকৃতির অব্যাখ্যাত রহস্য। জীবন নামক একটি ঘরে যদি দুটো দরজা থাকে, তার একটি দরজা বিজ্ঞান ও যুক্তি ও দর্শন ও ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞানের, যেগুলো দিয়ে এই জীবনকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলছে হাজার বছর ধরে; আর অন্য দরজাটি এখনো খোলাই হয়নি, সেটি রহস্যময়তায় ভরা, হুমায়ূন সেই দরজাটি খুলতে চেয়েছিলেন হিমুকে দিয়ে। কিন্তু এই কথাগুলো বলা হলো তাঁর প্রথমদিকের রচনা সম্বন্ধে। পরবর্তীকালে জনপ্রিয়তার পিচ্ছিল পথ তাঁকে নিয়ে গেছে পতনের দিকে, তাঁর অপরিণত-অপরিপক্ক টিনএজ পাঠকগোষ্ঠীর মন জুগিয়ে লিখতে গিয়ে করেছেন ক্ষমতার অপব্যবহার। এমনকি হিমুকে তিনি শেষ পর্যন্ত বানিয়ে ফেলেছেন এইসব তরুণদের উদ্ভট আনন্দফূর্তির সঙ্গী। ঘোরগ্রস্থ-জীবনবিমুখ-উদ্ভট হিমুর ভক্তরাও হয়ে উঠলো জীবন-বিমুখ, সমাজ-বিমুখ, রাজনীতি-বিমুখ। শেষ পর্যন্ত চরিত্রটি তাই নেতিবাচক প্রভাবই ফেলেছে একটি প্রজন্মের ওপর।

উপসংহারের পরিবর্তে

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর প্রথম দুটো উপন্যাসেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, এই প্রথম একজন লেখক মধ্যবিত্ত পাঠকের নিজেদের মানুষ হিসেবে তাদের জীবনের আনন্দ-বেদনা আর সুখ-দুঃখের কথা বলতে এসেছেন। এরপর একের-পর-এক গল্প-উপন্যাস আর টেলিনাটকেও তিনি এঁকে গেছেন মধ্যবিত্ত জীবনের মমতামাখা ছবি। কিন্তু বিস্ময়কর পাঠকপ্রিয়তা পাওয়ার পর তিনি আর নিজেকে 'ছোট ছোট দুঃখ কথা'র ভেতরে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। পাঠককে তিনি নিয়ে যেতে চেয়েছেন এক স্বপ্নঘোরগ্রস্ত পৃথিবীতে— যে পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের কখনো দেখা হয় না; সৃষ্টি করেছেন হিমু বা মিসির আলির মতো অদ্ভুত সব চরিত্র— যারা আদৌ আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে বাস করে না, যাদের জীবনযাপনের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কোনো সম্পর্কসূত্র নেই, যাদের কাজকর্ম প্রায়-উদ্ভট ও অপরিচিত, শুধু স্বপ্ন ও কল্পনাতেই তাদেরকে পাওয়া সম্ভব, বাস্তবে নয়। হুমায়ুন পাঠককে অতি দক্ষতার সঙ্গে সেই স্বপ্ন ও বিভ্রমের জগতে পরিভ্রমণ করান, পাঠক আনন্দ পায়; অভিভূত হয়, সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয় তার দৈনন্দিন সংকট ও বাস্তবতা। বলা বাহুল্য যে, পাঠ শেষে পাঠক তার বেদনাক্লিষ্ট-সমস্যাজর্জরিত-সংকটমুখর ক্লান্ত জীবনে ফিরে আসে। কিন্তু ওই ক্ষণিক বিস্মৃতি ও বিভ্রম তাদের আনন্দ দেয় বৈকি! নিজের দুঃখ-কষ্ট-সংকট-সমস্যা ভুলে থাকার মতো আনন্দ আর কিসে আছে? হুমায়ুন ভাগ্যবান ও সফল। তিনি যেখানে হাত দিয়েছেন, সোনা ফলেছে। তিনি যখন তাঁর মধ্যবিত্ত পাঠকদের প্রতিদিনের জীবনকে আঁকলেন, পাঠক সেটি গভীর আবেগ ও ভালোবাসা নিয়ে গ্রহণ করলো; আবার যখন তাদেরকে ভুলিয়ে দিতে চাইলেন নিজেদের করুণ বাস্তবতা, পাঠক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটিও গ্রহণ করলো! এরকম বিস্ময়কর গ্রহণযোগ্যতা বাংলা সাহিত্যে এর আগে কখনো দেখা যায়নি।

হুমায়ূন আহমেদ সবসময় তাঁর পাঠককে কমিউনিকেট করেছেন এক সহজ-সরল-প্রাণবন্ত ভাষায়। কোন লেখক আছেন যিনি ভাষার মাধুর্য ও শক্তিমত্তা নিয়ে খানিকটা খেলা করতে পছন্দ করেন না? একমাত্র হুমায়ূনই ব্যতিক্রম— তাঁর সাহিত্যের ভাষা বরাবরই আটপৌরে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষা এবং বাকভঙ্গি থেকে যা এতটুকু পৃথক নয়। তাঁর লেখা উপভোগ করার জন্য পাঠককে একেবারেই শ্রম স্বীকার করতে হয় না। একজন লেখকের প্রধান কাজটিই তো পাঠককে কমিউনিকেট করা। হুমায়ূন তাঁর পাঠকদের আবেগ-অনুভূতি বোঝেন, কোথায় কোন কথাটি ব্যবহার বললে পাঠক আবেগাপ্লুত হবেন তিনি জানেন। তাঁর ভাষা এবং কমিউনিকেশন টেকনিক তাই পাঠকের আগ্রহ-আনন্দ ও ভালোবাসার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

হুমায়ূন আহমেদ যা-ই লেখেন না কেন, তাঁর উপস্থাপন পদ্ধতিটি এত চমৎকার যে, অবাস্তব কল্পকাহিনীও সত্য বলে মনে হয়। বিশ্বাসযোগ্যভাবে যে কোনো কিছু উপস্থাপন করার এই দুর্লভ ক্ষমতাই তাঁকে পরিণত করেছে গল্পের জাদুকরে। বহুকাল পর আমরা এমন এক কথাকার পেয়েছি যিনি হাসাতে চাইলে আমরা হাসি, কাঁদাতে চাইলে কাঁদি, আর যখন স্বপ্নঘোরগ্রস্ত বিভ্রান্তি তৈরি করেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভ্রান্ত হই।

রচনাকাল : ডিসেম্বর, ১৯৯৩
প্রথম প্রকাশ : ৭ জানুয়ারি, ১৯৯৪, দৈনিক জনকণ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইমদাদুল হক মিলন : গাহে অচিন পাখি

প্রাককথন

এক সাক্ষাৎকারে ইমদাদুল হক মিলন নিজের লেখালেখি প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকারোক্তি করেছিলেন— 'আমার কাছে মনে হলো কাগজে নাম ছাপা হওয়া একটা বিশাল ব্যাপার। ...এরপর শুধু পত্রিকায় নাম ছাপা হবে এই লোভে আমি অনেকগুলো বছর লিখেছি। সেটা সাহিত্য হয়ে উঠলো কি উঠলো না ভাবি নি। কোনটা ভালো পত্রিকা, কোনটা যৌন পত্রিকা বাছ-বিচার করিনি।... এক পর্যায়ে বুঝতে শিখলাম আমি যা লিখছি তা সাহিত্য হয়ে উঠেছে না।'

মূলত বাছবিচারহীন এ ধরনের মোহগ্রস্ত লেখার মাধ্যমেই তাঁর পরিচিতি গড়ে ওঠে, হয়ে ওঠেন দারুণ জনপ্রিয় একজন লেখক। মিলনের প্রথম যে গ্রন্থটি 'হিট' হয়েছিল সেটি ছিল হালকা ধরনের প্রেমের উপন্যাস— 'ও রাধা ও কৃষ্ণ'। এরপর থেকে জনপ্রিয়তার লোভেই হোক অথবা বাণিজ্যিক কারণেই হোক, এ ধরনের লেখা তিনি প্রচুর লিখেছেন; আর এ জন্য তাঁকে হতে হয়েছে নিন্দিত ও সমালোচিত এবং বিপুল দুর্নামের ভাগিদার।

কিন্তু এসবের বাইরে শিল্পসম্মত যে-সব লেখা লিখেছেন মিলন, তাঁর দুর্ভাগ্য যে সেগুলো তেমনভাবে সমালোচক ও গভীরমনস্ক পাঠকের মনোযোগ পায়নি। মিলনের সব রচনাকেই সাহিত্যবোধহীন এবং নিম্নমানের লেখা হিসেবে বর্ণনা করার একটা চল দেখা যায় আমাদের সাহিত্য-জগতে। অথচ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তিনি যদি জনপ্রিয় ধারায় গা না ভাসিয়ে শুধুমাত্র তাঁর ভালো লেখাগুলোর স্রষ্টা হতেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই পাঠক-সমালোচকদের কাছে তিনি পরিচিত হতেন একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখক হিসেবে। তাঁর 'গাহে অচিন পাখি', 'রাজার চিঠি', 'নিরন্নের কাল', 'জোয়ারের দিন' প্রভৃতি গল্প নিয়ে গৌরব করা যায়। 'পরাধীনতা', 'ভূমিকা', 'ভূমিপুত্র', 'কালাকাল', 'নদী উপাখ্যান' প্রভৃতি উপন্যাস গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। মিলনের ব্যর্থতা ও দুর্ভাগ্য এই যে, পাঠকের কাছে তিনি এসব রচনাকে প্রধান করে তুলতে পারেননি। তিনি এখনো পরিচিত ও সমালোচিত হচ্ছেন শুধুমাত্র জনপ্রিয় ধারার লেখক হিসেবেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই রচনাটি মিলনের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলো নিয়ে আলোচনা। এই গল্পগুলো তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ও ধারার বাইরে ভিন্ন ধারা ও বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। উল্লেখিত গ্রন্থের মোট চব্বিশটি গল্পের মধ্যে বারোটির পটভূমি গ্রাম, বাকিগুলোর শহর। কিন্তু একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে— প্রায় সবগুলো গল্পের প্রধান চরিত্র নিঃস্ব মানুষ আর এসব চরিত্র তাঁর কলমে উঠে এসেছে পরিপূর্ণভাবে, গভীর পর্যবেক্ষণলব্ধ বোধ ও ভালোবাসা থেকে। জীবনের যাবতীয় আশ্রয়-ঐশ্বর্য-গৌরব-উজ্জ্বলতা-সক্ষমতা হারিয়ে ফেলা রিক্ত-দুঃখী-পীড়িত-লাঞ্ছিত-বেদনাক্রান্ত ভাসমান ছিন্নমূল মানুষ, অতীত গৌরবের স্মৃতিক্লিষ্ট নস্টালজিক অসহায় মানুষ গল্পগুলোতে চমৎকার কুশলতায় চিত্রিত হয়েছে। 'গাহে অচিন পাখি' গল্পটির কথা ধরা যাক, যেটিতে আমরা একজন সর্বস্ব হারিয়ে ফেলা চূড়ান্ত নিঃস্ব মানুষ 'পবনার' সঙ্গে পরিচিত হই যাকে মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করাই কষ্টকর। তার স্থায়ী নিবাস গ্রামের একটা বাজার এবং তার সর্বক্ষণিক সঙ্গী একটা নেড়ি কুকুর, যেটার সঙ্গে তার সাদৃশ্য তীব্রভাবে গল্পে চিহ্নিত হয়েছে। ওই বাজারের পটভূমিতে গড়ে ওঠা গল্পটিতে আমরা পবনার জীবনকাহিনী তার নিজেরই মুখে শুনতে শুনতে আবেগে অভিভূত এবং গভীরভাবে আপ্লুত হই। পবনা বাজারে থাকে কিন্তু তার নিজের বলতে কিছু নেই, তার দিন চলে চেয়ে-চিন্তে, যদিও দোকানিরা তাকে দেখলে খেপে যায়, 'কুত্তা বেড়াল খেদানোর মতো' দূরদূর করে। তার জীবনযাপনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা যাক।

> 'মাছ চালার মাটিতে শোয় পবনা, মাটিতে বসে। ফলে গায়ের রঙ হয়েছে বাজারের বাইলা মাটির মতো। আর পবনার গায়ের গন্ধটা বটে, বাজারের হাজার বছরের পুরনো গন্ধটাও বাইসাব রে বলে পালায়। রাতের বেলা পবনা যখন মাছ চালায় শোয়, কুত্তাটাও থাকে পাশে। পাশাপাশি দুটো জীবকে একই রকম দেখায়।'

একদিন বাজারের এক মিষ্টির দোকানি লতিফ ময়রা আধ-মন মিষ্টির অর্ডার পেয়ে বানাতে বসলে পবনা সেখানে গিয়ে হাজির হয়, স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে কথাবার্তা শুরু করে এবং প্রতিটি কথার শেষে একটি বাক্য শোনা যায়— 'দিবেননি কত্তা একখান আমিত্তি?' তার সারাজীবনের সাধ— একদিন পেট ভরে আমৃত্তি খাবে, কিন্তু এই অতি সাধারণ সাধটিও অপূর্ণই রয়ে গেছে। এক সময় পবনা ঘোষণা করে, এক বসায় সে আড়াই-সের আমৃত্তি খেতে পারবে। বাজারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেক দোকানি আউয়াল ঝোঁকের মাথায় বাজি ধরে ফেলে— যদি পবনা সত্যিই আড়াই-সের আমৃত্তি খেতে পারে তাহলে সে আমৃত্তির দাম দেবে এবং কাল থেকে পবনার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করবে, আর না পারলে শাস্তি। পবনা রাজি হয় আর খেতে খেতে সে তার বিপন্ন জীবনকাহিনী শোনায়। তার বাবা ছিল কুখ্যাত ডাকাত যার ভয়ে 'গেরস্থ'রা রাতে ঘুমাত না, 'পোলাপান' কান্না থামিয়ে দিতো। তাকে মেরে ফেলেছিল নিজ দলের লোকেরাই। তার 'কল্লা'টা মাটির হাঁড়িতে করে তার বাড়িতে দিয়ে গিয়েছিল একজন। পবনার খুব সাধ ছিল পেট ভরে আমৃত্তি খাওয়ার, ওই হাঁড়ি— যেটিতে ছিল তার বাবার ছিন্ন মস্তক— দেখে সে ভেবেছিল, হাঁড়ি-ভরতি বুঝি আমৃত্তি আছে। (পাঠক, চমকে উঠতে হয় না এই ট্র্যাজিক ভাবনায়?) কিছুদিন পরে মা-ও তার প্রেমিকের সঙ্গে চলে গেল পবনাকে একা রেখে। দাইমার কাছে বড়ো হলো সে, কাজকর্ম শুরু করলো, বিয়ে করলো। একদিন বউটাও মরে গেল সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে। তার কোনো মানবিক আশ্রয় রইলো না আর, রইলো না কোনো রকমের পিছুটান। ঘর ছাড়লো সে সারাজীবনের জন্য, আর কোনোদিনই ফেরা হলো না তার। অতঃপর এই ক্লিষ্ট জীবন-যাপন। এসব বলতে বলতে তার খাওয়া হয়ে যায়, বাজিতে জেতে, পুরণ হয় আজন্ম লালিত সাধ, কিন্তু দীর্ঘদিনের অনাহারী শরীরকে তার অচেনা বলে মনে হয়। পরদিন বাজারের পাশে, নদীর পাড়ে, দুই নৌকার মাঝখানে হাত পা ছড়িয়ে তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মোটামুটি এই হলো গল্পের কাহিনী— বেদনাঘন সর্বস্ব হারানোর গল্প। এই কাহিনী এবং পবনার চরিত্রটি এত নিবিড় মমতায় নির্মিত যে পাঠককে ওই একটি চরিত্রই গভীরভাবে স্পর্শ করে যায়। পাঠক পবনার হারানোর বেদনার সঙ্গে, তার নিঃস্বতা, নিঃসঙ্গতা ও হাহাকারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। গল্পটির প্রধান সার্থকতা এখানেই। গল্পটিতে মিলনের কিছু প্রতীকী কাজ খুব চোখে পড়ার মতো। যেমন পবনার সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে একটা নেড়ী কুকুরের উপস্থিতি বেশ প্রতীকী তাৎপর্যপূর্ণ। 'রাতের বেলা পবনা যখন ধুলোবালি গায়ে দিয়ে শোয় কুত্তাটাও থাকে পাশে। পাশাপাশি দুটো জীবকে একইরকম দেখায়'— বলে পবনার জীবনের সঙ্গে পরিচয়বিহীন বাজারের 'নেড়ী কুত্তার' সাদৃশ্য দেখানো আর তার তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবন ও নিঃস্বতার প্রতি লেখকের তীব্র অঙ্গুলি-নির্দেশ পাঠককে গভীরভাবে ভাবায়, তার চারপাশের জীবন-যাপনকারী মানুষের দিকে তাকিয়ে অপরাধবোধে ভুগতে বাধ্য করে। গল্পের শেষে কুত্তাটা দেখে— 'দু'খান নাওয়ের মাঝখানে তার প্রভু পবন ঠাকুর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। দেখে কুত্তাটা দু'তিনখান ঘেউ দেয়। পবন ঠাকুর নড়ে না। কুত্তাটা কি বোঝে কে জানে, সে আর ঘেউ দেয় না। একটা নাওয়ের সামনে পা তুলে পেচ্ছাব করে।'— অংশটি আরেকবার চাবুক মারে পাঠককে। পবনার মৃতদেহের পাশে কুকুরের ওই 'পেচ্ছাব' করা তার জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুচ্ছতাকে, তার চূড়ান্ত অমানবিক জীবনের গ্লানিকে তীব্রভাবে মূর্ত করে তোলে। শুধু তাই নয়, যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার কারণে পবনারা যাপন করে নেড়ি কুকুরের মতো বা তারচেয়ে জঘন্য মানের জীবন, বঞ্চিত হয় একটি সুস্থ-স্বাভাবিক মানবিক জীবন থেকে, ওই পেচ্ছাব কি সেই সমাজ ও সমাজব্যবস্থার মুখের ওপরও নয়? একজন নিঃস্ব মানুষের সব হারানোর একটি সাধারণ গল্পের এই অসাধারণ প্রতীকী আঘাত পাঠককে দাঁড় করায় বহু প্রশ্নের মুখোমুখি।

পবনার জীবন-চিত্র নির্মাণের অসাধারণ কুশলতা প্রদর্শন ছাড়াও মিলন এই গল্পে আরও কিছু সূক্ষ কাজ করেছেন। আউয়ালের ঝোঁকের মাথায় বাজি ধরার পর অতগুলো টাকা নষ্ট হওয়ার জন্য নিজের প্রতিই তার ক্ষোভ, অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী ঈর্ষাকাতর দোকানিদের চাপা আনন্দ খুব সূক্ষভাবে তুলে এনেছেন লেখক। কিংবা লতিফ ময়রার আমৃত্তি বানানোর দৃশ্য এবং সবকিছুর মধ্যেও তার আত্মমগ্ন ভাবনা— তার দিন বদলে যাবে; যদিও বহুবছর ধরে একই ভাবনা ভেবেও তার দিন বদলায়নি, আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে খাওয়ার মুখ; তার অদ্ভুত কৃচ্ছতা— একটা আমৃত্তিও সে খায় না কখনো, যদিও তীব্র সাধ জাগে খাওয়ার; ইত্যাদি বিষয়গুলো তাঁর কলমের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গল্পে লতিফ ময়রা প্রায় পূর্ণাঙ্গ একটি চরিত্র। তার ভাবনা, তার বিশ্বাস ও সংস্কার, প্রত্যাশা ও আনন্দের যে ছবি গল্পে আমরা দেখতে পাই তা থেকে তার অবস্থান, তার সংস্কৃতি ও জীবন-যাপনের একটি দৃশ্যপট আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। লতিফের এই চরিত্রটি এবং তার জীবন-যাপনের এই দৃশ্যপটকে গল্পের ভেতরে আরেকটি গল্প হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। প্যাঁচালো আমৃত্তি বানানোর অসাধারণ দৃশ্য দিয়ে লতিফের জীবনের একটি প্রতীক-চিত্র লেখক যে কুশলতার সঙ্গে নির্মাণ করেছেন, সেটিও অনবদ্য।

সামগ্রিকভাবে গল্পটির উপস্থাপন-কৌশল, ভাষা, গ্রামীণ জীবন চিত্রায়ণে লেখকের বিস্ময়কর দক্ষতা, প্রতীকময়তা সবকিছুই প্রশংসার দাবিদার। পবনাকে লেখক এঁকেছেন গভীর মমতা দিয়ে যে গল্প পাঠের দীর্ঘদিন পরেও চরিত্রটির প্রতি পাঠকের মনে এক গভীর মমতা-সহমর্মিতা-সহানুভূতি জেগে থাকে।

২

এই বেদনা, এই ক্রমাগত হারিয়ে ফেলা, নিঃস্ব-ক্লিষ্ট হয়ে যাওয়া, বিষণ্ন-বিপন্ন-নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়াই 'শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থভুক্ত প্রায় প্রতিটি গল্পের মূল বিষয়বস্তু। মানুষ প্রতিনিয়ত কিছু-না-কিছু হারিয়ে ফেলে, হয়তো পায়ও কিছু; কিন্তু বিশাল হারানোর তুলনায় ঐ পাওয়া এত তুচ্ছ ও সামান্য যে পাওয়ার আনন্দ আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, জেগে থাকে শুধু হারানোর গভীর বেদনা। মিলনের গল্পগুলোতে আমরা এ-সব কিছুর রূপায়ন দেখতে পাই। তাঁর গল্পে পবনার মতো অতি তুচ্ছ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ, ডাকাত, সাধু, ফকির, বাউল, বিভ্রান্ত তরুণ, ওঝা, বেশ্যা, গুণ্ডা কিংবা খুব গতানুগতিক জীবন-যাপনকারী সংসারী মানুষ, সবাই-ই হারানোর বেদনায় ক্লান্ত ও বিষণ্ন।

'কিরমান ডাকাতের প্রথম ও দ্বিতীয় জীবন' গল্পে আমরা কিরমান ডাকাতের সঙ্গে পরিচিত হই যে যৌবনে ছিল দুর্দান্ত সাহসী, চেহারা-সুরত ছিল 'রাজা বাদশার লাহান', শরীরে শক্তি ও সামর্থ্যও ছিল অপরিমেয়; সময় ও জীবনের অনিবার্য নিয়মে সবই হারিয়ে ফেলে সে। স্বাস্থ্য ও মনোবল, ইচ্ছা ও প্রত্যাশা সবই ক্ষয়ে যায়। মায়াবী হৃদয় তার, ভালোবাসার স্পর্শে সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিল, কিন্তু সমাজ ও প্রকৃতির বিরূপতা-বিরুদ্ধতা তাকে স্থিত হতে দেয়নি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে আবার ফিরে যায় ভয়ংকর জীবনে এবং অনিবার্য পতন তাকে গ্রাস করে— ধরা পড়ে হারায় তার চোখ, গালের চামড়া, পা। অতঃপর তার পঙ্গু জীবন-যাপন এবং সাগরেদদের 'গুরুদক্ষিণা' নামক দয়ার দানে বেঁচে থাকা। একদিন তারই এক সাগরেদ জগু— যার ঘর অভাবী-অনাহারক্লিষ্ট মানুষের হাহাকার আর কান্নায় ভারি হয়ে থাকে এবং যে দল থেকে বিতাড়িত— অনুরোধ নিয়ে আসে কিরমানকে তার সঙ্গে যেতে হবে। কোনো কাজ করতে নয়, শুধু বীভৎস চেহারাটা দেখিয়ে মানুষকে আতংকিত করে তুলতে। জগুর ক্ষুধার্ত পরিবারের কথা ভেসে সে রাজি হয়। পরদিন বিকেলে ব্যাপারীরা হাট থেকে ফেরার সময় জগু তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, কিরমান থাকে আড়ালে সময়-মতো সামনে যাবে বলে। কিন্তু যেমনটি হওয়ার কথা ছিল, তেমনটি ঘটে না। জগুকে দেখে টাকা দেয়ার বদলে ব্যাপারীরা তাকে জাপটে ধরে চিৎকার শুরু করে। কিরমান বুঝতে পারে, এ সময় তার জগুর সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া উচিত; কিন্তু কী এক গভীর ঔদাসিন্য অথবা বৈরাগ্য অথবা অনীহায় সে যায় না, যেতে পারে না অথবা যেতে ইচ্ছে করে না। জগু ওদের হাত ছাড়িয়ে দৌড় দেয়, কিরমানের বুক-চেরা দীর্ঘশ্বাসের মাধ্যমে গল্প শেষ হয়।

গল্পটির পুরো অংশ জুড়ে আমরা কিরমানের ক্ষয়িত রূপ দেখতে পাই। তার অক্ষমতা, তার ব্যর্থতা, বয়স্ক জীবনের ভার অতি তীব্রভাবে টের পাওয়া যায়। গল্পটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, যে চরিত্রটি আমাদের সমাজদেহে একটি দুষ্ট ক্ষতের মতো, যার নামে আমরা শংকিত ও ঘৃণা বোধ করি লেখক সেই চরিত্রের প্রতি এক ধরনের মমতা সৃষ্টি করে দেন। জগুর ঐ দৌড়ে পালানোর দৃশ্য দেখে কিরমানের দীর্ঘশ্বাসের মতো আমাদেরও দীর্ঘশ্বাস পড়ে, মনে হতে থাকে— জগুর পরিবার আজও না খেয়ে থাকবে, মনে হয় কিরমান শেষ পর্যন্ত ওই ব্যাপারীদের মাথায় একটা কোপ দিলেই বুঝি ভালো করতো।

'খেলোয়াড়' গল্পের বীরুকেও আমরা তার অপ্রাপ্তির বেদনায় পরিপূর্ণ জীবনের একমাত্র আনন্দ— একটি দৃশ্যকে হারিয়ে ফেলতে দেখি। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয়াবহ টানাপোড়েনময় জীবনের কাছে পরাজিত বাবা, বিষণ্ন সংসার-যন্ত্রের মতো মা, একগাদা অকেজো ভাইবোনের সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা বীরু ভোরে দৌড়াতে গিয়ে প্রতিদিন একটি স্বপ্নময় বাড়ির সামনে দাঁড়াতো। সেই বাড়ির একটি কামরায় নীল আলো জ্বলে, 'লো ভল্যুমে ভারি সুন্দর একটি মিউজিক' বাজে আর সেখানে স্বপ্নের মতো একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বীরুর প্রতীক্ষায়ই কি? ভেবে তার ভারি আনন্দ হয়, তার হাহাকারপূর্ণ জীবনে ওটাই একমাত্র প্রাপ্তি। কিন্তু একদিন মেয়েটি অন্য এক উজ্জ্বল যুবকের সঙ্গে মোটর সাইকেলে উঠে বসে, বীরুর দিকে ফিরেও তাকায় না। তার বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে, বেঁচে থাকাকে অর্থহীন মনে হয়, সবকিছুর ওপর দুঃখী আর উদাসীন ছায়াপাত ঘটে। আবার শুরু করতে হবে সবকিছু, এই ভেবে সে দৌড়াতে শুরু করে, দৌড়াতে থাকে। এই দৌড়ানো কি তার দুঃখকে, হতাশা ও ব্যর্থতাকে, বেদনা ও হাহাকারকে পিছেনে ফেলে যাওয়ার জন্য? আসলে কি পালানো যায় কোথাও এসব থেকে, দূরে?

সোনাদাস বাউলের একমাত্র আশ্রয়টিও হারিয়ে ফেলার আখ্যান শোনান লেখক 'সোনাদাস বাউলের কথকতা' গল্পে। সে থাকতো 'বাজারের পেছন দিকে গগনবাবুর ধান-চালের আড়তে—আড়তের ভেতর ধান-চালের বস্তাগুলোর আড়ালে এক চিলতে ঠান্ডা মাটি। দুটো আড়াই মনী বস্তা কেটে সোনাদাস সেখানে বিছানা পেতেছে। মাথার কাছে স্কুলঘরের দুখানা থান ইট।' এই সাধারণ আশ্রয়টিও তাকে হারাতে হয়। কারণ গগনবাবু আড়ত বিক্রি করে ভারতে চলে যাচ্ছেন। সোনাদাস তার গান হারিয়েছে, হারিয়েছে জীবনের যাবতীয় সবকিছু, ছোট্ট আশ্রয়টুকুও শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যায়, হারিয়ে ফেলতে হয়।

যৌবনের ঐশ্বর্যময় দিন হারিয়ে গেছে বদ্যিবুড়োর জীবন থেকেও যার সঙ্গে আমাদের দেখা হয় 'বদ্যিবুড়োর জীবনকথা' গল্পে। যৌবনে সে ছিল গরুর ওঝা, দশগ্রামে নাম-ডাক ছিল, সম্মান ও চাহিদা ছিল, এখনো হয়তো নামটা আছে, ডাকটা নেই। বস্তুত সে নিজেই নেই কোথাও। এখন তার সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে, না থাকার মতোই বেঁচে আছে ভয়াবহ দুঃসময় ও দুরবস্থার মধ্যে। তার জন্য কোথাও আর কিছু অবশিষ্ট নেই, তার জন্য কোনো ভালোবাসার স্থান নির্দিষ্ট নেই। বদ্যিবুড়ো জীবনের জটিলতা বোঝে না, তার এই ক্ষয়ে যাওয়া আর অপ্রয়োজনীয় ভার হয়ে ভয়াবহভাবে বেঁচে থাকার পেছনে যে অর্থনৈতিক কারণটি দাঁড়িয়ে আছে, সে বুঝতে পারে না। তার বিশ্বাস— গরুকে সারিয়ে তুলে জীবের (শকুনের) মুখের আহার কেড়ে নেয়ার অপরাধে আজ তার এই অবস্থা। মাঝে মাঝে সে— 'মনের দুঃখে বুক চাপড়ে, কপাল চাপড়ে কাঁদে। বুড়াকালে এই দুঃখ আর সয় না আল্লা। লইয়া যাও, আমারে তুমি লইয়া যাও।'— বুড়োর এই কান্না আমাদেরকে বিষণ্ন করে তোলে। আর গল্পের শেষে বদ্যিবুড়োর— 'বাত দেনা গোলামের জিরা, খিদায় মইরা গেলাম। আল্লারে'— শীর্ণ শরীরের এই চিৎকারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে ওঠে, কিন্তু যাদের কাছে পৌঁছলে তার খিদেটা মিটতো তাদের কানে আর পৌঁছে না! এই গল্পে লেখক কেবল বুড়োর বেদনার গল্পই শোনাননি, গ্রামীণ জীবনের নানারকম সংস্কার ও বিশ্বাসের নিপুণ ছবি এঁকেছেন, যেন বুড়ো শুধু একটি চরিত্রমাত্র নয়, একই সঙ্গে একটি সংস্কৃতিরও প্রতিভূ।

'রাজা বদমাশ' গল্পের রাজাও হারিয়ে ফেলেছে তার যৌবন ও দাপট। তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা একটা বেশ্যাপাড়ায়, সবকিছু একটু কম বোঝে বটে, তবু এক দাপুটে যৌবন কাটিয়েছে সে। আর এখন, অল্প বয়সী ছেলেরাও তাকে মারপিট করে যায়, তার প্রেমিকা— বেশ্যাপাড়ারই এক বাসিন্দা— তার দিকে ফিরেও তাকায় না। গল্পের শেষে একটি দৃশ্য আমাদের চমৎকৃত করে—

> 'রাজা তখন ডেগারটা খোঁজে। হন্যে হয়ে খোঁজে। যখন্ পেয়ে যায় তখন আবার হাসি। হিহিহিহি। তারপর আরেকটা বোতল ভাঙে। একহাতে বোতল, এক হাতে দু ইঞ্চি ডেগার। বহুকালের পুরনো। জঙ ধরে গেছে। রাজা খেয়াল করে না। লাফ দিয়ে দোকান থেকে বেরোয়...। বাঘের মতো হুংকার ছাড়ে। এক বাপের পয়দা অইলে সামনে আয় শুয়োরের জানা। কার উদ্দেশ্যে গালাগালটা দেয় রাজা কেউ জানে না।'

মার খেতে খেতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষের মতো অনির্দিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রুর বিরুদ্ধে এই জ্বলে ওঠা কোথাও পৌঁছে দেয় না তাকে। আর সেটি হবেই বা কীভাবে? জ্বলে ওঠার কারণ ও যুদ্ধের অস্ত্র ওই জং ধরা ডেগারের মতোই অস্পষ্ট ও অকেজো। এই ভুল যুদ্ধ, ভুল জ্বলে ওঠা তাই কোনো ফলাফল বয়ে আনে না, মানুষগুলো আজীবন নিঃস্ব রয়ে যায়, বিপন্ন-ক্লিষ্ট জীবন-যাপন করে, বেদনা ও হাহাকারপূর্ণ সময়ের চাপে বিমর্ষ হয়ে থাকে আর হারিয়ে ফেলে জীবনের যাবতীয় গৌরব, ঐশ্বর্য ও সোনালী সময়।

৩

আমাদের গ্রামীণ জীবনে বহু কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস ছড়িয়ে আছে যেগুলো দ্বারা গ্রামীণ মানুষের জীবন-যাপন পদ্ধতি নানাভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। পশ্চাৎপদ সমাজ জীবনে বিজ্ঞান মনস্কতার অনুপস্থিতিতে অতি-লৌকিকতার ওপর অন্ধ বিশ্বাস ও আস্থা, যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন বিষয়ের ওপর অহেতুক নির্ভরতা মানুষের জীবনে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে। শুধু গ্রাম নয়, নগর জীবনেও এসব কুসংস্কারের প্রভাব তীব্রভাবে লক্ষ করা যায়। আমাদের সমাজ জীবনের স্বরূপ বুঝতে হলে এগুলো নিয়ে কথা বলার বিকল্প নেই। দুঃজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের সাহিত্যে এ ধরনের কাজ খুব সুলভ নয়। কয়েকটি গল্পে মিলনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেষ্টা আছে এ ধরনের কুসংস্কারগুলো এবং তা দ্বারা প্রভাবিত জীবনকে তুলে আনার।

'জ্বীন' গল্পে কাল্পনিক জ্বীন-ভূতের ওপর মানুষের বিশ্বাস এবং এ সংক্রান্ত কু-সংস্কার কতটা গভীরে ক্ষতিকরভাবে প্রোথিত তার প্রমাণ পাই। একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার তাদের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা আর দুঃসময়ের জন্য দায়ী করছে তাদের বড়ো ঘরটিকে। বাড়ির কেউ অসুস্থ হলে অন্যরা সেটিকে রোগজনিত ভাবছে না, ভাবছে অদৃশ্য-অকল্যাণকর কোনোকিছুর ক্ষতিকর প্রভাব হিসেবে। ওঝা (ফকির) কর্তৃক একটি অর্থহীন স্বপ্নের ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা এই পরিবারটির কুসংস্কারগুলোকে আরও তীব্র করে তুলেছে, তাদের পুরোপুরি নির্ভরশীল করে তুলেছে ওই ওঝার ওপর। ওঝা যে সমাধান দেয় সেভাবে কাজ করেও কোনো ফল পাওয়া যায় না। গল্পের শেষ দিকে বাড়ির কর্তাব্যক্তির অসুস্থতার অবসান ঘটানোর জন্য ওই ফকিরকে ডেকে আনা হয়, সে ঘরের ভেতর আলো-আঁধারির ভৌতিক ও রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করে কথিত জ্বীন ডেকে আনে। নাকি সুরে (!) জ্বীনগুলো সমাধান দিয়ে যায়, কিন্তু তা কাজে লাগানোর আগেই দেখা যায়— লোকটি মৃত। এই ধরনের কুসংস্কার জীবনে কতটা ভয়াবহ এবং দুঃখজনক পরিণতি ডেকে আনতে পারে, গল্পটি তার প্রমাণ দেয়।

'মমিন সাধুর তুকতাক' গল্পের মমিনসাধু— যার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা থাকার প্রশ্নই আসে না— সাধারণ মানুষের অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কারকে পুঁজি করে মানুষের ভেতরে এক ধরনের ভ্রান্ত মোহ সৃষ্টি করে তার ব্যবসা চালিয়ে যায়। মানুষের কাছে নিজেকে ব্যতিক্রম ও রহস্যময় করে তোলার জন্য সে গেরুয়া পোশাক পরে, গলায় একশ এক পদের জীবের হাড় দিয়ে তৈরি কথিত মালা পরে, যুবতী বোনকে অনূঢ়া রেখে তার অন্তর্লোককে ক্রমাগত অসুস্থ করে তোলে। বোন ঝুমঝুমি তীব্র যৌবনবতী, সাধুর অন্যায় সিদ্ধান্তে নিষ্পেষিত, নিজের ভেতরে তীব্র যৌন-তাড়না অনুভব করলেও তাকে অবদমিত জীবনযাপনই করতে হয়, কারণ সাধুর বিশ্বাস— 'তুই হইলি আমার লক্ষ্মী। আমার তন্ত্র। মাগ আনলে তন্ত্র নষ্ট অইবো।' ঝুমঝুমির কষ্ট ও বেদনা তার গাঁজা টানার আসর এবং ভাঁওতাবাজির ব্যবসাকে প্রভাবিত বা ব্যাহত করে না, কিন্তু অনিবার্য নিয়মেই এইসব স্ট্যান্টবাজির ওপর একদিন দুর্যোগ নেমে আসে। ঝুমঝুমি অচেনা এক পুরুষের সঙ্গে অনির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। সাধুর বিশ্বাস মতো তার তন্ত্র নষ্ট হয়ে যায়। লোকজন তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার প্রতি ভ্রান্ত মোহ কেটে যায়, তার কোনো গুরুত্বই আর মানুষের কাছে অবশিষ্ট থাকে না। তাকে আর দোকানিরা টাকাপয়সা আনাজপতি দেয় না, গ্রামের মানুষ তাদের বিপদ-আপদে রোগে-শোকে তাকে আর ডাকে না। তার আয়ের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, সে একটি ক্লিষ্ট ও বিপন্ন জীবনের মধ্যে পতিত হয়। সে কাঁদে, রাতভর কাঁদে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিরমান ডাকাতের মতো এই গল্পেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— চরিত্রগুলোর প্রতি একইসঙ্গে ঘৃণা ও মমতার সৃষ্টি হয়, ক্ষোভ এবং ভালোবাসা জন্ম নেয়। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে পুঁজি করে সাধুর ওই লোক ঠকানো ব্যবসা এবং তা টিকিয়ে রাখার জন্য বোনকে অনূঢ়া রাখার চেষ্টা আমাদের ভেতর একদিকে ঘৃণা ও ক্ষোভ, অন্যদিকে সব কিছু হারিয়ে যাওয়ার পর গভীর রাতে খাল-পাড়ে বসে তার অবিরাম কান্না, তার নিঃস্বতা ও রিক্ততা আমাদের হৃদয়ে মমতার সৃষ্টি করে। তার ঠকবাজ হওয়ার নেপথ্য কারণটি— যা আমাদের অজানাই থেকে যায়— উদঘাটনের একটা ইচ্ছে আমাদের তাড়িত করে। যেন তার এমন হওয়ার কথা ছিল না, যেন এমন হওয়ার জন্য সে নয়, দায়ী অন্য কেউ, অন্য কোনোকিছু। গল্পটিতে কিছু কুসংস্কারের বর্ণনায় লেখক দারুণ কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। ঝুমঝুমির দিকে বদ চোখে তাকালে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে, সাধু যা বলে তাই ফলে, ভূতে ধরা ভূত ছাড়ানোর ব্যাপারে বিশ্বাস ইত্যাদি ব্যাপারগুলো লেখক খুব সূক্ষ্মভাবে তুলে আনতে পেরেছেন।

'দরগাতলার জোড়া সাপ' গল্পেও আমরা এই ধরনের কিছু সংস্কারের সঙ্গে পরিচিত হই। পীরের প্রতি অন্ধভক্তি, তার সম্বন্ধে প্রচলিত বিভিন্ন অতিলৌকিক ঘটনার প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাসের একটি চিত্র এই গল্পে পাওয়া যায়। এরকম বিশ্বাস আমরা 'গাহে অচিন পাখি'তেও দেখতে পাই। লতিফ ময়রার বিশ্বাস— 'বাজান কইতো, আমিত্তি ভাজনের ঘেরানে বলে পরীস্তান থেকে জ্বীন পরীও আইয়া পড়ে।... আমার দোকানে আইজ জ্বীন পরী আইবো না তো? আদামোন আমিত্তি লইয়া আদামোন টাকা যদি দেয়।' গ্রামীণ জীবনের এসব বিশ্বাস ও কু-সংস্কার সূক্ষ্মভাবে তুলে আনার জন্য মিলন ধন্যবাদার্হ।

৪

মিলন গ্রামকে কত গভীরভাবে চেনেন তার প্রমাণ বহু গল্পেই রেখেছেন। গ্রামীণ জীবনের যাপন-পদ্ধতি আর যাপিত-সংস্কৃতির এক অসাধারণ রূপায়ন আছে তাঁর গল্পে। এ ধরনের প্রায় সবগুলো গল্পই উল্লেখযোগ্যতার দাবি করলেও এর মধ্যে দু-একটি নানা কারণে প্রায় ধ্রুপদী সাফল্যের দাবিদার।

'জোয়ারের দিন' এ-ধরনেরই এক অসামান্য গল্প। ইরফান— এ গল্পের প্রধান চরিত্র— মাছ-অন্ত-প্রাণ এক যুবক। জোয়ারের সময় এলে, বৃষ্টির দাপটে চরাচর গম্ভীর ও বিষণ্ন হয়ে উঠলে, তার রক্তে যেন মাছ ধরার ডাক শোনা যায়। ঘরে তার যুবতী অভিমানী বউ, মায়াবতীও। জোয়ারের দিনে, মাছদের আনন্দমুখর সময়ে, মাছ ধরাটা বউয়ের মোটেই পছন্দ নয়, তবু ইরফান তার নিষেধ না শুনে গভীর রাতে বিলে সঙ্গমরত বোয়াল শিকারে বেরোয়। ছোট মাছের প্রতি তার খুব ঝোঁক নেই, বোয়াল শিকারে সে 'ভূতের ভয়'ও উপেক্ষা করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে। মাছের জন্য তার আকর্ষণটিকে প্রথম দিকে একটু অস্বাভাবিকই লাগে, এমনকি এর জন্য সে বউয়ের 'আদরের' আহ্বানও নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করে সে। অতঃপর আমরা তাকে দেখি মাছের সন্ধানে মধ্যরাতে বিলের মধ্যে। মাছের সঙ্গে তার পরিচয় দীর্ঘদিনের, শিকারের পদ্ধতিও তার নখদর্পনে, এমনকি ওদের শব্দাবলির অর্থও সে বুঝতে পারে। এক সময় শব্দ শুনে সে এগিয়ে গেলে দ্যাখে, মাছ নেই। পাশেই আবার শব্দ। আবার। আবার।

> 'এক সময় সামনে পেছনে ডানে বাঁয়ে অসংখ্য বোয়ালের খল খল শব্দ শুনতে পেল ইরফান। পেয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। এক পা সামনে এক পা পেছনে ডানে বাঁয়ে চারদিকে চরকাবাজির মতো ঘুরতে শুরু করল সে। কিন্তু একটাও মাছ দেখতে পেল না। শুধু মাছের অবিরাম খল খল খল শব্দ। এক সময় মরা চাঁদের তলায় ঘন কালো মেঘ এসে স্থির হলো। খাড়া হয়ে আঁধার নামল বিলে। এবং মাছের শব্দ ক্রমশ সরে যেতে লাগল দূরে। ইরফান সেই শব্দ খেয়াল করে এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু সে যত এগোয় শব্দ তত সরে যায়। বিড়ির নেশার মতো তীব্র এক নেশায় পেয়ে বসে ইরফানকে। ইরফান এগোয়, শব্দ সরে যায়। ইরফান এগোয়, জল ক্রমশ গভীর হয়।'

গল্পের শেষে এসে ইরফানের ঐ অস্বাভাবিক আকর্ষণ ঠিক মাছের জন্য বলে মনে হয় না, বরং এর প্রতীকী সৌন্দর্যে ও আবহে পাঠক চমৎকৃত হন। মাছ হয়ে ওঠে স্বপ্ন ও প্রত্যাশার প্রতীক যার জন্য মানুষ উপেক্ষা করতে পারে সবকিছু। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, স্বপ্নের জগৎ চিরকাল রয়ে যায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। মাছের ওই শব্দের মতো স্বপ্নকেও যতই নিকটবর্তী মনে হোক না কেন, আসলে তা ওই ঘোরগ্রস্ত কল্পনার মতোই অনেক দূরের ব্যাপার। স্বপ্ন দূরে চলে যায় ক্রমাগত, আর তার ঠিকানা পেতে মানুষ নেশাগ্রস্তের মতো এগিয়ে যায় পরিণতি না জেনেই। মানুষ এগোয়, স্বপ্ন দূর থেকে দূরে চলে যায়, আর মানবজীবনে— 'জল গভীর হয়'-এর মতো অনিশ্চয়তা ক্রমশ গভীর হয়। আমরা না জেনেই এগিয়ে যাই পরিণামহীন গন্তব্যের খোঁজে, আর পরিত্রাণহীন অনিশ্চয়তা আমাদের জীবনকে সংকটময় করে তোলে।

'জোয়ারের দিন' গল্পটিকে মিলনের শ্রেষ্ঠ গল্প হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই আমি। শুধু মিলনেরই বলি কেন— বাংলা সাহিত্যের গল্প সম্ভারে এই গল্পটি এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে চিহ্নিত হবার যোগ্যতা রাখে।

৫.

ইমদাদুল হক মিলনের যে বিপুল জনপ্রিয়তা তা মূলত তাঁর প্রেমের গল্প-উপন্যসের জন্য। তরুণ বয়সের আবেগ-অনুভূতি, কিছুটা পাগলামি সর্বোপরি এই বয়সের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোমান্টিকতা তাঁর কলমে এত সূক্ষ্ম ও চমৎকার ভঙ্গিতে উঠে আসে যে একদম তরুণতর পাঠকটি, যে হয়তো সদ্য প্রেমে পড়েছে বা প্রেমে পড়ার কথা ভাবছে, তার কাছে মিলনের কোনো বিকল্প নেই। গড়পরতা সাধারণ পাঠকদের জন্য মিলন এক অসাধারণ প্রেমের গল্প লেখক। তবু 'শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থে তিনি কোনো প্রেমের গল্প অন্তর্ভূক্ত করেননি। কেন? তিনি কি তাঁর ওই ধরনের কোনো রচনাকেই গুরুত্বপূণ মনে করেন না? প্রেমের গল্প কি কালজয়ী হতে পারে না? একজন লেখকের প্রতিনিধিত্বশীল গল্প হিসেবে একটি প্রেমের গল্প কি উপস্থিত হতে পারে না? বিশ্বসাহিত্যে বহু মহৎ প্রেমের গল্প-উপন্যাস রচিত হয়েছে। তবে সফল বা মহৎ প্রেমের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে মিলনের লেখাগুলোর পার্থক্য হচ্ছে, এগুলোর প্রায় সবই একেবারে ছকে বাঁধা। অগভীর পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য এসব লেখেন বলেই কি তাঁর কলমে ভালো গল্প উঠে আসেনি? বারবার একই আবেগ-অনুভূতি, প্রায় একই রকম সংলাপ, ঘটনা ও পরিণতি তাঁর প্রেমের রচনাগুলোকে কোনো গভীর উপলব্ধিতে পৌঁছতে দেয় না। এসব গল্পে মানব-মানবীর সেই প্রাচীন, প্রাগৈতিহাসিক, রহস্যময়, অসংজ্ঞায়িত, অমীমাংসিত সম্পর্কের ছবি মেলা ভার। প্রেম তো কেবল সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ যৌবনের তীব্র মোহময়তা, আবেগ ও পাগলামি নয়। প্রেম কি মানুষকে পরিচালনা করে না সারা জীবনভর? প্রেমকে কি কখনো সংজ্ঞায় বাঁধা যাবে? মীমাংসিত কোনো সিদ্ধান্তে বাঁধা যাবে? মিলনের প্রেমের গল্পের এই সীমাবদ্ধতার কথা কি তিনি নিজে ভেবে দেখেছেন কখনো?

৬

প্রায় প্রতিটি গল্পেই প্রতীক ব্যবহার করতে পছন্দ করেন মিলন, সাধারণ বর্ণনায় আড়ালে আরও বহু কথা বলেন, চাবুক মারেন এই সমাজ ও সমাজ-বাস্তবতাকে। কিন্তু এই ধারা থেকে সরে গিয়ে কোনো কোনো গল্পে— বিশেষত রাজনৈতিক গল্পগুলোতে— তিনি বড়ো বেশি সরাসরি উপস্থিত হন। এই ধরনের গল্পগুলোতে চরিত্রগুলোর সঙ্গে স্বয়ং লেখকের নগ্ন উপস্থিতি পাঠককে ক্ষুণ্ন করতে পারে। 'হাসপাতালের সামনে' গল্পে আমরা তিনজন যুবককে হাসপাতালের সামনে বসে থাকতে দেখি যারা হতাশায় বিবর্ণ, লক্ষ্যহীন জীবনের ভার বহন করতে করতে ক্লান্ত, বিমর্ষ। তারা বেঁচে আছে সমাজদেহে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ও ঘৃণিত ক্ষতের মতো। কথোপকথনে জানা যায়, তারা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কিছুদিন তাদের খুব সম্মান ছিল, পরে আর থাকেনি, ক্রমশ অনাকাঙ্ক্ষিত হয়ে গেছে, অবহেলিত হয়ে পড়েছে। এখন তারা সারাদিন বসে গাঁজা টানে, যদিও প্রায়ই সেই গাঁজার পয়সাও জোটে না, দু-তিন মাস একই পোশাক পরে কাটিয়ে দেয়। তাদের শরীরে চুলকানি হয়েছে, চিকিৎসা দরকার, কিন্তু পায় না। আর হাসপাতালের সামনে বসে তারা এইসব কথা বলে। গল্পটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়বস্তু ও ভাব গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর, এবং সেটি এগিয়ে যাচ্ছিল একটি গভীর পরিণতির দিকে, পাঠকদের চেতনায় প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়ার জন্য, পাঠককে প্রশ্নের মুখোমুখি করার জন্য, কিন্তু গল্পের শেষের দিকে এসে যেন লেখক খেই হারিয়ে ফেলেছেন। গল্পের শেষে—

> 'আমগ লাহান অসুখ দেশের বেবাক মাইনসেরই। পুরা জাতির। চিন্তা করা যায় এই অসুখ লইয়া চইলা ফিরা বেড়াইতেছে মাইনষে। রংবাজী করে, প্রেম করে, মাল কামায়, পলিটিক্স করে, কোনো ডাক্তার আমগা চোহে দেহে না। পুরা জাতিটা হাসপাতালের সামনে বইয়া রইছে, কোনো চিকিৎসা অয় না।'

সংলাপটি গল্পকে ক্ষুণ্ন করে দেয়। গল্পটি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল, যে বেদনা ও ক্ষোভ আঁকা হয়েছিল ওই তিন যুবকের বুকে, তাতেই বোঝা যাচ্ছিল— তারা তিনজন শুধু নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, হয়ে উঠেছে পুরো তারুণ্যের প্রতীক-প্রতিনিধি। এই সংলাপ প্রতীকটিকে ভেঙেচুরে ফেলে। বড়ো সরাসরি, শ্লোগানের মতো এই সংলাপ একটি সমৃদ্ধ গল্পকে দুর্বল করে দেয়।

অনেকটা একই-রকম ব্যাপার দেখা যায় 'প্রস্তুতি পর্ব' গল্পে। তিনজন যুবক এবং একজন বৃদ্ধ নদীর পাড়ে বসে থাকে। যুবক তিনজন অপেক্ষা করে তাদের একজন বন্ধুর জন্য যে ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের কমান্ডার, যার কথায় তারা ছেড়ে দিয়েছিল একজন রাজাকারকে এবং সেই রাজাকারই তাকে শেষ পর্যন্ত জেলে ঢুকিয়েছে। তারাও হতাশা ও বিপন্নতায় ক্লান্ত তারুণ্যের প্রতিনিধি। তাদের জন্য কোথাও আনন্দময় বা প্রেরণাদায়ক কিছু অবশিষ্ট নেই। তারা আরেকটি যুদ্ধের স্বপ্ন দ্যাখে, যা নিয়ে আসবে সত্যিকারের মানবিক স্বাধীনতা। এই গল্পটির বিষয়বস্তু এবং ভাবও চমৎকার। কিন্তু গল্পের শেষে—

> 'বুড়ো নেতাই চরণ ছিল পেছনে। হাঁটতে হাঁটতে পিছিয়ে পড়েছে। বয়সের ভার। হাঁটতে হাঁটতেই গলাখাকারি দেয় নেতাই। দু'বার। তারপর ফ্যাসফ্যাসা গলায় বলে, আমার বয়স অইলো আড়াই কুড়ি। এই বয়সে দুইখান সাদিনতা দেখলাম। তার কথা শেষ করার আগেই দুলাল বললো, আরেকখানও দেখবেন। দেরি করেন। রত্না ফিরে আসুক। যুদ্ধ কারে কয়, সাদিনতা কারে কয় দেখবেন ইবার। আগের দুইখান যুদ্ধ অইছে বাইরের শত্রুর লগে, এইবার যুইদ্ধখান অইবো ঘরের শত্রুর লগে।'

বর্ণনাটি বড়ো নগ্নভাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়। আরেকটি যুদ্ধ, আরেকজন কমান্ডারের ফিরে আসার প্রতীক্ষার এই গল্প তো আমাদেরই চাওয়া, আমাদেরই প্রতীক্ষা। বিষয় হিসেবে এ গল্পের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করতেই হয় কিন্তু শ্লোগানধর্মী বক্তব্য এর শিল্পমান খানিকটা ক্ষুণ্ন করেছে বলেই মনে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭.

'রাজার চিঠি' মিলনের উন্নত গল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম স্থান দখল করে আছে। পুরোপুরি প্রতীকধর্মী এই গল্পটিতে অমরা এক রাজার সঙ্গে পরিচিত হই যিনি পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন তাঁর মন্ত্রিপরিষদ নামক চাটুকার বাহিনী দ্বারা। দেশের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের হাহাকার ও বেদনা ঐ চাটুকারদের ভেদ করে রাজার কাছে পৌঁছে না। রাজাকে তারা ভুল বোঝায় এবং নিজেদের আখের গোছায়। জনগণের পরম প্রিয় রাজা ভুল সত্য জেনে জনগণ থেকে ক্রমশ দূরে যেতে থাকেন এবং ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকেন। একদিন তাঁর মনে হয়, নিজের চোখে প্রজাকূলের অবস্থা দেখবেন। মন্ত্রীরা এই ঘোষণায় তটস্থ হয়, রাজাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে কিন্তু তিনি কোনো কথাই শোনেন না। রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে রাজা তাঁর প্রিয় স্বদেশভূমিকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অবস্থায় দেখতে পান, প্রিয় জনগণকে ক্ষুধার্ত অবস্থায়, ক্লিষ্ট-বিপন্ন দেখে তার হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার হয়। নিজের কানে তিনি তাঁরই বিরুদ্ধে প্রিয় প্রজাকুলের অভিমান ও ক্ষোভমিশ্রিত অভিযোগ শোনেন। দুজন মানুষকে তিনি কথা দিয়ে আসেন— তাদের কাছে রাজার চিঠি আসবে বলে। তারা হয়তো প্রতীক্ষায় থাকে কিন্তু কোনদিনই আর রাজার চিঠি আসে না। কারণ সেই রাতেই তিনি মন্ত্রীপরিষদের চক্রান্তে নিহত হন।

গল্পটি থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, রাজাটি কে। আমাদের দেশে বা তৃতীয় বিশ্বের যে-কোনো দেশেরই সাধারণ বাস্তবতা এটি। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে যিনি থাকেন, তাঁকে ঘিরে থাকে অসংখ্য-অজস্র চাটুকার। দেশের প্রকৃত অবস্থা কোনোদিনই কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছায় না। ভুল 'সত্য' জেনে কেন্দ্রবিন্দু বিচ্ছিন্ন হতে থাকে জনগণ থেকে। যখন তাঁর চেতনা জাগ্রত হয় তখন আর সময় থাকে না অথবা সুযোগই পান না কিছু করার।

গল্পটি সফল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি প্রশ্ন রয়েই যায়— এত যে জনগণ-প্রিয় রাজা, তিনি কী করে এত দীর্ঘদিন জনবিচ্ছিন্ন থাকেন? কী করে চাটুকারদের কথার ওপর নির্ভর করে দেশ পরিচালনা করেন? তাঁর তো ক্রমাগত জনগণের কাছে যাওয়ার কথা! যেতে এত দেরি হলো কেন? গল্পের কোথাও এর ইঙ্গিত নেই। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও— গল্পটিতে বাঙালির সবচেয়ে বেদনার, সবচেয়ে ট্র্যাজিক ঘটনাটি কুশলী প্রতীকের মাধ্যমে তুলে এনে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইমদাদুল হক মিলনের খুব উল্লেখযোগ্য এবং স্বতন্ত্র একটি বৈশিষ্ট্য হলো, বিভিন্ন গল্পে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ব্যবহার যা গল্পটির মূল আখ্যানপর্বে প্রবেশের মুখেই ওরকম একটি আবহ সৃষ্টি করে দেয়। তিনি যখন গ্রামের কথা লেখেন তখন শুরু করেন অনেকটা গ্রামীণ আবহ তৈরির ভেতর দিয়ে, শহরের ক্ষেত্রে উল্টোটা। উদাহরণ দেয়া যাক। 'গাহে অচিন পাখি'র কিছু অংশ—

> 'হাওয়ায় কি একটা ভাজা পোড়ার গন্ধ ওঠে। ভারি মনোহর। সেই গন্ধে মাছচালার ধুলোবালি থেকে মুখ তোলে বাজারের নেড়িকুত্তাটা। লতিফের বা দিকে দোকানের বাইরে পরপর সাজানো তিনখান আলগা চুলা। একখান দু'মুখী আর দুই খান একমুখী। দু'মুখীটায় বিয়ানরাতে এসে তুলে দেয় পুরনো কালের বিশাল একটা কেটলী। ব্যাঁকা ত্যাড়া গামলায় ময়দার পানি আর কলাই মিশিয়ে হাতে যখন নারকেলের তলা ফুটো আইচা নিয়ে বসেছে তখন দুপুর পার।'

এই অংশটিতে লেখকের ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। 'কুকুর' ব্যবহার না করে 'কুত্তা' শব্দের ব্যবহার, 'তিনখান আলগা চুলা' 'দু-মুখীটায় বিয়ানরাতে এসে তুলে দেয়' 'নারকেলের তলা ফুটো আইচা নিয়ে' ইত্যাদি বাক্যাংশ ব্যবহারে গ্রামীণ একটি আবহ গল্পের শুরুতে সৃষ্টি হয় এবং সারা গল্পে তা চলমান থাকে।

আবার 'রাজার চিঠি'তে— 'প্রাতকালে ঘুম ভেঙে রাজা দেখেন জানালা দিয়ে ঘরের মেঝেতে এসে পড়েছে ডিমের কুসুমের মতো গাঢ় রোদ।'— বাক্যটিতে লেখক 'প্রাতকালে' শব্দটি ব্যবহার করে একটি সম্ভ্রান্ত আবহ সৃষ্টি করেছেন যেন তা পাঠককে প্রস্তুত হবার জন্য আহ্বান— একটি অন্যরকম গল্পে প্রবেশ করার জন্য। এরকম বহু উদাহরণ বইটি জুড়ে ছড়িয়ে আছে।

আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলি। তিনি যে শুধু সংলাপেই আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেন তা-ই নয়, এমনকি চরিত্রগুলো মনের ভাবনাও তুলে আনেন তাদের মুখের ভাষাতেই। যেমন— 'লতিফ ভাবে, পবনার আতে চার গেলাস দোয়াইতে দেকলে বদলাম অইয়া যাইবো। গেরামের গইন্য মাইন্য মাইনষে তাইলে আর আমার দোকানে চা খাইতে আইবো না'। আঞ্চলিক শব্দ ও সংলাপ ব্যবহারে মিলনের সাফল্য ঈর্ষণীয়। এ ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা, আন্তরিকতা, প্রয়োগে কুশলতা প্রশ্নাতীত। আঞ্চলিক শব্দের প্রাচুর্য এবং আঞ্চলিক সংলাপের ব্যাপক ব্যবহার সারা বইটিতে ছড়ানো।

গ্রামকে মিলন কতটা গভীর ভালোবাসা নিয়ে, কতটা নিবিড়ভাবে দেখেছেন, চিনেছেন ও উপলব্ধি করেছেন তার প্রমাণ তাঁর গ্রামীণ পটভূমিতে লেখা গল্পগুলোতে পাওয়া যায়। তার দেখার চেখের গভীরতায় অবাক হতে হয় এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেবে যে ওই মানুষগুলোর প্রতিটি অনুভূতি, প্রতিটি আনন্দ ও বেদনার অভিব্যক্তি, তাদের চাওয়া-পাওয়ার সূক্ষ্ম বর্ণনা, তাদের হাসি, তাদের কান্না তিনি এত অসাধারণ কুশলতায় আনলেন কীভাবে? অন্তজ শ্রেণীর এই মানুষগুলোর জীবন যেন অচেনাই ছিল আমাদের কাছে, মিলন চেনালেন গভীরভাবে, গভীর দরদ ও মমতা দিয়ে, যেন এক অচিন পাখি এসে জীবনের গান গেয়ে গেল!

মিলনের গল্পে নিসর্গ এসেছে গভীর ভালোবাসাসহ। প্রতিটি গল্পে এর অপূর্ব বর্ণনা তাঁর নিসর্গ-প্রেমেরই পরিচয় বহন করে। যে-কোনো সময়ের যে-কোনো জায়গার নিসর্গ যে তাঁকে উদ্বেলিত ও মুগ্ধ করে তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন বহু গল্পে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলো লেখক হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতাকে নির্দেশ করে।

উপসংহারের পরিবর্তে

এই লেখাটি মিলনের সাহিত্য সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ কোনো আলোচনা নয়। যেটুকু বলা হয়েছে তা থেকে হয়তো এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়— তিনি যে-রকম একতরফাভাবে সমালোচিত হন তার সবটুকু তাঁর প্রাপ্য নয়। প্রতি বছর তিনি অসংখ্য নিম্নরুচির পুস্তক প্রকাশ করে সাহিত্যের কিছুটা ক্ষতি করেন— একথা মেনে নিয়েও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তিনি ইচ্ছে করলে ভালো লিখতে পারেন। 'শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থভূক্ত গল্পগুলোতে তাঁর জীবনবীক্ষণ, জীবন-বোধ, সমাজ-বীক্ষণ; তাঁর গল্পের চরিত্র, ভাষা, আঞ্চলিক সংলাপের ব্যবহার, আবহ, প্রতীক, উপমা ইত্যাদি সবকিছুই তাঁর সম্বন্ধে প্রত্যাশা করতে উৎসাহ জাগায়। মিলনের সামনে এখনো পড়ে আছে বিস্তীর্ণ পথ, দীর্ঘ সময়। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে— 'জনপ্রিয়' নামক ক্ষতিকর ধারা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি নির্মাণ করবেন এমন কিছু যা নিয়ে আমরা গৌরব করতে পারবো।

রচনাকাল : জানুয়ারি, ১৯৯২
প্রথম প্রকাশ : ৩০ জানুয়ারি ও ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, দৈনিক আল আমিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঈনুল আহসান সাবের : নগর জীবনের ধ্রুপদী রূপকার

সত্তর দশকের ঝড়ো সময়ে বাংলাদেশের সাহিত্যে যে কজন প্রতিশ্রুতিশীল ও সম্ভাবনাময় কথাসাহিত্যিকের আগমন ঘটেছিল, মঈনুল আহসান সাবের তাঁদের অন্যতম। তাঁর গল্পগুলো পড়লে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে— তিনি বরাবরই গতানুগতিকতা ছাড়িয়ে ভিন্নধর্মী কিছু লিখতে চেয়েছেন। যে বিষয়েই তিনি লেখেন না কেন, তাঁর স্বকীয়তা স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। তাঁর গল্পের পরিসর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বল্প আয়তনের, চরিত্র চিত্রণে তেমন জটিলতার আশ্রয় নেন না তিনি, বর্ণনায় ডিটেইলের কাজ নেই। বলার কথাটি প্রকাশের জন্য তিনি ব্যবহার করেন প্রতীক, সমসাময়িক কালে তাঁর মতো প্রতীকের এমন বিপুল ও কুশলী প্রয়োগ আর কারো মধ্যে চোখে পড়ে না। প্রতীকের অসামান্য প্রয়োগে আপাতদৃষ্টিতে তাঁর অনেক সাধারণ গল্পও বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে এবং পাঠ শেষে গল্পের আখ্যানপর্ব নয়, চরিত্র নয়, বরং পাঠকের কাছে যে কথাটি পৌঁছাতে চেয়েছেন তিনি সেটিই প্রধান হয়ে ওঠে।

২

আগেই বলা হয়েছে, যে বিষয় নিয়েই লেখেন না কেন, ভিন্নধর্মী কিছু উপহার দেয়ার চেষ্টা করেন সাবের। মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে লেখা তাঁর কিছু গল্পের কথা ধরা যাক। 'বৃত্ত', 'ধারাবাহিক কাহিনী', 'ভিড়ের মানুষ', 'দূর থেকে', 'এরকমই', 'আশ্চর্য প্রদীপ', 'সন্তাপ', 'অপেক্ষা', 'মৃদু নীল আলো' প্রভৃতি গল্পে আমরা মধ্যবিত্ত জীবনের দেখা পাই। কিন্তু এর অধিকাংশেই গতানুগতিক মধ্যবিত্তের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, গ্লানি-লজ্জা আর পরাজয়ের তীব্র চিত্রায়ণ নেই। নেই টানাপোড়েন, অভাব-অনটন, চাহিদা পূরণের অক্ষমতার তীব্র লজ্জা, যন্ত্রণা ও বেদনার দায়ভার (*বৃত্ত, ভিড়ের মানুষ, অপেক্ষা* এই তিনটি গল্প ছাড়া), নেই মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের চিত্র। তবু সাবেরের কুশলী বর্ণনা ও প্রতীক ব্যবহারের দক্ষতায় গল্পগুলো বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২ ক.

'বৃত্ত' গল্পটির কথা ভাবা যেতে পারে। এই গল্পের পরিসর ছোট তবে আর্থিক টানাপোড়েনের চিত্র বেশ প্রকট, অক্ষমতার কষ্ট একটু বেশি গভীর; যদিও এতসব সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রী প্রগাঢ় ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। স্বামী আলম, প্রতিদিন সকালে উঠে দৈনন্দিন কাজকর্ম— বাজার করা, রেশন তোলা, ছেলেদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি সারে। তারপর অফিস এবং যথারীতি বাড়ি ফিরে আসা এবং আরেকটি বৈচিত্র্যহীন দিনের জন্য অপেক্ষা। স্ত্রী ফিরোজা, সারাদিন বাড়ির কাজকর্ম নিয়ে পড়ে থাকে, দীর্ঘদিন ধরে একই ছক, একই রুটিন মেনে ক্লান্তিতে-অবসাদে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনকি, একটু বাইরেও যাওয়া হয় না তার। কখনো মৃদু ঝগড়া হয়, টানাপোড়েনের ছবিটি এতেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যাহোক, একদিন তারা ছকবাঁধা রুটিন ছেড়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য বাইরে বেরোয়। কোথায় যাবে এ নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেই অবশ্য, হয়তো উদ্দেশ্যহীন-লক্ষ্যহীন-গন্তব্যহীন ঘোরাফেরা— অনেকটা জীবনের মতোই। আলমের ভাঙাচোরা, প্রায় অকেজো (যা তাদের ম্রিয়মাণ দৈনন্দিন জীবন-যাপনেরই প্রতীক) মোটর সাইকেলের পেছনে উঠে বসে ফিরোজা। যেতে যেতে আলম তাদের প্রতিদিনের জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গগুলো দেখায়— বাজার, রেশন দোকান, বাচ্চাদের স্কুল, নিজের অফিস, নিবেদিতা ওয়ার্কশপ (যেখান থেকে সে মোটর সাইকেল সারায়), সুদখোর হান্নানের বাড়ি (যেখান থেকে সে প্রয়োজনে ধার-কর্জ করে)। কিন্তু এসব ছাড়িয়ে যখন সে আরও সামনে এগিয়ে যেতে চায়, পারে না, বরং কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে আসে নিজেদের বাসা, রেশন শপ, বাজার ইত্যাদি।

> 'আলম মোটর সাইকেলের ওপর ঝুঁকে পড়ে, তীক্ষ্ণ চোখে রাস্তার দিকে তাকায়। বারবার অর্থহীন গিয়ার বদলায় সাইকেলের, স্পীড বাড়িয়ে আবার কমিয়ে আনে। কিন্তু মোটর সাইকেল ক্রমশ তাদের বাজার পেরিয়ে আসে, রেশন শপ ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে তারা দেখতে পেলো নোটন ঝোটনদের স্কুল, আলমের অফিস, নিবেদিতা ওয়ার্কশপ। আলম খুব চেষ্টা করে, সাইকেলের কত কি ঘোরায়, নাড়ায়, ফিরোজা তার কিচ্ছু বোঝে না, খুব কাঁপছে আলম, সে শুধু বুঝতে পারে। আবার তারা ফিরে আসছে, ফিরোজা টের পেলো, আলমের হাত কেঁপে যাচ্ছে মোটর সাইকেলে, সে চেঁচিয়ে উঠলো— ফিরোজা আমি চেষ্টা করছি ফিরোজা, কিন্তু বাজার, রেশন শপ, নোটনদের স্কুল, ওয়ার্কশপ, সুদখোর হান্নানের বাড়ি, এসব থেকে আমি বের হতে পারছি না, ফিরোজা, আমি বের হতে পারছি না।' (বৃত্ত/ পরাস্ত সহিস)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু মধ্যবিত্ত নয়, মানুষের জীবনের অসহনীয় পৌনঃপুনিকতা ও গতানুগতিকার এক চমৎকার প্রতীকী বর্ণনা এটি। মানুষ সারাজীবনই একটি বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খায়, ওই পরিত্রাণহীন বৃত্ত থেকে বেরিয়ে পড়তে চায়, মুক্তি পেতে চায়, কিন্তু কিছুতেই পারে না, বৃত্তাবদ্ধ জীবন-যাপনে তারা ক্লান্ত-বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের সিরিয়ার পাঠক ও সমালোচকদের কাছে মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলো কোনোদিনই বিশেষ আনুকূল্য পায়নি। এ ধরনের একটি বদ্ধমূল ধারণা এদেশের সাহিত্যভূমিতে প্রোথিত হয়ে গেছে যে, মধ্যবিত্ত জীবন মানেই স্যাঁতস্যাঁতে তরল আবেগ ও ভাবালুতা, মধ্যবিত্ত চরিত্র মানেই নাকে-চোখে জল, ভেজা আবেগে থরথর এক বিধ্বস্ত চরিত্র। সম্ভবত এই প্রতিষ্ঠিত ধারণার বিপরীতে দাঁড়িয়ে এই একটি মাত্র গল্প দিয়েই সাবের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন— এই জীবন নিয়েও কী অসামান্য গল্প রচিত হতে পারে।

২ খ.

আর এই তীব্র পৌনঃপুনিকতায় আক্রান্ত, বৈচিত্র্যহীন, পরিবর্তনহীন, অনুজ্জ্বল, সম্ভাবনাহীন, অনতিক্রম্য বৃত্তে আবদ্ধ জীবন যাত্রায় প্রতিদিনের চেনা ঘটনাগুলোর বাইরে নতুন কিছু ঘটলে আমরা দেখি, সাবেরের চরিত্রগুলো এক আশ্চর্য জীবনবোধের পরিচয় দিচ্ছে।

'জীবন যাপন' গল্পের দম্পতির কাছে হয়তো পুরনো বাড়ি ধসে যাওয়ার খবরের চেয়ে নিজেদের জীবন-যাপনের টুকিটাকিই প্রধান হয়ে উঠেছিল, আর তাই স্বামী ইসমাইল এই সংবাদটি নিয়ে এলেও তারা মেতে ওঠে নিত্য-প্রয়োজনীয় আলোচনায়। অবাক হতে হয় যখন দেখি, ধসে পড়া বাড়িটি দেখতে যাওয়ার সময় স্ত্রী রোকেয়া শাড়ির রং পছন্দ করছে এবং কমলা রঙয়ের শাড়ির সঙ্গে মানানসই কোন লিপস্টিকের শেড নেই বলে আফসোস করছে, ইসমাইল অফিসের কাপড় ছেড়ে নতুন পোশাক পরছে। যেন এক উৎসবে যাচ্ছে তারা। বিস্ময় আরও বাড়ে যখন তাদের মৃতের সংখ্যা নিয়ে বাজি ধরতে দেখি। ঘটনাস্থলে মৃতের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আয়োজনও জমে ওঠে। কৌতূহলী লোকজনের রসনা-বিলাসের জন্য চা-সিগারেট-বাদামওয়ালাদের কদর বাড়তে থাকে আর হ্যাজাক-জ্বালানো চটপটি-ফুচকার দোকান জমে ওঠে এবং 'সেসব জায়গায় জটলা একটু বেশি।'

এত ক্ষয়ক্ষতি, এত মৃত্যু কি তবে এই দম্পতিকে বা লোকজনকে স্পর্শ করেনি? হয়তো করেনি কিংবা করেছে কিন্তু তাদের কাছে নিজেদের জীবনযাপনের খুঁটিনাটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই জীবনবোধ, এই বেঁচে থাকার অহংকার আরও গভীরভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে যখন এই দম্পতি রিকুশা করে ফিরতি পথ ধরে। ইসমাইল নিজের জন্য পান কেনে, দামি সিগারেট কেনে, সন্তানের জন্য মিমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেনে, স্ত্রীর জন্য 'ফ্রেশ ডালমুট' কেনে। কে বলবে তারা একটি ধ্বংসস্তূপ দেখতে এসেছিল? তারা 'ভাগ্যক্রমে' মৃতদেহ আর স্বজন-হারানো নিস্তব্ধ মানুষও দেখে এসেছে কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত জীবনের নিত্য সাধ-আহ্লাদ তাতে বিশেষ ব্যাহত হয়নি। অতএব 'দুপাশে লাল-নীল বাতি জ্বলে, ফুরফুরে বাতাস, রিক্সা এগোয়'— আর তারা যেন জীবনের স্বপ্ন-গন্ধময় বর্ণিল আয়োজনের মধ্যে ফিরে যায়। কিংবা 'পুলিশ আসবে' গল্পে নিঃসঙ্গ প্রতিবেশীর আত্মহত্যা-পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার এক দম্পতির আচরণে আমরা হতবাক হয়ে যাই। সদ্য অফিস ফেরত ক্লান্ত-শ্রান্ত জামাল বাসায় ফিরে স্ত্রীর কাছে খবরটি শুনতেই তার 'গা এলানো ভাব দূর, বেশ এনার্জেটিক মনে হচ্ছে নিজেকে', কারণ অন্যান্য দিনে 'এ সময়টা বড় একঘেয়ে কাটে। অফিস থেকে ফেরার পর সময় ফুরাতে চায় না। কোথাও যাওয়ার নেই, কিছু করার নেই।' কিন্তু আজকে একটি 'চমকপ্রদ' ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তার অবসন্নতা দূর হয়। গেটের কাছে গিয়ে অন্যান্য প্রতিবেশীকে আবিষ্কার করে একই বিষয়ে আলাপরত অবস্থায়। জামালের মতো তারাও ম্রিয়মাণ, দৈনন্দিন জীবনের পৌনঃপুনিক ঘটনাসমূহে অবসাদগ্রস্ত— আমরা বুঝতে পারি, কারণ তাদের আলোচনায় প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতির চেয়ে নিজ জীবনের প্রসঙ্গই বেশি উচ্চকিত। শুনতে পাই, একজন জানতে চাইছে— 'আচ্ছা, ও ফ্ল্যাটটা কতদিনে খালি হতে পারে বলেন দেখি?'— এবং এক বছরের আগে তার সম্ভাবনা নেই শুনে হতাশা ব্যক্ত করছে। লোকটির মৃত্যু যেন এক কৌতুককর বিষয় তাদের কাছে— 'মিজান সাহেবের ফিগার খানা তো দেখেছেন, ভূত হলে তাকে কেমন লাগবে একবার ভেবে দেখুন তো! তাদের হাসি একটু জোরেই বাজে।' আবার মৃত লোকটির জিনিসপত্রের কী হবে এ প্রসঙ্গে— 'আমি অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম এই সমস্যার সমাধান একটাই, মিজান সাহেবের জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতে হবে, যার বটি নেই সে বটি, যার চেয়ার নেই তার জন্য চেয়ার, যার তোষক দরকার সে নেবে তোষক, এভাবে বাদবাকি জিনিসগুলোও আমার প্রস্তাব পছন্দ হলো? ...তুমুল একচোট হাসি।' এগুলো কি একজন নিঃসঙ্গ মানুষের আত্মহত্যার মতো একটি মর্মান্তিক ঘটনার পর তারই প্রতিবেশীদের আলাপচারিতা? অবিশ্বাস্য মনে হয় এই আচরণ, তবু তা সত্য। একটি পরিত্রাণহীন গণ্ডিবদ্ধ জীবনের অধিকারী লোকজনের কাছ থেকে এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করা যায় না। গল্পে ঘটনা বিশেষ কিছু এগোয় না। আমরা দেখি, পুলিশের আগমনে তাদের আলোচনা নতুন গতি ও প্রাণ ফিরে পেয়েছে আর জামাল ঘরে ফিরে তার স্ত্রীর সঙ্গেও তা অব্যাহত রেখেছে। না বললেও বোঝা যায়, অন্য সবাই একই কাজ করছে। মেতে উঠেছে নতুন কিছু একটা ঘটার উত্তেজনায়। গল্পের এই অভাবিত পরিণতি পাঠককে চমকে দিয়ে যায়। জীবন কতটা গতানুগতিক ও বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়লে এরকম চিন্তা করা সম্ভব, তা আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাখ্যা করার দরকার পড়ে না। নিঃসঙ্গ প্রতিবেশীর মৃত্যুতে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা নয়, বৃত্তাবদ্ধ জীবনে এ এক ভিন্নতর ঘটনার মর্যাদা পায়, আলোচনার জন্য নতুন একট বিষয়বস্তু পাওয়া যায়— বেঁচে থাকার জন্য এ যেন এক নতুন প্রেরণা।

'লাফ' গল্পে আবার সেইসব ম্রিয়মাণ মানুষ— কিছুই করার নেই, কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, নতুন কোনো ঘটনা নেই। অতঃপর দুজন লোক ইলেকট্রিক পোলের ওপর উঠে বসেছে শুনে সেই দৃশ্য দেখতে বেরিয়েছে এক দম্পতি মিনা ও শফিক। যথারীতি 'মিনা বিকেলে হালকা রঙের শাড়ি ভাল লাগবে না' বলে 'একটা রঙচঙে শাড়ি পরলো' শফিক 'চকলেট রঙের শার্ট পরলো— এটায় তাকে খুব মানায়।' যেন এক উৎসবে যাচ্ছে তারা। আমরা বুঝতে পারি, ঘটনাটি তাদের কাছে উৎসবের মর্যাদাই পাচ্ছে। কারণ সচরাচর এ সময় তাদের বেরুনো হয় না, তাও আবার এমন একটি 'বিশেষ' ঘটনা উপলক্ষে। নির্দিষ্ট স্থানে বহুলাকের ভিড়— যেন এক মিলন-মেলা। তবে কি এ এক (ওই দম্পতির মতো) বৃত্তাবদ্ধ মানুষের সম্মিলন? এসব লোক প্রত্যাশা করে থাকে যেন উঠে বসা লোক দুজন উঁচু থেকে লাফ দেয়, কিন্তু তারা স্বাভাবিকভাবেই নিচে নেমে এলে দর্শকদের মধ্যে যেন এক গভীর হতাশা নেমে আসে! রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ মুহূর্তেও এ নিয়ে ওই দম্পতির দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়।

এসব গল্পে আমরা জীর্ণ, ম্লান, ম্রিয়মাণ, ক্ষয়ে যাওয়া মধ্যবিত্ত জীবনের ছবিটি ফুটে উঠতে দেখি। খুবই সহজ ভাষায় সাবের এই অনতিক্রম্য বৃত্তের কথা জানিয়ে দেন পাঠককে।

গল্পগুলোর আরেকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার মতো। এগুলোতে প্রধান চরিত্রগুলো ছাড়াও নাম না-জানা অসংখ্য মানুষের উপস্থিতি দেখতে পাই। 'জীবন যাপন' গল্পে ধসে পড়া বাড়ি দেখতে আসা মানুষ, 'পুলিশ আসবে' গল্পে প্রতিবেশীর মৃত্যুতে অন্যান্য প্রতিবেশীর আলাপচারিতা, কিংবা 'লাফ' গল্পের মজা দেখতে আসা দর্শকরা যেন প্রধান চরিত্রগুলোর সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। যেন তারা সবাই মিলে একটিমাত্র চরিত্র যে প্রতিনিধিত্ব করছে জরাজীর্ণ জীবন-যাপনকারী মানুষের, প্রধান চরিত্রগুলো যেমন এইসব 'বিশেষ' ঘটনায় উদ্বেলিত, তারাও একই রকম— গল্পে উল্লেখিত না হলেও বুঝতে পারি তারা সবাই মিলে হয়তো একইভাবে বাসা থেকে সেজেগুজে বেরিয়েছে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা দেখার জন্য।

অনেকগুলো মানুষ মিলে একটি মাত্র চরিত্রের ইমেজ সৃষ্টি করার এই অসামান্য প্রক্রিয়াটি সাবের ছাড়া আর খুব কম লেখকের গল্পেই নির্মিত হতে দেখা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২ গ.

এই যে জীবন— বৈচিত্র্যহীন, পৌনঃপুনিক, ধূসর হয়ে আসা সম্ভাবনা ও স্বপ্ন, প্রায় না থাকার মতোই জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকার এই জীবনকে কি মেনে নেয়া যায়? নাকি পারে কেউ মেনে নিতে? মেনে নেয়া যায় না বলেই এরকম জীবন-যাপনকারী মানুষগুলোর খুব গভীরে গোপনে পরম মমতায় লালিত হয় মধুর স্বপ্ন। তাদের দৈনন্দিন জীবন-পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে ওই স্বপ্ন হয়তো খানিকটা বেমানান, তবু স্বপ্ন তো স্বপ্নই। 'আশ্চর্য প্রদীপ' গল্পের মলি তাই ফেরিওয়ালার কাছে থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে পুরনো প্রদীপ কিনে স্বামীর সঙ্গে হিসেব-নিকেশে মেতেছে ওটাকেই আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ ধরে নিয়ে। কী কী চাওয়া যেতে পারে দৈত্যের কাছে তার একটা তালিকাও তৈরি হয়ে গেছে! বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, গহনা, কনস্ট্রাকশন ফার্ম ইত্যাদি আরও বহু কিছু। সাবের তাদের ভেতরের স্বপ্নগুলোকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনেন। দম্পতির ওই আশ্চর্য কার্যকলাপে অবাক হয়ে যেতে হয়। এ-ও এক ফ্যান্টাসী বটে। কিছুই সত্য নয় তারা জানে, কিন্তু চাহিদার লিস্ট তৈরিতে তারা এতটাই মগ্ন যেন জীবনে এর চেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় আর হয়ই না। এ যেন নিজেদের জীবন-যাপনের প্রতি এক তীব্র কটাক্ষ, বিদ্রুপ ও উপহাস। নিজেকেই ব্যঙ্গ করা, নিজের ব্যর্থতার প্রতি এক ভয়ংকর প্রতিশোধ। গল্পের শেষে তারা অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ে— সে হাসিতে একইসঙ্গে ভাঙে তাদের স্বপ্নের সৌধ, কল্পনার মোহনীয় পৃথিবী, সেই ভাঙা ফাটল দিয়ে তাদের ভাঙাচোরা জীবন উঁকি দেয়— 'কাল মশারির ঐ ফুটোটা সেলাই করতে ভুলো না যেন, কাল রাতে বেশ কয়েকটা জাম্বো সাইজের মশা ঢুকেছিল।'

আবার 'মৃদু নীল আলো' গল্পের হাফেজ পাশের শূন্য বাড়িতে তার নিজের মতো কারো উপস্থিতি টের পায়। দীর্ঘদিন ওই ফ্ল্যাট বাড়িটি খালি ছিল। এত সুন্দর বাড়িতে, এত বেশি ভাড়া দিয়ে কে-ই বা এমন নোংরা এলাকায় আসবে? কিন্তু হঠাৎ যেন হাফেজ টের পায়, ওখানে কেউ এসেছে এবং ওদেরকে তার কাছে পরিচিত বলে মনে হয়।

> 'তাকে দেখে সে মুহূর্তেই হাফেজের মনে হল— আরে এ লোকটিকে তো আমি চিনি।... লোকটার বয়স তারই মতো, সুতরাং ভার্সিটি, কলেজ কিংবা কে জানে স্কুলজীবনের বন্ধুও হতে পারে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, শুধু বয়সের মিল নয়, তাদের চেহারায়ও মিল আছে। লোকটা অবশ্য সব মিলিয়ে তার চেয়ে অনেক উজ্জ্বল, তবে মিলটুকু টের পাওয়া যায়।... ও বাড়ির স্ত্রীটিকে দেখল সে। সে আবার অবাক হল, এ মহিলাটিও যেন চেনা, যেন তার পরিচিত।— পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে সে যেটুকু বুঝল, তাতে তার মনে হল জুটি হিসেবে ওরা চমৎকার।' (মৃদু নীল আলো / মৃদু নীল আলো)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য গল্পটি এ পর্যায়ে আসার আগেই আমরা জেনে গেছি— হাফেজ দাম্পত্য জীবনে সুখী নয়। স্ত্রীর নির্মমতা তার সমস্ত আয়োজনের ভেতর কালো অন্ধকারের ছায়াপাত ঘটায়। এমনকি সঙ্গমের উদ্যোগ নিলেও তাকে— 'এমন ছারপোকার মতো করছো কেন'? — এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনতে হয়। বোঝা যায়, হাফেজের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত, সেখান থেকে বিরামহীন রক্তপাত ঘটে।

পাশের বাসার নতুন প্রতিবেশী ওই সুখী দম্পতি তাই তার আগ্রহ ও কৌতুহলের বিষয় হয়ে ওঠে। নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখার উত্তেজনা আর আনন্দ নিয়ে সে তাদের সঙ্গমদৃশ্য দ্যাখে।

> 'পুরোটা দেখা যাচ্ছে না, তবে জানালার পর্দা বেশ কিছুটা সরানো। ঘরে মৃদু নীল আলো, সে আলোয় পুরো দৃশ্যটি যেন অলৌকিক হয়ে উঠেছে। যদিও দৃশ্যটি স্থির নয়, তবে ততটা গতিশীলও নয়, বরং তীব্র, ছটফটে, যেন যে-কোনো মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। কিন্তু এত কিছুর পরও দৃশ্যটি মায়াবী। সে অভিভূতের মতো তাকিয়ে থাকল।... স্ত্রীটি যেন চিতা বাঘের মত ক্ষীপ্র ও তীব্র। কখনও মনে হচ্ছে একটি চিতা ধীর গতিতে ছুটে এসে লাফ দিয়েছে, সেই লাফটি মাঝ পথে হঠাৎ থমকে গেছে। কখনও মনে হচ্ছে পুরুষটি লাফ দিয়ে মাঝপথে থমকে যাওয়া চিতাটিকে ধরে শূন্য থেকে সবেগে মাটিতে চিৎ করে ফেলবে। আবার কখনও তারা, যেন বেদনার্ত। যেন অন্যকে ধরে না রাখলে তাদের কেউ একজন চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে। আবার কখনও তারা পরস্পরকে গুড়িয়ে দিতে চায়, যেন পরস্পরকে কী এক বিপুল ক্রোধে ও বিক্রমে দেখে নিতে চায়। এই তীব্র দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ব্যাকুল সে এক সময় উত্থিত নিজেকে, সবেগে চেপে ধরলো এবং উত্তেজনায় অস্থির-উন্মাদ হয়ে গেল।' (মৃদু নীল আলো / মৃদু নীল আলো)

হাফেজ এসব দ্যাখে আর বাবার বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া স্ত্রীর কাছে অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়। গল্প এগিয়ে যায়, আকস্মিক চমকটির জন্য পাঠককে অপেক্ষা করতে হয় গল্পের শেষ পর্যন্ত। হাফেজের স্ত্রী ফিরে এলে পরিস্থিতি পাল্টে যায়।

> 'জাহানারা তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে নিয়ে গেল জানালার কাছে—... 'দ্যাখো, জানালা দিয়ে দ্যাখো, তাকাও তুমি। কোথায় নীল আলো? মিথ্যুক কোথাকার! পাশের বাসায় লোক এসেছে, না? স্বামী-স্ত্রী, তাদের নাকি আবার খুব চেনা চেনা লাগে। কী শান্তিতে নাকি ঘুমায় তারা, আবার ওসব করতে দ্যাখে তাদের। মিথ্যুক, পাগল, চুপ করে আছো কেন, তাকাও তুমি— নীল আলো, না? কোথায় তোমার নীল আলো... ফাঁকা বাড়ি, অন্ধকার ছাড়া আছে কি ওদিকে?' (মৃদু নীল আলো / মৃদু নীল আলো)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, অন্ধকার ছাড়া কিছুই নেই ওদিকে। হাফেজ কি তবে আসলেই মিথ্যুক? তাহলে কী দেখলো সে এতদিন? আমরা বুঝে যাই, সে আসলে কল্পনায় নিজেকেই দেখেছে ওখানে। যে জীবন সে কামনা করে, তারই ছায়া যেন পাশের ফ্ল্যাটে নীল আলোয় বাস্তব রূপ নিয়েছে। না থাকুক ওরকম দৃশ্য বাস্তবে, কিন্তু 'জাহানারা কি জানে না, ও কথার উত্তরে সে বলতে পারে, সে এমন বলতেই পারে, জাহানারা, কোথাও কি নীল আলো নেই?' আমরা বুঝতে পারি, ওই স্বপ্নময় নীল আলোর জন্য হাফেজের বুকের ভেতরে কী গভীর কামনা! 'কোথাও জীবনের জন্য কি নীল আলো নেই' এ আসলে তার নিজের কাছেই অনুচ্চারিত প্রশ্ন। কোথাও কি নেই এতটুকু প্রত্যাশিত জীবনের সম্ভাবনা? এতটুকু ভালোবাসা, এতটুকু প্রেম, যা জীবনকে এনে দিতে পারে আনন্দময় উদ্দামতা— কোথাও কি নেই তার উপস্থিতি? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না, তবু আমরা বুঝতে পারি। নেই, কোথায় নেই এতটুকু ভালো থাকার সম্ভাবনা। এ হয়তো নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, কিন্তু একজন সফল শিল্পীর পক্ষে এই বর্তমানকালে এই নির্দয় সময়-সমাজে আর কী-ই বা করার আছে, যেখানে কোথাও কোনো ইতিবাচকতার ছোঁয়া নেই?

৩

আর এভাবেই সাবের হয়ে ওঠেন মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রূপকার। বাংলাদেশের গল্পের অর্ধ শতকের ধারাবাহিকতায় সাবেরের মতো এমন গভীর তীব্রতায় নাগরিক জীবন-যন্ত্রণার বিষয়টি আর কারো গল্পে ধরা পড়েনি। আমার সব সময় মনে হয়েছে— আমাদের লেখকদের মধ্যে সাবেরই এই দুর্বিসহ জীবন-যাপনের প্রকৃত স্বরূপটি বোঝেন। আর এই বিষয়ে প্রথম দিকের গল্পগুলোতেই তাঁর প্রতিভার আভাস লক্ষ করা গেলেও পরবর্তীকালে তা আরও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'অবসাদ ও আড়মোড়ার গল্প উত্তম কুমার'-এর কথা হয়তো অনেকেরই মনে পড়বে। এই গল্পের দম্পতি তাদের ভয়াবহ অবসাদ কাটাতে— এতটাই অবসাদগ্রস্থ তারা যে কোথাও বেড়াতে গেলে কাপড়-চোপড় পরতেও ক্লান্তি লাগে— একটি খেলায় লিপ্ত হয়। লোকটি তার স্ত্রীকে সঙ্গমের সময় কল্পনা করে নিতে বলে যে সঙ্গমটি হচ্ছে উত্তমকুমারের সঙ্গে— উত্তম কুমার মেয়েটির প্রিয় নায়ক। প্রথমে বোঝা যায় না এর ফলাফল কী, কিংবা মেয়েটি সত্যিই তা-ই ভেবে নিয়েছিল কী-না। কিন্তু গল্পের শেষে আমরা যখন শুনি, সে তার স্বামীকে কল্পনাটি ফিরিয়ে আনার কথা বলছে, তখন আপাদমস্তক কেঁপে ওঠা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। তবে কি সে স্বামীর সঙ্গে নয়, বস্তুত, সঙ্গমটি হয়েছিল উত্তম কুমারের সঙ্গেই? কেবল শরীরটি ছিলো স্বামীর কিন্তু কল্পনায় অস্তিত্ব ছিল উত্তম কুমারের! এবং আমরা দেখি, ব্যাপারটার প্রতি তার মোহও আছে, অবসাদ কাটাতে সে আবারও কল্পনায় সঙ্গমে লিপ্ত হতে চায় উত্তম কুমারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে। অবসাদ, নাগরিক ক্লান্তি, বিপন্নতা, গতানুগতিকতার বোধ কতটা ভয়াবহভাবে গ্রাস করে নিলে এরকম ভাবা সম্ভব? সাবের যেন সমস্ত শুভ ও কল্যাণবোধ, সুখ ও দাম্পত্য জীবন ইত্যাদি ভালো ভালো কথাগুলোর ওপর বাজ ফেলে ছাড়বেন। কারণ তিনি জানেন—এই জীবন, এই তথাকথিত মূল্যবোধসমূহ, এই ভন্ডামিপূর্ণ সুখী সুখী ভাব– সবকিছুই মুখ থুবড়ে পড়ে এই নির্দয় নগর জীবনে।

৪

গতানুগতিক কোনো প্রেমের গল্প লেখেননি সাবের। বাজার-চলতি বিভিন্ন প্রেমের গল্পে আমরা বহু ব্যবহারে পচে যাওয়া যে বিষয়গুলোর দেখা পাই, সাবেরের গল্পে সে-সব নেই। তাঁর গল্পের কোনোকিছুই ঠিক সরাসরি নয়, বরং খানিকটা রহস্যময়তায় লুকায়িত। সাবেরের যে-সব প্রেমের গল্প চোখে পড়ে, অধিকাংশেই আমরা দেখতে পাই, গল্পের চরিত্রগুলোর ভেতরে 'প্রচলিত' প্রেম হয়ে ওঠে না। একটা দূরত্ব, একটা দেয়াল, একটি চিরন্তন অমীমাংসিত সম্পর্কের আভাস রয়েই যায়। তাদের মধ্যে কোনো নিদিষ্ট সম্পর্ক আবিষ্কার করাও দুরূহ হয়ে পড়ে। এসব গল্প থেকে সম্পর্কবোধ নিয়ে সাবেরের একটি দার্শনিক উপলব্ধির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ মেলে। একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের সম্পর্ককে, গভীরভাবে ভাবতে গেলে, কোনোভাবেই সংজ্ঞায়িত করা যায় না। আমরা যে-সব শব্দ দিয়ে সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করতে চাই সেগুলো কি বিভ্রান্তির ওপর দাঁড়ানো নয়? মানুষ চূড়ান্ত বিচারে একা, নিঃসঙ্গ ও স্বতন্ত্র। সম্পর্কের বিষয়টি তাই শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত ও অসংজ্ঞায়িত। এই বিষয়টি তাঁর গল্পগুলোতে চমৎকারভাবে চিত্রিত হতে দেখি নৈর্ব্যক্তিক কুশলতায়। কোনো সরল সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারার ব্যর্থতা পাঠক হৃদয়ে এক ধরনের বেদনা জাগিয়ে রাখে, কিছু প্রশ্ন রয়েই যায়। গল্পগুলো তাই আকর্ষণ করে পাঠককে। এর সবই যে সফল গল্প তা হয়তো নয়, কিন্তু এগুলোর ভিন্নমাত্রিক ব্যঞ্জনাটুকু মনের গভীরে অনুরণন তোলে।

সাবেরের সবচেয়ে চমৎকার প্রেমের গল্প 'তার স্বপ্ন'। বলা বাহুল্য গল্পটি ভিন্নধর্মী, সফল এবং উল্লেখযোগ্য। একটিমাত্র চরিত্র নিয়ে গল্প। কোনো এক প্রতিষ্ঠানের নিম্নমানের কর্মচারী সে। অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই, মেসে ফিরে এসে নিত্যদিনের ক্লান্তিকর ঝগড়া-ফ্যাসাদ, হৈ-চৈ— ব্যর্থ মানুষগুলো যা নিয়ে বেঁচে থাকে। সে-ও কি তাই নয়? মাসে মাসে গ্রামে প্রায়-অন্ধ মাকে টাকা পাঠায় সে, খুচরো পয়সা জমিয়ে মায়ের চোখ অপারেশনের টাকা জমানোর চেষ্টা করে, আর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি হিসেবে কাঁধের গভীর ক্ষতচিহ্ন আর অন্তর্গত কান্না নিয়ে বেঁচে থাকে। বৈচিত্র্যহীন, সম্ভাবনাহীন এই বেঁচে থাকা— এই জীবন যাপন। একদিন সে ঘনায়মান সন্ধ্যার ম্লান আলো-অন্ধকারের মধ্যে একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাউজ খুঁজে পায় তার মেসের পাশের রাস্তায়, যার অনতিদূরেই একটি সাদা দোতলা বাড়ি, যেটি দেখলেই একটা সুখী সুখী ভাব জাগে আর সেই বাড়ি মাতিয়ে রাখে তিনজন উজ্জ্বল-উচ্ছল তরুণী। সে ব্লাউজটিকে ওই বাড়ির ছোট মেয়ের বলে সনাক্ত করে এবং সঙ্গে করে মেসে নিয়ে আসে। নিজ কামরার দরজা বন্ধ করে সে ব্লাউজটির সঙ্গে কথা বলে। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন ও কল্পনার কথা। ব্লাউজটিকেই একটি নাম দিয়ে তাকে আদর করে, ভালোবাসে। যেন ব্লাউজটি সত্যিই ওই বাড়ির ছোট মেয়ে। যেন তাদের মধ্যে কত গভীর প্রেম! গল্পটিকে আমার কাছে খুবই ভিন্নধর্মী ব্যঞ্জনাময় বলে মনে হয়েছে। বাঙালি পাঠকের এ ধরনের 'প্রেমের গল্প' পড়ার অভিজ্ঞতা খুব সামান্যই, বলা চলে অভূতপূর্ব।

৫

যে সময়টিতে সাবের এবং তাঁর সমসাময়িকেরা নিজেদেরকে গড়ে তুলেছেন লেখক হিসেবে, সত্তরের সেই দুর্বিনীত, নির্দয়, বিপন্ন সময়কে তাঁর লেখায় খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। সাবেরের সফল গল্পগুলো আবহমান সত্যকে ধারণ করে আছে যেগুলো কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই নয়, সব কালের জন্যই সত্য। পরিবর্তিত স্থান-কালেও এই সর্বজনগ্রাহ্য গ্রহণযোগ্যতা সফল শিল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু একজন লেখকের কাছে তাঁর সময়ের চিত্রায়ণ প্রত্যাশা করাও পাঠকের অধিকারের মধ্যে পড়ে। সাবের যে সেটি পারেন না, তা নয়। এ ধরনের একটিমাত্র গল্প 'ভুল বিকাশ' তার প্রমাণ। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের প্রথম দু-তিনটি বছর এ গল্পে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সফলভাবে চিত্রিত হয়েছে। গল্পে আমরা দেখি, একজন যুবক তার স্ত্রীর কাছে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তার স্বল্প সময়ের আশ্রয়স্থল একটি গ্রামের আর সেখানকার মানুষদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে। তাঁর স্মৃতিতে গেঁথে আছে একাত্তরে মানুষের সীমাহীন আত্মত্যাগ, পারস্পরিক মমত্ববোধ, ভালোবাসা এবং আবহমান গ্রামবাংলার ঐশ্বর্য। তিন দিন ছিল সে ওখানে, তারপর তিন বছর কেটে গেছে, কিন্তু ভুলতে পারেনি একটুও। এক সময় সে স্ত্রীকে নিয়ে ওই গ্রামে পৌঁছে। কিন্তু তার স্মৃতিতে যে গ্রাম গেঁথে আছে, বর্তমানের সঙ্গে তাকে মেলাতে পারে না কিছুতেই। মানুষ আর আন্তরিক নয় মোটেই, পুকুরে আর সারাদিন জাল ফেলেও মাছ পাওয়া যায় না, কেউ মারা গেলে তার দাফনের জন্য লোক পাওয়া যায় না, ঐশ্বর্যশালী সেই গ্রামের অধিবাসীরা এখন ক্ষুধার তাড়নায় শহরমুখী। একাত্তরে সে গ্রাম ছেড়ে সীমান্তমুখে পালানোর সময় তার মানিব্যাগ ফেলে গিয়েছিল তখন মুসা নামের যে ছেলেটি দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে তাকে সেটা ফিরিয়ে দিয়েছিল, আজ মাত্র তিন বছরের মাথায় সেই মুসা-ই তার হাতঘড়ি, মানিব্যাগ, তার স্ত্রীর গয়না ছিনিয়ে নেয়। আমরা বুঝতে পারি, মানুষ বদলে গেছে ভয়াবহভাবে, বদলানোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণটি যদিও সাবের উল্লেখ করেননি, আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না–, মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি বলে, তাদের অসীম আত্মত্যাগের মুল্যায়ন হয়নি বলে, সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদেরকে ক্ষুধার রাজ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে তাদের এই নেতিবাচক পরিবর্তন। ওই সময়ের এই চমৎকার চিত্রায়ণ, সময় ও মানুষের এই অপ্রত্যাশিত 'ভুল বিকাশ' সাবেরের কলমে চমৎকারভাবে উঠে এসেছে।

৬

মঈনুল আহসান সাবের সবচেয়ে বেশি গল্প লিখেছেন বোধহয় নিসর্গ নিয়ে। নিসর্গের সংস্পর্শে এসে নাগরিক মানুষের পরিবর্তন আর প্রকৃতির সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় মানুষের ক্রমাগত যন্ত্রে পরিণত হওয়ার চিত্র চমৎকার প্রতীকময়তায় পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন তিনি। 'হন্তারক', 'প্রাকৃতিক' 'ফিরে আসা' 'সীমাবদ্ধ' এই ধরনের গল্প। এর প্রায় সবগুলোই উল্লেখযোগ্য ও সফল। এর মধ্যে 'সীমাবদ্ধ' গ্রন্থের গল্পগুলো আলোচনা-সমালোচনা-প্রশংসায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। এই গল্পগ্রন্থে প্রতীকের ব্যবহারে সাবেরের দক্ষতা একটি ইর্ষণীয় সাফল্যের পর্যায়ে পৌঁছেছে।

এ ধরনের গল্পে নাগরিক মানুষের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা, একাকীত্ব, জীবনের দুঃসহ জটিলতা ও বিপন্নতার বোধ, এবং বৃত্তাবদ্ধ জীবনের কুশলী ছবি দেখা যায়। আধুনিক যন্ত্র-নির্ভর নগর জীবনের দুঃসহ চাপে মানুষ আর স্বাভাবিক নেই। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসবোধ, মমত্ববোধ আর যাবতীয় সহজতা-সরলতা-স্বাভাবিকতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলির মর্মান্তিক অবসান ঘটেছে। বিচ্ছিন্নতা আর সম্পর্কহীনতার জটিল আবর্তে মানুষ ক্রমশ বাণিজ্যিক হচ্ছে, নিঃসঙ্গ হচ্ছে, হয়ে উঠছে দিশেহারা। নগর জীবনে বিচ্ছিন্নতা যেমন বাড়ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের, তেমনই মানুষের সঙ্গে নিসর্গেরও। নিসর্গ, যা মানুষকে নমনীয় আর উদার করে তোলে, তার অনুপস্থিতি আমাদেরকে ক্লান্ত করে তুলছে, করে তুলছে বিপন্ন এবং ক্রমশ আমরা এই অমানবিক জীবন যাপনেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। 'সীমাবদ্ধ' গ্রন্থের তিনটি গল্পে আমরা এসবেরই ছবি দেখতে পাই অসামান্য প্রতীকময়তায়।

প্রথম গল্পটিতে দেখি, নগর জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার চাপে— 'মানুষের হৈ-হল্লা, চিৎকার, ছোটাছুটি এসবের প্রতি অথবা সমগ্র মানুষের প্রতি তীব্র এক বিতৃষ্ণা কিংবা তাকে হয়তো ক্ষোভও বলা যেতে পারে'— এক যুবক শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে নিসর্গের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য। এক সময় সে 'গাছের পাতায় গান আর নীরবতার নিজস্ব আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই নেই' এমন একটি জায়গায় একটি বাংলোয় পৌঁছে যায়। বাংলোর অনতিদূরে দীর্ঘ-বিস্তৃত বনভূমি। গল্পের শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখান থেকেই। সেখানে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয় তার, যাকে কিছু লোক এখানে এনে বন্দি করে রেখেছে এবং আজ রাতেই তারা দল বেঁধে আসবে। মেয়েটির 'মুখের সঙ্গে একটু বেমানান বড় বড় চোখ, পেঁয়াজ রঙের ঠোঁট, মুখায়বরে সামান্য অমার্জিত ভাব যা বরং তার যৌবন-দীপ্তি, সৌন্দর্য কিংবা সারল্য আরও বৃদ্ধি করেছে।' এবং— 'নিটোল বাতাস পাহাড়ী ফুলের গল্প, অল্প দূরে সবুজ বনভূমির ওপর চাঁদের আলো আর নীরবতা অস্বীকার করে তার কান্নার শব্দ সব দিকে ছড়িয়ে পড়লো। উচ্চস্বরে কান্না নয়, শব্দ গুমরে উঠছিল।' — এমন একটি মেয়ে যুবককে মিনতি জানায় উদ্ধারের জন্য এবং অতঃপর সে মেয়েটিকে নিয়ে ঘনায়মান সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়ে এবং অচিরেই বনভূমির ভেতর চলে আসে। সবুজ-নিবিড়-মায়াবী বনভূমি তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয় দেয়, হিংস্র মানুষদের খপ্পর থেকে রক্ষা করে। চাঁদের আলোয় বনভূমির ভেতর পথ চলতে চলতে মেয়েটি তার দীর্ঘ দুঃশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা-ভয়-শঙ্কা ঝেড়ে ফেলে সহজ হয়ে ওঠে— 'এমন সহজতা না এলে বনভূমির এই সবুজ সতেজ বৃক্ষাদির সঙ্গে বুঝি খাপ খায় না। তাকে এখন সদ্যরোপিত কোনো কোমল চারার মতো মনে হয়, সামান্য ক্লিষ্টতা নিয়েও সে স্নিগ্ধতা ছড়ায়।' মেয়েটি উজ্জ্বল ও উচ্ছল হয়ে ওঠে। কথা বলতে বলতে তারা ক্রমশ কাছাকাছি চলে আসে। সবই ঘটে যায় বনভূমির আবেশ ও আচ্ছন্নতায়। রাত গভীর হলে মেয়েটি যুবকের কাঁধে মাথা রেখে বহুকালের আপনজনের মতো অবলীলায়, নিশ্চিন্তে ঘুমায়। পরদিন সকাল থেকে তাদের আবারও হাঁটার শুরু। গন্তব্য শহর। পথে মেয়েটি প্রায় নগ্ন হয়ে ঝিলের জলে স্নান করে, বুক খুলে সেখানে হিংস্র লোকগুলোর নখের আঁচড় দেখায়। অপরিচিত এক যুবকের কাছে সে কী অসম্ভব-অকল্পনীয় সহজ-স্বাভাবিকতায় নিজেকে মেলে ধরে, ভাবা যায় না! ক্রমশ তারা নগরের কাছাকাছি চলে আসে। এরই মধ্যে তাদের পারস্পরিক বহু কথা জানা হয়ে গেছে, অনেকটা কাছাকাছি চলে এসেছে পরস্পরের। কিন্তু এক সময়, যখন তারা শহরের রুক্ষতার ভেতর পৌঁছে— পরিস্থিতি বদলে যায়। মেয়েটির সহজতা, প্রকৃতির মতো নিবিড় সবুজতা হারিয়ে যায়। মেয়েটি তখন 'আমাকে সরু চোখ দ্যাখে, আমি অবাক হয়ে তাকাতেই সে মুখ ফিরিয়ে সরে যায় একপাশে। তার চোখে মুখে তখন সন্দেহ, দ্বন্দ্ব আর আতঙ্ক...।' এরপর—

> 'আমরা তখন প্রায় শহরের মাঝখানে। সে কি গর্জন চারপাশে, গাড়ি ঘোড়া আর যেন লোহার পাত পায়ে হাঁটা মানুষের কি উদভ্রান্ত দৌড়-অনির্দিষ্ট ছোটাছুটি, কি ঘোর কালো বর্ণে ছাওয়া আকাশ, কারখানার বিকট গর্জন। মেয়েটা আমার নাগাল থেকে সরে গিয়ে টেনে টেনে বুকের আঁচল বারবার ঠিক করে, বিন্যস্ত শাড়ি আরো বিন্যস্ত করতে চায়, সহজ ভঙ্গির হাঁটা ছেড়ে কেমন জড়িয়ে পা ফেলে। আড়চোখে সে আমাকে দ্যাখে আর আমরা যত শহরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরে যাই ক্রমশ, ততই সে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। সে আমাকে বিশ্বাস করে এতটা পথ এসেছিল। এখন কি আশ্চর্য, সে আমাকে বিশ্বাস করছে না, হা ইশ্বর, সে আমাকে ভয় পাচ্ছে। নিজেকে কী সহজেই গুটিয়ে ফেলেছে!' (সীমাবদ্ধ-১/ সীমাবদ্ধ)

অংশটুকু ব্যাখা করার প্রয়োজন পড়ে না। সাবের এই গল্পে প্রতীক ব্যবহারে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই অংশটুকুতেই তিনি পাঠককে জানিয়ে দিয়েছেন কী অস্বাভাবিক দ্রুতগতি আর নির্মমতায়, নগরের পরিবেশ ও জলবায়ু মানুষের সকল শুভ ও সুন্দর সম্পর্ক, পারস্পরিক বিশ্বাস ও মমত্ববোধ, সকল সহজতা ও স্বাভাবিকতাকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষকে করে তোলে নিঃসঙ্গ, অবিশ্বাসী ও বিপন্ন।

'সীমাবদ্ধ-২' গল্পের যুবক-যুবতী শহর থেকে পালিয়ে বনভূমির কাছে এক বন্ধুর বাংলোয় এসে উঠেছে বিয়ে করবে বলে। তারা পরস্পরকে ভালোবাসে গভীরভাবে, কিন্তু মেয়েটি খুব রক্ষণশীল, বিয়ের আগে কিছুতেই নিজের অর্গল খুলতে রাজি নয় সে। অবশেষে তারা নিসর্গের সান্নিধ্যে এসে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং এক সময় মেয়েটি নিজেকে সমর্পণ করার জন্য প্রস্তুত হয়। এই সময় দূরে বাঘের গর্জন তাদের আরও পাগল করে তোলে। মেয়েটি সভ্যতার সমস্ত অপ্রয়োজনীয় খোলস ছাড়িয়ে নিজেকে নিসর্গেরই অংশ করে তোলে, কিন্তু এর পরপরই যখন সার্ভে প্লেনের শব্দ পায় তারা, মেয়েটি নিজেকে গুটিয়ে নেয় আবার, খোলসে আবদ্ধ করে নিজেকে, নাগরিক লজ্জা-সংকোচ-সংস্কারের কাছে পরাজিত হয়ে 'সভ্য' মানুষ হয়ে যায় তারা। এই গল্পেও প্রতীকের ব্যবহার লক্ষণীয়। যখনই তারা একটি প্রাকৃতিক শব্দ— বাঘের গর্জন শুনলো তখন তারাও হয়ে উঠলো প্রাকৃতিক, কিন্তু পর মুহূর্তেই সভ্যতার যান্ত্রিক শব্দ তাদেরকে করে তুললো নানারকম সীমাবদ্ধতায় আক্রান্ত নাগরিক জীব।

'সীমাবদ্ধ-৩' গল্পেও এরকম একটি চমৎকার প্রতীক আছে। সদ্য বিবাহিত যুবক-যুবতী হানিমুনে এসেছে বনভূমির কাছাকাছি কোথাও। তারা ধীরে ধীরে অসম্ভব সুন্দর জায়গাটির সঙ্গে পরিচিত হয়, মুগ্ধ হয়, এমনকি এখানে সারাজীবন থেকে যেতে পারবে বলেও ভাবতে শুরু করে। এক রাতে তারা বেরিয়ে বনভূমির পাশে, নদীর কাছাকছি বসে পড়ে। কিন্তু গভীর নিস্তব্ধতায় পতিত বনভূমি, জনমানবহীন, সভ্যতার স্পর্শবিহীন অঞ্চলের গভীর নীরবতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে তোলে। এক সময় তাদের কাছে নিসর্গের এই বিশালতা-গভীরতা অসহ্য বোধ হয়—

'টের পাই আমাদের চারপাশে সব কিছু ক্রমশ বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে ওঠে।... বাতাস যেন রণহুংকার দিয়ে ওঠে। জোৎস্না যেন আরেক পরল নিজেকে খুলে দেয়। নদী যেন ছুটতে আরম্ভ করে। আকাশের যেন আরও কিছু বিস্তার ঘটে। আমাদের সহ্য হয় না, আমাদের ভয় হয়। এত বড়, এত বিশাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। আমরা বাংলোর দিকে ছুটতে আরম্ভ করি। দ্রুত ছুটে পৌঁছে যাই। ...ঘরে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে দিই। আমরা হাঁপাই কিন্তু তৃপ্তিতে আমাদের চোখমুখ চকচক করে। আমাদের ছোট ঘর, দু'পা হাঁটলে তার দেয়াল, মাথার দেড় হাত ওপরে ছাদ, ঘরে জ্বলছে বিদ্যুতের ম্যাটম্যাটে আলো। তিন ব্লেডের ফ্যান সীমিত পরিসরে নিয়ন্ত্রিত বাতাস ছড়াচ্ছে। আমরা স্বস্তিবোধ করি।' (সীমাবদ্ধ-৩/ সীমাবদ্ধ)

আমরা যে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি এই সঙ্কীর্ণ-ক্ষুদ্র-সীমাবদ্ধ জীবনে, গল্পের এই অংশটি সেই সত্যের উদ্ভাস ঘটায়। নিসর্গ আমাদেরকে বিশালতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় বটে, কিন্তু সেই বিশালতা-উদারতার একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আমরা গ্রহণ করতে পারি, তার পরে নয়। এতই সীমাবদ্ধ আমাদের জীবন যে প্রকৃতির বিশালতাও আমাদের কাছে অসহ্য বোধ হয়।

'সীমাবদ্ধ' গ্রন্থের অন্য দুটো গল্পের মতো এটিতেও প্রতীকের ব্যবহার চমৎকার। কিন্তু তুলনামূলকভাবে এটি দুর্বল গল্প। গল্পটি অসম্ভব পুনরাবৃত্তিতে আক্রান্ত, ঘুরে-ফিরে বারবার একই সংলাপ কোথাও কোথাও বিরক্তির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। শেষের দিকে গল্পটি তার দৃঢ়তা হারিয়েছে এবং বক্তব্যগুলো খুবই সরাসরি এসেছে এবং শেষ দিকের প্রায় প্রতিটি সংলাপে 'সীমাবদ্ধ' শব্দটি ব্যবহার করে তিনি যেন গ্রন্থটির নামকরণের স্বার্থকতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন! পড়তে গিয়ে মনে হয়, গল্পটি লেখার সময় লেখকের খুব তাড়া ছিল।

৭

সাবেরের সফল গল্পগুলোতে মানুষের জীবন যতটা না চিত্রিত হয় তার পারিবারিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা-সম্ভাবনা-অবস্থার প্রেক্ষাপটে, তার চেয়ে বেশি হয় ভালোবাসা-সহমর্মিতা-মানবতার বিপর্যয় এবং যান্ত্রিকতার প্রবল গ্রাসের প্রেক্ষাপটে। তাঁর এ ধরনের গল্পগুলো খুবই ব্যতিক্রমধর্মী এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে।

যেমন, 'গ্রাস' গল্পে আমরা মানুষের ক্রমশ যন্ত্রে পরিণত হওয়ার দৃশ্যটি চমৎকার প্রতীকময়তায় চিত্রিত হতে দেখি। একটি রোবট তৈরীর কারখানায় একজন সাংবাদিক গিয়ে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সাফল্যে অভিভূত হন। রোবটদের কার্যকলাপ তাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। কিন্তু তাকে যে লোকটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সব দেখায়, তার চরম ভাবলেশহীন অভিব্যক্তি সাংবাদিকের মনে খটকা জাগায়— এ হয়তো মানুষ নয়! কিন্তু কারখানা-প্রধান তরফদার সাহেব লোকটিকে নিজের ছেলে হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সন্দেহটি প্রবল হয়ে উঠলে তরফদার সাহেবকে জিজ্ঞেস করে সাংবাদিক এক অদ্ভূত পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। তিনি জানান—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যন্ত্রপাতি ক্রমশ ওকে নিজেদের দলে টেনে নিচ্ছে। ...ওর কোনো দুঃখ নেই, ভালোবাসা নেই, কাঁদে না, হাসে না, আর আমাকে বাবা বলে ডাকে না। আমরা কোটি কোটি টাকা ঢালছি। হাজার বিজ্ঞানীকে জড়ো করেছি। দিন রাত কাজ করছি, কারণ আমরা ঠিক মানুষের মতো রোবটা বানাতে চাই। কিন্তু সাংবাদিক সাহেব মানুষ যে ক্রমশ... ।'

এই বর্ণনার পর আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে কি? মানবতার বিপর্যয় ঘটছে এভাবেই এবং মানুষ ক্রমশ স্বাভাবিকতা হারিয়ে যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে অথবা নিজেকে আড়াল করে ফেলছে নানা-রকম মুখোশের আড়ালে। 'মুখোশ' গল্পে সাবের মানুষের মৌলিকতা হারিয়ে ফেলার একটি চমৎকার প্রতীকী ছবি এঁকেছেন। যে নিষ্পাপ সহজতা-স্বাভাবিকতা নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, আধুনিক জীবনের নানা জটিলতা ও যান্ত্রিকতা তাকে ধ্বংস করে ফেলে। সমস্ত মানবিক অনুভব-অনুভূতির অকাল মৃত্যুর ফলে মানুষ পরিণত হয় যন্ত্র বা মুখোশ পরা বিচিত্র প্রাণীতে। মানব জীবনের এই চরম দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতি সাবের তাঁর শক্তিশালী কলমে উঠিয়ে এনে আমাদের গভীরভাবে স্পর্শ করেন।

উপসংহারের পরিবর্তে

ক.

বাংলাদেশের কথাশিল্পীদের মধ্যে ভাষার মোহনীয় রূপটি নিয়ে খেলা করার প্রবণতা খুব বেশি দেখা যায় না। বাংলাভাষা যে কতটা মধুর, মোহময়ী, লাবণ্যময়ী ও রূপসী হতে পারে, দু-চারজন ছাড়া আর কারো লেকা পড়ে তা বোঝার উপায় নেই। সাবেরের ভাষাটিও অতটা মোহনীয় নয় বরং কখনো কখনো দু-একটি শব্দের অতিব্যবহার (যা প্রায় মুদ্রাদোষের পর্যায়ে পড়ে) পাঠককে ক্ষুণ্ন করে, তবুও তাঁর ভাষায় একটা অন্তর্গত সুর ও ছন্দ পাঠককে মুগ্ধ করার ক্ষমতা রাখে। তাঁর অনেক গল্পে তাড়াহুড়ার চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু তিনি যদি কিছুটা সংহত হয়ে লেখেন তাহলে তাঁর ভাষা যে কতটা মোহনীয় হতে পারে, 'সীমাবদ্ধ' গ্রন্থটি তার প্রমাণ দেয়।

খ.

তাঁর সংহত রচনাগুলোর বর্ণনাভঙ্গি আশ্চর্য সুন্দর। উদাহরণ দেয়া যাক—

'জয়ার দুচোখে বনভূমির ছায়া যতই গভীর হয়ে ওঠে, ততই সে নিজেকে মেলে ধরে। এক অপ্রয়োজনীয় খোলস থেকে ওকে আমি মুক্ত করে আনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুকের বাঁধনটুকু তীব্র অস্থির হাতে খুলে ফেলি। পরমুহূর্তে দুটো অস্থির উজ্জ্বল সবুজ টিয়ে তাদের ধারালো খয়েরি ঠোঁট বাঁকিয়ে লাফিয়ে উঠেই ডানা মেলে উড়ে যাবার ভঙ্গিতে জেগে থাকে। তারপর আরও নিচে মালভূমির মাথায় বনভূমি, তার নিচে একটি কালচে গোলাপ সারারাত কুয়াশায় ভিজেছে।' (সীমাবদ্ধ-২/সীমাবদ্ধ)

গ.

সাবেরের গল্পে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র গভীরভাবে উঠে আসেনি। যারা 'সমাজবাস্তবতার সাহিত্যের' গোঁড়া অনুসারী তাঁদের কাছে সাবেরের রচনাগুলো তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে না-ও হতে পারে। কিন্তু মানবিক অনুভূতির এই চরম দুর্দশাগ্রস্ত-অবক্ষয়গ্রস্ত সময়ে তাঁর রচনাগুলোর অবশ্যই উপযোগিতা রয়েছে।

ঘ.

সাবের কখনো তাঁর গল্পে সব কথা বলেন না, অনেক কিছুই পাঠকের কাছে ছেড়ে দেন বুঝে নেয়ার জন্য। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, তাঁর গল্পগুলো ব্যক্তি সাবেরের মতোই নির্জনতাপ্রিয় ও অন্তর্মুখীন— যার বাইরেটা নিরীহ, আটপৌরে ও সাধারণ; ভেতরটা তীব্রভাবে উজ্জ্বল, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও অসাধারণ।

রচনাকাল : জুলাই ১৯৯৩
প্রথম প্রকাশ : ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪, দৈনিক জনকণ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহীদুল জহির: রহস্যের সন্ধানে

শহীদুল জহির যে শক্তিমান লেখক, এ বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না। অন্তত আমি কাউকে সন্দেহ প্রকাশ করতে দেখিনি। কিন্তু তাঁর শক্তিমত্তার জায়গাগুলো কখনোই খুব ভালোভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়নি, এমনকি তাঁকে বুঝে ওঠা নিয়েও সংশয় ছিল সবসময়ই। যারা তাঁর লেখা পছন্দ করেন তাঁদের অনেককেই আমি জিজ্ঞেস করেছি, শহীদুল জহিরের লেখা কেন তাদের ভালো লাগে? প্রশ্নটি বরাবরই তাঁর পাঠকদের জন্য ছিল বিব্রতকর। সত্যি কথা বলতে কি, আমার জন্যও। আমি নিজেও সবসময় তাঁর লেখা বুঝে উঠতে পারিনি। মুগ্ধ হয়েছি অথচ নিজের কাছেই এই মুগ্ধতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারিনি। বিশেষ করে, তাঁর চরিত্রগুলোর প্রায় উদ্ভট-অদ্ভুত-রহস্যময় কাণ্ড-কীর্তি এক ধরনের বিমূঢ় অনুভূতি সৃষ্টি করতো আমার মধ্যে, এখনো করে। এই লেখায় তারই কিছু উদাহরণ দেয়ার চেষ্টা করবো। সত্যি বলতে কি, মানবজীবনের যে বিপুল-প্রকাণ্ড রহস্যময়তা, সেটিকে তিনি উপস্থাপন করেছেন এমন এক ভঙ্গিতে যে এর কোনোকিছু বুঝে ওঠা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। তাঁর সব গল্প পাঠকরা বুঝে উঠতে পেরেছেন সে দাবি বোধহয় কেউই করবেন না, কিন্তু এমনই এক ঘোরলাগা বর্ণনাকৌশল ব্যবহার করতেন তিনি যে, একবার ওই গল্প পড়লে তার আবেশ থেকে বেরোনো কঠিন হয়ে ওঠে। তাঁর গল্প টেনে নিয়ে যায় এর ভাষা ও বর্ণনার গুণে; শেষ করে বুঝে উঠতে একটু সময় লাগলেও, কিংবা আদৌ বুঝে ওঠা না গেলেও, পাঠ শেষে এক ধরনের ভালো লাগার আবেশ ছড়িয়ে পড়ে। প্রিয় পাঠক, আসুন দেখা যাক, তাঁর সেইসব রহস্যের কিছু উন্মোচন করা যায় কী না!

১.

'কোথায় পাব তারে' গল্পের আব্দুল করিম বলে বেড়ায় যে, সে 'ময়মনসিংহ' যাচ্ছে। তার এই ঘোষণা মহল্লাবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, কারণ এই 'আইএ পাশ বেকার' যুবকটি 'জীবনে কোথাও যায় নাই এবং যাবে না'। কেন সে ময়মনসিং যেতে চায়? কারণ সেখানে 'আমার বন্দু আছে, বেড়াইবার যামু।' নানা কৌতুককর ঘটনায় গল্প এগিয়ে চলে, এবং এক পর্যায়ে এসে আমরা জানতে পারি তার এই 'বন্দু'র নাম 'শেপালি'। এই নামটি শোনার পর—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভুতের গলির লোকদের কাছে তখন আব্দুল করিম এবং তার ময়মনসিং যাওয়ার প্রসঙ্গের চাইতে শেফালি প্রসঙ্গ বড় হয়ে ওঠে, দক্ষিণ মৈশুন্দি এবং ভুতের গলির এই মহল্লার লোকদের দিন উত্তেজনায় ভরে যায়; হালায় প্রেম করে নিহি, তারা বলে। তাদের মনে হয় যে, আব্দুল করিম বেকার বলেই তার পক্ষে এইসব করা সম্ভব; তখন মহল্লার লোকেরা বেকার থেকে প্রেম করাকে ঘৃণা করতে শেখে; তারা ভুলতে পারে না যে, শেফালি একটা মেয়ে এবং আব্দুল করিম বলে যে সে তার বন্ধু। ফলে মহল্লার লোকদের রাতের ঘুম বিঘ্নিত হয়, সারা দিনের কর্মক্লান্ত দেহ নিয়ে তারা বিছানায় জেগে থাকে, জীবনের ব্যর্থতা এবং অপচয় বোধ তাদেরকে গ্রাস করেত উদ্যত হয় এবং তারা কেমন বিষণ্ন হয়ে পড়ে; তাদের মনে হয় যে, বেকার থাকাই তো ভাল আব্দুল করিমের মতো।'

(প্রিয় পাঠক, ইটালিক লাইনগুলো লক্ষ করুন। মনে কি হচ্ছে না, এই পংক্তিগুলো এই গল্প থেকে বিযুক্ত? কারণ আগাগোড়া যে ভাষাভঙ্গিতে গল্পটি উপস্থাপিত হয়েছে তার সঙ্গে এই লাইনগুলোর কোনো মিলই নেই।)

আব্দুল করিম এইসব বলে বটে, কিন্তু তার ময়মনসিংহ যাওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। নানা কারণ দেখিয়ে বিরত থাকে, কিন্তু যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে মরতে দেয় না সে। কেন?

'আব্দুল আজিজ ব্যাপারির মনে হয় যে, এটা আব্দুল করিমের একটা খেলাই, এবং সে হয়তো নিজের সঙ্গেই খেলে, শেফালি এবং ময়মনসিং বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে সে হয়তো তার জীবনের কর্মহীনতার ভেতর এই এক অবলম্বন গড়ে তোলে।'

অবশেষে সে মহল্লার দুলালকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হয়। কিন্তু অচিরেই আমরা বুঝতে পারি, সে ওই মেয়েটির নাম ছাড়া আর কিছুই জানে না। না তার গ্রামের নাম, বা বাবার নাম। যদিও শেফালিদের বাড়িতে যাবার একটা পথনির্দেশ সেখানে দেয়া আছে। সেটি এরকম:

মোছাঃ শেপালি বেগম
ফুলবাইড়া
মৈমনসিং
ঢাকা মহাখালি বাসস্ট্যান
মৈমনসিং শহর, গাঙ্গিনার পাড়
গাঙ্গিনার পাড়– আকুয়া হয়া ফুলবাইড়া বাজার, থানার সামনে
উল্টা দিকে হাঁটলে বড় এড়াইচ গাছের (কড়ই গাছ) সামনে টিএনউ আপিস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিএনউ আপিস সামনে রাইখা খাড়াইলে, বামদিকের রাস্তা– নাক বরাবর
হাই স্কুল ছাড়ায়া বরাবর সুজা, ধান ক্ষেত, কাঁটা গাছ, লাল মাটি,
বামে মোচর খায়া নদী
আহাইলা/আখাইলা/আখালিয়া নদী
নদী পার হয়া ব্রিজ পিছন দিয়া খাড়াইলে
দুপুর বেলা যেদিকে ছেওয়া পড়ে তার উল্টা দিকে,
ছেওয়া না থাকলে, যেদিকে হাঁটলে পায়ের তলায় আরাম লাগে সেইদিকে
নদীর পাড় বরাবর এক মাইল হাঁটলে দুইটা নাইরকল গাছ
দুই নাইরকল গাছের মইদ্দে খাড়ায়া গ্রামের দিকে তাকাইলে
তিনটা টিনের ঘর দেখা যাইব
তিনটা ঘরের একদম বাম দিকের ঘরের পাশ দিয়া যে রাস্তা গেছে
সেই রাস্তা ধইরা
আগাইলে চাইর দিকে ধান ক্ষেত, পায়ে হাঁটা আইলের রাস্তা
দূরে চাইর দিকে আরও গ্রাম
ক্ষেতে পাকা ধান যেদিকে কাইত হয়া আছে, সেই দিকে,
অথবা, যুদি ধানের দিন না হয়,
যেদিকে বাতাস বয় সেই দিকে গেলে পাঁচটা বাড়ির ভিটা দেখা যাইব,
তিনটা ভিটা সামনে দুইটা পিছনে,
পিছনের দুইটা বাড়ির ডালিম গাছওয়ালা বাড়ি।

এই পথনির্দেশ যত সহজ মনে হয়, আসলে তা নয়। বিশেষ করে 'দুপুর বেলা যেদিকে ছেওয়া পড়ে তার উল্টা দিকে, ছেওয়া না থাকলে, যেদিকে হাঁটলে পায়ের তলায় আরাম লাগে সেইদিকে' অথবা 'ক্ষেতে পাকা ধান যেদিকে কাইত হয়া আছে, সেই দিকে, অথবা, যুদি ধানের দিন না হয়, যেদিকে বাতাস বয় সেই দিকে গেলে'— এইরকম বিভ্রান্তিকর, অদ্ভুত, বিচিত্র পথনির্দেশনা মেনে কীভাবে কাঙ্ক্ষিত নারীর কাছে পৌঁছানো সম্ভব! বাতাস কি একদিকে বয়? পাকা ধান কি কেবল একদিকেই কাত হয়ে থাকে? কোনদিকে হাঁটলে পায়ের তলায় আরাম লাগে সেটি নির্ণয় করা কি সহজ কাজ? সহজ নয় বলেই বিষয়টি ঝামেলা পাকায়। আব্দুল করিম দিনের এমন এক সময় ওই সাঁকোর ওপর দিয়ে পার হয়, যখন 'ছায়া দেহের মায়া ত্যাগ করে দূরে যেতে চায় না' অর্থাৎ মধ্যদুপুর, তখন তার সামনে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি খতিয়ে দেখা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। অর্থাৎ কোনদিকে গেলে পায়ের তলায় আরাম লাগবে সেটিই তাকে নির্ণয় করতে হবে এখন। কিন্তু সেটি টের পেতে হলে তো জুতো খুলতে হবে, আর জুতো খুলতে গিয়ে আব্দুল করিম ফিতের উল্টো দিকে দিয়ে টান দিয়ে একটা বিষ গেরো পাকিয়ে ফেলে। অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর বিষ গেরো খুলে জুতো খুলতে সক্ষম হলেও, সে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ফিরে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিয় পাঠক, আপনার কি মনে হয়, এই পথনির্দেশ অনুসরণ করে কেউ কোনোদিন কোথাও পৌঁছাতে পারবে? কিন্তু তারচেয়ে বড় প্রশ্ন, একটি প্রায়-অসম্ভব পথনির্দেশ অনুসরণ করে এত দূর পর্যন্ত গিয়েও সে অকস্মাৎ ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয় কেন? তার এই আচরণের অর্থ কী? আর ফিরেই যদি আসবে তাহলে এতদিন ধরে সে শেফালির কাছে যাওয়ার এই তীব্র আকুলতা প্রকাশ করেছিল কেন? কেনই বা সত্যি সত্যি শেফালির সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল? প্রশ্নটি তুলে রাখলাম, উত্তর সন্ধানটি পরে করা যাক। তার আগে আরেকটি উদাহরণ।

২

'ডলু নদীর হাওয়া' গল্পে তৈমুর আলি চৌধুরী বাধ্য হয়ে একটি শর্ত বা চুক্তি মেনে নিয়ে মগ কন্যা সমর্তবানু ওরফে এলাচিংকে বিয়ে করে। চুক্তিটি হলো— সমর্ত তার স্বামীকে 'জহর' (বিষ) দিয়ে মারবে। এবং কথাটি যে কেবল কথার কথা নয়, এটা যে সে সত্যিই করতে চায় সেটি সে প্রমাণ করে বাসর রাতেই। দুটো বিড়ালকে পায়েস খেতে দিলে এর একটি মারা যায় (অর্থাৎ সেটিতে বিষ মেশানো ছিল), অন্যটি তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। এরকম কাণ্ড সে পরেও আরেকবার করে বিড়াল বা কুকুর মেরে। অতঃপর তৈমুর আলি চৌধুরীকে বাধ্য হয়েই এই 'খেলায়' অংশগ্রহণ করতে হয়। সমর্তবানু তার স্বামীকে প্রতিদিন দুটো গ্লাস এগিয়ে দেয়, যার একটিতে বিষ, আরেকটিতে বিশুদ্ধ পানি। চল্লিশ বছর ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই ভয়ংকর 'খেলা' চলে এবং তৈমুর আলি নির্ভুলভাবে প্রতিদিনই পানির গ্লাসটি তুলে নেয়। এর মানে কি? সমর্তবানুর এই আচরণের ব্যাখ্যা কি? সে কি প্রতিশোধ নেয়, যেহেতু এই বিয়েতে সে সম্মত ছিল না, নিতান্তই বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে? তৈমুর আলিই বা কী করে নির্ভুলভাবে প্রতিদিনই পানির গ্লাসটি তুলে নেয়? কেন কখনোই তার হাতে বিষের গ্লাসটি উঠে আসে না? এটি কীভাবে সম্ভব? এর ব্যাখ্যা কী? দুটো গদ্দাসের একটিতে সত্যিই বিষ ছিল কী না, সেই সন্দেহ তৈমুর আলির যেমন জাগে, পাঠকের মনেও জাগে। কিন্তু একদিন কৌতূহলবশত দুটো গ্লাসের পানিই একসঙ্গে খেয়ে ফেললে তার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তারপরও সন্দেহটির অবসান হয় না। কারণ সমর্তবানুর আঙুলে যে আঙটিটি ছিল সেটি সত্যিই হীরার কী না সেটি অমিমাংসিতই থেকে যায় (এই হীরার আংটি থেকেই সে 'জহর' তৈরি করতো!)। যদি তা না হয় তাহলে বিয়ের রাতেই কৃত পরীক্ষায় দুটো বিড়ালের একটি মরে গেল কেন? এইসব প্রশ্নও তুলে রেখে আরেকটি গল্পে যাওয়া যাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

'প্রথম বয়ান' গল্পে আব্দুর রহমান কোনো এক সুদূর অতীতে তাদের মহল্লায় যে জায়গাটিতে কেরোসিন বাতি জ্বালানো হতো সেই জায়গাটি খুঁজে মরে। (তখনও মহল্লায় বিদ্যুৎ বাতি আসেনি, কেরোসিন বাতিই জ্বালানো হতো।) এই খোঁজাখুঁজিতে তার জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, সে স্থায়ী মাথাব্যথার রোগীতে পরিণত হয়, তবু বিষয়টি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে না। আসলে সে কী খোঁজে?— 'মহল্লার লোকেরা যখন বলে, আবদুর রহমান মিঞা আদতে কি বিচরায়?– তখন মনে হয় যে, আবদুর রহমান হয়তো অন্য কিছু খোঁজে!' এই কেরোসিন বাতি, বাতিওয়ালা, ইত্যাদি অনুষঙ্গ এমনিতেই ঢাকার পুরনো অধিবাসীদের স্মৃতিকাতর করে তোলে। আব্দুর রহমান কি সেই সূত্রেই শৈশবকে খোঁজে? নাকি ওই ঘটনার সঙ্গে তার জীবনে আসা প্রথম প্রেমটিকে খোঁজে? কারণ, সেই সুদূর কৈশোরে সে আর তার বন্ধু আবুল হোসেন বসে থাকতো, আর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে কেরোসিন বাতিওয়ালা এসে 'খাম্বার' ওপর রাখা বাতি জ্বেলে দিয়ে যেত। কিশোর আব্দুর রহমানের কৌতূহলটা একটু বেশিই ছিল, কারণ সে কেবল বসে বসে দেখেই ক্ষান্ত হতো না, উঠে গিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো। আর সেজন্যই সে প্রথম প্রেমটিকে হারায়। এই দুটো বিষয়কে শহীদুল জহির তাঁর অনবদ্য সংশয়পূর্ণ ভাষায় সম্পর্কিত করেছেন এইভাবে—

> '...তখন একদিন সুপিয়া আকতার যেন কোথায় গেছিল, গেলে ফিরা আসতে হয়, তাই কোত্থেকে যেন সে ফিরা আসে; তার পরনে বোধহয় শাড়ি অথবা হয়তো সালোয়ার কামিজই ছিল, সঙ্গে যেন কে, হয়তো তার আম্মা, না হয় দাদি আম্মা। তারা সেই বিকাল বেলা জোড়পুলের দিক থেকে মহল্লার ভিতর দিয়া হেঁটে আসে এবং তাদের হাতে, হয়তো সুপিয়ার হাতে কিংবা তার মা অথবা দাদির হাতে চম্পা ফুল গাছের একটা ভাঙ্গা ডাল দেখা যায়। কোত্থেকে তারা এই ফুল গাছের ডাল ভেঙ্গে আনে তা বোঝা যায় না, তবে মনে হয় যে, তারা হয়তো কোথাও এই চম্পা ফুল গাছ দেখতে পায় এবং তাদের হয়তো শখ হয়, হয়তো সুপিয়ারই শখ হয়, হয়তো সে গোঁ ধরে, বলে, একটা ঠাইলা ভাইঙ্গা লই?...এই সময়, গ্রাজুয়েট হাই স্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্র, আব্দুর রহমান লুঙ্গির ওপর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে তার ছেলেবেলার প্রিয় বন্ধু আবুল হোসেনের সঙ্গে মন্দিরের নিচা বারান্দায় বসে ছিল; তখন সুপিয়া এবং বোরকা পরা তার আম্মা অথবা দাদি হেঁটে আসে। এতদূর থেকে এই ডাল বয়া আনতে যায়া সুপিয়ার শেষমেষ বাড়ির কাছে এসে কাহিল লাগে, একটা মেয়ের কাহিল লাগতে পারে, ফুলের ডালটা হয়তো ভারি মনে হয়, ফলে সে– অথবা হয়তো তার কাহিল লাগে না, কারণ চম্পা ফুলের একটা চিকন ডাল এবং কয়টা পাতা আর ফুল এমন কি ভারি, তবু সে– আব্দুর রহমান ও আবুল হোসেনের সামনে দিয়া হেঁটে পার হয়া যাওয়ার সময় ডালটা আব্দুর রহমানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোলের ওপর ফালায়া দেয়, এই কাজটা সে তার আম্মা এবং দাদির সামনে এমনভাবে করে যে, মনে হয় সে ডালটা রাস্তার কিনারায় ফালায়া দিল মাত্র, আর কিছু না। হয়তো আর কিছু ছিলও না, অথবা হয়তো ছিল... এই সময় সেই বাত্তিওয়ালা লোকটা আসে... আব্দুর রহমান উঠে গিয়ে তাকায়া থাকে।'

[প্রিয় পাঠক, *ইটালিক* শব্দগুলো লক্ষ্য করুন। যেন এই বর্ণনার মধ্যে যেন সংশয়ের বন্যা বয়ে গেছে। কোনো ব্যাপারেই কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে দেবেন না লেখক, এ যেন তাঁর পণ।]

পরপর তিনদিন এই ঘটনা ঘটে এবং আব্দুর রহমান ঘটনাটির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়। আরও অনেক পরে সুফিয়ার সঙ্গে তার দেখা হলে সুফিয়া তাকে বিষয়টি খুলে বলে যে, কাজটি সুফিয়া ইচ্ছেকৃতভাবেই করতো এবং ফুলের ডালটি তার কোলে ফেলে দেয়ার পর আব্দুর রহমান কী করে সেটা দেখার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষাও করতো সে। কিন্তু আব্দুর রহমান প্রতিদিনই বাতিওয়ালার কাছে চলে গেলে সুফিয়ার তরফ থেকে ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই কথাটি জানার পর—

'আব্দুর রহমানের এই শোক হয়, এবং সে তা অনেকদিন চেপে রাখে, কিন্তু সে মাথা ধরার ব্যারামে আক্রান্ত হয় এবং গোপনে রাস্তার কিনারায় কেরোসিনের বাত্তির জায়গা খোঁজার ছলে হয়রান হয়ে অন্য কিছু খোঁজে।'

কী খোঁজে সে? এ কেমন ধরনের খুঁজে ফেরা যা তার জীবনটিকেই বিপর্যস্ত করে তোলে? শহীদুল জহিরের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আমি তাঁকে এই প্রশ্নটি করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন— 'কী খোঁজে, আমিও ঠিক বলতে পারবো না।... অন্তত আলো-টালোর মতো মহৎ কিছু খোঁজে না, সেটা নিশ্চিত!' তাহলে কী খোঁজে আব্দুর রহমান?

৪.

'চতুর্থ মাত্রা' গল্পের আব্দুল করিম জীবন ও জগতের সাথে সম্পর্কহীন, বিচ্ছিন্ন, বিযুক্ত। সে নিজের ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও যায় না, কেউ তার কাছে আসেও না, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কোনো সম্ভাবনাই যেন তার জীবনে নেই। এই প্রায় ব্যাখ্যাহীন বিমূঢ় বিচ্ছিন্নতার মধ্যে তার সংযোগ ঘটে কেবল দুজনমাত্র মানুষের সঙ্গে। পুরনো কাগজওয়ালা যার কাছে সে প্রতিদিন কাগজ বিক্রির খেলা খেলে, আর কাজের বুয়া যে তার ঘরের কাজগুলো করে দিয়ে যায়। এই সংযোগ তার একাকীত্বকে না ঘুচিয়ে বরং তার বিচ্ছিন্নতাকে আরও প্রকট করে তোলে। কাগজ বিক্রি ছাড়াও আরেকটি কাজ সে নিয়মিতই করে। প্রতিদিন নিজের সংগ্রহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

থেকে কাঁচের গ্লাস ভেঙে দরজার বাইরে রেখে দেয়, আর মহল্লায় কটকটিওয়ালা এলে বালকেরা হল্লা করে সেই ভাঙা কাঁচ দিয়ে কটকটি কেনে, কটকটি ভাগ করা নিয়ে ঝগড়া ও মারামারি করে, এবং পরিশেষে ব্যাপারটা নিয়ে অভিযোগ জানাতে তাদের অভিভাবকেরা তার কাছে আসে। তাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে তার মন খারাপ হয়ে যায়, আর সে ঘরের বাইরে গিয়ে বেঞ্চিতে গিয়ে শুয়ে থাকে, আর ওই সময় একটি মেয়ে ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসে। এ-ও আসলে তার এক খেলা। গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাই, তার সঞ্চিত পুরনো কাগজ ফুরিয়ে গেছে, ভাঙতে ভাঙতে গ্লাসও শেষ। প্রতিদিন গ্লাস ভাঙলে কতদিনই বা অবশিষ্ট থাকতে পারে, প্রতিদিন কাগজ বিক্রি করলেই বা কতদিন থাকে? অতঃপর সে নিজেই আবার কাগজওয়ালার কাছ থেকে কাগজ কিনে আবার তার কাছেই বেচে, কটকটিওয়ালার কাছ থেকে ভাঙা কাঁচের টুকরো কিনে আবার দরজার বাইরে রেখে দেয়। যেন এক চক্র, বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু কেন সে এসব ঘটনা ঘটায়? এই প্রশ্নের সহজ একটা উত্তর যেন পাওয়া যায়, লেখক তাই একটা কৌশল নেন। মেয়েটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তিনি এইভাবে—

> 'মহল্লার লোকদের আচরণে আব্দুল করিমের হয়তো মন খারাপ হয়ে যাবে, কারণ আমরা দেখতে পাব যে, ...অভিভাবকগণ চলে গেলে সে ঘরে না ফিরে, বাসার বেঞ্চের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকবে।... তখন, মহল্লার গলিতে আব্দুল করিমের বাসার সামনে দিয়ে আমরা এক তরুণী অথবা যুবতীকে হেঁটে আসতে দেখব।... আমরা বুঝতে পারব আব্দুল করিম কেন পানি খাওয়ার গ্লাস ক্রমাগতভাবে ভাঙবে; আমরা বুঝতে পারব যে, গ্লাস না ভাঙলে ভূতের গলির বালকেরা কটকটি মিঠাইয়ের জন্য মারামারি করবে না, তারা মারামারি না করলে তাদের পিতারা আব্দুল করিমের সঙ্গে ঝগড়া করতে আসবে না, তারা ঝগড়া করতে না এলে তার মন খারাপ হবে না, তার মন খারাপ না হলে সে বাড়ির প্রাঙ্গণে গলির ধারে বাঁশের খুঁটির ওপর তক্তা বাঁধা বেঞ্চ শুয়ে থাকবে না, এবং তাহলে...'

মনে হয়, যেন ওই মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ-আকাঙ্ক্ষা থেকেই আব্দুল করিম গ্লাস ভেঙে দরজার বাইরে রেখে দেয়ার মতো অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটায়। গ্লাস ভাঙার একটা লেখককৃত কারণ আমরা জানতে পারলেও, কাগজ বিক্রির এই পুনরাবৃত্তিময় খেলাটি সে কেন খেলে? তার এই আচরণের অর্থ কী? কেনই বা সে এরকম বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

'মনোজগতের কাঁটা' গল্পেও অতি অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে থাকে। এই গল্পে আব্দুল আজিজ ব্যাপারির বাড়িতে বারবার সুবোধচন্দ্র নামে এক ভাড়াটিয়া আসে, যার স্ত্রীর নাম স্বপ্না এবং বারবার তারা ওই বাড়ির কুয়োর মধ্যে পড়ে মারা যায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় কীভাবে ঘটনাটি ঘটে তার বিস্তারিত বিবরণ হাজির করেছেন লেখক, এবং তারপরই জানাচ্ছেন কুয়োয় পড়ে মারা যাওয়ার ঘটনাটি আরও একবার ঘটে এর সাত বছর আগে (১৯৬৪ সালে?)। দু-বার একই ঘটনা ঘটার অনেকদিন পর আরেকবার— 'নিঃসন্তান রংবাজ জেনারেলের শাসনকালের শেষদিকে'— যখন মহল্লাবাসী জানতে পারে, ওই বাড়িতে সুবোধচন্দ্র-স্বপ্না দম্পতি আবার ভাড়াটিয়া হিসেবে এসেছে, তাদের মনে হয়— এদেরকে তারা চেনে এবং এদের পরিণতিও তারা জানে। তারা আবার শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং তাদের শঙ্কা সত্য বলে প্রমাণিত হয়— ভারতের অযোধ্যায় মসজিদ ভাঙার প্রতিক্রিয়ায় ভূতের গলির সুবোধচন্দ্র-স্বপ্না দম্পতি কুয়োয় পড়ে মারা যায়। এটা কীভাবে সম্ভব? একই দম্পতি বারবার কুয়োয় পড়ে মারা যায়, আবার ফিরেও আসে, এর ব্যাখ্যা কী? সময় কি এখানে চক্রাকারে ঘুরছে? আর তাই একই ঘটনা ফিরে ফিরে আসছে? এই গল্পটি থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে চাই, নইলে এই ঘটনার ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে পড়বে। গল্পের শুরুর দিকে লেখক জানাচ্ছেন—

> 'ভূতের গলির লোকেরা এরকম সন্দেহ করে যে, তারা সময়ের একটি চক্রাবর্তের ভেতর আটকা পড়ে গেছে।...তারা দেখতে পায় যে, তাদের জীবনে সময়ের কাঠামোটি ভেঙে পড়েছে, বর্তমান অতীতের ভেতর প্রবিষ্ট হয়ে গেছে অথবা অতীত, ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই বিভ্রান্তির ভেতর তারা সেদিন মাটি কেটে কুয়ো ভরাট করার কাজ করে, কারণ, তা না করলে, তাদের এরকম ধারণা হয় যে, আব্দুল আজিজ ব্যাপারির নূতন ভাড়াটে সুবোধচন্দ্র অতীতে, বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে এই কুয়োর ভেতর পড়ে যাবে।'

আবার শেষের দিকে এসে এই একই বিষয় নিয়ে তিনি বলছেন—

> এরপর কোনো এক সময় ভূতের গলির লোকেরা সময়ের এক জটিল গোলক ধাঁধার ভেতর প্রবেশ করে, কারণ, দেখা যায় যে, তারা স্বপ্নার বানানো নিমকপারা খাওয়ার কথা ভুলে যেতে পারে না এবং তাদের এই কথাটি সর্বদা মনে পড়ে যে, সুবোধচন্দ্রকে তারা ক্রমাগতভাবে বলেছিল, ডরায়েন না, কিন্তু সুবোধচন্দ্র এবং তার স্ত্রী ক্রমাগতভাবে মহল্লার কুয়োর মধ্যে পতিত হয় অথবা তারাই তাদেরকে ফেলে দেয়; তখন মহল্লার লোকদের পুনরায় বিষণ্ন লাগে এবং গ্লানিবোধ হয় এবং তখন কোনো একদিন মহল্লার একদল লোক কোদাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে আব্দুল আজিজ ব্যাপারির বাড়িতে গিয়ে হাজির হয় এবং তাদের জীবনের সবচাইতে বড় বিভ্রান্তির ভেতর প্রবেশ করে এবং তাদের মনে হয় যে, তাদের জীবনে সময়ের কাঠামোটি ভেঙে পড়েছে...

তাদের এরকম মনে হয়, কারণ, বড়িওয়ালা আব্দুল আজিজ ব্যাপারি সুবোধচন্দ্র বা তার স্ত্রীকে সনাক্ত করতে পারে না, এবং তার বাড়িতে কোনো কুয়ো আছে বলেও স্বীকার করে না। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণও তারা দেখতে পায়। ফলে—

তারা আবিষ্কার করে তখনও পর্যন্ত মহল্লায় হয়তো সুবোধচন্দ্র আসে নাই, দেশ স্বাধীন হয় নাই, এবং অযোধ্যায় মসজিদও ভাঙা হয় নাই; কিন্তু তখন, একইসঙ্গে তারা সুবোধচন্দ্রের ক্রমাগতভাবে কুয়োর ভেতর পড়ে যাওয়ার ঘটনার কথা মনে করতে পারে এবং তারা খুবই বিচলিত এবং গ্লানিবোধ করে এবং তারা বিভ্রান্ত হয়। তারা সময়ের কোন তলে আছে তা তারা বুঝতে পারে না, কিন্তু যে নিমকপারা তারা খেয়েছিল অথবা খাবে তার স্বাদের কথা তারা ভুলতে পারে না, এবং ভয় না পাওয়ার যে কথা তারা সুবোধচন্দ্রকে বলেছিল বা বলবে, তার ব্যর্থতার স্মৃতি তাদেরকে এমনভাবে পীড়ন করে যে, তারা আব্দুল আজিজ ব্যাপারিকে বলে, আপনের এই কুয়া আমরা বুজায়া ফালামু, এবং তার বাধা উপেক্ষা করে তার চোখের সামনে মাটি কেটে কুয়ো বুজিয়ে ফেলে... এই বিভ্রান্তির ভেতর তাদের এরকম মনে হয় যে, তারা হয়তো কোনো এক জায়গায় কোনো এক স্বপ্নের ভেতর আটকা পড়ে আছে এবং এই স্বপ্নের ভেতর তারা অতীত থেকে ভবিষ্যতে অথবা ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে; এবং তাদের মনে হয় যে, সুবোধ ও স্বপ্নার বিষয়টি হয়তো সত্য নয়, স্বপ্ন; কিন্তু তখন তাদের আব্দুল আজিজ ব্যাপারির বাড়ির প্রাঙ্গণে লাগানো স্বপ্নার তুলসী গাছটির কথা মনে পড়ে, তারা আজিজ ব্যাপারির বাড়িতে যায় এবং দেয়ালের কিনারায় মৃদু বাতাসের ভেতর তুলসি গাছটিকে দেখে; এবং তাদের কুয়োটির কথা মনে পড়ে।

সময় নিয়ে এই আশ্চর্য বিভ্রান্তিরই বা অর্থ কী? কীভাবে ব্যাখ্যা করবো আমরা এই জটিল বিভ্রান্তিকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. ক

এতক্ষণ ধরে শুধু প্রশ্ন উত্থাপন করেছি, এবার বিষয়গুলোর সুরাহা করার চেষ্টা করা যাক।

'কোথায় পাব তারে' গল্পের প্রায় পুরোটা জুড়ে 'ময়মনসিং' বা 'শেপালির' কাছে যাবার জন্যে আব্দুল করিমের যে তীব্র আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে, তা আসলে প্রেমের কাছে যাবার জন্য তার আকুলতা। এই প্রেমই তার বেকার ও গঞ্জনামুখর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। সেই ইঙ্গিতও আছে গল্পে— 'এটা আব্দুল করিমের একটা খেলাই, এবং সে হয়তো নিজের সঙ্গেই খেলে, শেফালি এবং ময়মনসিং বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে সে হয়তো তার জীবনের কর্মহীনতার ভেতর এই এক অবলম্বন গড়ে তোলে।' শুধু তাই নয়, তার এই প্রেম মহল্লাবাসীর মধ্যেও ঈর্ষার জন্ম দেয়— 'মহল্লার লোকদের রাতের ঘুম বিঘ্নিত হয়, সারা দিনের কর্মক্লান্ত দেহ নিয়ে তারা বিছানায় জেগে থাকে, জীবনের ব্যর্থতা এবং অপচয় বোধ তাদেরকে গ্রাস করতে উদ্যত হয় এবং তারা কেমন বিষণ্ন হয়ে পড়ে; তাদের মনে হয় যে, বেকার থাকাই তো ভাল আব্দুল করিমের মতো!' এ হচ্ছে প্রেমহীন মানুষের বেদনা ও হাহাকারের গল্প। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়— আব্দুল করিম এতদূর পর্যন্ত গিয়েও ফিরে আসে কেন? কারণ, আমার মনে হয়, সে একসময় বুঝে যায়— আসলে ওখানে পৌঁছানো যাবে না। প্রেম তার জন্য নয়। সে হয়তো কোনো এক অনির্ণেয় কারণে সেটা পেতেও চায় না। প্রেম পাওয়া নয়, প্রেমের সন্ধান করাটাই তার কাছে জীবন। শুধু তার কাছেই নয়, হয়তো সবার কাছেই। আমরা সবাই হয়তো একটি প্রেমের সন্ধান করতে করতেই জীবন কাটিয়ে দিই। কেউ হয়তো পায়, কেউ কখনোই পায় না। আব্দুল করিম না পাওয়ার দলে।

৬. খ

'ডলু নদীর হাওয়া' গল্পের বিষয়টিকে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করবো? এক কথায় বলা যায়— প্রেম ও দাম্পত্য জীবন। যে তীব্র প্রেম তৈমুর আলিকে মগ কন্যা সমর্তবানুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল (হয়তো সেই প্রেমের কেন্দ্রে ছিল এই যৌবনবতী কন্যার শরীর, তবু, প্রেম তো!), সেই প্রেমকে দাম্পত্য জীবনে রূপ দেয়াটা ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত। প্রেম ও সংসার, বা প্রেম ও দাম্পত্য জীবন তো আসলে প্রায় পরস্পরবিরোধী ব্যাপার, একসঙ্গে যেতেই চায় না। সংসারের নানা খুঁটিনাটি, নানা জটিলতা, গতানুগতিক-দৈনন্দিন জীবনের অসহ্য পৌনঃপুনিকতা, একই সংসার-বৃত্তে বারবার ফিরে যাওয়ার দুঃসহ বাধ্যবাধকতা, অনতিক্রম্য গণ্ডিবদ্ধতা— এই সবকিছুতে প্রেম আর থাকে না, থাকে বিশুদ্ধ যন্ত্রণা। কিন্তু শুধু কি যন্ত্রণাই থাকে, আর কিছু নয়? হয়তো থাকে, কিন্তু তা ওই পানির মতোই সাদামাটা, প্রয়োজনীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু বর্ণহীন! এই বিষয়টিকেই শহীদুল জহির উপস্থাপন করলেন পানি ও বিষের আদলে। অর্থাৎ আপনি যদি সংসার-জীবনে প্রবেশ করেন তাহলে প্রতিদিনই আপনাকে অপ্রতিরোধ্যভাবে বিষের মুখোমুখি হতে হবে, এবং আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আপনি ওই বিষ পান করে মুক্তি লাভ করবেন (গল্পের শেষে তৈমুর আলি সেটিই করে। এ তো মৃত্যু নয়, যেন দুঃসহ গণ্ডি থেকে অলৌকিক মুক্তি!), নাকি পানি পান করার মতো সাদামাটা জীবনযাপন করে যাবেন! দাম্পত্য জীবন যাপন না করেও শহীদুল জহির এই জীবনের গূঢ় সত্য যেভাবে উন্মোচন করলেন, তার দ্বিতীয় উদাহরণ অন্তত আমার চোখে আর পড়েনি।

৬. গ

'প্রথম বয়ান' গল্পের আব্দুর রহমান আসলে কী খোঁজে? তার হারিয়ে যাওয়া সোনার শৈশব? তার প্রথম প্রেম? নাকি শৈশব আর প্রথম প্রেম খোঁজার ছলে সে আসলে সরলতার কাছে ফেরার উপায় খোঁজে? সরলতার কাছে ফেরার আকাঙ্ক্ষা তো মানুষের মৌলিক আকাঙ্ক্ষা। যে নিস্পাপ-নিষ্কলুষ সহজতা-সরলতা দিয়ে বর্ণিল করে সাজানো থাকে আমাদের শৈশব-কৈশোর, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তো তার মৃত্যুই ঘটে যায়। বাড়ে জটিলতা, বাড়ে দুঃখবোধ। এই জটিলতাপূর্ণ জীবন-যাপনের ভেতরে একটি চম্পা গাছের ডালের মধ্যে লুকায়িত প্রেমকে কী আশ্চর্য সরল আর মোহনীয় একটি ঘটনা বলে মনে হতে পারে, ভেবে দেখুন প্রিয় পাঠক!

৬. ঘ

'চতুর্থ মাত্রা' এবং 'মনোজগতের কাঁটা' গল্প দুটোকে পাশাপাশি রেখে বিচার করে দেখা যাক।

'চতুর্থ মাত্রা' গল্পের আব্দুল করিম যেসব অদ্ভুত কাণ্ড করে তার কারণ কী? একটি কারণ হতে পারে, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা। নাগরিক জীবনে আমরা যে অ্যাবসার্ডিটির মধ্যে বাস করি, এটি তারই এক শিল্পিত প্রকাশ। বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা নাগরিক জীবনের অনিবার্য উপাদান, সেই বিচ্ছিন্নতা আবার এমন স্তরের যে, কারো সঙ্গেই কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের পদ্ধতি বা ভাষা আমাদের জানা নেই। অথচ মানুষের যোগাযোগের আকাঙ্ক্ষাটি তার অন্য অনেক আকাঙ্ক্ষার মতোই এক মৌলিক আকাঙ্ক্ষা। আর সেটি আছে বলেই আমরা ক্রমাগত যোগাযোগের চেষ্টা করে যাই। কিন্তু এ ছাড়াও এ গল্পের অন্য একটি গুরুত্ব আছে। শহীদুল জহির তাঁর অনেক লেখাতেই টাইম-ফ্রেমের ধারণাকে ভেঙে দিয়েছেন— অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে এক যাদুকরি ভাষায় মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছেন। কখনো-কখনো তাই দেখি, বর্তমানের ঘটনা বর্ণনা করে তিনি যখন অতীতের ঘটনায় ফিরে যাচ্ছেন, তখন একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেমিকোলন(;)দিয়ে 'ফলে' এই শব্দটি ব্যবহার করে বর্তমান-অতীতের সংযোগটি স্থাপন করছেন। যেন অতীতের ঘটনাটি ঘটছে বর্তমানের এই ঘটনার প্রেক্ষিতে। অথচ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কালের ধারণাটি ঠিক উল্টো। আমরা ভাবি যে, বর্তমানের ঘটনা ঘটে অতীতের ঘটনার প্রেক্ষিতে। (তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'মুখের দিকে দেখি'-তে তিনি এই কাজটি সবচেয়ে কুশলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন।) কিন্তু এই গল্পে এবং 'মনোজগতের কাঁটা' গল্পে আরও প্রকটভাবে, তিনি শুধু টাইম-ফ্রেমই নয়, সময়ের ধারণা পর্যন্ত বদলে দিয়েছেন। সময়কে ভাবা হয় একরৈখিক, শুধু সামনের দিকেই যার যাত্রা। কিন্তু ভারতবর্ষে বহুকাল আগে এমন একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে, সময় বৃত্তাকার। অর্থাৎ সময় নিজেই তার সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর ফিরিয়ে আনে। শহীদুল জহির এই ধারণাটিকেই ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর লেখায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এই বৃত্তাকার সময়ের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও হতে পারে। তাঁর 'চতুর্থমাত্রা' গল্পটি পড়লেই ব্যাপারটা ভালোভাবে বোঝা যায় । বিজ্ঞানের ভাষায় সময়কেই চতুর্থ মাত্রা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। তিনি যে বিষয়টি জানতেন না তা তো নয়, না জানলে 'চতুর্থ মাত্রা' শব্দটিই তিনি ব্যবহার করতেন না। তো, এই গল্পেও ওই পুনরাবৃত্তির খেলা। যেন একই সময় বারবার ফিরে ফিরে আসছে। কিন্তু বৃত্তাকার সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটি পরিষ্কার নয় বলেই তাঁর গল্প আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে। সময় বৃত্তাকার বলেই তাঁর গল্পের ঘটনাগুলো এত পুনরাবৃত্তিময়— এটি যদি আমরা মেনেও নিই, তাহলেও পাঠকরা একটি সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। সেটি হলো— ঘটনাগুলো বারবার ফিরে ফিরে এলেও হুবহু একই রূপে ফিরে আসে না কেন? কেন সামান্য একটু পরিবর্তিত রূপে ফিরে আসে? এর উত্তর পাওয়া যাবে ওই বৃত্তের চরিত্রের মধ্যেই। একটি বৃত্ত একটি পূর্ণ চক্র পূরণ করার পর দ্বিতীয় পরিক্রমণ শুরু করে, কিন্তু এই দ্বিতীয় চক্রটি হুবহু প্রথমটির মতো হয় না, (যদিও সাদৃশ্যটি এতই বেশি থাকে যে অভিনিবেশি পাঠক ছাড়া পার্থক্যটুকু বুঝতেই পারবেন না), কারণ প্রথম চক্র ও দ্বিতীয় চক্রের মধ্যে একটি সময়ের পার্থক্য ঘটে যায়। আর আমরা তো জানিই, সময়ের পার্থক্য ঘটলে দুটো সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনার মধ্যে সূক্ষ হলেও একটি পার্থক্য থাকবেই। 'মনোজগতের কাঁটা' গল্পে এই পার্থক্যটি ধরা পড়ে, যখন দেখি প্রথম সুবোধচন্দ্র-স্বপ্না দম্পতির বাড়ি নারায়ণগঞ্জ, দ্বিতীয় সুবোধচন্দ্র-স্বপ্না দম্পতির বাড়ি সাতক্ষীরায়, তৃতীয় সুবোধচন্দ্র-স্বপ্না দম্পতির বাড়ি সিরাজগঞ্জ। এই সূক্ষ পার্থক্যটুকু ছাড়া তাদের সবকিছুই এক, তাদের জীবনযাপন, বাস্তবতা, আচার ব্যবহার, এমনকি এই তিন সুবোধচন্দ্রর ছোট ভাইয়ের নামও এক– পরাণ! এবং গল্পে এই পার্থক্যটুকু এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যে, পাঠকের চোখ এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু এই গল্পের অন্য একটি ব্যাখ্যাও দেয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। গল্পের শেষ দিকে এমন একটি বিভ্রান্তিতে পড়ে মহল্লাবাসীরা যে, এইসব ঘটনা আদৌ ঘটেনি। বিভ্রান্ত হন পাঠকরাও। আদতেই কি ঘটেনি এইসব? কিন্তু তাদের যে স্বপ্নার হাতে 'নেমকপারা' খাওয়ার কথা মনে পড়ে, তুলসিগাছের কথা মনে পড়ে, সুবোধচন্দ্রকে অভয় দেয়ার কথা মনে পড়ে, এবং তাদের কুয়োর মধ্যে পড়ে যাওয়ার কিংবা তাদেরকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়ার কথা মনে পড়ে! কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এই বিভ্রান্তির? লক্ষণীয় বিষয় যে, এই কুয়োর মধ্যে পড়ে যাওয়ার ঘটনাটি তিনবার ঘটে তিনটি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সময়— একটি ১৯৬৪, একটি ১৯৭১, এবং শেষেরটি একটি 'নিঃসন্তান রংবাজ জেনারেলের শাসনকালের শেষদিকে' যখন 'অযোধ্যায় মসজিদ ভাঙার' ঘটনা ঘটে। এই পড়ে যাওয়া বা ফেলে দেওয়া আসলে মহল্লাবাসীর মনোজগতেই ঘটে। একটি সম্প্রদায়ের মনোজগতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ এমন সংগোপনে লুকায়িত থাকে যে, সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় সেটি প্রকাশিতই হয় না, প্রকাশিত হয় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সময়। নিজেদের অবচেতন মনের এই বিষয়টি বুঝতে পারে না বলে এই গল্পের অসহায় চরিত্রগুলো বিষণ্ন বোধ করে, অপরাধবোধে ভোগে। এই বিষণ্নতা আর অপরাধবোধ সচেতন মনের, সাম্প্রদায়িকতার বিষ অবচেতনের। এবং সময়ের চক্রাবর্তের মধ্যে পড়ে যাওয়া এই মানুষগুলোকে দেখে মনে হয়, এই ঘটনা ঘটতেই থাকবে যতদিন পর্যন্ত না মনোজগৎ থেকে ওই কাঁটাটি সরিয়ে ফেলা যাবে, যতদিন পর্যন্ত না ওই সাম্প্রদায়িকতার কুয়োটি বুজিয়ে ফেলা হবে। সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে দুই বাংলায় বহু গল্প লেখা হয়েছে, কিন্তু বিষয়টিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা বা এইরকমভাবে উপস্থাপন করার উদাহরণও দ্বিতীয়টি নেই।

যাহোক, একটি কথা বলে রাখা ভালো— তাঁর গল্পের একমাত্রিক ব্যাখ্যা করা খুবই বিপদজনক, কারণ এর সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা হাজির করলেও সেটিকে ভুল বলে মনে হয় না। এই বহুমাত্রিকতাই শহীদুল জহিরের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই রচনাটিতে যে-সব ব্যাখ্যা হাজির করা হয়েছে, সেগুলো সবই এই লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত। হয়তো অন্য কেউ গল্পগুলোকে অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যা করবেন। হয়তো সেটিও সঠিক ব্যাখ্যা। কারণ, শিল্পের কোনো ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত নয়।

উপসংহারের পরিবর্তে

শহীদুল জহির বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে এক বিস্ময়কর লেখক। এমন আর একজন লেখকও আসেননি দুই বাংলার সাহিত্যে। তাঁর গল্পের (এবং উপন্যাসেরও) বিষয় অভিনব, বর্ণনাকৌশল অভূতপূর্ব, নির্মাণশৈলী বিস্ময়কর। তাঁর প্রতিভাকে 'যাদুবাস্তবতা'র মতো বহুল ব্যবহৃত ক্লিশে একটি শব্দ দিয়ে বর্ণনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার চেষ্টা করা হয়েছে বরাবর, কখনো খুঁজে দেখা হয়নি এই শব্দবন্ধ দিয়ে আসলে কী বোঝানো হয়। আমাদের জনজীবন, আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা, বিশেষ করে পুরনো ঢাকার মানুষ ও তাদের জীবনকে তিনি বরাবর উপস্থাপন করেছেন এক কৌতুকপূর্ণ ভঙ্গিতে, কিন্তু এই কৌতুকের মধ্যেই লুকানো থাকে এক গভীর বেদনাবোধ। যে বীভৎস বাস্তবতা তাঁর গল্পের চরিত্রগুলোকে দখল করে রাখে, তারা সেটি কোনোক্রমেই অতিক্রম করে যেতে পারে না, এক অনতিক্রম্য বৃত্তে তারা ঘুরপাক খেতে থাকে, যেন এই মানুষগুলোর জীবন এমনই, গতানুগতিক-পরিবর্তনহীন-সম্ভাবনাহীন-ম্লান-বিষণ্ন। তাদের জন্য বেদনাবোধ ছাড়া একজন সংবেদী কথাশিল্পীর আর কী-ই বা থাকতে পারে।

রচনাকাল : মে, ২০০৮
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০০৮, শালুক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~